

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বি.বি.টি
অমনিবাস



Scanned
by
Atanu
Prepared
by
Abhishek



boirboi.net
বোর্বোইনেট

বই আর
বই

বইটি পরে যদি ভালো লাগে তাহলে **boirboi.net** এর chat box যে এসে
ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না।

କିରାଟୀ ଅମ୍ବନିବାସ

ମୈହେନ୍ଦ୍ରନାଥ୍ ପତ୍ର

ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ

সূচীপত্র

ভূমিকা—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য	১
তাতল সৈকতে	
বনমরালী	১০৩
সুভদ্রা হরণ	১৯৭
বিদ্যুৎ-বহি	২৭৩

ভূমিকা

কিরীটির জন্মের পূর্বে তাঁর জন্মদাতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ‘চোখের জলে’। কাব্য-কাব্য শেনালেও কথাটা সত্য। আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, প্রসঙ্গ সূত্রে নীহারবাবুই সেদিন মনে করিয়ে দিলেন। বছর চলিশেক আগে একবার ‘বার্ষিক শিশুসাধী’র সম্পাদনার ভার পড়েছিল আমার হাতে। অনেক খ্যাতনামা লেখকের লেখা বেরিয়েছিল সেদিনকার এই শারদীয়া কিশোর পত্রিকায়, অচেনা অজানা লেখকের লেখাও কিছু কিছু ছিল। যৌবনের উৎসাহবশে গল্প কবিতা প্রবন্ধ যতগুলি এসেছিল সব নিজে পড়ে বাছাই করেছিলাম, লেখকের নাম বা মুখ দেখে নয় রচনার শুণ বিচার করে। ‘চোখের জল’ গল্পটি যে কিশোর বয়সী একটি ছাত্রের রচনা তা নির্বাচনের সময়ে নয়, পরে জেনেছিলাম।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত নামক মেডিকেল কলেজের প্রথম না দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সেই ছাত্রটিকে কে চিনত? কিন্তু আজ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি সর্বত্র প্রসারিত। জনপ্রিয়তার দিক থেকে কোনও সমকালীন ঔপন্যাসিক তাঁকে অতিক্রম করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

বন্ধুবরের অনুরোধে তাঁর ‘কিবীটি অমনিবাসে’র একটি ভূমিকা লিখে দিতে হবে। তিনি আর্দ্ধকে অগ্রজতুল্য ভাল বাসেন, তাই না বলতে পারিনি: কিন্তু এ কথাও তাঁকে বলেছি, তাঁর রচনাবলীর পক্ষে অন্য কারও ভূমিকা নির্ভুল অবস্থার ও অর্থহীন। বাংলা নাহিত্যের একটি অনতিপৃষ্ঠ লেখাকে তিনি বিচিত্র পুষ্পপল্লবে সাজিয়েছেন। পাঠক তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যশোলাভ করেছেন জনসমাজের কাছে। তাঁর গ্রন্থের পক্ষে সেই কারণে ভূমিকা মাত্রেই বাহ্য মনে করি। তা ছাড়া আরও একটি কথা বলি। ভূমিকা অনেক সময় পৃষ্ঠপোষণের রূপ ধরে। তাতে কি গ্রহ কি গ্রহকার কারও মান বাড়ে না।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত পেশায় ডাক্তার, সাহিত্য তাঁর মেশা, ইংরেজীতে যাকে বলে hobby। ডাক্তার হিসেবে তিনি কত বড় তা জানার প্রয়োজন আমার হয় নি, সে বিচারের যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু নেশার ক্ষেত্রে তিনি যে অপরিমেয় কীর্তি অর্জন করেছেন সে বিষয়ে কারও মনে সংশয় থাকবার কথা নয়। লোকমুখে শুনেছি প্রকাশকরা নাকি কোনও গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর বাড়িতে এলে আগে একটি শিলি নজরানা স্বরূপ তাঁর সামানে রাখেন তারপর তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। এতটা সত্য কিনা জানি না। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার থেকে লেখকের জনপ্রিয়তার মাত্রাটা সহজেই নিরূপণ করা যায়। সরকারী ও বেসরকারী নানা গোষ্ঠীর অন্তিপ্রচল্লম কৃগা এবং অতিপ্রকট বিজ্ঞাপন-প্রিণ্ট যে সকল সাহিত্য-পুরস্কার বিতরণ হয়ে থাকে, পাঠকের হাত থেকে পাঠয়া এই সুবর্ণকীর্ণীটের কাছে তাদের মহিমা নিষ্পত্ত হয়ে যায়। রসিক ব্যক্তিরা সাহিত্যিক সাফল্যের একটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন, ঈর্ষাষ্ঠিত সময়ব্যবসায়ী বন্ধুর সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে পাঠকের কাছে লেখকের জনপ্রিয়তা সেই অনুপাতে বাঢ়ছে বলে বুঝে নিতে হবে। নীহারবাবুর বন্ধুভাগ্য কেমা সেকথা জিজ্ঞাসা করে তাঁকে বিবৃত করব না।

গোয়েন্দা কাহিনী নথকে উন্নাস্ত্বশর দিন গিয়েছে। বিদেশী সাহিত্যে তাঁর প্রমাণ নিত্য পাচ্ছি। শক্তিমান লেখকের হাতে রহস্য-রোগও উচ্চকোটির সাহিত্যরসে সমৃক্ষ

হতে পারে নীহারবাবুর রচনায় তার অবিরল পরিচয় পাই। ‘বৌরাণীর বিল’ গ্রন্থ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি।

‘সবিতা সকলের নিকট হতে দূরে এসে খোলা জানালাটটি... ॥৭৮ন দাঁড়িয়েছিল। পুরু আকাশকে রাঙা করে সূর্যোদয় হচ্ছে। দিগন্তপ্রসারী বৌরাণীর বিলের জলে কে যেন মুঠো মুঠো রাঙা আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। টোধুরী বৎশের সমস্ত পাপ ক্ষালিত করে সর্বপাপঘ দিবাকর যেন উদ্যাচল থেকে শাস্তির মন্ত্র আকাশের মাটিতে জলে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছেন দিক হতে দিগন্তে।

সবিতার দু চোখের কোলে জল।

মৃত পিতাকে স্মরণ করে দুটি হাত একত্র করে সে প্রগাম জানায় : তার পিতার আস্থা যেন শাস্তি পায়। হে সর্বপাপঘ সবিতা—সবিতাকেও ক্ষমা কর।’

‘বৌরাণীর বিল’ প্রথম খণ্ড, কি.অ.

অনুবৃত্ত আর একটি প্রশাস্ত সুন্দর চিত্র বর্তমান খণ্ডেই পাবেন। ৪৪ পৃষ্ঠায়—

—“প্রত্যুষের প্রসন্ন আলোয় সমস্ত অস্তর জুড়ে তার তখন যেন তৈরো রাগের রঙ লেগেছে। জেগেছে সুর।

মেঝেতে বিস্তৃত পুরু গালিচার একপাশে রক্ষিত নিজের তানপুরাটা টেনে নিয়ে কোলের কাছে মেঝেতে গালিচার ওপরই বসে মুরা বাঁজী।

তানপুরার তারে মৃদুমন্দ অঙ্গুলি চালনা করতে করতে সে গুণগুণিয়ে ওঠে—

ধন ধন সুরত কৃষ্ণ মুরারে

সুলছানা গিরিধারী

সব সুন্দর লাগে

অত পিয়ারী।”

নীহারবাবুকে আগে গোয়েন্দা কাহিনী লেখক পরে সাহিত্যিক বলে যাঁরা ভাবেন তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেন। তিনি মৃলত: সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, সাহিত্য-বোদ্ধা। আমরা ভুলে যাই যে গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়াও তিনি অনেক গল্প উপন্যাস, টেক্ষণ নিখেছেন। সে-সব গ্রন্থ সমাদৃত হয়েছে। তাঁর উক্তা নার্মক নাটকটি শতাধিক রাত্রি ধরে অভিনীত হয়েছিল, সেকথা অনেকেরই মনে থাকে না।

জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নাটক অভিনয়ের সূত্রে স্টেজের এবং সাজঘরের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল, ‘সুভদ্রা হরণে’ তার সুন্দর পরিচয় পাই। হরিদাস সামন্তের সাজপোশাক পরা অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে এবং সে-মৃত্যুও এই সাজঘরের। গন্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই ‘নাটকীয়’। নামটির নির্বাচনও বিষয়োপযোগী। এই সামন্তস্য বিধানের কৃতিত্বই কাহিনীটিকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে পটভূমি মিলে গেছে অঙ্গাঙ্গীভাবে।

‘তাতল সৈকতে’র অবিনাশবাবুর চরিত্র-চিত্রণেও লেখক নাটকের সাহায্য নিয়েছেন। বাংলা নাটকের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তার অনেক সাক্ষ্য এখানে মিলবে—

‘অবিনাশ পায়চারি করছেন আর মৃদুকষ্টে আলঙ্গি করে চলেছেন—

নির্ময় মিয়তি। অঙ্গিম সংয়ে

এই মহা বিশ্বরূপ। দেশেৰ।

গুরুদেব!—শ্রমা কর। শ্রমা
কর প্রভু। অস্ত্র আবাহন মন্ত্র
দাও প্রভু ফিরাইয়া মোরে।

... ...
অভিশাপ—বুঝলি মা এ সুরমার অভিশাপ!
সতী নারী দেছে অভিশাপ!” ইত্যাদি

তাতল সৈকতে, পৃ: ৭৪

অভিনেতা রূপে দেখানোর জন্যে তাঁর মুখ দিয়ে আমাদের অতি পরিচিত নাটকের কথাগুলি বারংবার শোনানোর তাৎপর্যটি লক্ষণীয়।

গোরেন্দু উপন্যাসে অঙ্গ জায়গায় অনেকগুলি চরিত্রের ভিড় হয়, গঞ্জের প্রয়োজনেই হয়। কে কখন কোথায় গেল কি করল কি বলল তা পাঠকের মনে রাখা কঠিন। অনেক লেখক পাঠকের স্মৃতিকে সাহায্য করেন চরিত্রের নামগুলির মধ্যে বিশেষত্ত্ব আরোপ করে। ‘তাতল সৈকতে’ গ্রন্থে মহাভারতের দুঃশাসন দুর্ঘোধন শকুনি গান্ধারী ইত্যাদি নামগুলির প্রয়োগ যে নির্বার্থক নয় বুদ্ধিমান পাঠক সেটা বুঝতে পারবেন।

লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত সম্বন্ধে একটা অভিযোগ—তিনি যাঁর কাছে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছেন তাঁর নাম একবারও উল্লেখ করেন নি। অথচ এই ব্যক্তিটি অলঙ্ক্ষে থেকে তাঁর নানা গ্রন্থ অধ্যয়নলক্ষ বিদ্যা, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি এবং দেশবিদেশ পরিঅভ্যন্তরের ফলস্বরূপ অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে আছেন। তাঁর নাম ডাঙ্কাৰ এন. আৱ. গুপ্ত। কিৱীটীর রংটা দিয়ে তাঁকে ঠিক চেনা যাবে না। কিন্তু কিৱীটীর মুখে এবং চরিত্রে ডাঙ্কাৰ গুপ্তের আদলটা তাঁদের চোখে সহজেই ধৰা পড়বে যাঁৰা উভয়কে অন্তরঙ্গভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

তাতলি সৈকতে

॥ এক ॥

মানুষের জীবনে এমন এক প্রকাট ঘটনা দৈবত ঘটে যায় যা একটা দুঃস্বপ্নের মতই যেন বাকি জীবনে কখনই সে ভুলতে পারে না। ডাঃ সমর সেনও তার জীবনের এক মধ্যরাত্রির অনুরূপ একটি ঘটনা আজ পর্যন্ত ভুলতে তো পারেইনি, এমন কি আজও যেন মধ্যে মধ্যে তার নিদ্রার ব্যাপাত ঘটিয়ে তার মনের মধ্যে অঙ্গুত এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। মধ্যে মধ্যে আঙ্গুত নিদ্রার ঘোরে যেন ডাঃ সমর সেনকে সেই দুঃস্বপ্নটা আতঙ্কিত করে তোলে।

মনে কৈ অঙ্ককারের মধ্যে যেন কে তার দিকে চেয়ে আছে।

গুলুকহীন, হিঁর নিষ্কম্প, বিভীষিকাময় দুই চক্ষুর কঠিন মৌন দৃষ্টি যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে। এ দৃষ্টি যেন এ জগতের নয়, কোন প্রেতলোকের বায়বীয় দেহের।

হাড় জাগানো বলিবেখাক্ষিত মুখ : ফ্যাকাশে রক্তহীন লোল চর্ম। বিস্রস্ত কাঁচাপাকা চুলগুলি বলিবেখাক্ষিত কপালের উপরে নেমে এসেছে।

আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই লোকটির বক্ষে সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে একখানি কালো বাঁটওয়ালা ছোরা।

ডাঃ সমর সেনের ঘুমটা আজও আবার ভেঙ্গে গেল।

নিষ্ঠুর মধ্যরাত্রি। ঘরের মধ্যে ও বাইরে অঙ্ককার থমথম করছে। নিশ্চিদ্র জমাট কালো কালির মত নিবিড় অঙ্ককার।

তারপরই ডাঃ সমর সেন স্পষ্ট শুনতে পায় বদ্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত করতে করতে কে যেন মৃদু কঢ়ে ডাকছে, ডাক্তার সাব, ডাক্তার সাব—

কে?

সে রাত্রেও ঠিক অমনি শয়নঘরের বদ্ধ দরজার গায়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট করাঘাতের শব্দে আচমকা ডাক্তারের ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।

একটা জটিল অপারেশনের ব্যাপারে সমস্তটা দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত থেকে পরিশ্রান্ত ডাক্তার তাড়াতাড়ি গিয়ে শয়ার গ্রহণ করেছিল এবং ঘুমিয়েও পড়েছিল।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ ও সেই সঙ্গে কে যেন ডাকছে, সাব, ডাক্তার সাব—

একটা বিক্রী অস্পষ্টির সঙ্গে ডাঃ সেন শয়ার উপর উঠে বসে, কে?

সাব আমি শিবু। একটা জরুরী কল এসেছে।

কল! এত রাত্রে জরুরী কল!

একান্ত বিরক্তচিত্তেই ডাঃ সেন শয়া থেকে মেঝের উপরে নেমে দাঁড়ায়। মাঝের শেষ, তবে বিহার অঞ্চল বলেই শীতের প্রকোপ যেন একটু বেশীই দাঁত বসায়। খাটের বাজু থেকে গরম ড্রেসিং গাউনটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপাতে চাপাতে বিরক্তির সঙ্গেই ঘরের দ্বার অর্গল-মুক্ত করে বাইরে এসে দাঁড়াল, কে? কোথা থেকে কল এসেছে?

একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছে সাহেব। আমি বাইরের ঘরে বসতে দিয়েছি—
বিনীতভাবে ভৃত্য শিবদাস বলে।

শিবদাস ডাক্তারের কমবাইড় হ্যাণ্ড।

ডাঃ সেন বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

একতলা বাংলো প্যাটার্নের ছোটখাটো বাড়িটা। সামনে ও পেছনের দিকে নাতি প্রশস্ত
বারান্দা, বারান্দা অতিক্রম করে ভাঙ্গার ঘরের সামনে এসে ভারী পদ্ধিটা তুলে ভিতরে
চুকল। ঘরের অত্যুজ্জ্বল অঙ্গোয় ডাঃ সেন আগস্টকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

গলাবঙ্গ কালো বাঁকের একটা কোট গায়ে, মাথায় উলের মাফি ক্যাপ এক বৃক্ষ
ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে একটা সোফার উপর পা তুলে দিয়ে শীতে জবুরু ভাবে বসে।
ডাঃ সেনের অদশকে লোকটি উঠে দাঁড়ায় : নমস্কার। আপনিই বোধ হয় ডাঃ সেন?
হ্যাঁ।

বলছিলাম কি, এখুনি আজ্ঞে, আপনাকে একটিদ্বার ত্রীনিলয়ে যেতে হবে।

ত্রীনিলয়! কার বাড়ি? ভাকুঝিত করে ডাঙ্গার প্রশ্ন করে।

বলছিলাম কি, সাত-সাতটা কোল মাইনসের প্রোপ্রাইটার রায় বাহাদুর দুর্যোধন
চৌধুরীর নাম শোনেননি আজ্ঞে?

না। শোনবার সৌভাগ্য হয়নি। একটু ব্যগ্রভরেই যেন জবাবটা দেয় ডাঃ সেন। তা
কেস্টা কি, কারই বা অসুখ?

বলছিলাম কি, অধীন সামান্য ত্বকীলদার। সংবাদ তো জানি না আজ্ঞে, তবে
রায়বাহাদুরেরই অসুখ—তিনিই আজ্ঞে রোগী।

হ্যাঁ। এখান থেকে আপনার ত্রীনিলয় কতদূর?

তা মাইল দশক পথ হবে।

ফিস্ কিন্তু আড়াইশো টাকা নেব।

তাই পাবেন। বলছিলাম কি, একটু তাড়াতাড়ি করলে—

বসুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি আসছি।

ডাঙ্গার ঘর হতে বের হয়ে গেল।

লোকটিকে বাইরের ঘরে বসতে বলে শয়নঘরে চুকে বেশ বদলাতে বদলাতে ডাঙ্গার
কলাটির কথাই ভাবছিল।

সত্যি কথা বলতে কি ডাঙ্গার একটু যেন বিস্মিতই হয়। এ তল্পাটে আড়াইশো টাকা
ফিস এক কথায় দিতে রাজি হয়। তাছাড়া ডাঃ সেন বৎসরখনেক হয় এখানে এসে
প্র্যাকটিস্ শুরু করেছে, কিন্তু কই রায়বাহাদুর দুর্যোধন চৌধুরী বা ত্রীনিলয়ের নাম
ইতিপূর্বে কখনও শনেছে বলে তো মনে পড়ে না। তাই যেন কিছুটা কোতুহল জাগে মনের
মধ্যে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে ডাঙ্গার পুনরায় বসবার ঘরে ফিরে এসে বলে,
চলুন।

আগে সেই বৃক্ষ ও পশ্চাতে ডাঃ সেন তাকে অনুসরণ করে ওরা বাইরে এসে দাঁড়ায়।
আকাশে স্বল্প জ্যোৎস্না পাতলা একটা কুয়াশার আবরণের তলায় যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে
আছে। কুয়াশাছম সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে ডাঙ্গার দেখতে খায় গেটের অন্তিমদূরে
কালো রঙের একখানা সুবৃহৎ প্যার্কার্ড-গাড়িয়ে আছে সুরীকৃত একটা ছায়ার মতই।

বৃক্ষই এগিয়ে গিয়ে গাড়ির সামনে উপবিষ্ট ড্রাইভারকে সম্মোহন করে বলে,
রামনরেশ, দরজাটা খুলে দাও।

ডাক শনেই ড্রাইভার নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিল।

উঠন ডাঙ্গারবাবু।

আগে ডাঙ্কার ও পশ্চাত্তে বৃন্দ গাড়ির মধ্যে উঠে বসে অতঃপর।
গাড়ির দরজা বন্ধ করে দুয়ে রামনরেশও গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।
গাড়ি নিঃশব্দ গতিতে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে মেটাল রোডের উপর
পড়তেই স্পীড নেয় প্রয় ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের কাছাকাছি।

নিষ্ঠক মদু বয়াগা ঘেরা, স্বল্প চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রি।
মেটালে বাঁজানো মসৃণ উচু-নীচু পাহাড়ী পথ।
সুতীর হেড লাইটের আলো ফেলে গাড়ি ছুটছে ছ ছ করে গন্তব্যপথে।
চামড়ার পকেট থেকে চামড়ার সিগার কেসটা বের করে একটা সিগারে অগ্নি-সংযোগ
করত্ব।

জুলন্ত সিগারে গোটা দুই টান দিয়ে পাশে উপবিষ্ট বৃন্দের দিকে আড়চোখে একবার
তাকিয়ে মদু কঠে প্রশ্ন করল, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

বিলক্ষণ। শ্রীকুণ্ডলেশ্বর শর্মা। বান্ধন, বারেন্দ্র শ্রেণী—কাশ্যপ গোত্র—
ভদ্রলোকের নামের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের পরিচয়টা পর্যন্ত পেয়ে ডাঙ্কার যে একটু
বিশ্বিত হয়নি তা নয়। তাই কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করেই থাকে। তারপর আবার প্রশ্ন
করে, ছঁ, আচ্ছা কুণ্ডলেশ্বরবাবু, রায়বাহাদুরের অসুখটা কি কিছুই জানেন না আপনি?

বলছিলাম কি আজ্জে, জানিও বটে আবার জানি নাও বটে।

কুণ্ডলেশ্বরের কথায় ডাঙ্কার এবার যেন একটু বেশী কৌতুহলী হয়ে ওঠে এবং
অন্তরের কৌতুহলটা চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করে, কি রকম? জানেন অথচ আবার
জানেনও না!

আজ্জে তাই।

হঁ, তা কতদিন রায়বাহাদুরের ওখানে কাজ করছেন?

তা বিশ বৎসর। হ্যাঁ, তা বলছিলাম কি, তাই হবে বইকি।

ওঁ, তবে তো অনেক দিন আছেন। অনেক দিনকার পুরনো লোক আপনি।

তা তো বটেই। তবে বলছিলাম কি আজ্জে, নিজে যখন যাচ্ছেন সবই তো আজ্জে
স্বচক্ষে দেখবেন আর জানতেও পারবেন আজ্জে।

ডাঃ সেন বুঝতে পারে যে কোন কারণেই হোক কুণ্ডলেশ্বর রায়বাহাদুরের বোগের
সংবাদটি তাকে দিতে ইচ্ছুক নয় আপাতত।

এরপর আর পীড়াপীড়ি করাটা শোভন দেখায় না, অতএব নিঃশব্দে সে ধূমপানকৃত
করতে থাকে।

ইউরোপ থেকে বছ কঠে নিজের চেষ্টায় এফ.আর.সি.এস হয়ে এসে কলকাতা শহরে
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হয় ডাঃ সমর সেন নবীন উদ্যানেও আশায়। কিন্তু
দু বছর ধৈর্য ধরে থেকেও যখন প্র্যাক্টিসের ব্যাপারে বিশেষ কোন সুবিধাই করতে
পারল না ডাঃ সমর সেন—এবং প্রায় উপবাসের সামগ্ৰি—অর্ধাং যে বস্তুটি হলে
সুলভাবে এ জগতে বেঁচে থাকা চলে সেই অর্থের অনটেন্টা ক্ৰমশ এমন জটিল হয়ে
উঠতে সাগল যে উপবাসও বটে, সেই সঙ্গে অস্তিত্বকুণ্ড যাবার যোগাড় তখন বিলাতি
থেতাবটা পকেটস্টু করে এক প্রকার বাধ্য হয়েই মহানগৰীৰ মায়া ত্যাগ করেছিল সে।
তারপর কিছুদিন ধৈর্য অনেক ভেবে সে কোন এক ধনী বজুৱ কাছ থেকে হাজার দুই টাকা

ধার করে বিহারের এই প্রতিপ্রবান অঞ্চলে এসে ডেরা বেঁধে প্র্যাক্টিস শুরু করল।

এবারে বোধ হয় ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন ছিলেন। বৎসরখানেকের মধ্যেই সুচিকিৎসক হিসাবে সমর সেমের নামটা আশেপাশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এবং ইতিমধ্যে চার-পাঁচ মাহলের মধ্যে যত ধনী কোল মাইনসের প্রোপ্রাইটার সকলের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত রায়বাহাদুর দুর্যোধন চৌধুরীর নাম তে সে শোনেনি।

 প্রিচ্ছি কৌতুহলকে কেন্দ্র করে সমরের মনের মধ্যে নানাবিধ চিন্তা ঘুরপাক থাচ্ছিল।
কুণ্ডলেশ্বর শর্মা নিষ্ঠক নিরুম হয়ে তার পাশেই বসে আছে।

অঙ্ককারে আর একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকাল সমর কুণ্ডলেশ্বরের দিকে, কিন্তু দেখা গেল না লোকটার মুখ।

ভদ্রলোকের নামটও আস্তু।

নিঃশব্দ গতিতে দামী গাড়ি মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে যেন হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে।
আঁকাৰ্বাঁকা উঁচুনীচু পথ।

একটানা গাড়ির ইঞ্জিনের একটা চাপা গেঁ গেঁ শব্দ ও হাওয়ার সৌ সৌ শব্দের
সংমিশ্রণ।

মধ্যরাত্রে ঘূম ভেঙে তোলায় চোখের পাতায় ঘূম যেন তখনও জড়িয়ে আছে।

এবং গাড়ির দোলায় কখন একসময় বুঝি ঘুমিয়েও পড়েছিল সমর—হঠাৎ একটা মন্দ
ঝাঁকুনি ও একটা দীর্ঘ বিশ্বি চিৎকারে তল্লা ছুটে গেল।

উঁ! উঁ!

কুয়াশাছফ সামান্য যেটুকু চন্দ্ৰকিৰণ প্ৰকৃতি জড়ে এতক্ষণ স্বপ্নের মতই বিৱাজ
কৰছিল, ইতিমধ্যে সেটুকুও যেন কখন নিভে গিয়েছে।

থমথমে অঙ্ককারে বিশ্বি চিৎকারের শব্দটা যেন ভৌতিক এক বিভীষিকার মত রাত্রির
অঙ্ককারকে ঢিবে দিয়ে গেল।

সমর চমকে চোখ মেলে তাকায়। ড্রাইভার রামনৱেশ ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে নেমে
দাঁড়িয়ে হাতল ঘূরিয়ে গাড়ির দৱজা খুলে দিয়েছে।

বলছিলাম কি আজ্জে, শ্রীনিলয়ে এসে গেছি ডাঙোৱাবু—নামুন আজ্জে।

কুণ্ডলেশ্বরের কথায় সমর গাড়ি থেকে নামে।

পোটকোৰ নীচে গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

সামনেই টানা দীর্ঘ বারান্দা লোহার ৱেলিং দিয়ে ঘেৱা।

স্বল্প-শক্তির একটা প্ৰজলিত বৈদ্যুতিক বাতি পোটকোৰ সিলিং থেকে ঝুলছে তাৰই
মন্দ আলোয় বারান্দার কিয়দংশ ও সম্মুখের পোটকো আলো-আঁধারিতে যেন অস্তুত
একটা রহস্যে নিবিড় হয়ে উঠেছে।

সমর গাড়ির ভেতৰ থেকে তার ডাঙোৱিৰ বাগটা নামাতে যেতেই কুণ্ডলেশ্বর বাধ
দিল, থাক। বলছিলাম কি আজ্জে, কৈৱালা প্ৰসাদই নামিয়ে আনবৈ খন। চলুন।

কুণ্ডলেশ্বরের ইঙ্গিতে সমর সিঁড়ি অতিক্ৰম কৰে বারান্দা-পথে অগ্রসৰ হয়।

আগে কুণ্ডলেশ্বর, পেছনে সমর।

দীর্ঘ বারান্দা অতিক্ৰম কৰে কুণ্ডলেশ্বরকে অনুসৰণ কৰে একসময় উভয়ে প্ৰকাণ
একটা বন্ধ দৱজাৰ সামনে এসে দাঁড়ায়।

দরজার গায়ে কলিং বেল চিপতেই অল্পক্ষণ পরে নিঃশব্দে বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত হল।

চলুন—

প্রকাণ একটা হলঘর

একটি মাত্র স্বল্প-শক্তির নীলাভ বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় ঘরটা স্বল্পালোকিত।

বারেকের জন্ম চোখ তুলে সমর ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল।

ঐশ্বর্যের আচর্যে সমগ্র ঘরখানি যেন একেবারে ঠাসা, তবে ঝুঁটি বা শৃঙ্খলার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। মেঝেতে পুরু গালিচা বিস্তৃত : বড় বড় কারুকার্যমণ্ডিত মেহগমি কাঠের আলমারি গোটাচারেক। একপাশে খানপাঁচেক সোফা। একপাশে প্রকাণ একটি শ্বেতপাথরের টেবিল—টেবিলের দুদিকে খান আঢ়েক চেয়ার।

এক কোণে একটি ট্যান করা বৃহৎ ব্যাঘ্রমূর্তি জিঘাংসায় ধারাল দস্ত বিকশিত করে আছে। কাচের চোখ দুটো ধক্কধক্ক করে জুলছে নীলাভ দৃষ্টিতে।

দেওয়ালের সর্বত্র বড় বড় সব বিদেশি নরনারীর তৈলচিত্র।

বেশির ভাগই ইংরাজ অধীশ্বর ও অধীশ্বরীদের।

এক কোণে সুবৃহৎ পাথরের স্ট্যাণ্ডে একটি সুদৃশ্য দামী জার্মান ক্লক দণ্ডায়মান।

ঐ সময় হঠাৎ চং চং করে রাত দুটো ঘোষণা করল ক্লকটা।

ক্লকের সক্ষেত্রধনি যেমন গভীর তেমনি মিষ্টি।

ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিটা প্রায় মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গুত বামন আকৃতির এক নেপালী ভৃত্য ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করতেই কুণ্ডলেশ্বর তাকে সঙ্ঘোধন করে বলে, সিঙ্কিটারীবাবুকে সংবাদ দে কৈরালা, ডাঙ্কারবাবু এসেছেন।

ডাঙ্কার সাব্র্কা উপরমে লে যানে কো হকুম হায়, কৈরালা বলে।

ও, বলছিলাম কি, তাহলে আজ্ঞে যান ওর সঙ্গেই। আমি আপনার ব্যাগটি পাঠিয়ে দিছিঁ।

সহসা এমন সময় আবার সেই পূর্বের বিশ্রি চিংকারটা রাত্রির অঙ্ককারে শোনা গেল।

ও কিসের চিংকার কুণ্ডলেশ্বরবাবু? সমর প্রশ্ন না করে আর পারে না।

আজ্ঞে নাইটকীপার হ্ম সিং পাহারা দিচ্ছে। আজ্ঞে তাহলে বলছিলাম কি আপনি যান—

নাইটকীপার?

হ্যাঁ, নাইটকীপার হ্ম সিং সারারাত জেগে অমনি করে শ্রীনিলয় পাহারা দেয়।

চলিয়ে ডাঙ্কার সাব—

কৈরালাপ্রসাদের ডাকে সমরের সঁথিৎ যেন আবার ফিরে আসে। আঘগত চিঙ্গার সে কেমন যেন একটু অন্যমনক্ষ হয়ে পড়েছিল।

চল—

কৈরালাপ্রসাদকে অনুসরণ করে সমর।

হলঘরটি অতিক্রম করে উভয়ে আর একটি স্বল্পালোকিত সীমুর লম্বা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এত বড় বারান্দায় কেবলমাত্র একটি সিল্পি থেকে স্বল্প-শক্তির বৈদ্যুতিক বাতি জলছে, সে আলোয় অঙ্ককার তো দূরীভূত হয়ইনি বরং অঙ্ককার আরও যেন ঘন ও রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সমরের কেমন বিশ্ময় বোধ হচ্ছে। এত বড় জৌকজমকপূর্ণ ধনীর প্রাসাদতুল্য বাড়ি অথচ আলোর ব্যবস্থা এত কম কেন!

আর আলোর ব্যবহার আহেতুক এই কার্পণ্যই বা কেন! এর কারণই বা কি!

শুধু আলোর ব্যবহারই হচ্ছে কম তাই নয়, সমস্ত বাড়িটা জুড়ে আদৃত একটা স্তুতাও যেন থম থম করছে।

মনে হয় যেন এ কারও কোন বাড়ি বা বাসস্থান নয়, কোলাহলমুখরিত নগরীর দূরপাণ্ডে পরিত্যক্ত ভয়াবহ এক নিঃশব্দ বিরাট কোন এক কবরখানা।

রাত্রির অক্ষরারে সেখানে কালো বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে পড়ে নিঃসীম কালো শূন্যতা। অশুরীরী প্রেতের নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে ও দীর্ঘশ্বাসে সেখানকার বায়ুতরঙ্গ হিমানীর মিঠাটোনা, সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগায়, প্রতি রোমকৃপে রোমকৃপে ভীতির অনুভূতি তোলে।

বলাই বাহুল্য সিঁড়িপথেও তেমন আলোর ব্যবহা নেই।

মৃদু আলোছায়াছন্ন প্রশস্ত সিঁড়িপথ অতিক্রম করে বামন আকৃতির কৈরালাপ্রসাদকে অনুসরণ করে দ্বিতীয়ে অনুরূপ একটি দীর্ঘ বারান্দার প্রাণ্ডে এসে সমর দাঁড়ায় এবং সেখানে পৌছেই বামন কৈরালাপ্রসাদ ঘুরে দাঁড়ায় এবং চাপা কঠে বলে, চলে যান, সামনেই ঘর।

কথা কটি বলে এবং দ্বিতীয় কোন বাক্যেচারণে সমরকে অবকাশ মাত্রও না দিয়ে নিম্নে অত্যন্ত দ্রুতপদে কৈরালাপ্রসাদ সিঁড়িপথ দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘটনার অত্যন্ত দ্রুত আকস্মিকতায় সমর যেন কতকটা হতবুদ্ধি ও বিহুল হয়ে আলোছায়াছন্ন বারান্দার প্রাণ্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

সম্মুখে পর পর অনেকগুলি ঘরের দরজা। কৈরালাপ্রসাদ বলে গেল সামনের ঘরে যেতে কিন্তু কোন্ ঘরে সে যাবে!

হতবুদ্ধি সমর যন্ত্রচালিতের মতই কতকটা অগ্রসর হয়ে প্রথম বন্ধ দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে ঈষৎ ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে বীণাযন্ত্রসহযোগে অপূর্ব সুমিষ্ট নারীকঠসঙ্গীতের একটা বাপটা কানে এসে প্রবেশ করে : খুল্ খুল্ যায় বাজুবন্দ।

সঙ্গীত ও সেই সুরের আকর্ষণে বোধ হয় মন্ত্রমুক্তের মত অত্যুজ্জ্বল আলোকোষ্ঠসিত সেই কঙ্কের উন্মুক্ত দ্বারপথেই ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায় সমর।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর প্রভায় সমগ্র কক্ষখানি যেন ঝলমল করছিল।

বাড়ির সর্বত্র অন্ধকার অথচ ঐ কক্ষটি যেন আলোয় ঝলমল। তাছাড়া রোগী দেখতে এই মধ্যরাত্রে যে বাড়িতে সে এসেছে—সেই বাড়িরই কোন ঘরে ঐ রকম সঙ্গীতের আনন্দ বসবে—ব্যাপারটা সহসা যেন কেমন সমর সেনের বোধগম্য হয় না। তাই কতকটা বিস্ময় বিস্মৃত হয়ে সে দাঁড়িয়ে যায়।

সমস্ত মেঝে জুড়ে দামী গালিচা বিস্তৃত এবং মাঝখানে ফরাস বিছানা। সেই ফরাসের উপর অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী কোলের কাছে বীণা নিয়ে বীণে সুরবক্ষারের সঙ্গে নিজের মধুপুরী কঠস্বরকে গঙ্গা-যমুনার ধারার মতই মিলিয়ে দিয়েছে।

অদূরে উপবিষ্ট পঞ্চাশের উধৈরেই হবে, এক অর্তাৰ সুত্রী ধূতি-পাঞ্চাবি পরিহিত শ্যামকাঞ্জি প্রৌঢ় ব্যক্তি।

প্রৌঢ়ের কাঁধের উপর দামী একখানা কাশ্মীরী শাল কাঁধ থেকে মাটিতে নেমেছে।

যদ্ব ও কঠের মিলিত সুরধীয়া যেন সুধাক্ষরণ করছিল কক্ষমধ্যে।

গায়িকার সুরেলা কঠ তথনও মিনতি করছে বারংবার : খুল্ খুল্ যায় বাজুবন্দ।
সুরের ধারায় সম্মোহিত স্মর যেন সব কিছু ভুলে যায়।

সে যেন ভুলে যায় কেন সে এখানে এসেছে। সে যে একজন ডাঙ্গার এবং বিশেষ একটি রোগীর সন্টান পরিস্থিতির দরুন তাকে এই মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে আনা হয়েছে, কিছুই দেন মনে পড়ে না।

কতক্ষণ ত্রৈ ভাবে মন্ত্রমুদ্রের মত দাঁড়িয়ে ছিল সমর তার নিজেরও মনে নেই—হঠাৎ চমকে ঝুঁচে পিঠের ওপর যেন কার অলঙ্কিত মৃদু করস্পর্শে।

তাকে তাকায় সমর সেন, তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রোগ ডিগডিগে এক বজ্জি, দৈর্ঘ্য প্রায় ছ ফুটেরও ইঞ্চিখানেক বোধ হয় বেশি হবে। যেমন দৈর্ঘ্যে সেই অনুপাতে প্রস্থে একেবারে শূন্যের কোঠায় বললেও চলে।

মাথার চুল ছেট ছেট করে কদম্বাছাঁট করা। শকুনের মত দীর্ঘ বাঁকানো নাসিকা ও ক্ষুদ্র গোলাকার চোখ। চোখের দৃষ্টি স্থির ঘষা কাচের ন্যায় ফ্যাকাসে প্রাণহীন। সহসা দেখলে প্রেতের চাউনি বলেই মনে হয়।

মুখের দু পাশের হনু দুটি বিশ্রিভাবে সজাগ হয়ে আছে। দাঢ়ি নির্খুতভাবে কামানো।

তান হাতের হাড় বের করা শিরাবহুল তজনীটি ওষ্ঠের ওপর স্থাপন করে ইশারার লোকটি সমরকে কথা বলতে নিষেধ জানাল এবং স্থির ঘষা কাচের মত ফ্যাকাসে দৃষ্টি দিয়ে যেন বলে—আমার সঙ্গে আসুন।

কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সমর দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় না করে লোকটিকে অনুসরণ করে বাইরের স্বল্পালোকিত বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

স্প্রিং অ্যাকশনে ঘরের দরজাটা পুনরায় ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

॥ দুই ॥

ও ঘরে নয়। মামাকে দেখতে এসেছেন তো আপনি?

সমর কতকটা বোকার মতই যেন ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়, হ্যাঁ—

চলুন ঐ ঘরে।

কোন মানুষের কঠস্বর এতখানি কর্কশ, চাপা ও অস্বাভাবিক হতে পারে সমরের যেন ধারণারও অতীত ছিল।

অবাক বিশ্বয়ে তখনও সমর লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল।

লোকটার পরিধানে পায়জামা ও গায়ে একটা কালো রঙের ভারী গ্রেট কোট।

আশ্চর্য! অমন রোগা লোকটা অতবড় একটা ভারী গ্রেট কোট কেমন করে গায়ে দিয়ে আছে!

আপনি—কি যেন বলবার চেষ্টা করে সমর।

লোকটি পূর্ববৎ কর্কশ গলায় বলে, আমি রায়বাহাদুর পুরোধন চৌধুরীর ভাষে।
আমার নাম শকুনি ঘোষ।

শকুনি ঘোষ! বিশ্বিত হতক্ষম সমর পাশ্টা প্রশ্নটা যেমন নিজের অজ্ঞাতেই উচ্চারণ করে ফেলে।

হা হা করে লোকটা বিশ্রী বুৎসিত ভাবে একটা চাপা হাসি হেসে গতে। মনে হল ফেল
করাত দিয়ে কেউ কাঠ চিরছে ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দে।

আজ্জে, মাতুল দুর্যোধনের ভাগিনেয় শকুনি। কেন, মহাভারত পড়েননি? নামটা আবার আমার এই মামৰচ দেওয়া। চলুন—

আর দ্বিতীয় প্রকারুণ্য না করে এবারে সমর অগ্রসর হয় শকুনিকে অনুসরণ করে। একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তের বদ্ধ দরজাটা ঠেলে খুলতে কতকটা জড়িত চাপা কঠের একটা চিৎকার সমরের কানে এসে প্রবেশ করল, সম্পত্তি ভোগ করবে! আমার এত কঠের সম্পত্তি শালারা বারো ভূতে লুটে থাবে! একটি আধলা পয়সাও নয়। কোন শালাকে একটা কানাকড়িও দেব না।

০ সমর তখন শকুনির নীরব চোখের ইঙ্গিতে কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

বড় আকারের হলঘরের মত বেশ প্রশস্ত একখানা ঘর।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি কালো রঙের একটা ভারী পর্দা ঝুলছিল অনেকটা পার্টিশনের মত।

পর্দার ওপাশ থেকে নীলাভ আলোর একটা দৃতির চাপা ইশারা পাওয়া যায়।

পর্দার ওপাশ থেকেই কঠস্বরটা শোনা যায় বেশ স্পষ্ট এতক্ষণে।

আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ সেন ঘরের চারদিকে তাকায়।

পর্দার এপাশে একটি বেশ বড় সাইজের গোলাকার টেবিলের চারপাশে খানপাঁচেক চেয়ার ও গোটা দুই সোফা, একটা সেলফ্—সেলফের তিনটি তাকে নানাবিধ ও বুধপত্রের ছোট-বড় নানা আকারের শিশি, রোগীর খাবার ও ফিডিং কাপ, স্প্রে, ডুস—কেনিউলা প্রভৃতি সাজানো রয়েছে।

এবং ডাঃ সেনের নজরে পড়ে ঘরের দুটি সোফা অধিকার করে পাশাপাশি দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন নিঃশব্দে। আর তাঁদের সামনে একজন দাঁড়িয়ে।

তাঁদের মধ্যে একজন মনে হয় মধ্যবয়সীই হবেন, প্যান্ট ও সার্ট পরিধানে, গলায় স্টেথোটি জড়ানো, উনি যে একজন চিকিৎসক বোঝা গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পবয়সী, তেইশ-চবিশের মধ্যে, পরিধানে তার ধূতি ও গায়ে একটি শাল জড়ানো।

তৃতীয় যে দাঁড়িয়ে, তার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। মাথার চুল ব্যাক-ব্রাস করা সহজে।

বেশ উঁচু লম্বা চেহারা এবং অতি সুন্ত্রী। চোখে পুরু লেসের কালো সেলুলয়েডের ক্রেমের চশমা। ভদ্রলোকের পরিধানে ধূতি ও শেরওয়ানী।

শেরওয়ানীর বোতামগুলি খোলা।

দণ্ডায়মান ব্যক্তির নজরই ঘরে প্রবেশ করবার পর সর্বপ্রথম সমর ও শকুনির উপরে পড়ল।

এবং কেউ কিছু বলবার আগে শকুনই বলে তার সেই বিশ্বী গলায় ডট্টর সেন।

উপবিষ্ট দুজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, বোধ হয় ডাঙ্ডারকে অজ্ঞান জানাতেই।

আর ঠিক এই সময়ে পর্দার ওপাশ থেকে আবার কঠস্বর শেনা গেল।

অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ চাপা দ্রুত কঠস্বর : শালারা ভাবছে আমি কিছু বুঝি না! আমায় slow poison করছে, টের পাছিছ না, না? সব—সব জানি। সব বুঝতে পারছি, পুলিশ সাহেব মিঃ দালালকে চিঠি দিয়েছি। Conspiracy—বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে—সব জানিয়েছি তাকে।

কতকটা স্পষ্টিত হয়েই মেন ডাঃ সেন সেই কথাগুলো শুনছিল, হঠাতে অন্য একটি কঠিনতরে ডাঃ সেন সামনের দিকে তাকায়। প্যান্ট-কোট পরিহিত ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন এবং মনু মোলায়েম কঠো বললেন, আসুন ডাঃ সেন। এবং পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত প্রথম ভদ্রলোকটির দিকে নির্দেশ করে বললেন, ইনি ডাঃ সানিয়াল, দাদার attending physician.

উভয় ডাক্তারকে নমস্কার ও প্রতিনিমস্কার জানায়।

ওপাশে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য কঠিনতর তখন আবার নীরব হয়ে গিয়েছে।

অপানি attending physician, অন্য কোন বড় ডাক্তার রায়বাহাদুরকে দেখেছেন কি?

সমরের কথায় মনু হাসির ক্ষীণ একটা আভাস ডাঃ সানিয়ালের ওষ্ঠপ্রাণে দেখা দিয়েই আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

তারপর বলেন, বলুন বরং কে রায়বাহাদুরকে আজ পর্যন্ত দেখেননি! কলকাতার হেন বড় ডাক্তার নেই ওঁকে একাধিকবার এসে দেখে যাননি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। রায়বাহাদুরের একটা ডাক্তার ফোবিয়া আছে বলতে পারেন; এক বছর ধরে এক প্রকার শয্যাগত হয়ে আছেন। আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত অ্যানজাইনার সাতটা অ্যাটাক হয়েছে—

বিশ্বায়-বিশ্ফারিত চক্ষে তাকাল সমর ডাঃ সানিয়ালের মুখের দিকে এবং বলে, বলেন কি?

হ্যাঁ, ডাঃ সানিয়াল বলেন, রায়বাহাদুরের একটা নয়, দশটা নাকি হার্ট আছে। শুধু কি তাই ডাঃ সেন, ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কোঠায়। আটবার ডবল নিউমোনিয়ার অ্যাটাক, সাতবার অ্যাকিউট ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি, তিনবার পারনিসাস্ ম্যালেরিয়া ও দুবার টাইফয়েডে ভুগেছেন। এবারের অ্যাটাকটা হার্ট অ্যাটাক থেকে শুরু হয়, বর্তমানে এক বৎসর শয্যাশায়ী। এখন জেনারেল অ্যানাসারক উইথ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর।

হ্যাঁ। তা আমি ওঁকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি—

বেডসোর থেকে গ্যাংগ্রিন হতে চলেছে তাই আপনাকে ডাকা হয়েছে—

ও—কথাটা উচ্চারণ করে সমর চুপ করে যায়।

বুঝতে পারে না ঐজন্য এত রাত্রে এই ভাবে তাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে আনবাব এবং কি জরুরী প্রয়োজন ছিল।

সমর ভাবছিল, শুধু এই বাড়িটা, তার আবহাওয়া ও এখানকার বাসিন্দারাই বিচিত্র নয়, এ-বাড়ির সব কিছুই যেন কেমন বিচিত্র। কোথাও স্বাভাবিকতার যেন জেশমাত্র নেই। শুধু বিচিত্র হলেও বুঝি কথা ছিল, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যেন একটা রহস্যের ইঙ্গিত।

ঢং করে রাত্রি আড়াইটে ঘোষণা করে ঘরের দেওয়ালে বসালো একটি ওয়াল-ক্লক ঐ সময়।

এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার পর্দার ওপাশ থেকে শোলা গেল সেই পূর্বে কঠিনতর—ডাক এল, ডাক্তার!

কঠিনতরে পূর্বের মতই বিরক্তি।

ডাঃ সানিয়াল হস্তদণ্ড হয়ে যেন পর্দার ওপাশে চলে গেলেন।

ଓପାଶେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଶୋନା ଯାଚିଲ । ଡା: ସେନ କାନ ପେତେ ଥାକେ ।

ଆମାକେ ଡାକଛିଲେନ ରାଯବାହାଦୁର ?

କି କର ? ତୁ ଯି—ତୁ ଯି—ଏ ସତ୍ୟତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ଆହଁ ନାକି ?

ଆଜେ—

ମବ ଟେଲିଫୋନ ଶକୁନିଓ ଆହଁ, ମେ ବେଟୋଓ ସତ୍ୟତ୍ର କରଛେ । ତାଡ଼ାଓ । ତାଡ଼ାଓ
ଦୁଃଖାସନକେ ତାଡ଼ାଓ । ଜାନ ନା he is dangerous—

ଡାକ୍ତର ସାନିୟାଲ ବୋଧ ହୁଏ ରାଯବାହାଦୁରେର କଥାର କୋନ ଜବାବ ଦିଲେନ ନା, ପାର୍ଶ୍ଵବାର୍ତ୍ତା
ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୋଧନ କରେ ବଲଲେନ, ନାର୍ସ, ଘୁମେର ଓସୁଧଟା ଦିଯେଛିଲେନ ?

ସମେ ସମେ ରୋଗୀର ତୀର-ତୀଳ୍ପ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋନା ଗେଲ, ନା ନା—ଘୁମ ପାଡ଼ିଯେ ତୋମରା
ମକଳେ ମିଳେ ଆମାକେ ଖୁନ କରତେ ଚାଓ । ଆମି କିଛୁ ବୁଝି ନା ବଟେ, ନା !! Get out—ବେର
ହେଯ ଯାଓ ମବ ଏଥାନ ଥେକେ, ଦୂର ହେବ । ଥାବ ନା, ଘୁମେର ଓସୁଧ ଥାବ ନା ।

ଡା: ସାନିୟାଲେର କଠ୍ସର ଶୋନା ଯାଯ । ତିନି ବଲେନ, ଡା: ବର୍ଧନ ଆଜ ଫୋନେ ବଲେଛେନ
ଏ ଓସୁଧଟା ଦିତେ—

ଏକଟା ଆର୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲ ।

ପରକଣେଇ ଆବାର ଶୋନା ଗେଲ ରାଯବାହାଦୁରେର କଠ୍ସର : ବଲୁକ, ଆମି ଥାବ ନା—କିନ୍ତୁ
ଯା ବଲେଛିଲାମ ତା କରା ହେଯେ ? ଡା: ସେନକେ ‘କଳ’ ଦେଓଯା ହେଯେ ?

ହୁଁ, ତିନି ଏସେଛେନ—

କୋଥାଯ ? ଡାକ—ଡାକ ତାକେ—

ଡା: ସେନ ଏବାରେ ନିଜେଇ ପର୍ଦାର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଯାଯ ।

ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଏକଟା ପାଲକ୍ଷେର ଉପରେ ରବାରେ ଗଦି ଓ ବ୍ୟାକରେସ୍ଟେର ସାହାଯ୍ୟେ ରୋଗୀକେ ଉଚ୍ଚ
କରେ ଶ୍ୟାର ଉପରେ ଶୋଯାନୋ ଆହଁ ।

ଏକ କୋଣେ ତ୍ରିପ୍ତେର ଓପର ନୀଳ କାଚେର ଡୋମେ ଢାକା ସ୍ଵଳ୍ପଶକ୍ତିର ଏକଟି ବୈଦ୍ୟତିକ ବାତି
ଜୁଲଛେ, ବାତିର ନୀଳାଭ ଆଲୋଯ ଶ୍ୟାର ଉପରେ ଶାୟିତ ରୋଗୀ ରାଯବାହାଦୁର ଦୂର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚୌଧୁରୀର
ଦିକେ ତାକାଳ ସମର । ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଉପାଧାନେର ଉପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସାଦା ଚାଦରେ ଆଚାଦିତ ରାଯବାହାଦୁର
ଶ୍ୟାର ଆହଁନେ । କେବଳମାତ୍ର ରୋଗୀର ମୁଖ୍ୟାନା ଦେଖା ଯାଯ ଆର ମବ ଢାକା ।

ନିରାଶା, କ୍ରେଧ, ବିରକ୍ତି, ବେଦନା ଓ ବିତ୍ତନ୍ତ ମବ କିଛୁ ଯେନ ଏକମେ ଫୁଟେ ଉଠେଇଁ
ବଲିରେଖାକିତ ରୋଗୀର ମୁଖ୍ୟରେ ଓପରେ । ହାଡ୍ ଓ ଚର୍ମସାର ମୁଖ୍ୟାନା, ମାଥାର ଚଳ ଛୋଟ ଛୋଟ
କରେ ଛାଟା ।

ସମସ୍ତ ହାଡ୍ସର୍ବସ୍ତ ମୁଖ୍ୟାନିର ମଧ୍ୟେ ଦୀର୍ଘ ଉନ୍ନତ ନାସିକା ଯେନ ଉନ୍ନତ ଏକଟା ପ୍ରକ୍ଷେର ମତ
ଜେଗେ ଆହଁ ।

ଚକ୍ର ପାତା ଦୁଟି ମୁଦ୍ରିତ ।

ପାଶେ ଦୀନ୍ଦିଯେ ଡା: ସାନିୟାଲ ଓ ମାଥାର ସାମନେ ଓସୁଧର ଫାସ ଛାତେ ହିରନ୍ଦିରକ ଦୀନ୍ଦିଯେ
ତଥନେ ଏକଟି ଅଙ୍ଗବୟାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁତ୍ରୀ ତିଳଚାନ ବାଙ୍ଗଲି ନାର୍ସ ।

ଡା: ସେନ ଏସେଛେନ—

କଥାଟା ଡା: ସାନିୟାଲ ରାଯବାହାଦୁରକେ ଜାନାଲେନ ।

ଚକ୍ର ମୁଦ୍ରିତ ଅବହାତେଇ ରାଯବାହାଦୁର ପ୍ରକ୍ଷ କରେନ, କୋଥାଯ ?

ସମର ଆରଓ ଏକଟା ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଏକେବାରେ ରୋଗୀର ଶ୍ୟାର ସାମନେ ଦୀଡାଳ ।

রায়বাহাদুর চোখ খুললেন এবং পূর্ণ দৃষ্টিতে সমরের দিকে তাকালেন।

ডাঙ্কার সেন? you are Dr. Sen—

হ্যাঁ।

কিন্তু you are too late! আর মাত্র দের ঘণ্টা সময় আছে।

সমর রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কেমন যেন বোকার মত। রায়বাহাদুরের চোখ ততক্ষণে আবার মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে।

সেমগুলি? You? All of you—সাক্ষী থাকবে, ওরা আমায় রাত চারটের সময় হত্যা করবে। কিরীটি—কিরীটিবাবু কই? তাঁকে যে এত করে আমি ডেকে নিয়ে এলাম, তিনি ঘুম কাছাকাছি না থাকেন তো বুবেনে কি করে—আমার হত্যারহস্য মীমাংসা করবেন কি করে। ডাক—নার্স—মিঃ রায়কে ডাক—

নার্স বোধ হয় রায়বাহাদুরের আদেশ পালনের জন্যই পর্দার ওপাশে চলে গেল।

আপনার হাতটা একটিবার দেখতে পারি কি?

ডাঃ সমর সেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করে।

পালস্ দেখবেন? কিন্তু কি হবে দেখে? পালস্ ঠিকই আছে—তাছাড়া যাকে আর দেড় ঘণ্টা বাদে হত্যা করা হবে তার পালস্ দেখে কি বুবেন? Not a natural death. Not a case of heart failure. পালস্ দেখে কি সে-মৃত্যুকে আপনি ঠিকাতে পারবেন?

কি করে জানলেন যে আর দেড় ঘণ্টার মধ্যে কেউ আপনাকে হত্যা করবে?

ভাবছেন প্রলাপ বকছি, না হয় পাগল হয়ে গেছি, না ডাঃ সেন? শুধু আপনি কেন, সকলেই তাই ভাবছেন, কিন্তু দেখবেন, এখুনি দেখবেন। দেখতে পাবেন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয় কিনা। দেড় ঘণ্টা আর কতটুকু সময়—

সমর ওষুধের ফ্লাস্টা, একটু আগে যেটি নার্স কক্ষ থেকে বের হয়ে যাবার সময় সামনের টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল সেটা তুলে নিয়ে বলে, এই ঘুমের ওষুধটা থান তো। আপনার একান্তভাবে এখন ঘুমনো দরকার—একটু ঘুমতে পারলে নিশ্চয়ই সুস্থ বোধ করবেন। জেগে জেগে আপনি যত দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

কি বললেন, দুঃস্বপ্ন—আমি জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছি? হ্যাঁ, দুঃস্বপ্নই বটে। দেখছি গত এক বৎসর ধরে। But it is as true as anything, একটু পরেই আপনারা জানতে পারবেন গত এক বৎসর ধরে যে অবশ্যজ্ঞাবী মৃত্যুর কথাটা আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠছে সেটা সত্য—It is coming,—আসছে মৃত্যু, আসছে, ঘুম হবে না জানি আমি—কোন ওষুধেই আর ঘুম হবে না, তবু যখন বলছেন দিন কি ওষুধ খেতে হবে। সত্যিই আমি ঘুমোতে চাই। Deep, sound sleep—

সমর রায়বাহাদুরকে ওষুধটা খাইয়ে দিল।

নার্সের সঙ্গে সঙ্গে এমন সময় কিরীটি রায় এসে পর্দার পাশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

কে?

আমি কিরীটি, রায়বাহাদুর।

সমর চোখ তুলে আগস্তকের দিকে তাকায়।

কিরীটির পরিধানে প্লিপিং পায়জামা ও কিমোনো। দেখলেই বোধ যায় সদ্য সে শর্যা থেকে বোধ করি উঠে এসেছে।

কোথায় ছিলেন এতক্ষণে?

এই ঘরেই তো ছিলাম।

ঘুমোছিলেন, কৈ? এমনি করে ঘুমোগেই আপনি আমার হত্যা-রহস্যের কিনারা করেছেন আর কি? সময় যে ঘনিয়ে এল সেদিকে খেয়াল আছে?

কিরীটী ঘুম হেসে শাস্ত কঠে প্রত্যুত্তর দেয়, সে তো আপনার হিসেবমত রাত চারটোয়।
এখনও এক ঘণ্টার ওপরে সময় আছে।

আমি সময় আছে!

তচুড়া আপনাকে তো বলেছি, আমি একবার এসে যখন উপস্থিত হয়েছি, প্রাণ থাকতে আপনার আর কোন বিপদ যাতে না ঘটে সে চেষ্টাই করব।

করুন। যত পারেন চেষ্টা করুন কিন্তু বাধা দিতে পারবেন না এও আমি জানি।

চং চং চং!...

রাত্রি তিনটো ঘোষিত হয় ওয়াল-ক্লকে।

রায়বাহাদুর আবার বলেন, আর এক ঘণ্টা—

আপনি এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন দেখি রায়বাহাদুর!

কথাটা বলে কিরীটী।

রায়বাহাদুর চোখ বুজে ছিলেন, কিরীটীর কথার কোন জবাব দিলেন না।

ঘুমোবেন না বললে কি হবে—দু-চার মিনিটের মধ্যেই রায়বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছেন
ওষুধের প্রভাবে, বোৰা গেল তাঁর মৃদু নাসিকাধনিতে।

রায়বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছেন বুরতে পেরে কিরীটী সকলকে চোখের ইঙ্গিতে ঘর
ছেড়ে চলে যেতে বলে।

একমাত্র নার্স বাদে বাকি তিনজনে বাইরে চলে আসে।

পর্দার এদিকে এসে ওরা দেখে একমাত্র দুঃশাসন চৌধুরী ভিন্ন বাকি দুজন—শকুনি
ঘোষ ও অন্য ভদ্রলোকটি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত নেই।

ডাঃ সানিয়াল কিরীটী ও ডাঃ সমর সেনকে লক্ষ্য করে বলেন, চলুন আমার ঘরে,
আপনাদের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

সকলে রোগীর ঘর থেকে বের হয়ে একেবারে লাগোয়া পার্শ্ববর্তী কক্ষের দ্বার ঠেলে
ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে।

ছেট্ট একখানি ঘর, রোগীর ঘরের সঙ্গে মধ্যবর্তী একটি দ্বারপথে যোগাযোগ আছে।

একটি লোহার খাটে সাধারণ একটি শয়া বিস্তৃত।

ঘরের কোণে একটি আলনায় কয়েকটি জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে ঝুলন্তে। একটি
ছেট্ট টেবিল। একধারে ছেট্ট একটি নেয়ারের খাটে শয়া বিছানো। খানকাতটি বই ও
খাতাপত্র টেবিলের উপরে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো। খাটের নিচে একটি চামড়ার সুটকেস।

ইলেক্ট্রিক স্টোভে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কেত্লীতে জল ফুটছিল।

খানতিনেক চেয়ারও ঘরে ছিল।

বসুন। কফি তৈরি করি একটু, কারও আপত্তি নেই তো—সানিয়াল বলেন।

ডাক্তার সেন বা কিরীটী কারোরই আপত্তি ছিল না। দুজনেই তাই জবাব দেয়, বেশ
তো!

কেত্লীর জল ফুটে গিয়েছিল।

ডাঃ সমর সেন কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই আমার কিরীটীবাবু।

কেতলী থেকে গৱম জল একটা কাচের টি-পটে ঢেলে কফির গুঁড়া মেশালেন ডাঃ সানিয়াল। সমর সেনের প্রশ্নে তার দিকে চেয়ে বললেন, বলেন কি মশাই, আমন একটা লোকের সঙ্গে আজও পরিচয় হয়নি আপনার?

না, মৃদু হেসে সেন বলেন।

বহুমতেন্তৰে কিরীটী রায়। ডাঃ সানিয়াল জবাব দিলেন।

আপনাকেও উনি বুঝি ডেকে এমেছেন? সমর প্রশ্ন করেন।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, হ্যাঁ, শুনলেন না, রায়বাহাদুরের বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছে যে তাঁকে হত্যা করবার জন্য তাঁর চারপাশে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এবং আজ রাতেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত!

হঠাতে এমন ধারণা হল কেন তাঁর?

ঠিক যে হঠাতে হয়েছে বললে ভুলই বলা হবে ডাঃ সেন, কিরীটী বলে, তবে—

ইতিমধ্যে ডাক্তার সানিয়াল কফি তৈরি করে কিরীটী ও ডাঃ সেনকে দু'কাপ দিয়ে, নিজেও এক কাপ কফি নিয়ে বসলেন।

ডাঃ সানিয়াল কফিতে এক চুমুক দিয়ে ডাঃ সেনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, রায়বাহাদুরকে দেখে আপনার কি মনে হল ডাঃ সেন?

মনে হল যেন একটা illusion-এ ভুগছেন, কিন্তু কতদিন থেকে এরকম হয়েছে? ডাঃ সেন বললেন।

দিন সাতেক হবে। দিন সাতেক আগে থেকেই ঐ কথাটা প্রায় বলছেন, আজকের তারিখে রাত চারটের সময় নাকি উনি নিহত হবেন।

এর আগে কখনও এ ধরণের কথা বলেননি?

না। আমি তো প্রায় মাস আল্টেক হল এখানে আছি attending physician হয়ে—

I see—তা, আর ঐ যে সব ষড়যন্ত্রের কথা কি বলছিলেন? এবারে প্রশ্নটা করে সমর সেনই।

আপনি তো অনেকদিন এখানে আছেন, হঠাতে এরকম ধারণা ওর হল কেন কিছু বলতে পারেন ডাঃ সানিয়াল?

কিরীটী এবার প্রশ্ন করল।

না। বরং আমি তো দেখতে পাচ্ছি রায়বাহাদুরের আঘায়স্বজনেরা আপ্রাণ ক্ষেত্রে করছেন সর্বদা কি ভাবে ওঁকে একটু সুস্থ ও নিশ্চিন্ত রাখতে পারবেন। এ ধরণের সঙ্গে যে কি করে আসে—

ডাঃ সেন এবারে বলে, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, অভিশাপ—এটা একটা অর্ধের অভিশাপ ডাঃ সানিয়াল। অর্থ জিনিসটাই এমন যে না থাকলেও শাস্তি নেই, আবার থাকলেও শাস্তি নেই। শাস্তির করাত, এগুতেও কাটে পিছতেও কাটে।

কিরীটী কথাটা শুনে মৃদু হাসে।

নিঃশেষিত কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে কিমোনোর পকেট থেকে একটা সিগার বের করে দেশলাই সহযোগে অগ্রিসংযোগ করল কিরীটী।

কিছুক্ষণ নিঃশেষে ধূমপান করবার পর কিরীটী বলে, গত দশ বৎসর থেকে

ରାୟବାହାଦୁରକେ ଚିନି । A self-made man. ପ୍ରଥମ ଜୀବନେ କୁଳ ରିକ୍ରୁଟିଂ ଥିକେ ଶୁରୁ କରେ
ତ୍ରମେ ନିଜେର ଅସାଧାରଣ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥେର ମାଲିକ ହେଁଛେ । ସାତ-
ଶତାବ୍ଦୀ କ୍ରେତାଲ୍ ମାଇନିଂରେ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟ୍‌ର ହେଁଛେ ।

বলেন কি! ডাঃ সেম বলেন।

କୁଳାମ୍ବିଓ ଶୁଣେଛି ବନ୍ଦ ପତିଷ୍ଠାନ ଓର୍ବ ବନ୍ଦ ଦାନ ଆଜେ । ଜବାବ ଦିଲ କିବାଟି ।

ଜୁଗାଡ଼ ଦେଖିବାରେ କହିଲି ଶୁଣିଛି।

দুরজ্বার গায়ে এমন সময় সহস্রা মদ করাঘাত শুনতে পাওয়া গেল।

କେ ? ଦାଃ ସାନିଯାଲାଟ୍ ପଶୁ କବଳେନ ଏବଂ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଦ୍ୱାର ଖୁଲେ ଦିଲେନ ।

ঘৰে প্ৰেশ কৱলেন বায়বাহাদৰেৱ ভাই দুঃশাসন চৌধুৰী।

এবং কক্ষের মধ্যে উপবিষ্ট কিরীটী ও ডাঃ সমর সেনকে লক্ষ্য না করেই ডাঃ সানিয়ালকে বলেন, ডাঙ্গার, আমাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিতে পার? কিছুতেই ঘুম্রেতে পারছি না। ঘুম আসছে না। এ আর তো পারি না—এক মাস হল আর কত না ঘুমিরে কুটাৰ—

এখানে তো আমি কোন ওষুধ রাখি না মিঃ চৌধুরী। ও-ঘরে অনেক রকমের ঘুমের ওষুধ আছে। আমার নাম করে নাস্রের কাছে চান গিয়ে, সে দেবে'খন।

ওসব সাধারণ বারিউটন গ্রুপ অফ ড্রাগস্যে আমার কিছু হবে না। সব থেঁয়ে
দেখেছি। বরং যদি আমাকে একটু মরফিয়া injection করে দাও হাফ গ্রেন—

ମରଫିଆ! ବିଶ୍ଵିତ ଡାଃ ସାନିଯାଲ ଯେନ କତକଟା ଆସଗତ ଭାବେଇ କଥାଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରେନ।

ହଁ, ମରଫିଯା । ଆଜ୍ଞା ଥାକ, ଆଜଓ ଯା ହୋକ ଏକଟା କିଛୁ ଖେଳେଇ ଦେଖି—ବଲତେ ବନତେ ଦଃଶମନ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରହାନ କରଲେନ ।

ওঁৰা আবার গল্প শুরু করলেন।

আবুও আধ ঘণ্টাটাক পরে।

সহসা কতকটা যেন ঝড়ের বেগেই বৃদ্ধগোছের একটি ভূত্য ঘরের দরজার সামনে
এসে উদ্বেগাকুল কঢ়ে বলে ওঠে, ডাঙ্গারবাবু! ডাঙ্গারবাবু! শীগগিলি আসুন! কর্তাৰা—
কর্তাৰা—

କିରୀଟି ତତକ୍ଷଣେ ଚେଯାର ଥେକେ କତକଟା ଯେନ ଲାଫିଯେଇ ଉଠେ ଛୁଟେ ଦରଜାର ଗୋଡ଼ାଯା
ଏସେ ଦାଙ୍ଗାଯ ।

কি—কি হয়েছে কর্তাবাবুর ?

খন—খন হয়েছেন কর্তাবাবু!

সে কি। বিশ্বিত একটা চিৎকারের মতই যেন কথাটা ডাঃ সালিমালের কষ্ট হতে নির্গত
হয়।

ଠୀ ଶ୍ରୀଗଣ୍ଗାରୀ ଆସନ ।

সকলের আগে কিরীটী যেন ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং তার পশ্চাতে
ডাঃ সেন, ডাঃ সামিয়ালও বের হয়ে গেলেন।

রায়বাহাদুরের ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

কিরীটি সর্বপ্রথম ঘরের মধ্যে গিয়ে পা দিল এবং ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ওয়াল-কুকটা রাত্রি চারটে ঝোম্পা করল।

ঢং ঢং ঢং ঢং...

রাত চারটে।

কিরীটির বুকের ভেতরটা যেন ধক্ক করে ওঠে। তাহলে সত্যসত্যই রায়বাহাদুরের নিজের মৃত্যুর বাপারে নিজের ভবিষ্যৎবাণীটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল!

কয়েকটা শুরু অতঃপর কিরীটি কেমন যেন বিহুল বিভ্রান্ত ভাবে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয় না।

॥ তিন ॥

ঘরের মধ্যে ঐ সময় ওরা তিনজন ছাড়াও দুঃশাসন ও বৃহস্পতি উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের চোখেমুখেই একটা অসহায় ভীতিবিহুল ভাব। নির্বাক এবং কেমন যেন বিশ্঵াসবিভৃত সকলে।

ওয়াল-কুকের গভীর সঙ্কেতধ্বনিটা যেন নিষ্ঠুর হত্যার কথাটাই জানিয়ে দিয়ে গেল।

মৃত্যু আছেই। কে কবে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে—এবং আসে যখন অমোদ পরোয়ানা হাতেই এসে হাজির হয়। তবু রায়বাহাদুরের মৃত্যুটা যেন অকস্মাত একটা ধাক্কা দিয়েছে সবার মনেই। কোন কথা না বলে কিরীটি অতঃপর ঘরের মধ্যের পর্দাটা তুলে রায়বাহাদুর যেখানে শায়িত স্থানে এসে দাঁড়াল। অন্যান্য সকলেও তাকে অনুসরণ করে ওর আশেপাশে এসে দাঁড়ায়।

অদূরে সর্বপ্রথম সকলেরই দৃষ্টি পড়ে রোগীর শিয়ারের কাছে, চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট নার্সের মাথাটা চেয়ারের উপরে একপাশে হেলে রয়েছে।

আর—আর শায়িত মুদ্রিতচক্ষু রায়বাহাদুরের বুকের ঠিক মাঝখানে সুদৃশ্য কালো বাঁটওয়ালা একটা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে—যেন নিষ্ঠুর মৃত্যুর ডয়াবহ প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিচ্ছে।

রায়বাহাদুরের গায়ের উপরে যে সাদা চাদরটি ছিল সেই চাদর সমেতই ছোরাটা ভেদ করে গিয়েছে। কিন্তু ছোরাটার কালো বাঁটের চার পাশে লাল রক্তচিহ্ন শুভ চাদরের উপরে যেন ডয়াবহ একটা বিভীষিকার মত মনে হয়।

কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি ডাঃ সানিয়াল প্রথমেই রায়বাহাদুরের পাণ্ডুলিপি দেখলেন, সব শেষ! অনেকক্ষণ মারা গেছেন।

কিরীটি প্রথমে নার্সের নাম ধরে ডাকে, কিন্তু সাড়া না পেয়ে অগ্রিয়ে উপবিষ্ট ও নিপ্তিত নার্সকে ঠেলে জাগাতে গিয়ে দেখে গভীর নিদ্রায় আচ্ছম নার্স।

কিরীটির বুকতে কষ্ট হয় না যে স্বাভাবিক ঘূর্ম নয়। কেমন জীব ঘূর্মের ওযুথের সাহায্যেই নার্সকে গভীর ঘূর্মে আচ্ছম করা হয়েছে, সজ্ঞবত ইত্তেকরেই।

ডাক্তার দুজনও ইতিমধ্যে নার্সের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ডাঃ সানিয়াল ঘূর্মস্ত নার্সকে পরীক্ষা করতে উদ্যত হন, কিরীটি সবে দাঁড়ায়।

অপলক দৃষ্টিতে কিরীটি নিহত, মুদ্রিতচক্ষু রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চেমে ছিল। সমস্ত মুখথামা ঝুঁকে যেন ঝুঁটে উঠেছে একটা নিষ্ঠুর অবজ্ঞার চিহ্ন।

অদূরে টেবিলের উপরিষ্ঠিত নীলাভ দুতিতে মুখখানার মধ্যে যেন কেমন এক নিদানণ
বিভীষিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঘরের মধ্যে সকলেই নিস্তর, কারও মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই।

কেবল পদার ওপাশের ওয়াল-ক্লকটা একমেয়ে শব্দ করে চলেছে। মন্থর বিশ্রী টক্
টক্ শব্দ সহেই নিশ্চলতার মধ্যে।

ড্রঃ কি ভয়ানক!

১০ সকলেই যুগপৎ গ্র কথাগুলি সহসা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে তাকাল।
কথাটা বলেছিলেন দৃঃশ্যাসন চৌধুরী। কথাটা বলেই তিনি দু'হাতে নিজের মুখখানা
ঢেকেন।

ডঃ সানিয়াল যেন কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হল না, ঠিক ঐসময়
একটা ভারী জুতোর মচমচ শব্দ সকলের কানে প্রবেশ করে।

মচমচ শব্দে জুতো পায়ে কে যেন এই কক্ষের দিকেই এগিয়ে আসছে।

মচ-মচ-মচ। জুতোর শব্দ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিরীটীই সর্বাগ্রে পর্দার
ওদিকে পা বাড়িয়েছিল এবং পর্দার এদিকে আসতেই দেখতে পেল পুলিসের ইউনিফর্ম
পরিধানে হাস্টপুষ্ট ভারিকী চেহারার এক অফিসার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। বারেক কিরীটী
ও পুলিশ অফিসারটি দুজনের দিকে অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। কিরীটী
প্রথমে কথা বলে, আপনিই বোধ হয় এখানকার এস.পি.মিঃ দালাল?

হ্যাঁ। আপনি?

আমি! আমার নাম কিরীটী রায়। আসুন, এইমাত্র আমরা জানতে পেরেছি রায়বাহাদুর
নিহত হয়েছেন।

কি বললেন! রায়বাহাদুর—উৎকর্থা মিশ্রিত কঠে প্রশ্ন করলেন পুলিশ সুপার মিঃ
দালাল।

হ্যাঁ। চলুন, এই ঘরের পর্দার ওপাশে মৃতদেহ।

স্তুপিত নির্বাক এস.পি.দালাল যন্ত্রালিতের ন্যায় কিরীটীকে অনুসরণ করলেন।

পর্দার এপাশে এসে পা দিতেই এবং মৃতের বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ রায়বাহাদুরের প্রতি
নজর পড়তেই অস্ফুট কঠে আবার দালাল সাহেবে বলে ওঠেন, উঃ, What a horrible
sight! কি ভয়ানক! Then really he has been killed!

সত্যিই ভয়ানক! যেন পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চরমতম বিশ্যয়। একটা
ভয়াবহ দৃঃশ্যপ্র। মাত্র ঘটাখানেক আগেও যে লোকটি জীবিত ছিলেন, প্রাণস্পন্দনের মধ্যে
দিয়ে নিজের সন্তাটাকে ঘোষণা করছিলেন, এই মুহূর্তে অসহায় মৃত্যুর মধ্যে যেন মিংশেষে
লোপ পেয়েছেন। নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছেন জীবনসমুদ্রের বুক থেকে। এবং এই ঘটনার
মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত রহস্য হচ্ছে এই যে, এই ছুরিকাবিদ্ধ মৃত্যুলোকটি কেমন করে না-
জানি অবধারিত অবশ্যজ্ঞাবী তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি পূর্বাপেক্ষে জানতে পেরেছিলেন কোন
এক আশ্চর্য উপায়ে। কিন্তু সত্যিই কি জানতে পেরেছিলেন না সেটা ডাঙ্কারের ভাষায়
একটা সত্যিই ইলিউশন মাত্র। না, ব্যাপারটা তাঁর অস্মৃত মন্তিক্ষের উভেজনাপ্রস্তু একটা
কল্পনা মাত্র।

নার্স সুলতা করের জ্ঞান আরও আধ ঘণ্টা পরে ফিরে আসে একটু একটু করে।

ওযুধের প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে সে ঘুম থেকে জেগে উঠল। প্রথমটায় সে কিছুই বুঝতে পারে না। চোখের ঘুর ও মনের নিন্দ্রিয়তাটুকু যেন কেটেও কাটতে চায় না। একটা নেশার ঘোরের মত সমস্ত চেতনাকে তার এখনও আচ্ছয় করে আছে যেন। কিরীটির পরামর্শে এক কাপ স্ট্রং কফি খালকরার পর সুলতা যেন কতকটা ধাতস্ত হয়।

কিন্তু তাকে নামাভাবে প্রশ্ন করেও তার বক্তব্য হতে এমন কিছুই পাওয়া গেল না যা রায়বাহাদুরের শ্রুত্য-রহস্যের উপরে আলোকসম্পাত করতে পারে।

সুলতা কর্তৃবললে, রাত্রি দুটো নাগাদ ডাঙ্গার সানিয়ালের কফি তৈরি হয়েছিল। সেই কফি প্রাপ্ত করবার পর হতেই তার বিশ্রামক ঘুম পায় এবং সে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিরীটি তখন প্রশ্ন করে, রায়বাহাদুর কি তখন জেগে ছিলেন?

না—সুলতা বলে। রায়বাহাদুরকে ডাঃ সেন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আসবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে রায়বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েন।

সাধারণত দীর্ঘকাল ধরে, বলতে গেলে প্রায় নিয়মিতই ঘুমের ওষুধ সেবন করবার ফলে ইদানীং কোন ঘুমের ওষুধেই সহজে রায়বাহাদুরের নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছিল না।

অথচ আশ্চর্য, আজ ঘুমের ওষুধ পান করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই রায়বাহাদুরের নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং শ্রীঘোষ গভীর ঘুমে আচ্ছয় হয়ে পড়েন।

রায়বাহাদুরকে নিন্দিত দেখে সুলতা করেরও দু চোখের পাতায় তুলুনি নেমে আসতে চায়। এবং কখন একসময় সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুই তার মনে নেই।

সুলতা কর কথা বলছিল কিন্তু কিরীটির মনে হয় তার কথাবার্তায় একটা ভীতির ভাব যেন সুস্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রথমত ডিউটি দিতে দিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয়ত সেই ঘুমস্ত অবস্থার মধ্যেই নিষ্ঠুর আততায়ীর হস্তে রায়বাহাদুর নিহত হয়েছেন—নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা তার গাফিলতি, তাই কি তার ঐ ভীতি?

কিন্তু কিরীটি নার্স সুলতা করের ঐ ভীতির ব্যাপারটা যেন বুঝেও ইচ্ছে করেই বিশেষ আমল দেয় না।

দালাল সাহেবে যখন বারংবার নানাবিধি প্রশ্নবাণে ভীত সুলতা করকে নানা ভাবে জেরার পর জেরা করে চলেছেন, কিরীটির মনের মধ্যে তখন সম্পূর্ণ অন্য একটি চিন্তা আবর্ত রচনা করে ফিরছিল যেন।

সত্যি কথা বলতে কি, রায়বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে তাঁর গৃহে এলেও ব্যাপারটার মধ্যে আদৌ কোন গুরুত্ব দেয়নি এতক্ষণ পর্যন্ত। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, রায়বাহাদুর যেমন করেই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে থাকুন না কেন—ব্যাপারটা একটা নিষ্ঠুর পূর্বপরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এখন আর।

বেচাবী সুলতা করের কোন দোষ বা অপরাধ নেই বুঝতে পারে কিরীটি। এবং হত্যাকারী যে ধূর্ত ও অত্যঙ্গ ক্ষিপ্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাইও নেই।

কারণ প্রথমত সে পূর্বহেই ঘোষণা করে ও প্ল্যান এঁটে রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছে।

দ্বিতীয়ত ঠিক হত্যার সময়টিতে বা পূর্বে এ বড়ির মুকলের মধ্যে যার রোগীর সর্বাপেক্ষা নিকট উপস্থিত থাকবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সুলতা করকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কৌশলে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাঢ়িয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার দিক থেকে কোন বাধা না আসে।

তৃতীয়ত যাকে হত্যা করবে বলে হত্যাকারী স্থির করেছিল তাকে পর্যন্ত তীব্র ঘুমের ওষুধ পান করিয়ে আগেই শুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই তো গেল হত্যাকারীর দিকটা।

নিহত রায়বাহাদুরের দিকটাও রীতিমত যাকে বলে জটিল। পূর্বাহে তিনি তো নিজের হত্যার কথা জানতে পেরেছিলেনই, তা সে যেমন করেই হোক এবং যেজন্য তিনি কলকাতা থেকে কিরীটীকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন ও এস.পি. দালাল সাহেবকেও কথাটা আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছিলেন। সেদিক দিয়ে হত্যাকারীকে বিচার করলে নিঃসন্দেহে হত্যাকারী প্রচুর রিক্ষ নিয়েছে, যেহেতু আগে থাকতে আটঘাট বেঁধে কাজ করে থাকলেও সে শুধু চতুর নয়, দুঃসাহসীও বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে সে কেমন করে এতগুলো সোকের উপস্থিতির মধ্যে ধোঁকা দিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে দিল!

কিরীটী আরও ভাবছিল, ছোরার সাহায্যে যখন রায়বাহাদুরকে হত্যা করা হয়েছে তখন এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে হত্যাকারী এই কক্ষে সশরীরে প্রবেশ করেছিলেই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ঠিক ঐ সময়টিতে এই কক্ষের মধ্যে নিন্দিতা নার্স সুলতা কর ও শুমন্ত রায়বাহাদুর ব্যক্তিত তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রাণী উপস্থিত ছিল কিনা। এবং উপস্থিত থাকলে কে উপস্থিত ছিল—এই বাড়ির মধ্যে আর কারই বা উপস্থিত থাকা সম্ভব!

মনে মনে অত্যন্ত দ্রুত কিরীটী চিঞ্চা করে নেয় এই বাড়ির সমস্ত লোকগুলিকে।

মৃত রায়বাহাদুর ছাড়া ঐ সময় বাড়ির মধ্যে উপস্থিত ছিল তাঁর সহোদর ভাই দুঃশাসন চৌধুরী, রায়বাহাদুরের খুল্লতাত অবিনাশ চৌধুরী, ভাষ্পে শকুনি ঘোষ, রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্র বৃহস্পতি চৌধুরী, বৃহস্পতির স্ত্রী নমিতা চৌধুরী, বৃহস্পতির একমাত্র একাদশ বর্ষীয় বালকপুত্র বিকর্ণ ও রায়বাহাদুরের বোনের মেয়ে রুচিরা দেবী, রায়বাহাদুরের বিধবা বোন ও রুচিরার মা গাঙ্কারী দেবী। এই আটজন বাড়ির ভেতরের লোক।

বাইরের কর্মচারীদের মধ্যে অন্দরে যাদের অবাধ যাতায়াত ছিল, ম্যানেজার নিত্যধন সাহা, তহশীলদার বৃক্ষ কুণ্ডলেশ্বর শর্মা ও পুরাতন নেপালী ভৃত্য কৈরালাপ্রসাদ ও ডাঙ্কার সানিয়াল এবং কিছুক্ষণ আগে এসেছেন ডাঃ সমর সেন, বৃন্দাবন, বি সৈরভী ও ননীর মা। এবং যাদের ছিল না তারা হচ্ছে ড্রাইভার রামনরেশ ও ভৈরব, নাইটকিপার হ্রম সিং, দারোয়ান বলদের ও দুধনাথ। এদের মধ্যে অর্থাৎ যাদের অন্দরে যাতায়াত ছিল না তাদের বাদ দিয়ে ঐ বারোজনের মধ্যে কেউ যদি হত্যাকারীকে সাহায্য করে থাকে তাহলে হয়ত তাকে খুঁজে বের করতে পারলে রহস্যের ব্যাপারে কিছুটা কিনারা হতে পারে! এখন কাকে কাকে ঐ বারোজনের মধ্যে বিশেষভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে! সেদিক দিয়ে একমাত্র আঙ্গীয়-পরিজনদের মধ্যে রায়বাহাদুরের পুত্র বৃহস্পতি চৌধুরীর একাদশ বর্ষীয় বালকপুত্রকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাকি সকলকে সন্দেহের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে কর্মণ বাকি সকলের প্রত্যেকেরই মৃত রায়বাহাদুরের মৃত্যুতে লাভবান হবার সভাবনা।

কাজেই প্রত্যেকের পক্ষেই রায়বাহাদুরকে হত্যা করা এমন কিছুই অসম্ভব নয় বা ছিল না।

কিরীটীর চিঞ্চাজাল হঠাত ছিম হয়ে গেল।

ঐ সময় সুপার দালাল সাহেব সুলতা করের জ্বানবন্দি শেষ করে দুঃশাসন চৌধুরীকে জেরা শুরু করেছেন।

আপনি বলেছেন দীর্ঘ পাঁচ বছর আপনি বাড়িছাড়া থাকবার পর মাত্র দিন দশেক আগে এখানে ফিরে এসেছেন কেমন কিনা?

হ্যাঁ। দালাল সাহেবের প্রশ্নের জবাবে জানান দুঃশাসন চৌধুরী।

এই পাঁচ বছর আপনি কোথায় ছিলেন?

বর্মামুলকে মৌচিতে—

মৌচিতে কেন?

মৌচিতে আমার মাইকার বিজনেস ছিল—

মাঝখান থেকে কিরীটি এবারে প্রশ্ন করে, কয়েকটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মিঃ দালাল মিঃ চৌধুরীকে, যদি অবশ্য আপনি অনুমতি দেন।

একটু যেন বিরক্তি ও অনিচ্ছার সঙ্গেই দালাল সাহেব বলেন, বেশ তো, করুন।

মিঃ চৌধুরীর কি মাইকার সেই বিজনেস এখনও আছে? কিরীটি এবারে প্রশ্ন করে দুঃশাসন চৌধুরীকে।

না। দাদার অনুরোধে সমস্ত বিজনেস তুলে দিয়েই একেবারে চলে এসেছি।

বিজনেস কেমন চলছিল আপনার?

খুব ভালই চলছিল। তাই আমারও বিজনেস তুলে দেবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। গত বছর দেড়েক ধরে দাদা অনবরত আমাকে ওখানকার বিজনেস তুলে দিয়ে দেশে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করছিলেন চিঠির পর চিঠি দিয়ে। তাছাড়া এখানকার এত বড় কলিয়ারী বিজনেস বৃহস্পতি একা একা ম্যানেজ করে উঠতে পারছিল না—

কেন, আমি তো যতদূর জানি ইদানীং অসুস্থ অবস্থাতেও দু-মাস আগে পর্যন্ত বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই রায়বাহাদুর নিজে বিজনেস দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া আপনার ছেটকাকা অবিনাশবাবুও তো বিজনেস দেখাশুনা করতেন বলেই শুনেছি—কিরীটি এবারে বলে।

কিরীটির কথায় দুঃশাসন চৌধুরী বিশেষ অর্থপূর্ণ একটু হাসি হেসে বলেন, কে দেখাশুনা করতেন বললেন, আমাদের কাকা সাহেব?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, তা দেখতেন বটে। তবে এতই যখন আপনার জানা আছে—এও নিশ্চয়ই আপনি জানেন, কাকা সাহেবের আসল বিজনেসের চাইতে গানবাজানার ব্যাপারেই বরাবর বেশী খোক এবং সেই কারণেই বরাবর দাদাকে না হোক মাসে হাজার দেড় হাজার করে অর্থ আঞ্চলিক আক্লেসলোগী বাবদ জলে ফেলতে হত। বলতে বলতে কঠের মধ্যে আরও তাছিল্য ও অবহেলার ভাব এনে বললেন, হ্যাঁ, তিনি দেখবেন বিজনেস! এই যে বাড়ির মধ্যে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, দেখুন গিয়ে কাকা সাহেব মিথ্যা খোসমেজাজ্জে বাট্টজীর গান শুনছেন এখনও তাঁর ঘরে আসব জমিয়ে।

কিরীটি দুঃশাসন চৌধুরীর কথায় কোনরকম শুরুত্ব না দিয়ে অত্যন্ত ধীর শাস্ত কঠে জবাব দেয়, দেখুন দুঃশাসনবাবু, আজ গত সাত বছর রায়বাহাদুরের সঙ্গে এবং আপনাদের এই ফ্যামিলির সঙ্গে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচয়। আশুনাক্ষেত্রে কাকা সাহেব অবিনাশবাবুর সমস্ত কিছুই আমার জানা, তিনি আমার আসৌ অপরিচিত নন। একটা কথা আপনি হয়ত ভুলে যাচ্ছেন দুঃশাসনবাবু, রায়বাহাদুরের বর্তমান সুবিগুল

সম্পত্তি অর্জনের মূলে আপনাদের কাকা সাহেবের দীর্ঘ বারো বৎসরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আছে। সেদিক দিয়ে আমি যতদূর জানি, রায়বাহাদুরই ইদনীং বৎসর তিনেক হল আপনাদের কাকা সাহেবের জন্য মাসিক দেড় হাজার টাকা মাসোহারার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইচ্ছে করেই—

শেষাঞ্চল কঠে এবারে দুঃশাসন চৌধুরী জবাব দিলেন, আপনি দেখছি অনেক কিছুই জানেন মিঃ রায়, তাই একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করার লোভটা দমন করতে পারছি না। এতই যখন আপনি জানেন, এও আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় যে কোথাও কোন কাগজপত্রে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ আছে, না এটা একটা উভয়ের মধ্যে তাদের মৌখিক ব্যবস্থাই হয়েছিল।

বৎসর দুই আগে রায়বাহাদুরের সঙ্গে যখন একবার আমার কলকাতায় দেখা হয়, কথায় কথায় সেই সময়েই রায়বাহাদুর আমাকে বলেছিলেন—লিখিত ভাবে তাঁর উইলের মধ্যেও—

উইল! দাদার উইল! পরম বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন দুঃশাসন চৌধুরী কথা কটা উচ্চারণ করেন কিরীটীকে বাধা দিয়ে।

হাঁ। উইলেই সে রকম লিখে দিয়েছেন তিনি, তাই আমাকে বলেছিলেন—

এবারে সত্যিই আমাকে হাসালেন মিঃ রায়। দাদার উইল! যতদূর আমার জানা আছে তাঁর তো কোন উইলই নেই।

পাকাপোক্ত রেজিস্টার্ড উইল একটা না থাকলেও—উইল তাঁর একটা ছিল আমি জানি—বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দিল এবার কিরীটী।

ভুল শুনেছেন। কাঁচা পাকা কোন উইলই তাঁর নেই।

ইতিমধ্যে একসময় রায়বাহাদুরের পুত্র বৃহমলা চৌধুরীকেও দালাল সাহেব ঐ কক্ষের মধ্যে ঢেকে এনেছিলেন।

পিতার আকশ্মিক নিষ্ঠুর মৃত্যুতে বৃহমলা চৌধুরী যেন শোকে মুহ্যমান হয়ে পাথরের মতই একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল।

তার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, বৃহমলাবাবু, আপনার বাবার কোন উইল বা ঐজাতীয় কোন কিছু লেখা কি নেই?

না। আমি যতদূর জানি—বাবার কোন উইল ছিল বলে আমি শুনিনি অঙ্গভূত আছে। কে বললে নেই। আছে, আলবৎ হ্যায়।

অকস্মাত অন্য একটি পুরুষের সুমিষ্ট কঠস্বরে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কটু প্রাণীই যুগ্মৎ বিশ্বিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় বক্তার দিকে।

কোন পুরুষের কঠস্বর এমন মধুস্নাবী হতে পারে এ যেন ধারণা করা যায় না— ডাঃ সেনের মনে হল।

সত্য অপূর্ব মিষ্টি কঠস্বর বক্তার।

এ তো কঠস্বর নয়, সঙ্গীতের সুর বৃক্ষ।

সঙ্গীতের জন্যই যেন ভগবান ঐ কঠস্বরটি সৃষ্টি করেছেন।

॥ চার ॥

সত্য গানের মতই মিষ্টি কষ্ট।

উচু বলিষ্ঠ পুরুষোচিত গঠন।

গায়ের রঙ কালো হলেও, মুখ-চোখের গঠন ও দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কিছু নিয়ে যেন অশুধ একটা শ্রী ও সৌন্দর্যের সমন্বয় যা সাধারণত বড় একটা চোখে পড়ে না।

পরিশেষে তিই কালোপেড়ে ফরাসভাঙ্গার গিলে-করা কঁচানো ধূতি। ধূতির কঁচা পায়ের প্রতার উপরে লুটুছে।

বোঝে একটা হাফ-হাতা গরম পাঞ্জাবি।

কাঁধের উপরে দামী কঙ্কার কাজ করা কমলালেবু রঙের কাশ্মীরী শাল।

পায়ে ঘাসের চঢ়ি।

কাকা সাহেব! যেন কতকটা আঘাগতভাবেই কথাটা উচ্চারণ করেন দুঃশাসন চৌধুরী।

এ বাড়ির কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী।

কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী সত্যিই এ বাড়ির একটি বিশেষ ব্যক্তিক্রম যেন। শুধু মাত্র চেহারা ও বেশভূষাতেই নয়, চালচলনে আদরকায়দায় কথবার্তায় এ বাড়ির কারও সঙ্গে যেন অবিনাশ চৌধুরীর কোন মিল নেই। শুধু আজ বলেই নয়, কোন কালৈই বুঝি ছিল না।

প্রথম যৌবনে ছিলেন কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী লোকটি উগ্র সাহেব। তারপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই উগ্র সাহেবিয়ানার বদলে তাঁর সব কিছুর মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটা বাদশাহী আভিজ্ঞাত্য। যেমন দিলদরিয়া তেমনি স্ফূর্তিবাজ। বিয়ে করেননি, তাই বলে ব্রহ্মাচারীর চরিত্রও নয়।

সুরা নারী সঙ্গীত অভিনয় ও শিকার এই ছিল লোকটির জীবনের সব কিছু। রায়বাহাদুরের মুখেই কিরিটি শুনেছিল, এককালে ঐসব খেয়ালে দু'হাতে লোকটি অর্থ উড়িয়েছেন। এখন অবিশ্য সঙ্গীতসাধনা নিয়েই ঘরের মধ্যে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখেন।

প্রথম যৌবনের সাহেবী আচরণের জন্যই সকলে তাঁকে কাকা সাহেব বলে সম্মোধন করত। এখনও সেই সম্মোধনেই তিনি পরিচিত।

অবিনাশ চৌধুরীর বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে। কিন্তু বয়স তাঁর যতই হোক না কেন, অতি পরিপাণি ও পরিচ্ছন্ন দেহের মধ্যে এতটুকুও তার ছাপ যেন দেখা যায় না।

আছে! আছে—আলবৎ আছে—দু'বছর আগে দুর্যোধন উইল করে রেখেছিল।

কটি কথা বলে এবারে অবিনাশ চৌধুরী বারেকের জন্য সকলের দিকে একবার চেয়ে বহুলার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন, সত্যিই কি দুর্যোধন মারা গেছে নাকি, বিনু? এরা গিয়ে এইমাত্র আমাকে সংবাদ দিল।

কিরিটি অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

সে যেন ঠিক বুঝতে পারে না—কে এইমাত্র অবিনাশ চৌধুরীকে গিয়ে দুর্যোধন চৌধুরীর মতৃসংবাদটা দিল!

কিন্তু অবিনাশ চৌধুরীর কথার কেউই কোন জবাব দেয় না।

ব্যাপার কি, তোমরা যে সবাই মুখে ছিপি এঁটে দিয়েছ বলে মনে হচ্ছে! কথা বলছ না কেন—বলতে বলতে প্রৌঢ় অবিনাশ চৌধুরীর পাশেই দণ্ডযামান পুলিশ-সুপার দালাল

সাহেবের প্রতি নজর পড়তেই মুহূর্তে কি একটা বিরক্তিতে যেন মুখটা তাঁর কুণ্ডিত হয়ে ওঠে।

এবং সকলকে যেন কৃতকটা বিশ্বিত ও বিব্রত করেই দালাল সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে এবাবে কষ্ট কষ্ট অবিনাশ বললেন, এ সময় দালাল সাহেব আপনি এখানে কেন? আপনি কেন এসেছেন?

রায়বাহাদুর নিজে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কি বললেন, দুর্যোধন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল? কেন? নিশ্চয়ই এ বাড়িতে কেন চুরু-ডাকাতির কিনারা করতে নয়?

গভীর কঠে দালাল সাহেব বললেন, তার চাইতেও গুরুতর ব্যাপারে চিঠি লিখে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে আসতে বলেছিলেন।

গুরুতর ব্যাপারে! গুরুতর ব্যাপারটা কি শুনি?

তিনি—রায়বাহাদুর যে আজ বাত্রে নিহত হবেন, যে করেই হোক ব্যাপারটা তিনি পূর্বাহ্নে বুবাতে পেরে আমাকে সাহায্য করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবং এখন দেখতে পাচ্ছি তাঁর সে অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যি-সত্যিই তিনি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছেন।

ইঁ, সত্যি-সত্যিই তাহলে দুর্যোধন নিহত হয়েছে! ব্যাপারটার মধ্যে যেন এতটুকু গুরুত্বও নেই এইভাবে কথা কটি উচ্চারণ করে ধীর শাস্ত ও মৃদু পদবিক্ষেপে ঘরের অন্যাংশে পর্দার ওপাশে এগিয়ে গেলেন অবিনাশ চৌধুরী।

কিরীটী ও দালাল সাহেবের নিঃশব্দে অবিনাশ চৌধুরীকে অনুসরণ করে।

শ্যায়ার উপর রায়বাহাদুরের মৃতদেহ ঠিক পূর্বের মতই পড়ে আছে দেখা যায়।

অবিনাশ একেবাবে মৃতদেহের সামনে শ্যায়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত সেই ভয়কর দৃশ্যের দিকে চেয়ে অশ্ফুট স্বরে বললেন, দুর্যোধন! Poor boy! সত্যি-সত্যিই তুই তাহলে মরলি! আশৰ্য্য, তুই যে মরবি এ কথা তুই জেনেছিলি কি করে!

সহসা এমন সময় কিরীটীর প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী ফিরে তাঁর দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকান।

কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনি তাহলে সে কথা জানতেন অবিনাশবাবু?

Who are you? অবিনাশ চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

চিনতে পারছেন না আমাকে, আমার নাম কিরীটী রায়!

কিরীটী রায়! ও হাঁ, মনে পড়েছে। আমাদের সেই দলিল জালের একটা ব্যাপারে বছর দুই আগে তুমিই না সব ধরে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

ইঁ, তা কি বলছিলেন, আমি সে কথা জানলাম কি করে, ন্যায় নতুন কথা তো নয়, দুনিয়াসুন্দ লোকেই তো শুনলাম জানতো। দুর্যোধন তো কথাটা বলে বেড়িয়েছে সকলকে শুনেছি।

আপনাকেও তাহলে তিনি বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

কবে?

দিন পনের আগে ও একবার বলেছিল—

এর মধ্যে আর বলেননি।

না। বলবে কখন—দেখাই তো হয়নি!

দেখাই হয়নি।

না।

কত দিন দেখা হয়নি?

তা দিন পনেরো হবে।

এই দিন পনেরোর মধ্যে একবারও ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি?

না।

উনি যে অসুস্থ তা আপনি জানতেন?

জানব না কেন!

তবে?

তবে আবার কি! ওসব বড়লোকের রোগফোবিয়া আমার দু-চক্ষের বিষ, I can't stand them.

রায়বাহাদুরের এই দীর্ঘদিনের রোগটা তাহলে আপনার মতে একটা ফোবিয়া ছাড়া কিছু নয়? কিরীটি বলে।

নিশ্চয়ই না।

কি বলছেন আপনি! এত বড় রোগ, এত ডাক্তার, সব ছিল তাঁর একটা ফোবিয়া? প্রশ্ন করলেন এবারে দালাল সাহেব।

হ্যাঁ, তাচাড়া আর কি! সাত-সাতটা হার্ট অ্যাটাক হলে কোন ভদ্রলোক উঠতে পারে বলে তো কখনও শুনিনি। আসলে ও হার্ট অ্যাটাক নয়।

আবাক বিস্ময়ে কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবিনাশ চৌধুরী তখনও বলে চলেছেন, বুকলেন, আসলে ওসব কিছু নয়, ওকে পেয়েছিল মেলানকোলিয়ায়, বেটসা অর্থাৎ সুরমার মৃত্যুর পর হতেই ও মেলানকোলিয়ায় ভুগছিল। ইদানীং আবার গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছিল, মেলানকোলিয়াই গিয়ে শেষে সিজোফ্রেনিয়াতে দাঁড়িয়েছিল। ভারি তো দু'ছটাক সম্পত্তি আর সামান্য কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, তার জন্যে লোকে ওকে হত্যা করবে! যত সব—

বড় বড় রোগের নাম উচ্চারিত হতে শুনেই ডাঃ সমর সেন ও ডাঃ সানিয়াল উভয়েই কৌতুহলী হয়ে অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকান।

উভয়েরই বাক্যস্ফূর্তি হয় না অবিনাশ চৌধুরীর কথা শুনে।

অবিনাশ চৌধুরী বললেন, অপঘাতে মৃত্যু! এইবার সব ধর্মে পড়বে। দীর্ঘদিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে দুর্ঘোধন আর আমি সব গড়ে তুলেছিলাম এইবার সব যাবে। অভিশাপ—সত্তিসাধীর অভিশাপ!

বলতে বলতে অবিনাশ চৌধুরী বোধ হয় ফিরে যাওয়ার জন্মাই পা বাড়িয়েছিলেন।

দালাল সাহেবে সহসা বাধা দিলেন, অবিনাশবাবু!

তুমি আবার কে?

আমি এখানকার এস.পি.।

I see—তা তোমার কিছু বক্তব্য আছে নাকি?

ଜ୍ଞ କୁଞ୍ଚିତ କରେ ତୀର ଦୃଷ୍ଟିତ୍ତ ତାକାନ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଦାଲାଳ ସାହେବେର ମୁଖେର ଦିକେ ।
ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନେ ଦାଲାଳ ସାହେବ କେମନ ଯେନ ଥତମତ ଥେଯେ ତାକିଯେ ଥାକେନ ।

ଏହି ସମୟ କିରୀଟୀ କୃପା ବଲେ ଆବାର ।

ମେ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଏକଟା କଥା ଅବିନାଶବାବୁ—

ବଲୁନ୍ ।

ଏକଟ ଆଗେ ଘରେ ଢୁକତେ ଢୁକତେ ଆପନି ଯେ ବଲଛିଲେନ ଦୁ ବ୍ସର ଆଗେଇ ରାଯବାହଦୁର
ଡିଲାନ୍ କରେଛିଲେନ—

ହୁଁ, କରେଛିଲେଇ ତୋ ।

ମେଟା ଅବିଶ୍ୟ ଆମିଓ ଶୁନେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ ମେଟା କି ରେଜିସ୍ଟାର୍ଡ ଉଇଲ ?

ରେଜିସ୍ଟ୍ରେ କରେଛି କିନା ଉଇଲଟା ତା ଜାନି ନା ତବେ ଏକଟା ଉଇଲ ତାର ଆଛେ । ଆଗେ
ଯେ ଘରେ ଦୂର୍ଯ୍ୟାଧନ ଶୁତ ମେହି ଘରେର ଆଯବନ ଚେସ୍ଟେଇ ବୋଧ ହୁଁ ତାର ମେ ଉଇଲ ଆଛେ, ଯତଦୁର
ଆମି ଜାନି । ତବେ ମେ ଉଇଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଓଯା ଯାବେ ବଲେ ଆର ଆମାର ଏଥିନ ମନେ ହଛେ
ନା ।

କେନ ? କିରୀଟୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ ।

କେନ ! ଏମନି ଅପ୍ରାତ ମୃତ୍ୟୁ, ତାର ଓପରେଓ ମେ ଉଇଲ ପାଓଯା ଯାବେ ବଲେ ଆପନି ମନେ
କରେନ ମିଃ ରାଯ ? ତାହାଡା ଆମି ତୋ ଜାନି ମେ ଉଇଲେ ଏହି ଯାରା ସବ ପରମାଣ୍ମୀଯେର ଦଲ
ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଏମେ ଭିଡ଼ କରେଛେ ତାରା କେଉଁଇ କିଛୁ ପାଇନି ।

କି ବଲଛେନ ଆପନି ? କିରୀଟୀଇ ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

ହୁଁ, ଉଇଲଟା ଯଦି ଝୁଁଜେ ପାନ ତୋ ମେଟା ଖୁଲଲେଇ ଆମାର କଥାର ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟେ ନିଜେର
ଚୋଥେଇ ଦେଖିତେ ପାବେନ ।

ଅତଃପର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆର ବାକ୍ୟବ୍ୟ ନା କରେ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ କଷ୍ଟତ୍ୟାଗ କରେ ଚଲେ
ଗେଲେନ ନିଃଶବ୍ଦେ ।

ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀର ଶେଷେର କଥାଯ ଓ ତାର କଷ୍ଟ ହତେ ପ୍ରହାନେର ମେଙ୍ଗେ ମେଙ୍ଗେ ଯେନ ସମଗ୍ର
କଷ୍ଟର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ବିଶ୍ରୀ ଥମଥମେ ଭାବ ଜମାଟ ବେଁଧେ ଓଠେ ।

ଅଭାବନୀୟ ପରିହିତି ।

କାରାଓ ମୁଖେଇ କୋନ ଶବ୍ଦଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ । ନିଶ୍ଚପ ସକଳେଇ ।

ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀଇ ଯେନ ସକଳକେ ଅକସ୍ମାତ ମୂର କରେ ଦିଯେ ଗିଯେଛେ ।

ଓଦିକେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୁଁ ଆମାର ।

ଆକାଶେର ବୁକେ ଶେଷ ଅନ୍ଧକାରେର ପାତଳା ପଦ୍ମଟା ଆସନ ଆଲୋର ଛୋଯାଯ ଫେନ ଥିଲ
ଥିର କରେ କାଂପାଇଲ ।

ନାଇଟ୍-କିପାର ହମ୍ ସିଂହେର ଥବରଦାରିର ଚିଂକାର ମେ ରାତ୍ରିର ମତ ଥେବେ ମିଲେଇଲ ବୋଧ
ହୁଁ ।

ସାରାରାତ୍ରିର ଜାଗରଣକ୍ଳାନ୍ତ ହମ୍ ସିଂ ବାଗାନେର ମଧ୍ୟେ ଛୋଟ ଟାଙ୍କିର ଶେଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ଏତକ୍ଷଣ
ଗିଯେ ହ୍ୟାତ ଢୁକେଛେ ।

ଏଥିନ ଟାନା ଘନ୍ଟା ଚାରେକ ଘୁମୋବେ ।

ବେଳା ଦଶଟା ସାଡେ ଦଶଟା ନାଗାଦ ଏକବାର ଜେଗେ ନିଜ ହାତେ ଉନ୍ନମ ଧରିଯେ ଏକ ମଗ କଡ଼ା
ଚା ତୈରି କରେ ପାନ କରେ ଆବାର ବେଳା ବାରୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁମୋବେ ।

তারপর কিছু ঝটি ও ডাক্তাহার এবং আবার স্বৰ্যস্ত পর্যন্ত একটানা নিদ্রা।

জাগবে সে ঠিক সন্ধ্যাব অবিষ্ট অন্ধকার যখন প্রকৃতির বৃকে একটু একটু করে ঘন হয়ে উঠবে।

কিরীটাই ঘরের নিষ্ঠদত্ত ভঙ্গ করে।

দালাল স্মাহেবের দিকে চেয়ে বলে, আপনার জবানবন্দি নেওয়া শেষ হল দালাল
সাহেব!

—এই যে শুরু করি—

দালাল সাহেবে আবার তাঁর জবানবন্দি নিতে শুরু করেন।

রায়বাহাদুরের ভাই দুঃশাসন চৌধুরীর জবানবন্দি নেওয়া তখনও শেষ হয়নি,
আকশ্মিকভাবে ঘরের মধ্যে অবিনাশ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটে।

কিরীটাই নির্দেশে বোধ হয় তারই পূর্ব প্রশ্নের জের টেনে দালাল সাহেব দুঃশাসন
চৌধুরীর দিকে চেয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি এই তো বলতে চান যে
রায়বাহাদুরের কোন প্রকার উইলই ছিল না?

আমি তো মশাই সেই রকমই জানি।

তবে আপনার কাকা সাহেব যে সব কথা বলছিলেন—

ছেড়ে দিন না মশাই। একটা অর্ধ-উন্মাদ লোক— ওঁর কথা কেউ বিশ্বাস করবে নাকি?
তাছাড়া দিবারাত্রি গান আর বাইজী নিয়েই তো পড়ে আছেন।

কিরীটাই এবার প্রশ্ন করে, অর্ধ-উন্মাদ নাকি অবিনাশবাবু?

তাছাড়া আর কি! আর এখানে সকলেই তো সে কথা জানে। খোঁজ নিলেই জানতে
পারবেন বছর পাঁচেক আগেই প্রথম ওঁর মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই সময়
অনেক চিকিৎসা করা হয়, এমন কি কিছুদিন কাঁকে মেন্টাল হস্পিটালেও ওঁকে রাখা
হয়েছিল।

আপনি তো দীর্ঘকাল ধরে বিদেশে ছিলেন এবং রায়বাহাদুরের মুখেই আমি শুনেছি
আপনার সঙ্গে এ বাড়ির কথনও পত্র বিনিময়ও ছিল না। এসব কথা তবে আপনি
জানলেন কি করে?

এখানে এসেই শুনেছি।

হঁ। বলতে বলতে হঠাৎ বৃহলা চৌধুরীর দিকে ফিরে চেয়ে কিরীটা প্রশ্ন করে,
বৃহলাবাবু, সত্যিই কি আপনার দাদুর মাথার গোলমাল ঘটেছিল?

হ্যাঁ, দাদুকে কিছুদিন রাঁচিতে কাঁকে মেন্টাল হস্পিটালে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা
হয়েছিল।

কতদিন হাসপাতালে তিনি ছিলেন?

তা বছর দেড়েক তো হবেই।

সেখান থেকে কি পরে তাঁকে তারাই ডিসচার্জ করে দেয়, না আপনারাই ওঁকে ছাড়িয়ে
আনেন?

ভাল হয়ে যাওয়ায় আমরাই ওঁকে ছাড়িয়ে আনি।

অসুখটা কি হয়েছিল তাঁর জানেন কিছু?
না।

দালাল সাহেবের আবার প্রশ্ন শুরু করেন দুঃশাসন চৌধুরীকে।

রাত্রি টিক সাড়ে তিনটে থেকে রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এ ঘরে আসবার পূর্ব
পর্যন্ত সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন দুঃশাসনবাবু?

মাস তিনেক ধরে রাত্রে আমার একেবারেই বলতে গেলে ঘূম হয় না। তবে আজ নার্স
আমাকে একটা স্ট্রং ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল তাতেই বোধহয় একটু ঝিম মত এসেছিল। বোধ
হয় তো কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েও পড়েছিলাম।

ইঁ। তা রায়বাহাদুর যে মারা গেছেন টের পেলেন কি করে?

সত্যি কথা বলতে কি—দাদার আজ কদিনকার কথা শুনে আজকের রাত্রে ঐ সময়ে
যে একটা বিপদ ঘটতে পারে আর কেউ বিশ্বাস না করলেও কেন যেন আমার মন
বলছিল, একেবারে অবিশ্বাস করে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার নয়। তাছাড়া আমি তো এই
পাশের ঘরেই থাকি, তাই চারটে বাজবার মিনিট চার-পাঁচ আগেই হঠাৎ তন্ত্র ভেঙে এ
ঘরে এসেছি—

এসে কি দেখলেন?

দেখলাম ঘরের মধ্যে একা দাদার চাকর দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে-মুখে একটা ভয়ের
চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললে, বাবু
নেই। পর্দার ওপাশে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই—

তারপর?

তখন আমিই ওকে আপনাদের ডাকতে বলি ডাক্তারের ঘর থেকে।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী নার্স সুলতা করের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, দুঃশাসনবাবুকে কি
ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন সুলতা দেবী?

ডাঃ সানিয়ালের ইনস্ট্রাকসন ছিল একটা লুমিনল ট্যাবলেট দিতে, তাই দিয়েছিলাম।

মৃদু কোমল কঠে সুলতা কর জবাব দিল।

কিরীটী লক্ষ্য করে, সুলতা কর ত্রি বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ সমর সেন ও ডাঃ সানিয়াল
যুগপৎ যেন নার্স সুলতা করের মুখের দিকে তাকাল।

ডাঃ সানিয়াল কি যেন বলবারও চেষ্টা করেন কিন্তু বলার সময় পান না—দাদার
সাহেবে তাড়াতাড়ি বলেন, আচ্ছা এবারে আপনি আপনার ঘরে যেতে পারেন
দুঃশাসনবাবু। তবে একটা কথা—আমার জবানবন্দি না শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং আমার
পারমিশন ব্যক্তিত এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেন যাবেন না।

দুঃশাসন চৌধুরী দালাল সাহেবের নির্দেশ শুনে ফিরে তাকায়, তার মনে আমাকে কি
নজরবন্দী রাখা হচ্ছে?

না, নজরবন্দী নয়। শুধু একা আপনি নন, এ বাড়িতে যাবা যাবা এখন আছেন
প্রত্যেকের প্রতি আমার ত্রি আদেশ।

বেশ।

দুঃশাসন চৌধুরী অতঃপর ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন এবং স্পষ্টই বোধ গেল দালাল
সাহেবের কঠোর নির্দেশে তিনি আদেশেই সঞ্চালিত হতে পারেননি।

এবং শুধু দুঃশাসন চৌধুরী^{ক্ষমতা}, সকলেই যে একটু মনঃস্থল হয়েছে, সকলের মুখেই
যেন তার আভাস পাওয়া গেল।

কিন্তু দালাল সাহেব কেনে জঙ্গেপটি করলেন না।

তিনি এবার বহুল চৌধুরীর দিকে চেয়ে বললেন, বৃহমলাবাবু, এবারে আপনাকে
আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

॥ পাঁচ ॥

বহুল চৌধুরী কেমন যেন বিহুল দৃষ্টিতে দালাল সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বলে,
বলুন!

আশা করি আপনাকে যা যা জিজ্ঞাসা করব তার সঠিক জবাব পাব।

নিশ্চয়ই।

গলার স্বরটা মদু।

রাত তিনটে থেকে এ ঘরে আসবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপনি কি আপনার ঘরেই
ছিলেন?

হ্যাঁ। সঙ্গে থেকেই শরীরটা আমার আজ ভাল ছিল না। তাছাড়া ডাঃ সানিয়াল
বলেছিলেন ভয়ের কোন কারণ নেই, তাই নিজের ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলাম।

সে ঘরে আর কেউ ছিল?

না। আমি একটি এক ঘরে শুই বছরখানেক যাবৎ।

আপনার স্ত্রী ও ছেলে।

পাশের ঘরে তারা শোয়।

কার কাছে এ দুঃসংবাদ প্রথমে পেয়ে তাহলে আপনি এঘরে আসেন?

কাকাই গিয়ে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সব কথা বলেন।

কাকা মানে দুঃশাসনবাবু?

হ্যাঁ।

এবারে কিরীটি প্রশ্ন করে, হ্যাঁ, আচ্ছা বৃহমলাবাবু, আপনার বাবা যে রাত্রে মারা যাবেন
এ কথা আপনাকে বলেছিলেন কি কথনও?

বলেছিলেন। কিছুদিন থেকে প্রত্যেকের কাছেই তো ও কথা বলেছেন তিনি।

আচ্ছা হঠাৎ ঐ ধরনের কথা বলবার ঠাঁর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে
আপনার মনে হয় কি বৃহমলাবাবু? দালাল সাহেব প্রশ্ন করেন।

কি জানি, আমি তো দেখতে পাই না।

এমন সময় ঘরের মধ্যে সকলকে বিস্মিত ও সচকিত করে অপূর্ব একটি নারীকষ্ট
শোনা গেল।

বৃহমলা! দাদাকে নাকি সত্যিসত্যিই কে খুন করেছে?

যুগপৎ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কঠি প্রাণীই সেই নারীকষ্ট শব্দে ফিরে তাকায়।

মধ্যবয়সী অপূর্ব সুন্দরী এক নারী ও তার পার্শ্বে এক অপূর্ব সুন্দরী কুড়ি-একশ বৎসর
বয়স্কা যুবতী।

শুধু অপূর্ব সুন্দরীই নয় সেই যুবতী, রাপের যেন তার সত্যিই তুলনা নেই।

কি দুপ।

চিত্রকরের আঁকা যেন একখনা ছবি।

চোথের দৃষ্টি যেন ফেরালৈ যায় না।

দুটি অসমবয়সী নারীজীর্ণতিকে দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে একে অন্যের প্রতিচ্ছায়া।

অর্থাৎ মা ও মেলা—

সকলেই বয়সী নারীর প্রশ্নে স্তুতি, নির্বাক।

বহুমাল চৌধুরীই কথা বলে প্রথমে, পিসিমা।

কিরীটী এতক্ষণে চিনতে পারে, ইনিই দুর্ঘাধন চৌধুরীর বিধবা ভগিনী গান্ধারী দেবী।

বহুমাল পিসিমা এবং তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গান্ধারী দেবীর একমাত্র কন্যা রুচিরা দেবী।

রুচিরার অপূর্ব রূপলাবণ্যের কথা কিরীটী রায়বাহাদুরের মুখে ইতিপূর্বে শুনেছিল
বটে তবে ভাবতে পারেনি যে রুচিরা সত্যিসত্যিই অমনি ব্রহ্মবতী।

মুঢ়ু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কিরীটী রুচিরার দিকে এবং শুধু কিরীটীই নয়, ডাঃ সমর
সেনও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে রুচিরার দিকে চেয়ে ছিল পলকহীন দৃষ্টিতে।

আপনিই রায়বাহাদুরের বোন? সহসা কিরীটী গান্ধারী দেবীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। মৃদুকষ্টে গান্ধারী দেবী প্রত্যুত্তর দেয়।

আপনার দাদা রায়বাহাদুর যে নিহত হয়েছেন কার মুখে শুনলেন?

রুচি আমাকে একটু আগে গিয়ে বলল।

কে? রুচিরা দেবী, মানে আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ।

এবারে কিরীটী রুচিরার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, আপনি বলেছেন আপনার
মাকে যে আপনার মামা নিহত হয়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি করে জানলেন সে কথা?

আমি—রুচিরা একবার মার মুখের দিকে চেয়ে কিরীটীর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে
কেমন যেন ইতস্তত করে।

হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে? আমি তো জানি আপনারা দক্ষিণের মহলে থাকেন,
তাই না?

হ্যাঁ।

তবে?

আমাকে ছোটমামাবাবুই তো গিয়ে বলে এসেছেন।

কি বললি, আমি বলে এসেছি? বিশ্বাস করবেন না, মিথো কথা—দুঃশাসন চৌধুরী
হ্যাঁ কাঢ়—কঠিন প্রতিবাদে চিক্কার করে ওঠেন এবং যুগপৎ সকলেই তাঁর মুখের দিকে
তাকায়।

মিথ্যে কথা বলছি? কি বলছ ছোটমামাবাবু? একটু আগে তাঁয়ে তুমি আমাকে বলে
আসেনি যে বড়মামাবাবুকে ছোরা দিয়ে কে যেন খুন করেছে। মিথুকথা শুনেই তো আমি
মাকে গিয়ে খবর দিয়েছি।

It's a damn lie! ডাহা মিথো কথা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুঃশাসন চৌধুরী আবার
প্রতিবাদ জানায়, কথন তোর ঘরে আমি গিয়েছিলাম রে মিথুক? আমি তো বহুমালকে
ডাকতে গিয়েছিলাম। তাঁর ঘরেই ছিলাম।

ছেটমামা, মিথ্যে কথা বলে ক্ষোন লাভ নেই। তোমার কীর্তির কথা জানতে তো আর কারও বাকি নেই।

রঁচিরা!

বিশ্বি কঠে দৃংশাসন চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন। সামান্য একটা কথাকে কেন্দ্র করে বাদ-প্রতিবাদে মুক্তি কষের মধ্যে যেন একটা বিষের হাওয়া জমাট বেঁধে ওঠে।

কিরীটি ফেল তিক্ত ব্যাপারকে আর বেশীদূর গড়াতে দেওয়া উচিত হবে না।

সে শৈর শাস্তি কঠে বলে, দৃংশাসনবাবু, বাদানুবাদের কোন প্রয়োজন নেই। সত্যকে কেন্দ্রে আপনারা গোপন করে রাখতে পারবেন না, সময়ে সবই জানা যাবে। তারপর দৃংশাসন চৌধুরীর দিকে ফিরে বলে, দৃংশাসনবাবু, আপনি কিন্তু শৈরের জন্য যদি একটু ছির হয়ে ওই চেয়ারটায় বসেন—আমি রঁচিরা দেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কিন্তু রঁচিরাকে দৃংশাসন চৌধুরী কি যেন প্রতিবাদ জানাতে শুরু করতেই কিরীটি তাঁকে পুনরায় বাধা দিল, না, এখন আর একটি কথাও নয়। আপনাকে যখন আমি প্রশ্ন করব আপনার যা বলবার বলবেন।

বেশ। তাই হবে। গজগজ করতে করতে দৃংশাসন চৌধুরী অনতিদূরে রাখিত চেয়ারটার উপরে গিয়ে উপবেশন করলেন।

রঁচিরাকে প্রশ্ন করবার আগে একটা ব্যাপার কিরীটির চোখে পড়েছিল। রঁচিরা ঘরে ঢোকার পর হতেই ডাঃ সমর সেনের দিকে মধ্যে মধ্যে আড়চোখে সে তাকাচ্ছিল। এবং শুধু সে নয়, ডাক্তার সেনও।

কিন্তু কিরীটি যেন ব্যাপারটা আদৌ লক্ষ্য করেনি এইভাবে রঁচিরাকে অতঃপর প্রশ্ন শুরু করে।

রঁচিরা দেবী, বলুন তো এবারে, ঠিক কতক্ষণ আগে আপনার ছেটমামা দৃংশাসন চৌধুরী আপনাকে গিয়ে রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন?

তা ঘট্টাখানেক!

বলতে বলতে কিরীটি একটিবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, বেশ, এখন বলুন exactly, দৃংশাসনবাবু আপনাকে গিয়ে কি বলেছিলেন?

ছেটমামাবাবু আমার ঘরে গিয়ে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে, বড়মামাবাবুকে নাকি ছোরা মেরে কে খুন করেছে!

এই কথা বলেই তিনি চলে আসেন, না তারপরেও ঘরে ছিলেন?

চলে আসেন।

হ্যাঁ। এক ঘণ্টা আগে যদি দৃংশাসনবাবু আপনাকে খবরটা দিয়ে থাকেন, চারটে বাজবার কয়েক মিনিট আগেই বলুন খবরটা উনি আপনাকে দিয়েছেন, তাই নয় কি?

হ্যাঁ, তাই হবে।

বেশ। আচ্ছা একটা কথা রঁচিরা দেবী, দৃংশাসনবাবু যখন আপনার ঘরে যান আপনার ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?

হঠাৎ কিরীটির শেষ প্রশ্নে রঁচিরা দেবী কেমন যেন একটু খতমত খেয়ে যায়।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ঘরের দরজা বজ ছিল।

ঘরের আস্তে জুলা ছিল, না নেডানো ছিল?

আর একবার চমকে ওঠে রঁচিরা, মুসু কঠে বলে, জুলানোই ছিল।

ଆପନି ଜେଗେ, ନା ସୁମିଯେ ଛିଲେନ ?

ସୁମିଯେ ଛିଲାମ ।

ତୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିତେ କିରାଟୀ ରୁଚିରା ଦେବୀର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାଯ ।

ଠିକ ଆହେ ରୁଚିରା ମୁଣ୍ଡି, ଆପନି ଆପାତତ ଆପନାର ସରେ ଯେତେ ପାରେନ । ପରେ
ପ୍ରୟୋଜନ ହଲେ ଆପରାକେ ଆମରା ଥବର ଦେବ ।

ନିଃଶ୍ଵରେ ରୁଚିରା କର୍ଫ୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ଏବଂ ସର ଛେଡି ଯାବାର ଆଗେ କିରାଟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଆବ ଏକବାର ଡାଃ ସେନେର ଦିକେ
ନିମ୍ନେରେ ଜନ୍ମେ ତାକାଳ ।

କିରାଟୀ ଏକବାର ମୃତ ରାଯବାହାଦୁରେର ବୋନେର ଦିକେ ତାକିଯେ ମୃଦୁ କଟେ ଡାକେ, ଗାନ୍ଧାରୀ
ଦେବୀ ।

କିରାଟୀର ଡାକେ ରୁଚିରାର ମା ଏକଟୁ ଯେନ ଚମକେ ଉଠେଇ କିରାଟୀର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାଲେନ ।
ଏଥାନେ ଆପନି କତଦିନ ଆହେନ ?

ବର୍ତ୍ତର ସୋଲ ହବେ । ଆମାର ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଥେକେଇ ଦାଦା ଏଥାନେ ଆମାକେ ନିଯରେ ଏମେ
ରେଖେଛେ—ବଲତେ ବଲତେ ଗାନ୍ଧାରୀଦେବୀର ଚୋଥେର ପାତା ଦୁଟୋ ଯେନ ଅନ୍ତରେ ବାପସା ହେଁ
ଆମେ ।

ଆପନାରା କଯ ବୋନ ?

ଆମି ଆର କୁଞ୍ଚି ।

କୁଞ୍ଚି ଦେବୀଓ କି ଏଥାନେ ଆହେନ ?

ନା, ମେ ବହଦିନ ଆଗେ ମାରା ଗେଛେ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଛେଲେ ଐ ଶକୁନି ।

ଶକୁନି ! ଠିକ ତୋ, ଶକୁନିବାବୁକେ ଦେଖଛି ନା ! ତା ତିନି କୋଥାଯ ? ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ଦାଲାଲ
ସାହେବ ବଲେ ଓଠେନ ।

ଡାଃ ସମର ସେନେରେ ଶକୁନିର କଥା ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼େ ଯାଯ । ମନେ ପଡ଼େ ଯାଯ ତାର
ମେହି କଥା, ଆଜେ ମାତୁଲ ଦୂର୍ଯ୍ୟନେର ଭାଗିନୀର ଶକୁନି ।

ଦୁଃଶାସନ ଚୌଧୁରୀ ହଠାତ୍ ବଲେ ଓଠେନ, ଡେକେ ଆନବ ମେ ହତଭାଗଟାକେ ଦାଲାଲ ସାହେବ ?

ନା, ଆପନି ବସୁନ । ଡାକା ଯାବେ'ଥିନ । କିରାଟୀ ଶାତସ୍ଵରେ ଜବାବ ଦିଲ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେବୀର
ଦିକେ ଅତଃପର ଆବାର ତାକିଯେ ବଲଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେବୀ, ଆପନାର ମେଯେ ରୁଚିରାର
ବିଯେର କୋନ ଚେଷ୍ଟାଚରିତ୍ କରଇଛେ ନା ?

ରୁଚିର ବିଯେର ସବ କିଛୁ ତୋ ଏକପ୍ରକାର ଠିକଇ ହେଁ ଆହେ ।

ଠିକ ହେଁ ଗେଛେ ତାହଲେ ?

ହଁ ।

କୋଥାଯ ? କାର ମଙ୍ଗେ ?

ସମୀରେର ମଙ୍ଗେ, ଆର ସମୀର ତୋ ଏଥନ ଏହି ବାଡ଼ିତେଇ ଆହେ ।

ସମୀର ! ବିଶ୍ୱିତ କିରାଟୀ ଯେନ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେବୀକେ ପାଲ୍ଟା ପ୍ରକ୍ଷ କରିଛେ ।

ହଁ—ସମୀର ବୋସ । ଓଦେର କଯଳାର ବାପସା ଆହେ, ଅବସ୍ଥା ଖବର ଭାଲ । ଦାଦାଇ ଏ ବିଯେର
ମର ଠିକଠାକ କରେଛିଲେନ ନିଜେ ପଢ଼ନ କରେ ।

କିରାଟୀ ଏବାରେ ଦୁଃଶାସନ ଚୌଧୁରୀର ଦିକେ ତାକିଯେ ଯିଲେ, କାଉକେ ପାଠିଯେ ଦୁଃଶାସନବାବୁ
ସମୀରବାବୁକେ ଏକବାର ଡେକେ ଆନୁନ ନା ଦୟା କରେ ଏଥାନେ ।

ନିଶ୍ଚୟାଟି । ବଲେ ଦୁଃଶାସନ ଚୌଧୁରୀ ଏକଜନ ଭୃତ୍ୟକେ ତଥୁନି ସମୀରକେ ଡେକେ ଦିତେ
ବଲଲେନ ।

কিরীটী আবার গান্ধারী দেবীর দিকে ফিরে প্রশ্ন শুরু করে, আচ্ছা গান্ধারী দেবী, আপনি আর রঞ্চিরা দেবী কি একই ঘরে শেন?

না। পাশাপাশি দুটো ঘরের দুজনে শুই, তবে দু'ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য মাঝখানে একটা দরজা আছে।

রঞ্চিরা দেবী বিশ্বান আপনাকে গিয়ে রায়বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ দেন তখন আপনি জানেন কিছু? আপনি কি ঐ সময় জেগে ছিলেন?

না, স্বর্মিয়ে ছিলাম। তাছাড়া ঘুম আমার চিরদিনই একটু বেশী গাঢ়। ডাকাডাকি না করলে বড় আমার একটা ঘুম ভাঙে না।

তাহলে রঞ্চিরা দেবীহ—মনে আপনার মেয়েই আপনাকে ডেকে তুলেছেন ঘুম থেকে? হ্যাঁ।

আপনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আপনাকে তিনি ঠিক কি কথা বলেছিলেন আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ, রঞ্চি বললে দাদাকে নাকি কে ছোরা মেরে খুন করেছে।

তা নয়, আমি জানতে চাই, ঠিক রঞ্চিরা দেবী আপনাকে কি কথা বলেছিলেন? মনে করে বলুন।

রঞ্চি বলেছিল—

হ্যাঁ বলুন—ঠিক তিনি কি কথাগুলো আপনাকে বলেছিলেন?

ও বলেছিল, মা, শীগগির এস। বড় মামাবাৰু নাকি খুন—

আর কিছু তিনি বলেননি?

না।

আচ্ছা আর একটা কথা, ইদানীং কিছুদিন ধরে যে রায়বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল আজ রাত চারটোর সময় কেউ তাঁকে হত্যা করবে, এ কথাটা কি আপনি জানতেন? মনে আপনি কি শুনেছেন তাঁর মুখ থেকে কথনও?

হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি।

হ্যাঁ, আচ্ছা আর দুটি প্রশ্ন কেবল আপনাকে আমি করতে চাই গান্ধারী দেবী। তারপর একটু থেমে বলে, বলতে পারেন রায়বাহাদুরের কেন ইদানীং ধারণা হয়ে গিয়েছিল ঐ রকমের একটা যে তাঁকে সকলে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে?

না, বলতে পারি না। আমার তো মনে হয় এমন কোন কারণই থাকতে পারে না। তাছাড়া তাঁকে এ বাড়ির মধ্যে তাঁর আঞ্চলিকজনরা কেউ কেনই বা হত্যা করতে পারে! দাদাও যেমন সকলকে ভালবাসতেন, সকলেও তেমনি দাদাকে ভালবাসত।

হ্যাঁ। আচ্ছা আপনার দাদা রায়বাহাদুরের কোন উইল ছিল বলে জানেন মা কিছু কথনও শুনেছেন?

হ্যাঁ, যতদূর জানি দাদার বোধ হয় একটা উইল আছে।

সে উইল সম্পর্কে অর্থাৎ সে উইলের মধ্যে কি সেখা আছে বা না আছে, সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

না।

আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন।

গান্ধারী দেবী নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অতঃপর কিরীটী পুলিস-সুপার দালাল সাহেবের সঙ্গে অন্যের অশ্রুতভাবে কিছুক্ষণ যেন কি মৃদুকষ্টে আলোচনা করে।

এবং মধ্যে মধ্যে কয়লা সাহেব মাথা নেড়ে সম্ভতি জানান।

বাইরে আবার পদশব্দ শোনা গেল।

এবার পুরুষ সঙ্গে সঙ্গেই আটশ-উন্ত্রিশ বৎসরের একজন সুন্ধী যুবক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। যুবকের পরিধানে স্লিপিং পায়জামা ও গায়ে জড়ানো একটা পাতলা কয়লালেবু রংয়ের কাশ্মীরী শাল।

মাথায় বিশ্রস্ত কেশ ও চোখে-মুখে সুস্পষ্ট একটা নিদ্রাভঙ্গের ছাপ যেন তখনও লেগে আছে।

দুঃশাসন চৌধুরীই তাকে সর্বাগ্রে আহুন জানালেন, এস সমীর। তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপার কি? হঠাৎ? উদ্বিগ্ন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বারেকের জন্য দুঃশাসন চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে সমীর ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করল।
শোননি কিছু?

না তো!

খুবই দুঃসংবাদ, দাদা খুন হয়েছেন।

খুন! যেন একটা আর্ত চিংকারের মতই শব্দটা সমীরের কষ্ট হতে নির্গত হয়।

হ্যাঁ। দাদকে কে যেন খুন করেছে।

আপনারই নাম সমীর বোস? ঐ সময় কিরীটী বাধা দেয়।

কিরীটীর প্রশ্নে সমীর মুখ তুলে তাকায়।

হ্যাঁ। আপনি?

আমার নাম কিরীটী রায়। এ কদিন আমি এখানে আছি, কিন্তু কই আপনাকে তো আমি দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

আমি তো আজই রাত আটটার গাড়িতে কলকাতা থেকে এসেছি।

ওঃ!

ডাঃ সমর সেন সমীর বোসকে চিনতে পেরেছিলেন।

এই ঘরের মধ্যে চুকে দুঃশাসন চৌধুরী ও ডাঃ সানিয়েলের সঙ্গে সমীর বোসকেই তিনি দেখেছিলেন।

কিরীটী আবার বলে, বসুন সমীরবাবু, কতক্ষণ এ ঘরে ছিলেন আপনি আজ রাত্রে?

সমীর চেয়ারের ওপরে উপবেশন করল। এবং মৃদুকষ্টে বলে, রাত তিঙ্গলে পর্যন্ত তো আমি এই ঘরেই ছিলাম। ডাঃ সেন আসবার পর আমি শুভে যাই।

আপনারও তো শুনেছি কয়লার খনি আছে, তাই না মিৎসেম?

হ্যাঁ।

কোথায়?

বিবিয়াতে ও সিঁজুয়াতে।

রায়বাহাদুরের ভাগী রঞ্জিরা দেবীর সঙ্গে তো আপনার বিয়ের সব কথাবার্তা হয়ে গেছে, তাই না?

কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু একটা, তবে এখনও final কিছুই হির হয়নি।
কুচিরা দেবীর সঙ্গেআপনার পরিচয় নিশ্চয়ই আছে?

হ্যাঁ।

কত দিনের পরিচয়?

তা অনেক দিনের হবে। কলেজের একটা ফাঁশনে বছরখানেক আগে কুচির সঙ্গে
আমার মালাপ হয়।

ও একটা কথা মিঃ বোস, এ বিয়ে সম্পর্কে কথাবার্তার জন্যই কি আপনি এখানে
এসেছেন কাল?

না। রায়বাহাদুরের একটা মাইন আমি কিনব, কয়েক মাস যাবৎ কথাবার্তা চলছিল।
সেই সম্পর্কেই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষ করে এবারে আমার এখানে
আসা।

কথাবার্তা কিছু হয়েছিল সে সম্পর্কে?

হ্যাঁ। রাত্রেই সব ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। সইও হয়ে গিয়েছে, এখন কেবল রেজিস্ট্রী
করা বাকি।

আপনি এখান থেকে একেবারে সোজা আপনার ঘরেই গিয়েছিলেন, তাই না মিঃ
বোস?

হ্যাঁ। বড় ঘূম পাচ্ছিল তাই সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আপনার সঙ্গে রায়বাহাদুরের ব্যবসা ছাড়া আর অন্য কোন কথা হয়েছিল কি মিঃ
বোস?

না।

রায়বাহাদুর যে গত রাত্রে ভোর চারটের সময় নিহত হবেন, সে ধরণের কোন কথাও
আপনাকে তিনি বলেননি?

না।

চাকর কে আপনাকে ডাকতে গিয়েছিল?

কৈরানাপ্রসাদ।

আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন মিঃ বোস। তবে একটা অনুরোধ, আমাকে না
জিজ্ঞাসা করে কিন্তু আপনি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

বেশ।

সমীর বোস অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটি এবারে দালাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, মৃতদেহটা তাহলে ময়না
তদন্তের জন্য সিভিল সার্জেনের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

হ্যাঁ, সেটা করতে হবে বৈকি। দালাল সাহেব বলেন, নীচে পাইকাটে আমার এ.এস.আই
আছে মিঃ মির, তাকেই ইনস্ট্রাক্ষনটা দিয়ে আমি পাঠিয়ে দিছি।

দালাল সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ ছয় ॥

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে।

ঘরের বক্ষ জামলাগুলো খুলে দিতেই প্রথম ভোরের শিঙ্ক আলো ঘরের মধ্যে এসে অবারিত প্রস্তুতায় যেন চারিদিক ভরিয়ে দেয়।

পুলিমের গাড়িতে করেই ইতিমধ্যে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়ে গিয়েছে।

দুঃশাসন চৌধুরী, দালাল সাহেব, ডাঃ সানিয়াল ও ডাঃ সমর সেন ব্যতীত সকলকেই কিরীটী বিদায় দিয়েছে।

কিরীটী তার ঘরে বসে কথা বলছিল দুঃশাসন চৌধুরীর সঙ্গে।

রঞ্চিরা দেবীকে তাহলে আপনিই রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদটা দিয়েছিলেন, মিঃ চৌধুরী?

নিশ্চয়ই না। সত্যি, আমি এখনও ভেবে পাছি না এত বড় ডাহা মিথ্যে কথাটা মেয়েটা বলে গেল কি করে!

দালাল সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, রঞ্চিরা দেবীর সঙ্গে আপনাদের কোন মনোমালিন্য নেই তো? দুঃশাসনবাবু?

একটা পূর্ণক্ষে ফাজিল প্রকৃতির মেয়ের সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কি কারণ থাকতে পারে বলুন তো দালাল সাহেব! চিরটাকাল গান্ধারী আর তার স্বামী হায়িকেশ দাদার ঘাড়ে বসে খেয়েছে। হায়িকেশের সঙ্গে গান্ধারীর বিয়েতে মোটেই আমার মত ছিল না। এককালে ওরা ধনী ছিল কিন্তু হায়িকেশের সঙ্গে যখন গান্ধারীর বিয়ে হয় তখন ওদের দুবেলা ভাল করে আহার জুট্ট না। থাকবার মধ্যে ছিল পৈতৃক আমলের একটা নড়বড়ে পুরনো বাড়ি আর দেহে ব্যাধি-দুষ্ট রূপ—

ব্যাধি-দুষ্ট রূপ!

তাহাড়া কি! এই রূপই ছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল অতীত ধনদৌলতের মিথ্যে উঁঁ একটা অহঙ্কার। এবাবে এসে যখন দেখলাম এখনও ওরা দাদার ঘাড়েই চেপে বসে আছে, দাদাকে বলেছিলাম ওদের একটা ব্যবস্থা করে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে। আ দাদা কি আমার কথা শুনলেন!

আচ্ছা এবাবে আপনি তাহলে যেতে পারেন দুঃশাসনবাবু।

দুঃশাসন চৌধুরী ঘর থেকে চলে গেলেন কিরীটীর অনুমতি পেয়ে।

একটু চা পেলে মন্দ হত না—কিরীটী বলে এই সময়।

ডাঃ সানিয়াল বললেন, চলুন না আমার ঘরে।

তাই চলুন।

কিরীটী, দালাল সাহেব, ডাঃ সানিয়াল ও ডাঃ সেন অতঃপর সমস্তে ডাঃ সানিয়ালের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

ডাঃ সানিয়াল ইলেক্ট্রিক স্টেডে কেতজীতে জল চাপিয়ে দিলেন।

হঠাৎ কিরীটী বসে, আপনারা বসুন, আমি দু'মিনিটের মধ্যে আসছি। চা হতে হতেই, আমি এসে পড়ব।

কিরীটী কথাটা বলে ডাঃ সানিয়ালের ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে কি ত্বেবে যেন ঘরের দরজাটা বক্ষ করে দিল।

শকুনি ঘোষ!

একবার শকুনির খোঁজটা নেওয়া দরকার। শকুনির ঘরটা কিরীটীর চেনা।

দোতলারই শেষ প্রান্তের ঘরটায় শকুনি থাকে।

কিরীটী বারবন্দ আস্তিক্রম করে শকুনির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঘরের দরজা বন্ধ। কি ভেবে হাত দিয়ে দ্বিষৎ ধাক্কা দিতেই দূয়ার খুলে গেল—দরজা ভেজানো ছিল।

মাঝখন আকারের ঘরটি। খোলা জানালা পথে ভোরের পর্যাপ্ত আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

সেই আলোয় কিরীটী দেখল, অদূরে শয়ার ওপরে শকুনি অকাতরে তখনও ঘুমোচ্ছে।

সত্ত্বাই শকুনি ঘুমোচ্ছিল। সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা। একটা ছন্দছাড়া শ্রাইন বিপর্যয়ের মধ্যে যেন পরম নির্বিকার ভাবেই একান্ত নিশ্চিষ্টে অঘোরে নিদ্রাভিভূত শকুনি ঘোষ। বাড়ির মধ্যে যে কিছুক্ষণ মাত্র পূর্বে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছে—ওর নিদ্রায় তাতে কোন ব্যাঘাতই ঘটেনি।

পরম নিশ্চিষ্টে ঘুমোচ্ছে শকুনি ঘোষ। গায়ের ওপরে একটা কস্তুর চাপানো।

ঘরের একধারে একটা চেস্ট-ড্র্যার, কপটা দুটো তার খোলা।

একবারশ জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে সেই চেস্ট-ড্র্যারটার মধ্যে স্তূপীকৃত করা আছে।

একটা বেহালা দেওয়ালের গায়ে পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে।

ঘরের এক কোণে একটা জলের কুঁজো এবং তার আশপাশের মেঝে জলে যেন তৈরি করে আছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

হঠাৎ নজরে পড়ে, একটা ব্যবহৃত ধূতি ও একটা মলিন তোয়ালে ঘরের কোণে পড়ে আছে।

কিরীটী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নির্দিত শকুনির শয়ার একবারে সামনেটিতে এসে দাঁড়ায়।

আবার কি ভেবে সেখান থেকে এগিয়ে গেল—যেখানে ক্ষণপূর্বে তার নজরে পড়েছিল একটা ব্যবহৃত ধূতি ও মলিন একখন তোয়ালে।

দ্বিষৎ নিচু হয়ে কিরীটী মেঝে হাতে প্রথমে তোয়ালেটা তুলে নিল হাতে।

স্থানে স্থানে তোয়ালেটা তখনও ভিজে বলে মনে হয় কিরীটীর। বুঝতে কষ্ট হয়ে না তার, রাতেই কোন একসময় ঐ তোয়ালেটা নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে তোয়ালেটা কিরীটী চোখের সামনে মেলে ধরে পরীক্ষা করতে থাকে।

সহসা কিরীটীর দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল চকিতি। তোয়ালের সিঙ্গ অংশগুলিতে একটা মৃদু লালচে আভা যেন।

সিঙ্গ অংশের দ্বিষৎ লালচে আভা যেন কিসের এক ইঙ্গিত দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই সিঙ্গ অংশগুলি পরীক্ষা করে একসময় আবার কিরীটী তোয়ালেটা ফেলে ধূতিটা হাতে তুলে নিল।

তোয়ালেটার মত অতঃপর ধূতিটাও ডাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

ধূতিরও কোন কোন আশ তখনও ঈষৎ সিঙ্গ বলেই মনে হয় এবং সেই সিঙ্গ অংশগুলিতে অস্পষ্ট একটা বৰ্ণনাভা যেন পরিষ্কার চোখের দৃষ্টিতে ধৰা পড়ে।

কিরীটী অতঃপর একটা দুঃসাহসিক কাজ করে, ধূতির ঈষৎ লালিমাযুক্ত ভিজে অংশ হতে একটা টুকরো ছিড়ে নিজের পকেটে রেখে দিল।

আর ঠিক-এসময় মৃদু একটা শব্দ ওর কানে প্রবেশ করতেই মুহূর্তে ও ফিরে তাকান।
শকুনির ঘূৰ ভেঙেছে।

এবং নিদ্রাভঙ্গে শকুন ইতিমধ্যে কখন যেন শ্যায়ার ওপরে উঠে বসেছে।

এবং কেমন যেন বিশ্বায়ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে শকুনি।

প্রথমটায় কিরীটীও যে একটু বিৱৰত হয়ে পড়েনি তা নয়, কিন্তু অসাধাৰণ প্ৰত্যুৎপন্নমতিভূই তাকে যেন উপস্থিত পৰিস্থিতিতে সজাগ ও সক্ৰিয় কৰে দেয়।

মৃদু হেসে যেন কিছুই হয়নি এইৱকম একটা ভাৰ দেখিয়ে কিরীটী শ্যায়ার ওপৰে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে উপবিষ্ট শকুনিৰ দিকে চেয়ে প্ৰশ্ন কৱল, ঘূৰ ভাঙল মিঃ ঘোষ?

শকুনি মৃদু কঠে জবাব দেয়, হঁ। আপনি?

আপনার খোঁজেই এসেছিলাম আপনার ঘৰে। দেখলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন তাই—
আমাৰ খোঁজে এসেছিলেন? কেন?

কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কৱবাৰ ছিল।

কথা? কি কথা?

গতকাল রাত্ৰে রায়বাহাদুৱেৰ ঘৰ থেকে হঠাৎ যে আপনি কোথায় উধাৰ হয়ে গেলেন
আপনার আৱ দেখাই পেলাম না!

হঁ। বড় ঘূৰ পাছিল তাই ঘৰে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

কখন শুতে এসেছিলেন? কিরীটী দ্বিতীয়বাৰ প্ৰশ্ন কৱে।

তা রাত তখন গোটাতিনেক হবে বোধ কৱি। আগেৰ রাত্ৰে মামাৰ ঘৰে জেগেছিলাম।
মামাৰ খৰ কিছু জানেন—কেমন আছেন তিনি?

কিরীটী শকুনিৰ প্ৰশ্নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শকুনিৰ মুখেৰ দিকে।

শকুনিৰ মুখ একান্ত নিৰ্বিকাৰ। দু'চোখেৰ দৃষ্টি একান্ত সহজ ও সৱল।

কোন পাপ দুৰভিসংক্ষি বা দুষ্কৃতিৰ চিহ্নমাত্ৰও যেন তাৰ চোখ-মুখেৰ মধো কোথো
নেই।

সহজ সৱল নিষ্পাপ দৃষ্টি।

মামাৰ সেই দুঃস্মিন্তা নিশ্চয়ই এখন আৱ অবশিষ্ট নেই—শকুনি বলে।

দুঃস্মিন্ত?

হঁ। শকুনি মৃদু হেসে বলে, তাৰ সেই দুঃস্মিন্তেৰ কথা আপনি তো জানেন। কুল রাজ্বে
ঠিক চাৰটেৰ সময় নাকি তিনি নিহত হৰেন, তাৰ সেই ফোৱকাস্ট—ডুরিয়াবণী নিজেৰ
মৃত্যু সম্পর্কে! আজ কয়েকদিন ধৰে কি যে তাৰ মাথাৰ মধ্যে চেপে বসেছিল আৱ সেজন্যা
কিই না এ কদিন ধৰে তিনি কৱেছেন। এমন কি আপনাকে পথস্তু তিনি তাৰ পৰিকল্পিত
হত্যা-ৱহস্যেৰ মীমাংসা কৱবাৰ জন্য ডেকে এনেছেন। তা এখন তাৰ সে ভয় কেটেছে,
তো?

মৃদু কঠে কিরীটী জবাব দিল, হঁ।

ভেবে দেখুন একবাৰ ব্যাপারটা মিঃ রায়, মামাৰ মত একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ঘাসি
তাৰ মাথাৰ মধ্যেও কি সব উষ্টু কঢ়না!

ধূতিরও কোন ক্লোন অংশ তখনও ঈষৎ সিন্ত বলেই মনে হয় এবং সেই সিন্ত অংশগুলিতে অস্পষ্ট একটা রাজ্ঞিমাভা যেন পরিষ্কার চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

কিরীটী অভ্যন্তর একটা দুঃসাহসিক কাজ করে, ধূতির দৈষৎ লালিমাযুক্ত ভিজে অংশ হতে একটা চুকরো ছিঁড়ে নিজের পকেটে রেখে দিল।

আর ঠিক এই সময় মৃদু একটা শব্দ ওর কানে প্রবেশ করতেই মুহূর্তে ও ফিরে তাকাল।
শকুনির ঘূম ভেঙেছে।

এবং নিদ্রাভঙ্গে শকুনি ইতিমধ্যে কখন যেন শয়ার ওপরে উঠে বসেছে।

এবং কেমন যেন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে শকুনি।
প্রথমটায় কিরীটীও যে একটু বিব্রত হয়ে পড়েনি তা নয়, কিন্তু অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই তাকে যেন উপস্থিত পরিস্থিতিতে সজাগ ও সক্রিয় করে দেয়।

মৃদু হেসে যেন কিছুই হয়নি এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে কিরীটী শয়ার ওপরে সদা নিদ্রাভঙ্গে উপবিষ্ট শকুনির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, ঘূম ভাঙল মিঃ ঘোষ?

শকুনি মৃদু কঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ। আপনি?

আপনার খৌঁজেই এসেছিলাম আপনার ঘরে। দেখলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন তাই—
আমার খৌঁজে এসেছিলেন? কেন?

কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

কথা? কি কথা?

গতকাল রাত্রে রায়বাহাদুরের ঘর থেকে হঠাত যে আপনি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন
আপনার আর দেখাই পেলাম না!

হ্যাঁ। বড় ঘূম পাচ্ছিল তাই ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

কখন শুতে এসেছিলেন? কিরীটী দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে।

তা রাত তখন গোটাতিনেক হবে বোধ করি। আগের রাত্রে মামার ঘরে জেগেছিলাম।
মামার খবর কিছু জানেন—কেমন আছেন তিনি?

কিরীটী শকুনির প্রশ্নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শকুনির মুখের দিকে।

শকুনির মুখ একান্ত নির্বিকার। দু'চোখের দৃষ্টি একান্ত সহজ ও সরল।

কোন পাপ দুরভিসন্ধি বা দুষ্কৃতির চিহ্নাত্মণও যেন তার চোখ-মুখের মধ্যে কোথাও
নেই।

সহজ সরল নিষ্পাপ দৃষ্টি।

মামার সেই দুঃস্মিন্তা নিশ্চয়ই এখন আর অবশিষ্ট নেই—শকুনি বলে।

দুঃস্মিন্ত?

হ্যাঁ। শকুনি মৃদু হেসে বলে, তাঁর সেই দুঃস্মিন্তের কথা আপনি তো জানেন। কল রাত্রে
ঠিক চারটের সময় নাকি তিনি নিহত হবেন, তাঁর সেই ফোরকাস্ট—ভবিষ্যাবৃণী নিজের
মৃত্যু সম্পর্কে! আজ কয়েকদিন ধরে কি যে তাঁর মাথার মধ্যে চেপে বসেছিল আর সেজন্ম
কিই না এ কদিন ধরে তিনি করেছেন। এমন কি আপনাকে পর্যন্ত কৃতি তাঁর পরিকল্পিত
হত্যা-রহস্যের মীমাংসা করবার জন্য ডেকে এনেছেন। তা এখন তাঁর সে ভয় কেটেছে
তো?

মৃদু কঠে কিরীটী জবাব দিল, হ্যাঁ।

ভেবে দেখুন একবার ব্যাপারটা মিঃ রায়, মামার মত একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বাস্তি,
তাঁর মাথার মধ্যেও কি সব উল্লেখ কঞ্জনা!

উন্ন্ট কল্পনা ? কিরীটি শকুনৰ মুখের দিকে তাকায়।

তাছাড়া আৱ কি বলি বলুন ! কোন সেইন ম্যানেৰ পক্ষে এটা চিন্তা কৰাও তো যায় না । এমন কথা কৰিবনকালেও শুনেছেন কথনও যে মানুষ তার হত্যার কথা পূৰ্বাহৈই জানতে পেৰেছে।

হঠাতে যেন কিরীটিৰ কঠস্বরে প্রত্যুষ্মৰটা বজ্রের মতই ঘোষিত হল, গভীৰ কঠে কিরীটি বনে, শকুনবাবু, দুঃস্বপ্নই হোক বা অন্য কিছুই হোক, নিষ্ঠুৰ নিৰ্মম সত্য হয়েই ব্যাপারটা গতকাল রাত্ৰে কিন্তু প্ৰমাণিত হয়ে গিয়েছে।

অংঃ ! কি বলছেন আপনি ? কতকটা যেন একটা চাপা আৰ্ত কঠেই শকুনি ঘোষ কথা উচ্চারণ কৱে বিশ্বায়-বিশ্বারিত দৃষ্টিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান কিরীটিৰ মুখের দিকে তাকায়।

হঁা, সত্যিসত্যিই গতকাল ঠিক রাত্ৰি চারটোৱে সময়েই আপনার মামা রায়বাহাদুৰ নিহত হয়েছেন।

বলেন কি মিঃ রায় ! সত্যি ?

হঁা, সত্যি । তিনি নিহত হয়েছেন।

আমি—আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পাৱছি না মিঃ রায়। মামা নিহত হয়েছেন ? কে—কে তাঁকে হত্যা কৱল ?

নিহত যখন হয়েছেন নিশ্চয়ই তখন কেউ না কেউ তাঁকে হত্যা কৱেছে এ অবধারিত।

মামা নেই ! সহসা শকুনি ঘোষেৰ দুটি চোখ অক্ষতে টলমল কৱে এবং কঠস্বরটা যেন বুজে আসে।

কিরীটি নিৰ্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শকুনি ঘোষেৰ মুখেৰ দিকে, অশ্রুপ্রাবিত তার দুটি চোখেৰ দিকে।

বেদনাক্রিট অশ্রুসিঙ্গ দুটি চোখেৰ দৃষ্টি ও সমগ্ৰ মুখখানি যেন সত্যিই বিষঘ-কাতৰ একটি অনিৰ্বচনীয় ভাবাবেগে নিবিড় হয়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুৱেৰ হত্যাসংবাদটা যে একান্ত মৰ্মাণ্ডিক ভাবেই শকুনি ঘোষকে একটা আঘাত দিয়েছে সে বিষয়ে যেন কোন সন্দেহ তার আৱ থাকে না।

সহসা শকুনি ঘোষ দুহাতে মুখটা ঢেকে বোধ হয় অদম্য ক্ৰন্দনেৰ বেগকে বোধ কৱাৰ প্ৰয়াসে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

কিরীটি চেয়ে থাকে কেবল শকুনি ঘোষেৰ মুখেৰ দিকে।

অনেক প্ৰশ্নই তার মনেৰ মধ্যে ঐ মুহূৰ্তে আনাগোনা কৱছিল।

কিন্তু সে নিঃশব্দে অপেক্ষা কৱতে থাকে যেন।

কাৱণ কিরীটিৰ ইচ্ছে কিছু প্ৰশ্ন তার দিক থেকে উচ্চারিত না হয়ে শকুনিৰ দিক থেকেই প্ৰথমে আসুক।

যা বলবাৰ শকুনিই স্ব-ইচ্ছায় প্ৰথমে বলুক, তাৱপৰ যা বলবাৰ সে বলবে।

ধীৱে ধীৱে শকুনি নিজেকে যেন কিছুটা সামলে নেয় এক সময়।

তাৱপৰ ধীৱে ধীৱে মুখ থেকে হাত সৱিয়ে যখন কিরীটিৰ মুখেৰ দিকে তাকায় তখনও তার অশ্রুসিঙ্গ চোখেৰ দৃষ্টিতে যেন একটা মৰ্মঘৃতী যেনেকাই প্ৰকাশ পাছিল।

সত্যি মিঃ রায়, এখনও যেন আমি ভাবতেই পাৱছি না এত বড় একটা দুঃটিনা সত্যিসত্যিই ঘটে গেছে। উঃ, কি ভয়ানক ! মামা নেই ? মামাকে হত্যা কৱা হয়েছে, এ যেন এখনও আমাৰ কল্পনাতেও আসছে না।

কিন্তু যা ইবার, যতই ধর্মান্তিক বা দুঃখের হোক ঘটে গিয়েছে মিঃ ঘোষ। এখন যদি আমরা সেই হত্যাকারীকে পেরে আইনের হাতে তুলে দিতে পারি, তবেই না আমাদের দুঃখের কিছুটা সাঞ্চন আপনাবে!

হত্যাকারীকে?

হ্যাঁ। হত্যাকারীকে যেমন করে হোক আমাদের ধরতেই হবে।

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই মিঃ ঘোষ। হত্যাকারীকে আমরা ধরবই, তবে তাকে ধরতে হলে সবাগে আমাদের যে বস্তুটির প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের পরম্পরাকে পরম্পরারে সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে পরম্পরার আমরা পরম্পরার সহযোগী না হলে আপনার মামা রায়বাহাদুরের নিষ্ঠুর মৃত্যুরহস্যের কোন কিনারাই করতে পারব না জানবেন।

কিরীটীর কথার শুরুনি কোন জবাবই দেয় না, নিঃশব্দে বসে থাকে সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

আবার একসময় কিরীটীই কথা বলে, মিঃ ঘোষ?

অ্যাঁ! শুরুনি যেন চমকে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

এ বাড়ির—মৃত রায়বাহাদুরের সমস্ত আঙ্গীয়-পরিজন আপনাদের সকলের সাহায্যই আমি চাই শুরুনিবাবু।

সাহায্য!

হ্যাঁ, সাহায্য। এ হত্যারহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে আপনারা সকলেই যে যতটুকু জানেন সমস্ত কথা অকপটে বলে আমাকে যদি না সাহায্য করেন, বুঝতেই পারছেন আমার পক্ষে এ রহস্যের কিনারা করা কতখানি কঠকর হবে!

কিন্তু কি ভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি মিঃ রায়? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না?

একটা কথা আপনার জানা দরক শুরুনিবাবু, আপনার মামা রায়বাহাদুরকে বাইরে থেকে কেউ এসে হত্যা করেনি বলেই আমার ধারণা।

কিরীটীর কথায় শুরুনি ঘোষ যেন দ্বিতীয়বার চমকে ওঠে।

এবং বিশ্বারিত দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

ঠিকই বলছি। বাইরে থেকে কেউ এসে তাঁকে হত্যা করেনি।

তার মানে আপনি বলতে চান—

তাই বলতে চাই শুরুনিবাবু, এ বাড়ির মধ্যেই কেউ-না-কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

সত্যিই আপনি একথা বিশ্বাস করেন মিঃ রায়?

করি। এবং আমার বিশ্বাস যে মিথ্যা নয় শীঘ্ৰই তা প্রমাণিতও হবে।

কেউ এ বাড়িরই বলতে ঠিক আপনি কাকে মীন করছেন মিঃ রায়, মানে কে এ নিষ্ঠুর হত্যার জন্য দায়ী?

বলতে দৃঃখ ও লজ্জাই হচ্ছে আমার মিঃ ঘোষ। এই বস্তুটির মধ্যে যারা রায়বাহাদুরের আঙ্গীয় বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যেই কেউ-না-কেউ সুনির্ণিতভাবে এ কাজ করেছেন।

আমি! কথাটা যেন কঠকটা অজ্ঞাতেই নিজের কঠ হতে শুরুনির বের হয়ে আসে।

হ্যাঁ, আপনিও করতে পারেন বৈকি।

কি বলছেন আপনি মিঃ স্লোয়ে? শকুনি যেন আর্টকষ্টে একটা চিংকার করে গঠে।

কিছুই অসম্ভব বলছেন না মিঃ ঘোষ। আপনার পক্ষেও রায়বাহাদুরকে হত্যা করা এতটুকুও অসম্ভব ননে আমি মনে করি না। অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এরপর শব্দনির্বায় কিছুক্ষণ যেন ফ্যালফ্যাল করে একান্ত বোকার মতই কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটি কথাও যেন উচ্চারণ করতে পারে না।

একটি শব্দও কিছুক্ষণ যেন তার কষ্ট হতে বের হয় না।

কিরীটি বলে, মানুষ স্বার্থের খাতিরে কখন যে কি করতে পারে আর না পারে, সে মানুষও নিজে অনেক সময় বোধ হয় চিন্তাও করতে পারে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না মিঃ ঘোষ। জানেন না তো আপনি, এ পৃথিবীটাই একটা বিচির্ব জায়গা! সময় সময় তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ প্রয়োজনের তাগিদে আজও সভ্যজগতের মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিতে পারে আমি বহুবার সচক্ষে দেখেছি। যাক সে কথা। এখন আপনি যদি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেন তবে সুবী হব। ডাঃ সানিয়ালের ঘরে আমাকে এখনি আবার যেতে হবে। তাঁরা আমার জন্য আপেক্ষা করছেন।

বলুন কি জানতে চান? নিষ্ঠেজ নিম্নকষ্টে শকুনি ঘোষ প্রত্যন্তের দিল।

॥ সাত ॥

ব্যস্ত হবেন না মিঃ ঘোষ, আপনি বসুন ঐ খাটে।

শকুনি ধীরে ধীরে তার খাটের ওপর বসে। কিরীটি তখন প্রশ্ন শুরু করে।

এবাবে বলুন, কাল রাত্রে ঠিক কটার সময় আপনি শুতে আসেন?

রাত তখন গোটিনিকে হবে সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে বললাম।

আপনি আমার মুখ থেকে আপনার মামার হত্যার সংবাদ শোনবার পূর্ব পর্যন্ত তাহলে সতিই কিছুই শোনেননি বা জানতে পারেননি ঐ সম্পর্কে, এটা কি সত্যি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আপনি বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কাল রাত্রে?

কিরীটির প্রশ্নে শকুনি ঘোষ প্রথমটায় কেমন যেন একটু ইতস্তত করে, তারপর মৃদুকষ্টে বলে, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম আসেনি। তবে বেশীক্ষণ জেগে যে ছিলাম না এও ঠিক।

হ্যাঁ। সেই সময় কেউ আপনার ঘরে আসেনি?

শকুনি আবার কিছুক্ষণ যেন চুপ করে থাকে, একটু বিরত ও চিন্তিত সে। কিরীটি কেবল আচ্ছে শকুনির মুখের দিকে।

এবং তারপর যেন কতকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই শকুনি বলে, না।

আবার কিরীটি কথাটার যেন পুনরুত্তি করে, কেউ আসেনি ঠিক করছেন?

তাই।

ঠিক আপনার মনে আচ্ছে?

হ্যাঁ।

বাইরে ঠিক ঐ সময় যেন একটা দ্রুত পদশব্দ শোনা গোল। কে যেন এই ঘরের দিকেই আসছে মনে হল।

কিরীটী ঘরে চুকেই ভেত্তা থেকে ঘরের কপাট দুটো ভেজিয়ে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল, সেই প্রায়-বন্ধ কপাটের দিকে চোখ তুলে তাকাল কিরীটী।

সহস্র প্রায়-বন্ধ কপাট দুটি খুলে গেল এবং পরক্ষণেই উন্মুক্ত দ্বারপথে যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল তার দিকে তাকিয়ে কিরীটী যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়।

কেবল আগস্তককে দেখেই কিরীটী ততটা বিস্মিত হয়নি, যতটা হয়েছিল আগস্তকের সমগ্র চৈবায়ম একটা ভীতি ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত চাঞ্চল্য দেখে।

আগস্তক বোধ হয় কক্ষে প্রবেশ করেই কিরীটীকে দেখতে পায়নি, কারণ কিরীটী ঘরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়।

শেকে, শুনেছিস কি সর্বনাশ হয়ে গেছে!

একরাশ উৎকণ্ঠা আগস্তকের কঠস্বরে যেন বারে পড়ে।

কিরীটী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আরও একটু পিছিয়ে গেল।

আগস্তক কিরীটীকে তখনও দেখতে পায়নি। বলে, তোরা কেউ বিশ্বাস করিসনি বটে তবে এ যে হবে তা কিন্তু আমি প্রথম থেকে দাদার কথা শুনেই বুবাতে পেরেছিলাম। আর এও তো জানা কথা এ কার কাজ—

আগস্তকের বকি কথাগুলো শেষ হল না, উপবিষ্ট নির্বাক স্থিরদৃষ্টি শুকুনির দিকে চেয়ে এতক্ষণে বোধ হয় কেমন একটু মনে মনে সন্দিক্ষ হয়ে পাশের দিকে তাকাতেই অদূরে দণ্ডয়ামান নির্বাক কিরীটীর স্থির দুটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সঙ্গে নিজের চোখের দৃষ্টি মিলিত হয়ে গেল।

মুহূর্তে বজ্জ্বার সমগ্র শরীরের স্নায় ও উপস্নায় দিয়ে একটা তীব্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বুঝি খেলে গেল।

কথাটা যা বলছিলেন গান্ধারী দেবী, হঠাতে বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

মৃত রায়বাহাদুরের অপরূপ সুন্দরী বিধবা ভগিনী গান্ধারী দেবীই আগস্তক।

মুহূর্তে যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে, প্রচণ্ড একটা বৈদ্যুতিক শক্তি নিমেষে সমগ্র স্নায়ুতে আঘাত দিয়ে গান্ধারী দেবীর সমস্ত বাক ও বোধশক্তিকে যেন মুহূর্তে হরণ করেছে।

গান্ধারী দেবী যেন প্রাণহীন একটা পাথরে পরিণত হয়েছেন অকস্মাৎ।

মূর্ক অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন গান্ধারী দেবী কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন গান্ধারী দেবী। আপনার যা বলবার বা শুকুনিবাবুকে যা বলতে এসেছিলেন নির্ভয়ে বলুন। কোন ভয় নেই আপনার, আমি কথা দিছি আপনাকে— বিশ্বাস করুন তৃতীয় কোন ব্যক্তিই এসব কথা জানতে পারবে না।

গান্ধারী দেবী তথাপি কিন্তু নিরস্তর।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন গান্ধারী দেবী কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন গান্ধারী দেবী। ঐ চেয়ারটায় বসুন। কিরীটী পুনরায় আহাৰ জানায় গান্ধারী দেবীকে।

অত্যন্ত সহজ ভাবে কিরীটী কথাগুলো উচ্চারণ করলেও কঠস্বরে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশের সুর যেন প্রকাশ পায়।

এ শুধুমাত্র অনুরোধই নয়, আদেশও।

এবং সে আদেশকে লঙ্ঘন করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

তথাপি কিন্তু গান্ধারী দেবী নিশ্চৃপ, পাষাণ-প্রতিমার মতই যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিরীটী আবার বলে খির অপলক দৃষ্টিতে গান্ধারী দেবীর চোখের দিকে চেয়ে, বসুন গান্ধারী দেবী!

এবারে সম্ভিসত্যই গান্ধারী দেবী কতকটা মন্ত্রমুক্তের মতই যেন সামনের চেয়ারটার ওপর থিয়ে বসলেন।

হ্যাঁ বলুন এবারে—একটু আগে যা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন!

কি বলব? ক্ষীণ কঠে এতক্ষণে গান্ধারী দেবী কথা কঠি বলেন।

রায়াবাহাদুরের হত্যাকারী সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে—আরও সোজা করে বলতে গেলে বলা যায়, নিশ্চয়ই আপনি কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন, তাই নয় কি?

সন্দেহ করেছি!

হ্যাঁ। একটু আগে তো সেই কথাই শকুনিবাবুর কাছে আপনি বলতে বলতে থেমে গেলেন।

আমি—

শুনুন গান্ধারী দেবী, আপনি নিজেই আপনার কথার ফাঁদে আটকে পড়েছেন। এখন আর উপায় নেই। কিন্তু তারও আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

কি?

আপনি নিশ্চয়ই চান যে রায়বাহাদুর—আপনার ভাইকে যে অমন নিষ্ঠুরভাবে গতকাল হত্যা করেছে, সেই নৃশংস শয়তান হত্যাকারী ধরা পড়ুক এবং তার সমুচিত শাস্তিবিধান হোক।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাই।

এবং এও আপনারা সকলেই জানেন সেই নিষ্ঠুর ব্যাপারের মীমাংসাই আমি করতে চাই!

হ্যাঁ।

এও নিশ্চয়ই তাহলে স্বীকার করবেন যে, নিষ্ঠুর ঐ হত্যারহস্যের মীমাংসা করতে হলে আমাকে আপনাদের—এ বাড়ির সকলেরই সাহায্যের প্রয়োজন অঙ্গ-বিস্তর? অন্যথায় ব্যাপারটা একটু জটিলই হবে?

কিন্তু—

তাহলে বলুন আপনি যা জানেন। অকপটে সব আমার কাছে খুলে বলুন—কিছু গোপন করবেন না!

কি বলব?

কাকে আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহ করছেন খুলে বলুন?

আবার গান্ধারী দেবী নিরুত্তর, চোখেমুখে তাঁর যেন সুস্পষ্ট একটা চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে।

বলুন—চুপ করে থাকবেন না!

ক্ষমা করবেন কিরীটীবাবু, আমি—মানে আপনি আর কথা ঠিক বুঝতে পারেননি। শকুনিকে আমি ঠিক তা বলতে চাইছিলাম না—

বিচ্ছিন্ন একটা হাসি যেন কিরীটীর ওষ্ঠে প্রাপ্তে মুহূর্তে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। এবং কৌতুকে চোখের তারা দৃষ্টি ধৰক্ষাক্ৰ কৰতে লাগল।

গান্ধারী দেবী আমি কিরীটী রায়। আমার সত্যিকারের পরিচয়টা হয়ত আপনার জানা নেই, নচেৎ বুঝতে পারতেন মানুষের মনের গোপন কথাকে টেনে বের কৰবার একটা শক্তি দৃশ্যমান আমায় দিয়েছেন। আপনার গলার স্বরকে আপনি মুক কৰে রাখলেও আপনার দৃষ্টি চক্ষু, হিঁরনিবন্ধ দুটি ওষ্ঠ অনেক কিছুই এই মুহূর্তে আমার কাছে সম্প্রস্তুতভাবেই ব্যক্ত কৰছে। আপনি আপনার গত রাত্রের জবানবন্দিতে যে বলেছিলেন— অপ্রাপ্তি ঘুমিয়ে ছিলেন এমন সময় আপনার মেয়ে রঞ্চিরা দেবী এসে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে আপনাকে রায়বাহাদুরের মৃত্যসংবাদটা দেন, কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা আর কেউ না জানলেও আমি কিন্তু ঠিকই ধৰেছিলাম গতকালই।

মিথ্যে! কথাটা উচ্চারণ কৰে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গান্ধারী দেবী কিরীটীর চোখের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মেলান।

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যে। কিরীটীর দু'চোখের দৃষ্টিতে আবার সেই শানিত ছুরির ফলার মতই তীক্ষ্ণতা ঘনিয়ে ওঠে।

এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়! পুনরায় প্রশ্ন কৰেন গান্ধারী দেবী।

হ্যাঁ, মিথ্যে। কারণ আমি জানি সে-সময় আপনি জেগেই ছিলেন এবং শুধু তাই নয়, পাশের ঘরে—মানে আপনার মেয়ের ঘরে কিছুক্ষণ পূর্বে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কথাই আপনার কানে গিয়েছিল।

এসব কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

মিথ্যে বা কল্পিত কিছুই বলছি না নিশ্চয়ই। সেটা অবশ্যই আমার চাহিতেও আপনি ভালই বুঝতে পারছেন গান্ধারী দেবী।

কিন্তু আমার মেয়ে রঞ্চিরাও কি আপনাকে বলেনি যে সে এসে আমাকে ঘুম হতে উঠিয়ে—

হ্যাঁ বলেছিলেন, তবে ঘুম তো নয় সেটা আপনার গান্ধারী দেবী—বলতে পারেন ঘুমের ভান মাত্র।

চকিতে শব্দুনি ঘোষ একবার গান্ধারী দেবী ও একবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় এই সময়।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে কিন্তু সেটুকুও ফাঁকি দিতে পারে না।

কিন্তু কিরীটীর চোখে মুখে তার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

ঘুমের ভান! আমি ঘুমোইনি—ঘুমের ভান কৰে ছিলাম?

ঠিক তাই। কারণ ঐভাবে জেগে ঘুমনোর হয়ত আপনার বহু সময়েই প্রয়োজন হয়, অবশ্য আপনার মেয়ে রঞ্চিরা দেবীর পক্ষে সেটা না জানাই সম্ভব।

না জানাই সম্ভব!

হ্যাঁ। অন্যথায় নিশ্চয়ই রঞ্চিরা দেবী আপনার সম্পর্কে সম্পূর্ণ হয়ে থাকতেন এবং যথাবিহিত সতর্কতাও হয়ত অবসর্পন কৰতেন।

কিরীটীবাবু!

একটা রক্ষ তীক্ষ্ণতা দেখি গান্ধারী দেবীর কঠম্বরে ঐ মুহূর্তে প্রকাশ পায়।

গান্ধারী দেবী, কিরীটী রায়ের এই দু'জোড়া চোখ ছাড়াও আর এক জোড়া চোখ—
অদৃশ্যও বলতে পরিষেবন সদা এমন সতর্ক থাকে যে তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়া অনেকের
পক্ষেই খুব সহজসাধ্য নয়। শুনুন তবে, গতরাত্রে আপনি যথন রায়বাহাদুরের ঘরে উঠে
এসেছিলেন সেই সময় আপনার চোখের পাতায় কোথাও আপনার ক্ষণপূর্বে কথিত নিদ্রার
বিন্দু দেখে আমি দেখতে পাইনি। শুধু তাই নয়, আপনার মাথার চুল ও বেশভূষায় এমন
একটা নিখুঁত পারিপাট্য ছিল যা অস্তত কোন সদ্য-নির্দেশিত ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যেতে
পারে না। বিশেষ করে যাঁকে একটু আগে ঘূম থেকে ডেকে তুলে একটা দুঃসংবাদ দেওয়া
হয়েছে এবং যার জন্য অস্তত তিনি পূর্বাহ্নে আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না। আরও একটা
ব্যাপার যেটো হয়ত আপনার ভাববারও প্রয়োজন হয়নি এবং আপনার নজর দেওয়ারও
অবকাশ হয়নি, আপনি কাল যথন রায়বাহাদুরের ঘরে এসে প্রবেশ করেছিলেন, আপনার
গায়ে একটা ফুলহাতা গরম-জামা ছিল। নিশ্চয়ই গরম-জামা গায়ে দিয়েও যেমন আপনি
নিদ্রা যান না তেমনি ও ঘরে আসবার পূর্বেও অত বড় একটা দুঃসংবাদ শোনবার পর
গরম-জামাটা গায়ে দিয়ে আসবার কথাটাও আপনার মনে আসবার কথা নয় এবং
স্বাভাবিকও নয়।

গান্ধারী দেবী কিরীটীর কথায় যেন সত্যিই একেবারে বোঝা হয়ে যান।

তাহলেই এখন বুঝতে পারছেন তো কেন আমি আপনার নিদ্রা সম্পর্কে সন্দিহান? এবারেও গান্ধারী দেবী কিরীটীর কথার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

গান্ধারী দেবী, মিথ্যে আপনি সব কথা আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা করছেন এখনও!

সহসা এবারে গান্ধারী দেবী একটু যেন রাঢ় কঠেই জবাব দিলেন, আমি কিছুই জানি
না কিরীটীবাবু। কেবল এইটুকু বলতে পারি, সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই
মিথ্যে আপনি আমাকে জেরা করছেন।

যদি তাই হয়, তবে একটু আগে এই ঘরে ঢোকবার মুহূর্তে শুকুনিবাবুকে যে কথাটা
বলতে গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে এখানে দেখেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন—সে কথাটা
কি? কি কথা ওঁকে বলতে যাচ্ছিলেন—সেটা অস্তত জানতে পারি কি?

না।

যেন একটা রাঢ় কঠিন আঘাতের মতই 'না' শব্দটি কিরীটীর মুখের ওপর এসে পড়ে
তাকেও নিশ্চুপ করে দিল।

ক্ষণকাল গভীর অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটী গান্ধারী দেবীর মুখের দিকে জ্বেয়ে
থেকে হঠাৎ বলে ওঁটে, গান্ধারী দেবী, একটা কথা—সমীরবাবুর সঙ্গে সত্যিমত্যই কি
আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর বিবাহ-ব্যাপারটা স্থির হয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ। ধীর কঠে গান্ধারী দেবী এবারে জবাব দিলেন।

আপনার নিশ্চয়ই এ বিবাহে খুব মত আছে?

আছে।

আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর?

কিরীটীবাবু, এটা সম্পূর্ণ আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে দাদার
মৃত্যুর কোন সংশ্লিষ্ট আছে বলেই আমি মনে করি না। অতএব একাঞ্জই অবাঞ্জের নয় কি
প্রশ্নটা আপনার?

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হচ্ছে আমি এ প্রশ়ঁটার জবাব চাই গান্ধারী দেবী।
আর যদি না দিই?

তাহলে বলুব মাথাই আপনি সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে জেদাজেদি করছেন, কারণ
আপনি ঢাকবার বাণিজ্যের করবার চেষ্টা করলে কি হবে আমি আগেই জেরা করে ঝুঁচিবা
দেবীর কাছে থেকে তার কথাতেই জেনেছি।

কি—কি জেনেছেন আপনি? নিরতিশয় উৎকর্ষ ও ব্যাকুলতা যেন গান্ধারী দেবীর
কঠিনরে ও চোখেমুখে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বললাম তো, যা জানবার তাই জেনেছি।

কি জেনেছেন আপনি? কি ঝুঁচিবা আপনাকে বলেছে?

মাপ করবেন গান্ধারী দেবী, সেটা আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে একান্ত ব্যক্তিগত ও
গোপনীয় ব্যাপার।

আপনি বলতে চাই ঝুঁচি আপনাকে বলেছে যে সে সমীরকে পছন্দ করে না, বিবাহ
সে করবে না?

বললাম তো গান্ধারী দেবী, তিনি—ঝুঁচিবা দেবী আমাকে কি বলেছেন বা না বলেছেন
বা আমি কি বলতে চাই বা না চাই সেটা প্রকাশ করতে আপনার কাছে আমি বাধ্য তো
নই—ই, ইচ্ছুকও নই।

আমি বিশ্বাস করি না কিরীটীবাবু, ঝুঁচি ঐ ধরনের কোন কথা আপনাকে বলতে পারে
আর যদি সে বলে থাকেও এ কথাটা যেন সে ভুলে না যায় যে, এখনও আমি তার মাথার
ওপরে বেঁচে আছি। খুশিমত তাকে আমি চলতে দেব না।

হঠাৎ কিরীটী হেসে ফেলে এবং হাসতে হাসতেই বলে, গান্ধারী দেবী, এবারে
আপনাদের কাছ থেকে আমি আগতত বিদায় নেব। কারণ আমার কফি বোধ হয় ঠাণ্ডা
হয়ে গেল সত্যিসত্যিই এতক্ষণে। আছো আসি—নমস্কার—

বলতে বলতে কিরীটী দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্তুতি বিশ্বায়ে শুনি ও গান্ধারী দেবী কিরীটীর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল।

॥ আটো ॥

বাঁজী সেতারে ভেরো আলাপ করছিল ও চাপা কঠে গুণগুণ সুর ভাঁজছিল।

আর অবিনাশ চৌধুরী সেই ঘরের বিস্তৃত গালিচার উপরে একটা জাপানী ঘাসের চাঁচি
পায়ে ইতস্তত পায়চারি করছিলেন এবং নিমন্ত্রণে আপন মনে আবৃত্তি করছিলেন

নারায়ণ! নারায়ণ বল কত বাকী

আর! শত পুত্রহরা কাঁদিছে গান্ধারী,

শত পুত্রবধূ তার! রাজ্ঞ শবে পরিকীর্ণ

কুরক্ষেত্র ভূমি! অক্ষোহিণী নারায়ণী

সেনা হয়েছে নিঃশেষ।

মুষ্টিবন্ধ হাত দুটি পিছনে রেখে অবিনাশ চৌধুরী পায়চারি করছিলেন।

ভেরোর প্রসম্ম আঙ্গো মুক্ত বাতায়নপথে ঘরের মধ্যে বিস্তৃত রক্তবর্ণ গালিচার উপরে
এসে সৃষ্টিয়ে পড়েছে।

সহসা একসময় বাইজীর দিকে ফিরে চেয়ে অবিনাশ চৌধুরী বলেন, মুম্বাবাং, এখন গান থাক! আজকে তেমার বিশ্বাম—তুমি যাও।

বারেকের জন্ম মাত্র অবিনাশ চৌধুরীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে মুম্বাবাং নিঃশব্দে সেতারটা প্রকৃষ্ণশে গালিচার ওপরে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

গোপনী অবিনাশ চৌধুরীর বিচ্ছিন্ন মতিগতির সঙ্গে সে বিশেষ পরিচিত।

এবং নিঃশব্দেই সে তার নির্দিষ্ট ঘরে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাঢ়ায়।

পাশেরই সংলগ্ন একটি নাতিপ্রশস্ত ঘর মুম্বাবাংয়ের জন্য নির্দিষ্ট।

মুম্বাবাং তার ঘরে এসে প্রবেশ করল।

আধুনিক কৃচিসম্মত ভাবে ঘরটি তার সুসজ্জিত।

মুম্বার সমস্ত অন্তরের মধ্যেই তখনও যেন ভৈরো রাগের একটা সুর-মহসুন চলেছে।

প্রত্যুষের প্রসন্ন আলোয় সমস্ত অন্তর জুড়ে তার তখন যেন ভৈরো রাগের রঙ লেগেছে। জেগেছে সুর।

মেঝেতে বিস্তৃত পুরু গালিচার একপাশে রক্ষিত নিজের তানপুরাটা টেনে নিয়ে কোলের কাছে মেঝেতে গালিচার ওপরই বসে মুম্বা বাঙ্গী।

তানপুরার তারে ঘূর্মুন্দ অঙ্গুলি চালনা করতে করতে সে শুনগুণিয়ে ওঠে—

ধন ধন সুরত কৃষ্ণ মুরারে

সুলছানা গিরিধারী

সব সুন্দর লাগে

অত পিয়ারী।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কখন ইতিমধ্যে একসময় যে রঞ্চিরা বাইজীর ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল তা সে টেরও পায়নি।

রঞ্চিরা এ বাড়িতে বেশী একটা থাকে না।

সে কলকাতায় কলেজে পড়ে। মধ্যে মধ্যে ছুটিছাটায় কেবল কখনও বেড়াতে আসে, আবার ছুটি ফুরোলেই কলকাতায় ফিরে যায়।

এ বাড়ি সম্পর্কে তার এই কারণেই বোধ হয় এতটুকুও কৌতুহল কোনদিন ছিল না।

এ বাড়ির আবহাওয়া হতে শুরু করে এই বাড়ির লোকগুলিও যেন কেমন তার নিকট অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।

কেমন যেন একটা চাপা গুমোট ভাব, একটা বিকৃত শাসনের নাগপাশ যেন এই বাড়ির প্রাণকে চেপে রেখেছে অস্তিপ্রহর।

এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেক হতে স্বতন্ত্র, কেউই যেন কারও আপনার নয়।

কারও সঙ্গে কারও যেন বিন্দুমাত্রও মনের যোগাযোগ নেই। কারও জন্ম কর্তৃও যেন এতটুকু সমবেদনা মেহ বা ভালবাসা নেই।

মনে হয় কেমন প্রত্যেকেই যেন একটা কৃৎসিত স্বার্থের ঘণ্টাবেতেও মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে এ বাড়ির আবহাওয়াকে বিষাক্ত ও ঘোলাটে করে রেখেছে।

কেউ কাউকে বিশ্বাস পর্যন্ত যেন করে না।

এবং যতবারই সেই কারণে রঞ্চিরা এখানে এসেছে এবং যে কদিন থেকেছে, নিজেকে যেমন এ বাড়ির সকল কিছু থেকে কতকটা ইচ্ছে করেই পৃথক করে রেখেছে, নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দিনগুলো কাটিয়েছে।

আর একটা কথা। এ বাড়িতে এসে থাকাকালীন সময়ে তবুও কদাচিং কথনও আজ
সকলের ঘরে গেলেও এবং একটা-আধটা কথা কারও সঙ্গে বললেও, কেন যেন আজ
পর্যন্ত ছুটিছাটা উপলক্ষে ইতিপূর্বে সে এ বাড়িতে যতবার এসেছে কোনবারই দাদু অবিনাশ
চৌধুরীর মহলে সে প্রবেশ করেনি এবং সেই কারণেই বোধ হয় বাঁজীকে দেখেনি বা
দেখতে পায়নি। অবিশ্য বাঁজীর এ বাড়িতে এই প্রথম পদার্পণ নয়।

গতকাল প্রত্যুষে তাই সে যখন অন্দরের বাগানে বেড়াচ্ছিল, এক মুহূর্তের জন্য দূর
থেকে ভ্রমণরতা বাঁজীকে দেখেই সে যেন চমকে উঠেছিল।

চেমকাবার অবিশ্য কারণও ছিল।

মুখটা যেন কেমন দূর থেকেই চেনা-চেনা লেগেছিল।

কোথায় কবে যেন সে এ মুখটির সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিতা ছিলও।

কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

অবশেষে আর কোতুহলকে দমন করতে না পেরে আজ খোঁজ করতে করতে বাঁজীর
ঘরে এসে নিজেই প্রবেশ করেছে।

বাঁজী তানপুরায় ডৈরো রাগ আলাপ করছিল।

আপন মনেই বাঁজী আলাপ করছিল, ঝটিলা যে তার ঘরে এসে ঢুকেছে সে টেরও
পায়নি।

চেয়েছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝটিলা বাঁজীর দিকে।

কঠস্বর ও বসবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত তার যেন কতই না পরিচিত।

কে—কে ঐ বাঁজী?

দাদুর গান-বাজনার প্রচণ্ড নেশা আছে ও জানত এবং মধ্যে মধ্যে নাকি বাঁজীরা
দাদুর কাছে গানের মুজরা নিয়ে আসত এ গৃহে দু-চার-দশ দিনের জন্য।

সে কারণে বাঁজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি সে, হয়েছিল গতকাল সন্ধ্যায় দূর থেকে
উদ্যানে ভ্রমণরতা বাঁজীকে দেখে।

আলাপ শেষ হতেই তানপুরাটা কোলের কাছে নামিয়ে রেখে গুনগুন করে তখনও
সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সামনের দিকে তাকাতেই বাঁজীর সামনে দর্পণে প্রতিফলিত ঠিক
পিছনেই নিঃশব্দে দণ্ডয়মান ঝটিলার প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়তেই চমকে বাঁজী ফিরে
তাকায়।

পরম্পরের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

কিছুক্ষণ পরম্পর পরম্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কথা বলে প্রথমে এবার ঝটিলাই সাবিত্রী না?

এতক্ষণে ঝটিলা চিনতে পেরেছে বাঁজীকে।

বাঁজী আর কেউ নয়, সাবিত্রী। বেধুনে ম্যাট্রিক পড়বার সময় তার সহপাঠিনী তো
ছিলই, ঝটিলার সঙ্গে হোস্টেলের একই ঘরে বাসও করেছিল সে কয়েক মাস।

অত্যন্ত অস্তরঙ্গতা একদিন ছিল ওদের পরম্পরের মধ্যে।

ঝটি!

এতক্ষণে বাঁজীরও কঠস্বর শোনা গেল।

হ্যাঁ। আশ্চর্য! কিন্তু তুই এখানে? ঝটিলা প্রশ্ন করে।

মৃদু হাসির একটা আভাস যেন খেলে যায় বাঁজীর ওপরে ওপরে, হ্যাঁ। আজ আমাৰ
পরিচয় আৰ সাবিত্রী নয়, আজ আমি মুয়া বাঁজী।

মুমা বাঙ্গজী!

হ্যাঁ। কিন্তু তুই এখানেই কিছুই তো বুঝতে পারছি না কুচি! সাবিত্রী বিতীয়বার আবার প্রশ্ন করে।

এটা তো আমার মামার বাড়ি। তুই তো জানিস মামাদের পয়সা ও দয়াতেই আমি মানুষ।

হাঁহাঁহাঁ ভুলে গিয়েছিলাম—কত দিনকার কথা। প্রায় তিন-চার বছর হবে, তাই না? আ হবে বৈকি।

ৰায়বাহাদুর—যিনি গতকাল—

হ্যাঁ, তিনিই আমার মামা। আর অবিনাশ টৌধূরী—ওঁর কাকা হলেন আমার দাদু। ও।

সাবিত্রী যেন হঠাতে চুপ করে গেল।

খোলা বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে অতঃপর নিঃশব্দে বসে রইল কিছুক্ষণ সাবিত্রী।

রঞ্চিরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তখন সাবিত্রী—মুমা বাঙ্গজীর দিকে।

সাবিত্রী!

তার সহপাঠিনী সাবিত্রী—যার রূপের ও কঠের খ্যাতি একদিন সমস্ত কলেজ ছাত্রীদের মধ্যে হিংসার বস্তু ছিল।

লেখাপড়ায় সাবিত্রী কোন দিনই ভাল ছিল না তেমন, অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

কিন্তু তবু সারা কলেজে তাকে চিনত না এমন কেউ ছিল না, তার মধুকরা কঠের জন্য।

নিঃশব্দে সাবিত্রী বসে আছে।

খুব প্রত্যমেই বোধহয় জ্ঞান করেছে। পরিধানে সাদা মিলের নকশগুড় একটা ধূতি। দু কাঁধের ওপর দিয়ে সিঙ্গ চুলের গোছা বুকের দু'পাশে বিলম্বিত।

কপালে দুই জুর মধ্যস্থলে একটি বোধ হয় শ্বেতচন্দনের টিপ।

সিঁথিতে বা কপালে এয়োতির চিহ্নমাত্রও নেই। অর্থাৎ সাবিত্রী তো বিবাহিতাই ছিল যতদূর ওর মনে পড়ে। ওর সমগ্র চোখেমুখে যেন একটা বিষণ্ণ করণ দৃঢ়খের ও ক্লিন্ট যাতনার ছায়া।

রঞ্চিরা আবার মন্দু কঠে ডাকে, সাবিত্রী!

সাবিত্রী রঞ্চিরার ডাকে যেন হঠাতে চমকে ওঠে।

এবং অত্যন্ত মন্দুকঠে বলে এবাবে, সাবিত্রীকে হঠাতে আজ এই বেশে সামান্য এক বাঙ্গজীর পরিচয়ে এতদিন পরে দেখে খুব চমকে গিয়েছিস, না? আম, ক্লেস। রঞ্চিরার দিকে তাকিয়ে সাবিত্রী রঞ্চিরাকে আহ্বান জানায়।

না। কিন্তু—

ও, তুই তো শুনেছিলি যে স্থামীর ঘরে যাবার পর সাবিত্রী আফিং খেয়ে আস্থাত্যা করেছিল—

না।

শুনিসনি? আশ্চর্য।

না, শুনিনি।

আবার কিছুক্ষণ কর্তৃক যেন আত্মচিন্তায় বিভোর হয়েই সাবিত্রী নিঃশব্দে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে থাকে।

হঠাতে আবার সাবিত্রী কথা বলে, সত্যি ভাই, আমার নিজেরই কি এক এক সময় কম আশ্চর্য জাপে। বাপ মা নাম রেখেছিল সাবিত্রী। দিদিমার মুখে খুব ছোটবেলায় গল্প শুনেছিনাম, যমের গ্রাস থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সাবিত্রী হয়েছিল সতী-সীমান্তনী, নারীকূলে ধন্যা গরবিনী। আর আমিও সাবিত্রী—স্বামীকে নিজ হাতে হত্যা করে হয়েছি মুমা বাইজী! আমিও নারীকূলে অনন্যা, কি বলিস!

একটানা কথাগুলো বলে হাসতে লাগল সাবিত্রী। চোখেমুখে একটা নারীকীয় জবন্য উল্লাস যেন উপচে পড়তে থাকে।

সাবিত্রীর কথায় রুচিরা যেন সত্যাই একেবারে বিশ্বে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

কি বলছিস তুই সাবিত্রী! স্বামীকে হত্যা করেছিস?

হ্যাঁ। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? এই হাত, এখনও এতে—ভাল করে চেয়ে দেখ, হয়তো হত্যার রক্ত লেগে আছে।

কেমন একটা অস্তুত দৃষ্টিতে যেন সাবিত্রী তাকিয়ে আছে রুচিরার দিকে।

ঘৃণা, বিদেশ, অজেগশ সব কিছুই যেন সাবিত্রীর দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে ঐ মুহূর্তে একসঙ্গে ফুটে উঠেছে।

দাঁড়া, দরজাটা ভাল করে বক্ষ করে দিয়ে আসি—বলতে বলতে হঠাতে যেন সাবিত্রী উঠে গিয়ে ঘরের দরজার কপাট দুটো বক্ষ করে দিয়ে ফিরে এল। এবং যেখানে বসেছিল সেইখানেই এসে বসল।

সাবিত্রী আবার বলে, ভাগ্য সাবিত্রীর রূপ ছিল—বোকা পুরুষগুলোর চোখ-ঝলসানো রূপ ছিল, নচেৎ এত বড় কোনদিন কি হতে পারতাম! গরীবের ঘরে জন্মেছিলাম, কিন্তু সেই রূপের দৌলতেই তো ধনীর ঘরে বিকিয়ে গেলাম, সে-সব কথা তো তুই জানিসই।

হ্যাঁ, কিন্তু—মৃদুকষ্টে কি বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল রুচিরা।

রূপের দৌলতে ধনীর ঘরের বধূ হবার সৌভাগ্যটুকুই কেবল সেদিন আমি তোকে বলেছিলাম রুচি, কিন্তু সে ধনীর ঘরের বধূর দৈনন্দিনের পরবর্তী যে দুঃখ ও লাঞ্ছনার কাহিনী সেটা সেদিন তোকে আমি শোনাইনি।

সাবিত্রী!

তাই। ধনীর পুত্রবধূ সাবিত্রীর কাহিনীই সেদিন তুই শুনেছিলি ভাই কিন্তু শোনানো হয়নি তোকে কেমন করে সেই বধূকে একদিন অনন্যাপায় হয়ে আজকের এই বাইজীতে রূপান্তরিত হতে হল।

রুচিরা চেয়ে থাকে সাবিত্রীর মুখের দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে সাবিত্রী আবার বলতে শুরু করে:

উঃ! যখন স্তুবি না সেদিনকার কথাগুলো, ঘৃণায় স্বামীর আর ধিকারে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করে। তখন কি জানি কেমন কলেজে পাঠিয়েছিল আমায়! খেয়াল—সম্পত্তি, ধনী স্বামীর খেয়াল! আমায় কলকাতায় পড়তে পাঠালে। ছোট শহরের এক স্কুলে পড়ছিলাম, সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে কলকাতায় ভর্তি করে দিল বেধুনে।

ধনীর খেয়াল কিনা তাই হচ্ছে একদিন ডাক এল আবার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার, পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে রহস্যপথেই।

হ্যাঁ, মনে আছে পরীক্ষার মাত্র দিনকয়েক আগে তুই পরীক্ষা না দিয়েই স্বামীর ঘর করতে চলে গেলে—

স্বামীর ঘরেই বটে। তবে ভেতরের ঘর নয়, বাইরের ঘর। স্বামীর বিলাসভবন বাগানবাড়িতে, নাচঘরে।

বলিস কি!

এক বর্ণও মিথ্যে নয়। এবং সেই বাগানবাড়িতে গিয়েই শুনলাম বিবাহিতা হলেও স্বামীর গৃহের অন্দরমহলে প্রবেশের নাকি আমার কোন অধিকার নেই—আমি সেখানে অহেতুক অনাবশ্যক বোঝা মাত্র।

কেন? প্রশ্নটা না করে চুপ করে থাকতে পারে না রুচিরা, তোকেও তো তিনি বিয়েই করেছিলেন।

তা করেছিলেন বটে, তবে ঘরে তাঁর প্রথম বিবাহিতা গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। আমার স্বামীর প্রথমা পত্নী। তাঁর সন্তানের জননী। তাঁর ছাড়পত্রে আগেই শীলমোহর পড়ে গিয়েছিল কিনা।

সে কি! তুই শুনিসনি কিছু বিয়ের সময় যে তাঁর আগের স্ত্রী বর্তমান ছিল!

গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত মা-বাপ আমার, তার ওপরে বিনা পথে এত বড় ঘরে এমন পাত্রে বিয়ে, তাঁরা হয়ত তাই আর কিছু শেনাটা প্রয়োজন মনে করেননি, কারণ জানবার কথা তো তাঁদেরই, আমার তো নয়। আমি তো তখন বাংলা দেশের বিয়ের কনে মাত্র। দেওয়া না-দেওয়ার ক্ষমতাটা তো ছিল তাঁদেরই হাতে। আইন্কাত জন্মস্বত্ত্ব সেদিন তো তাঁদের হাতেই ছিল।

হ্যাঁ, তারপর?

তারপর আর কি! ঘর যেখানে জলসাধর, সেখানে গৃহস্থ বধূর পরিণতি কি হতে পারে এ তো সহজেই বুঝতে পারিস।

স্বামী হয়ে তোকে—

মুহূর্তে যেন সাবিত্রীর দুই চক্ষুর তারা রুদ্ধ তেজে জুলে ওঠে।

তীক্ষ্ণ কঠে বলে, স্বামী! কাকে তুই স্বামী বলিস! যে তার নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে অন্যায়ে লম্পটের ক্ষুধার অনলে সমর্পণ করতে পারে, সে কি স্বামী? নাই বা হল এটা আইন্কাত সিদ্ধ বিয়ে, তবু তো অগ্নি-নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখেই আমাদের বিয়েটা হয়েছিল। মন্ত্র ও সেই অনুষ্ঠানকে না হয় সে অবীকার করলে, কিন্তু দায়িত্ব নীতি বা কৃতি বলে কি কিছুই নেই? তুম্হ বারিনীর হতই যেন একটা চাপ আঙ্গোশে ফুলতে থাকে সাবিত্রী।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছে যেন রুচিরা।

সাবিত্রী বলতে থাকে, কিন্তু আমিও তাকে ক্ষমা করিনি। আপনামের প্রতিশেধ নিয়েছি। কিন্তু বাকি একজনকে এখনও খুঁজে সামনে পাইবি। সঙ্গীতপিপাসু সে, তাই গানের মুজরা নিয়ে বাগানবাড়িতে বাগানবাড়িতে গানের অসমার আসরে হানা আজও দিয়ে বেড়াচ্ছি, কারণ জানি একদিন-না একদিন তার সন্ধান পাবই। সেই দিন—বলতে সহসা মুমা বাঁধী কোমর থেকে একটা তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরি বেয় করে। ছুরির চকচকে অগ্রসাগ্রটা যেন জিথাঃসায় হিলহিল করে ওঠে।

কুচিরা চমকে উঠে দুপা পিছিয়ে যায়।

সাবিত্রী খিলখিল করে হেসে ওঠে এবং হাসতে হাসতেই আবার ছুরিটা কোমরে গুঁজে
রাখতে রাখতে বলে, ক্ষয় পেলি কুচি? সম্মানের সঙ্গে গৃহের আবু নিয়ে নারীর মর্যাদায়
তোরা প্রতিষ্ঠিত অপমানিত লাঞ্ছিত নারীছের মর্মস্তুদ জুলা যে কী—কেমন করে তোরা
বুঝবি ভাই! কিং যন্ত্রণায় তারা নিশিদিম ছট্টফট করে মাথা খুঁড়ে মরে কেমন করে তোরা
বুঝবি!

সাবিত্রীর দু চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসে।

আর নির্বাক বিস্ময়ে সেই দিকে তাকিয়ে বসে থাকে কুচিরা যেন পাথরের মত।

॥ নয় ॥

কিরীটী ডাঃ সানিয়ালের ঘরে আবার ফিরে এল।

ডাঃ সমর সেনই প্রথমে কথা বলেন, এই যে মিঃ রায়, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?
দালাল সাহেব চলে গেলেন যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে করে!

কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন? কিরীটী প্রশ্ন করে!

হ্যাঁ, বিকেলের দিকে আবার আসবেন বলে গেলেন। কিন্তু আমি তো আর দেরি
করতে পারছি না মিঃ রায়। আজ আবার আমার একটা অপারেশন আছে। জবাব দিলেন
ডাঃ সেন।

কিরীটী যেন আপন মনে কি ভাবছিল। ডাঃ সমর সেনের প্রশ্নে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে
বলে, কি বললেন ডাঃ সেন?

আমার একটা অপারেশন ছিল। ডাঃ সেন আবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন।

নিশ্চয়ই। আপনি যাবেন বৈকি। আপাতত আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই।

ডাঃ সেন বলেন, কিন্তু দালাল সাহেব যে বলে গেলেন তিনি না ফিরে আসা পর্যন্ত
আমাকে অপেক্ষা করতে!

না, তার আপাতত কোন প্রয়োজন নেই। তবে যাবার আগে আমার যে কয়েকটা কথা
আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল ডাঃ সেন।

কিরীটীর শেষের কথায় যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই ডাঃ সমর সেন তার মুখের দিকে
তাকান।

কিরীটী মুদু হেসে বলে, কথাটা অবিশ্য একটু ব্যক্তিগত।

কি ব্যক্তি?

আপনি এই বাড়িতে কি কাল রাত্রেই সর্বপ্রথম এলেন—না আগেও এ বাড়িতে দু
একবার এসেছেন?

না, কাল রাত্রেই সর্বপ্রথম এ বাড়িতে আমি পা দিয়েছি।

ও। তাহলে এ বাড়ির কাউকেই আপনি পূর্বে চিনতেন না?

ডাঃ সেন যেন এবারে একটু চমকেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকান—মুঠতে পারছেন
নিশ্চয়ই আমার কথাটা?

আমি—মানে—

বলুন, সজ্জা বা দ্বিধার এতে কিছু নেই।

না, তা ঠিক নয়। কুচিরার সঙ্গে আমার আঙ্গাপ ছিল। তবে—

জানতেন না বোধ হয় কম্পকের রাতে এখানে এসে তাকে দেখার আগে পর্যন্ত যে সে
এ বাড়িরই একজন। তাই কি?

হ্যাঁ। বছর দুয়োক আগে কলকাতায় থাকবার সময়ই আলোছায়া সঙ্গের একটা চ্যারিটি
থিয়েটার শারফুরেশের সময় ঝচিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

তারপর—

তারপর অবিশ্য একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

এখন বুঝতে পারছি—

কি, মিঃ রায়?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, না, বিশেষ কিছু নয়। তারপর একটু খেমে কিরীটী আবার
প্রশ্ন করে, আপনি কি কখনও শোনেননি ঝচিয়া দেবীর মুখে, সমীরবাবুর সঙ্গে তাঁর
বিয়ের কথাবার্তা চলেছে?

না।

আশ্চর্য!

কি বললেন মিঃ রায়?

কিছু না। ঝচিয়া দেবীর সঙ্গে কতদিন আগে আপনার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল?

দিন পনের আগেও কলকাতায় দেখা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে আমি কলকাতায় যাই তো,
তখন দেখা হয়।

ক্ষমা করবেন, আর একটা কথা।

বলুন!

আপনি তো অবিবাহিত, তাই না?

হ্যাঁ।

বিয়ে সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন?

না।

কেন?

সত্যি বলব? মৃদু জবাব দেন ডাঃ সেন।

বলুন না।

এখনও জবাব পাইনি।

সে কি! এখনও জবাব পাননি?

না।

তাহলে আমি বলব মা ভৈষ্ণবী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ডাঃ সেন।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?

পরে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা এখারে তাহলে আপনি যেতে পারেন।

কিন্তু ডাঃ সেন একটু ইতন্তত করতে থাকেন তবু।

তখন কিরীটী বলে, যা বলবার তাঁকে আমিই বলব'খন। আপনি ধান।

ডাঃ সমর সেন উঠে দাঢ়ালেন বোধ হয় ঘর ত্যাগ করবার জনাই। ডাঃ সানিয়াল
ইতিমধ্যে আবার কিরীটীর জন্য এক কাপ চা তৈরী করে চামচের সাহায্যে চিনিটা
গুঙছিলেন। এবার তাঁর দিকে চেয়ে কিরীটী বলে, আচ্ছা ডাঃ সানিয়াল, রায়বাহাদুরের
যে attending nurse সুলতা কর, তার সম্পর্কে আপনার ঠিক কি ধারণা বলুন তো?

ডাঃ স্মর সেন ঘর দ্বাতে হয়ে গেলেন।

চায়ের কাপটা কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ডাঃ সানিয়াল বলেন, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়।

ডাঙ্গারের ইতে ইতে চায়ের কাপটা নিয়ে, চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে একটা আরামসচর শব্দ করে স্থিরভাবে কিরীটী বলে, বুঝতে পারলেন না?

হ্যাঁ

মুমে এই বলছিলাম আর কি, নিজের ডিউটি সম্পর্কে তার সততাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। আপনি তো অনেকদিন থেকেই সুলতা করকে দেখছেন এ বাড়িতে।

তা তাকে বিশ্বাস করা যায় বৈক। ডিউটির ব্যাপারে কখনও তার কেন গাফিলতি বড় একটা দেখিনি।

বলেন কি! আমার তো মনে হল বরং ঠিক তার উল্টো। নার্স হবার আদৌ উপযুক্ত নন তিনি। She has rather chosen the wrong profession!

কেন? এ-কথা বলছেন কেন? বিশ্বিত সপ্তশ দৃষ্টিতে তাকালেন ডাঃ সানিয়াল কিরীটীর মুখের দিকে।

তাছাড়া আর কি বলি বলুন! ডিউটি দিতে এসে নাহলে কেউ অমন করে অধোরে ঘুমোতে পারে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খেয়ে!

ডাঃ সানিয়াল নির্বাক বিষয়ে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

নিঃশেষিত চায়ের কাপটা একপাশে নামিয়ে রেখে পকেট হতে পাইপটা বের করল কিরীটী এবং অন্য হাতে কিমনোর পকেট হতে টোবাকো পাউচটা বের করে খানিকটা টোবাকো পাউচ থেকে দুই আঙুলের সাহায্যে তুলে পাইপের গহুরে ঠাসতে থাকে ধীরে ধীরে। এবং পাইপটা ঠিক করতে করতে কতকটা যেন অন্যমন্ত্র ভাবেই বলে, আমার কি মনে হয় জানেন ডাঙ্গার?

কি?

নার্স সুলতা কর শুধু যে তার ডিউটিতে গত রাতে মারাত্মক গাফিলতি করেছে তাই নয়, সে আমাদের সব কথা খুলে বলেনি।

সত্যি আপনার তাই মনে হয় নাকি মিঃ রায়?

হ্যাঁ। আরও অনেক কিছু সে জানে, যা ঘুমের দোহাই দিয়ে আমাদের কাছ থেকে চেপে গিয়েছে।

তাহলে আর একবার না হয় সুলতাকে ডাকি!

না। এখন তাকে আবার ডেকে এনে কোন ফল হবে না।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, এ ব্যাপারে ইচ্ছে করে কেন কৃত্য তার পক্ষে গোপন রাখবার কি কারণই বা থাকতে পারে?

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রাণে রহস্যময় হাসি দেখা যায়। মৃদু হেসে মেঝে বলে, কোথায় কার স্বার্থ—এত সহজেই ঠিক ধরা যায় না। অত সহজে যাচাই করতে গেলে কিন্তু আপনি ঠকবেন ডাঙ্গার। স্বার্থ ব্যাপারটা এমন সূক্ষ্ম ও যোরালো যে, অনেক সময় তার হাদিস পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ে। তারপর যেন কতকটা বেরাম্বা ভাবেই কিরীটী ডাঃ সানিয়ালের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বলতে পারেন ডাঙ্গার, আপনার এ নার্স সুলতা কর ও শরূনি যোষের মধ্যে পরম্পরারের আলাপ-পরিচয়টা ঠিক কি ধরনের এবং কত দিনের?

প্রশ্নোত্তরে এবারে একজুন মন্দু হেসে ডাঃ সানিয়াল বলেন, কেন বলুন তো?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

সুলতা কর এখনেই থাকে এবং শুনেছি শকুনিবাবুর সঙ্গে সুলতার এ বাড়িতে ডিউটি দিতে আসবার আগে থেকেই নাকি আলাপ-পরিচয় কিছুটা ছিল।

কথাটা শুনে কিরীটীর চোখের তারা দুটো যেন হঠাতে উজ্জল হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাতে এ-কথা আপনার মনে হল কেন মিঃ রায়? প্রশ্ন করেন ডাঃ সানিয়াল।

কারণ অবশ্য একটা আছে, কিন্তু তারও আগে আমাদের জানতে হবে কাল রাতে সুলতা কর তার জবানবন্দিতে কতকটা ইচ্ছে করেই বিশেষ একটা মিথ্যে কথা কেন বলেছিল?

বিশেষ মিথ্যে কথা! ডাঃ সানিয়াল বিশ্বিত ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, বিশেষ একটা মিথ্যে কথা। সে তার জবানবন্দিতে বলেছে, আপনার ঘরের তৈরি কফি খেয়েই নাকি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—কিন্তু কেন ঐ মিথ্যে কথাটা বললে!

কিরীটীর কথায় ডাঃ সানিয়াল চমকে উঠে বললেন, সে কি? কাল আবার তাকে আমি কখন কফি দিলাম?

জানি আপনি দেননি।

কিন্তু আমন একটা মিথ্যে কথা বলবার কি এমন কারণ?

এটা আর বুঝলেন না ডাক্তার! অর্থাৎ সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, হয়ত আপনার দেওয়া কফির মধ্যেই কোন তীব্র ঘুমের ওষুধ মিশ্রিত ছিল। যার ফলে সে ঠিক হত্যার সময়টিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলে, কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন ডাঃ সানিয়াল, সে তাহলে কার দেওয়া কফি থেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল? কে দিল ঘুমের ওষুধ-মিশ্রিত কফি তাকে কাল রাত্রে?

আপনার তাহলে ধারণা, কাল রাত্রে কেউ-না-কেউ তাকে কফি দিয়েছিল?

হ্যাঁ।

আচ্ছা মিঃ রায়, এমনও তো হতে পারে—কাল রাত্রে মিস কর আদপেই কফি পান করেনি! স্বেফ মিথ্যে কথা বলেছে!

না। মিস কর কাল রাত্রে কফি পান করেছিল। এবং কফির সঙ্গে কোন তীব্র ঘুমের ওষুধও যে মিশ্রিত ছিল সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

কে তাহলে দিল তাকে কফি! ডাঃ সানিয়াল আপন মনেই যেন কথাটা উচ্চারণ করেন।

তাই তো আমিও ভাবছি। কিরীটী চিন্তাভিত্তি ভাবেই পুনরায় বলে কে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি, মানে কে সুলতা করকে কাল রাত্রে ঘুম পাড়াবার জন্য ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে কফি তৈরী করে দিয়েছিল এবং কে গিয়ে তাকে আপনার নাম করে কফিটা দিয়ে এসেছিল, সেটাই সর্বাগ্রে আমাদের এখন জানা দরকার।

কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তাই যদি সত্ত্ব হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় মিঃ রায়, ডাঃ বলেন, মিস করকে এ ঘরে আর একবার ডেকে এনে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই তো সেটা চুকে যায়। কে তাকে কফি করে গত রাত্রে দিয়ে এসেছিল!

ডাঃ সানিয়ালের কঞ্চয় কিরীটী হেসে ওঠে এবং হাসতে হাসতে বলে, কেন, আপনি দিয়ে এসেছিলেন ম্যে তাই বলবে!

আমি যে তাকে কফি দিইনি আপনি তো তা জানেন, তাছাড়া আপনি তো আমার ঘরেই ছিলেন স্পে শ্যায়। আমরা তো সব এক জায়গাতেই ছিলাম।

ডাঙ্গার, এসব ব্যাপারে আপনি দেখছি একেবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আপনি এটা বর্ণনে না কেন, আপনি একজন মধ্যবয়সী পুরুষ—যে বয়সটা পুরুষের পক্ষে এবং বিপরীক পুরুষের পক্ষে বিশেষ করে একটু আশঙ্কাজনক। তাই এই চাতুরীর সাহায্য সে নিয়েছে। চালাক মেয়ে!

কিন্তু এ কথাটা কি তার বোঝাবার বয়স হয়নি যে জেরার মুখে সত্যটা প্রকাশ হবেই?

এখন সে ভুল শোনবার দোহাই দিয়ে অধীক্ষিত জানিয়ে হয়ত বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু তাতেই বা লাভটা কি?

লাভ! লাভ time-factor! কিরীটী হাসতে হাসতে প্রত্যন্তের দিল।

॥ দশ ॥

কিছুক্ষণ অতঃপর উভয়েই স্তুত হয়ে আত্মগত চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে এবং আবার এক সময় ডাঃ সানিয়ালই প্রশ্ন করেন, তাহলে আপনার ধারণা মিঃ রায় যে গত বারে মিস সুলতা করকে নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ কফির সঙ্গে ইচ্ছে করে ঘুমের ওমুধ মিশিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেছিল!

বলাই বাহ্যে। অন্যথায় তার উপস্থিতিতে মিঃ চৌধুরীকে ওভাবে হত্যা করা তো সম্ভবপর হত না।

I see! আচ্ছা মিঃ রায়, আপনার কি তাহলে মনে হয় মিস সুলতা কর এই হত্যার ঘড়্যন্ত্রের মধ্যে আছে?

ঘড়্যন্ত্রের মধ্যে আছে কিনা জানি না তবে হত্যার সময়টিতে সে অকুস্থানে উপস্থিত ছিল সেটাই যে সব চাইতে বড় কথা এখন।

কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই ডাঙ্গার—তবে হ্যাঁ, She was in deep sleep হত্যার সময়টিতে এটা ঠিকই।

অতঃপর ডাঃ সানিয়াল যেন বলবার মত কোন কথাই আর খুঁজে পান না। কিন্তু কিরীটীও নিঃশব্দে বসেই ধূমপান করতে করতে পীতাত হোঁয়া উদগীরণ করতে থাকে।

সহসা একসময় যেন চিন্তাগ্রস্ত মনটাকে একটা নাড়া দিয়ে চুরুটের অগ্রভাগ হতে ভস্যাবশেষ ছাইটা আঙুলের টোকা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে মৃদুকষ্টে কিরীটী বলে, ডাঙ্গার, আপনার পরামর্শটা তেবে দেখলাম মন্দ নয়—আর একবার বাজান্নে দেখতে ক্ষতি কি? আপনি গিয়ে একটিবার মিস করকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারিন, তাকে আবার cross করে না হয় দেখা যাক।

নিশ্চয়ই, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডাঃ সানিয়াল ঘর হতে বের হয়ে গেছেন।

দশ-পনের মিনিট পরেই বাইরে মন্দু পদশব্দ শোনা গেল এবং বোঝা গেল পদশব্দ এগিয়ে আসছে এবং পদশব্দ ঘরের বাইরে বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল।

মন্দু কঠে কিরীটী আহ্লান জানায়, আসুন সুলতা দেবী। দরজা খোলাই আছে।

সত্তি সুলতাই। সুলতা দরজা ঠেলে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কিরীটী চেয়ারটার উপরে সোজা হয়ে বসে একটু নড়েচড়ে।

সুলতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্য একবার কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তেলে তাকাল এবং কিরীটীর স্থির নিষ্কম্প দুই চোখের শান্ত দৃষ্টির সঙ্গে বারেকের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে মুখখানি অবনত করে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবন্ধ করে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

কয়েক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে যেন একটা বিশ্বি স্তুতা থমথম করতে থাকে।

কিরীটীই পুনরায় আড়চোখে সুলতার সর্বাঙ্গে বারেকের জন্য তার দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুলতার সমগ্র মুখখানিতে দৃশ্যিত্বার একটা কালো ছায়া যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বসুন সুলতা দেবী, এ চেয়ারটায় বসুন। নিঞ্চ কঠে কিরীটী সুলতাকে বলে কথাগুলো।

সুলতা কিরীটীর নির্দেশে সামনের শূন্য চেয়ারটা একটু ঠেলে নিয়ে বসল।

কিরীটী লক্ষ্য করে, সামনাসামনি চেয়ারে বসলেও সুলতা যেন তার দিকে চোখ তুলে চাইছে না।

কিরীটী সুলতার দিকেই চেয়ে ছিল।

দু হাত তার চেয়ারের দু দিককার হাতলের ওপর ন্যস্ত। দু হাতের দশ আঙুলের সাহায্যে সে চেয়ারের হাতল দুটো যেন চেপে ধরেছে।

কিরীটী নিঃশব্দে পূর্ববৎ ধূমপান করতে থাকে।

আদুরে টেবিলের উপর রাখিত টাইমপিস্টা কেবল ঘরের নিষ্ঠুরতা একযোগে টিক টিক শব্দ তুলে ভঙ্গ করে চলেছে।

দুজনের একজনও কোন কথা না বলায় মনে হচ্ছিল যেন একটা সুকঠিন স্তুতা ঘরের নিষ্ঠুরঙ্গ বায়ুস্তরে কুৎসিত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে।

পরম্পর যেন পরম্পরের মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে, কে কাকে এবং কে আগে প্রশ্ন করবে।

কিছুক্ষণ পরে কিরীটীই সেই স্তুতা ভঙ্গ করে এক সময় দক্ষ চুক্তের অঞ্চলগুরে ছাইটা সম্মুখের ত্রিপয়ের ওপরে রাখিত আঝাস্ট্রেটার ওপরে ঠুকে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, সুলতা দেবী, কয়েকটু কথা আপনার কাছ থেকে জানবার জন্য কষ্ট দিলাম(আপনাকে।

সুলতা কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু কিরীটীর কথার কোন প্রত্যাক্ষর দিল না।

দুর্ভাগ্যবশত গতরাত্রে ঘটনা-বিপর্যয়ে টিক দুঘটনাটার সমাই মিঃ চৌধুরীর শিয়ারের সামনে আপনার উপস্থিতিটা—বঙাতে বঙাতে কথার মধ্যে একটুখানি ইতৃষ্ণত করেই যেন কিরীটী আবার তার অধিসমাপ্ত বক্তব্যের ভের টেনে বলে, বুবাতেই পারছেন মিস কর, পুলিসের কাছে আপনার জবানবন্দিরই সব চাইতে বেশী মূলা এখন।

কিন্তু—সুলতা কিরীটীর দিকে মুখে তুলে কি যেন বলতে চেষ্টা করতেই, কিরীটী মন্দু ঘিতকঠে বলে, অবশ্য পিক দুর্ঘটনাটা যে সময় ঘটে আপনিই অকৃত্তানের সর্বাপেক্ষকা কাছাকাছি ছিলেন এবং একথাও মিয়ে নয় যে আপনার এ হত্যার ব্যাপারে কেননপ্রকার স্বার্থেরই যোগাযোগ থাকতে পারে না, তাহলেও বুবাতেই পারছেন এক্ষেত্রে আপনি যে একেবারে এক সহজেই সমস্ত প্রকার সন্দেহ থেকে রেহাই পাবেন তাও নয়।

কিরীটীর কথায় সুলতার চোখেমুখে যেন একটা চাপা আতঙ্কের অস্পষ্ট আভাস জেগে ওঠে সহসা।

আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন মিঃ রায়?

অত্যন্ত নিম্নকঠে ঢেঁক গিলে সুলতা প্রশ্ন করে।

কিরীটী মন্দু হেসে বলে, আপনি বোধ হয় জানেন না সুলতা দেবী, অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমরা গোড়াতেই ঐ সন্দেহ নিয়েই কাজ শুরু করি, কিন্তু সে কথা যাক, ভয় পাবেন না যেন তাই বলে। বলছিলাম সমস্ত কিছুকেই একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে ক্রমে ক্রমে আমরা নিঃসন্দেহে গিয়ে পৌছই। সন্দেহই আমাদের নিঃসন্দেহের সত্ত্বে পৌছে দেয়।

কিরীটী কথা বলতে বলতে এক সময় চেয়ার হতে উঠে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি শুরু করে দেয় এবং পায়চারি করতে করতেই পুনরায় তার বক্তব্যের মধ্যে ফিরে যায়, এবার আমাদের আসল ও কাজের কথায় আসা যাক—যে জন্য আপনাকে ডেকে এনেছি এ ঘরে। আমি যে প্রশংগলো আপনাকে করব, আশা করি ভেবেচিঙ্গে তার যথাযথ উভর দেবেন।

বলুন?

প্রথমত আপনার কি মনে আছে ঠিক কত রাত পর্যন্ত আপনি জেগে ছিলেন?

ঠিক কারেন্ট টাইম বলতে পারব না হয়ত, তবে মনে হয় সোয়া তিনটে পর্যন্ত বোধ হয় জেগে ছিলাম।

বেশ। আপনি আপনার গত রাত্রির জ্বানবলিতে বলেছেন, কফি পানের পরই কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন। মনে পড়ে আপনার?

হ্যাঁ, এমন ঘূম পেয়েছিল যে কিছুতেই জেগে থাকতে পারলাম না। তাছাড়া রায়বাহাদুরও ঘুমিয়ে পড়া—

কিরীটী আবার বলে, আচ্ছা ডাক্তারের কাছেই শুনেছিলাম, ইদানীং প্রায় কোন ঘূমের ওষুধেই নাকি রায়বাহাদুরের তেমন ভাল ঘূম আসত না এবং সেই কারণেই সমস্ত ব্যক্তি ধরেই ডাক্তারকে ও আপনাকে বলতে গেলে প্রায় তটস্থ হয়ে—মানে কখন ডাক্তারেন সেই জন্য সর্বক্ষণই প্রায় সজাগ হয়ে থাকতে হত, কথাটা কি সত্যি?

হ্যাঁ। মন্দকঠে সুলতা জবাব দেয়।

তাই যদি হবে তো অমন চট্ট করে মাত্র একটা ঘূমের বড় খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন কি করে?

সুলতা চুপ করে আছে। কিরীটীর প্রশ্নের কোন জবাব দিচ্ছে না।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে শকুনিবাবুর কতদিনকার আলাপ মিস কর?

কিরীটীর প্রশ্নে হঠাৎ যেন একটু চমকেই সুলতা তার মুখের দিকে ডাকায়।

কিরীটী সেই চমকান্তের লক্ষ্য করেই এবারে বলে, কই, কথাটার আমার জবাব
দিলেন না!

সুলতা মৃদুকষ্টে বলে, বছর দুই হবে।

দু বছর?

হ্যাঁ, আমার জন্ম এখানে, আমি এখানেই মানুষ। বাবা এখানকার একটা কোলিয়ারীর
অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ছিলেন।

Please excuse me, শকুনিবাবুর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কি করে হল?

রায়বাহাদুরের কোলিয়ারীর হাসপাতালে কলকাতা থেকে নার্সিং শিখে এসে প্রথম
যখন বছর দুই আগে চাকরি নিই—হাসপাতালের ডাক্তারবাবু মিঃ ঘোষের বন্ধু ছিলেন,
সেই সূত্রে হাসপাতালে ঐ সময় ওঁর যাতায়াত ছিল এবং সেই সময়েই আমাদের
পরস্পরের আলাপ-পরিচয় হয়।

একটা কথা সুলতা দেবী, রায়বাহাদুরের এখানে আপনাকে কাজে নিযুক্ত করবার
ব্যাপারে মিঃ ঘোষের কোন হাত ছিল কি?

কিরীটীর প্রশ্নটা এত পরিষ্কার যে প্রথমটায় সুলতা কিছুই জবাব দিতে পারে না।
নিঃশব্দে বসে কেবল নিজের পরিধেয় শাড়ির অঁচলের পাড়টা টেনে টেনে সোজা করতে
থাকে। কিরীটীও সুলতাকে দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন না করে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে তার প্রতি
চেয়ে থাকে।

অতঃপর কিছুক্ষণ ঐভাবেই নিষ্ঠুরতার মধ্যেই কেটে যায়।

ধীরে ধীরে এক সময় সুলতা আবার মুখ তুলে বাবেকের জন্য কিরীটীর প্রতি দৃষ্টিপাত
করল এবং শাস্ত ধীর কঠে বললে, না, আমার এখানে কাজে নিয়োগ সম্পর্কে মিঃ ঘোষের
কোন তদারকের প্রয়োজন হ্যানি, কারণ আমি রায়বাহাদুরের হাসপাতালেই চাকরি
করছিলাম। কাজেই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুই নার্সের প্রয়োজন হওয়ায় আমার কথা
ডাঃ সানিয়ালকে বলায় এখানে আমার চাকরি হয়। বলতে গেলে হাসপাতালের
ডাক্তারবাবুই আমার এখানে চাকরি করে দেন।

কিরীটী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকে।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, মিঃ ঘোষেই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে বলে এখানে
আপনার নিয়োগ যাতে হয় সে বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন?

কিরীটীর প্রশ্নে সুলতা কর মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়,
তারপর শাস্ত ধীর কঠে বললে, না, আপনার সে সন্দেহ সত্য নয়, তাছাড়া সে রকম কোন
কিছু হয়ে থাকলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

মুহূর্তের জন্যই কিরীটীর চোখের তারা দুটি চক্রচক্র করে ওঠে এবং যে উদ্দেশ্যে সে
একই প্রশ্ন বারংবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সুলতাকে করছিল সেটা যে কৃতকৰ্ম সিঙ্গ হয়েছে
তাতেই তার কিছুটা আনন্দ হয়। অতঃপর কিরীটী তার দ্বিতীয় প্রশ্ন করে।

মিস কর, এবারে আপনাকে আমি আবার গত রাত্রি সম্পর্কে ক্ষয়ক্ষতা প্রশ্ন করতে
চাই।

বলুন? শাস্ত স্বর সুলতার।

গতরাত্রের জবানবন্দিতে এবং আজও এই কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছেন, কফি
পানের পরেই আপনার দু চোখের পাতায় অসহ্য ঘূম নেমে আসে, আপনি কোনমতেই
আর চোখ খুলে রাখতে পারেন না, আপনি ঘূমোতে বাধা হন।

|| এগার ||

কিরীটীর প্রশ্নে কিছুক্ষণেই জন্য সুলতা ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দেই অভিবহিত হয়।

সুলতাকে মিশনে বসে থাকতে দেখে কিরীটী আবার বলে, আপনি বোধ হয় জানেন না যে গত রাত্রে আপনাদের প্রত্যেকের জবানবন্দীই থানায় recorded হয়ে গিয়েছে! এবং স্কুলান্ধারে এই রায়বাহাদুরের হত্যা-মামলায় আপনাদের আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের দেওয়া জবানবন্দীই প্রত্যেকের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে evidence হিসাবেই আদালতে জেরা করা হবে।

একটু থেমে কিরীটী আবার তার অর্ধসমাপ্ত বক্তব্যের জের টেনে বলতে শুরু করে, এবং এও হয়ত বুঝতে পারছেন, ঘটনাচ্ছে একমাত্র আপনিই সশ্রারীরে অকুস্থানের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি ছিলেন ঠিক হত্যার সময়টিতে!

কিন্তু আমি—আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যথাসাধ্য নিজেকে সংযতভাবে প্রকাশ করবার প্রয়াসে সুলতার কঠিন্তরে যে উদ্বেগ ফুটে ওঠে সেটা কিরীটীর কান এড়াতে পারে না!

হ্যাঁ, হয়ত ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু সেটাও তো আদালতের বিচারের সময় বিবেচনাসাপেক্ষ। সে ঘূর কেন এল? কারণ আপনার তো ঘুমোবার কথা নয়!

সুলতা এবপর আর নিজের মনের উদ্বেগকে সংযত রাখতে পারে না। স্পষ্ট ব্যাকুল কঠেই বলে ওঠে, কি আপনি বলতে চাইছেন মিঃ রায়! আপনি কি বিশ্বাস করেন না সত্যসত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি এমন এসে যায় বলুন মিস কর? আমি তো আর কিছু আদালতের নিয়োজিত প্রতিভূ নই এবং স্বয়ং বিচারকও নই, আপনাদের মতই একজন সাধারণ তৃতীয় ব্যক্তি—যে হত্যার সময় এই বাড়িতে উপস্থিত ছিল এইমাত্র!

কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, নচেৎ আপনি কি ভাবেন আমার জেগে থাকা সত্ত্বেও আমি আমার চোখের ওপর একজনকে হত্যা করতে বাধা দেব না? কারও পক্ষেই কি সেটা সম্ভব?

কারও পক্ষে সম্ভব কিনা সেটা এক্ষেত্রে নিষ্পত্তিযোজন। তবে আপনি যে আপনার duty ঠিকভাবে পালন করেননি, এ কথাটা তো নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করতে পারেন না।

আমি আমার duty অবহেলা করেছি!

করেননি? নিশ্চয়ই করেছেন সুলতা দেবী। নিজেই ব্যাপারটা একবার জানে করে ভেবে দেখুন না, রাত্রে একজন মুর্মূরি রোগীর সেবা ও দেখাশুনা করবার জন্মই তো টাকা দিয়ে আপনাকে নিয়োজিত করা হয়েছিল এখানে। আপনি জেগে থেকে রোগীর ভালমন্দ দেখাশোনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে অবিলম্বে ডাঙ্গারকে সাথের ঘর থেকে ডেকে আনবেন, এই তো ছিল আপনার duty? সেদিক থেকে ঘুমিয়ে আপনি কি কর্তব্যে অবহেলা করেননি? বলুন, জবাব দিন আমার প্রশ্নের!

শেষের দিকে কিরীটীর কঠিন্তরে যেন কতকটা আদেশের সুরই ফুটে ওঠে।

সুলতা চুপ করে বসে থাকে। কোন জবাবই দিতে পারে না কিরীটীর অতক্ষিণ প্রশ্নের।

আপনি বলেছেন আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কফি পানের পরই; ধরে নেওয়া গেল

নাহয় কথটা আপনার সম্ভাৱণাৰ পৰই আদালত আপনার সম্পর্কে প্ৰশ্ন তুলবে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই কফিৰ মধ্যে ঘুমেৰ ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল!

ঘুমেৰ ওষুধ?

হ্যাঁ। নচেও কী এক কাপ কফি খেয়ে কেউ আমন গভীৰতাবে ঘুমিয়ে পড়তে পাৰে? বৰং উচ্চেটাই স্বাভাৱিক। কফিতে ঘুম তাড়ায়।

সুলতা কিৱীটীৰ মুখেৰ দিকে ফ্যালফ্যাল কৱে চেয়ে থাকে।

কিৱীটী আবাৰ বলে, ধৰন তাই যদি হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবাৰ প্ৰশ্ন উঠবে, কে আপনাকে কফিৰ সঙ্গে ঘুমেৰ ওষুধ দিল? আৱ প্ৰশ্নটা ঐখানেই শেষ হবে না। কাৰণ আৱও একটা প্ৰশ্ন কৱা যেতে পাৰে ঐ সঙ্গে, কে আপনাকে কফি পাঠিয়ে দিয়েছিল?

কেন, কফি তো ডাঙাৰ সানিয়ালই দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে, যেমন এৱে আগেও প্ৰায়ই প্ৰতি রাত্ৰে ঐ সময় এক কাপ কৱে কফি তিনি আমাকে দিয়ে যেতেন!

সুলতাৰ জবাবে কিৱীটী যেন চমকে ওঠে, কিন্তু কঠিনৰে তাৰ কিছুই প্ৰকাশ পায় না।

কিৱীটী কেবল প্ৰশ্ন কৱে, প্ৰায় রাত্ৰেই তাহলে ডাঃ সানিয়াল ঐ সময় আপনাকে এক কাপ কৱে কফি পাঠিয়ে দিতেন নাকি?

হ্যাঁ। রাত্ৰে ঐ সময় তিনি প্ৰত্যহই কফি পান কৱতেন এবং জেগে থাকবাৰ সুবিধে হবে বলে আমাকে তিনিই একদিন suggest কৱেন, ঐ সময় এক কাপ গৱম কফি পান কৱলে আমাৰ জেগে থাকতে নাকি তত কষ্ট হবে না। সেই জন্য এক কাপ কৱে কফি আমাকেও পাঠিয়ে দিতেন এবং আমিও কফিটা খেতাম, কাৰণ ঐ সময়টায় প্ৰতি রাত্ৰেই প্ৰায় আমাৰ একটা ঘুমেৰ বোঁক আসত।

আপনি সে কথা ডাঙাৰ সানিয়ালকে বলেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম।

ও। তাহলে দেখছি প্ৰায় রাত্ৰেই ঐ সময়টা আপনার ঘুমেৰ একটা বোঁক আসত বলেই ডাঃ সানিয়াল আপনাকে কফি পাঠিয়ে দিতেন নিজে!

অৱ্যাপকি, কি বললেন?

বলেছিলাম জেগে থাকবাৰ জন্যই আপনি কফি খেতেন! তাহলে কাল রাত্ৰে যদি আপনাকে কফিৰ সঙ্গে ঘুমেৰ ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েই থাকে, তাহলে it was intentional!

সুলতা কিৱীটীৰ কথা যেন কিছুই বুঝতে পাৱেনি, এইভাৱে ওৱে মুখেৰ দিকে চেয়ে থাকে।

যাক সে কথা, আচ্ছা মিস কৱ, এ বাড়িতে আপনি তো অনেকদিন ধৰে স্নায়বাহীদুৱেৰ রোগশ্যায় duty দিচ্ছেন? কতদিন ধৰে রাত্ৰে ঐ সময় আপনি ডাঙাৰেৰ কাছ থেকে কফি থাচ্ছেন মিস কৱ?

কতদিন ধৰে থাচ্ছি?

হ্যাঁ, একটু আগে আপনি বললেন না। উনিই মানে ডাঃ সানিয়ালই একদিন কফি থাবাৰ কথা আপনাকে বলেছিলেন?

খুব বেশী দিম নয়, বোধ হয় দিন দশেক হবে।

দিন দশেক!

হ্যাঁ, বোধ হয় দিন দশ থেকেই রাত্রে তিনি যখন কফি খান, সেই সময় কফি তৈরি হলে এক কাপ করে আমার জন্য দিয়ে যেতেন।

সাধারণত বিভিন্নভাবে—অর্থাৎ ডাঃ সানিয়ালই কি আপনাকে কফি এনে দিতেন প্রতি রাত্রে?

হ্যাঁ, ডাক্তার সানিয়ালই দিতেন নিজে।

ডাঃ সানিয়ালই দিয়ে যেতেন! আবার প্রশ্ন করল কিরীটী।

হ্যাঁ।

গত রাত্রেও তাহলে তিনিই দিয়ে গিয়েছিলেন কফি?

হ্যাঁ, ডাঃ সানিয়ালই।

সুলতার জবাবে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য কিরীটী যেন বিশ্বায়ে বোবা হয়ে থাকে। তারপর আবার এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে শাস্ত ধীর কঠে বলে, কিন্তু সুলতা দেবী, অন্যান্য রাতের কথা আমি বলতে পারব না বটে তবে গতকাল রাত্রে যে তিনি আপনাকে কফি দিতে আসেননি সে সম্পর্কে কিন্তু আমি স্থিরনিশ্চিত।

ঘরের মধ্যে হঠাতে যেন বজ্জ্বল হল।

কি বলছেন আপনি মি রায়, আমি তখন জেগে একটা বই পড়ছিলাম—ডাঃ সানিয়ালই কাল রাত্রেও আমাকে নিজে এসে কফি দিয়ে গেছেন!

না, বললাম তো, কাল রাত্রে তিনি যে অস্তত আপনাকে কফি দিতে আসেননি সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত। কারণ সে সময় তাঁর ঘরেই তিনি উপস্থিত ছিলেন।

না, তা হতে পারে না।

হওয়া-হওয়ির কথা এ নয় মিস কর, কারণ it is a fact। তাছাড়া আমি নিজে ও ডাঃ সেন ঐ সময় ডাক্তারের ঘরে বসে সকলে মিলে তাঁরই হাতে তৈরি কফি পান করছিলাম। কাজেই বুঝতে পারছেন, তিনি কিছু আর ম্যাজিকের দ্বারা নিজেকে অদৃশ্য করে কিংবা আমাদের hypnotise করে আমাদের চোখের সামনেই সে ঘর থেকে বের হয়ে এসে আপনাকে কফি দিয়ে যেতে পারেন না।

সুলতারও বিশ্বায়ের যেন অবধি থাকে না। বিশ্বিত ব্যাকুল কঠে সে বলে ওঠে, কিন্তু বিশ্বাস করুন মি রায়, আমি বলছি সত্যিই তিনি গত রাত্রে কফি দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে নিজে এসে অন্যান্য দিনের মত।

না দেননি, তবু আপনি যখন বলছেন—আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা আপনার দেখবার ভুল সুলতা দেবী।

দেখবার ভুল!

হ্যাঁ। বা এমনও হতে পারে, আপনি অদৌ ভাল করে দেখেননি চেয়েকে গত রাত্রে আপনাকে কফি দিয়ে গেল—মানে হয়ত অন্যমনস্ক ছিলেন কোনো ব্যক্তি!

তবে—একটা ভয়ার্ট শক্তি সুলতার দু চোখের তরিয়ে ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, এ-কথা অবিশ্য সত্যি একজন কেউ এসে গত রাত্রে কফি দিয়ে গিয়েছেন, তিনি অবিকল ডাঃ সানিয়ালের মত দেখতে হলেও আসল ডাঃ সানিয়াল নন। অন্য কেউ। কিন্তু কে সে? সেই-ই হচ্ছে প্রশ্ন—শেবের কথাটা কিরীটী যেন আস্থাগত ভাবেই উচ্চারণ করে কর্তৃকটা।

আপনার কথা যে কিছুটো বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ রায়। তিনি ডাক্তারের মত দেখতে, অথচ তিনি নন।

বললাম তো একটু আগে আপনাকে, এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, নিষ্ঠুর সত্য যা ঘটেছিল কালরাত্রে তাই বলেছি আপনাকে আমি। আচ্ছা এবারে আপনি বাড়ি যেতে পারেন মিস করো।

বাড়ি যাবো

হাঁ প্রয়োজন হলে আমরাই দেখা করব। কেবল এই জায়গা ছেড়ে পুলিসের বিনা অনুমতিতে কোথাও আপাতত যাবেন না।

সুলতা নিঃশব্দে শ্বাস গতিতে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সুলতা করের পায়ের শব্দটা বারান্দায় একসময় মিলিয়েও গেল।

সুলতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে এক সময় হাতের সিগারটা নিভে গিয়েছে কিরীটির খেয়ালও হয়নি। আবার নির্বাপিত সিগারটায় অগ্নিসংযোগ করে হাতের দেশলাইয়ের কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নেহাঁ একটা অনুমানের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে কিরীটি সুলতাকে প্রশ্ন করেছিল ঐভাবে এবং অক্ষ্মাঁ তার হাতের মধ্যে একটি মূল্যবান সূত্র (clue) এনে গেল।

সুলতাকে প্রশ্ন করতে করতে এবং তার জবাবের পর কিরীটির এখন আর বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না যে গত দশদিন ধরে ডাঃ সানিয়ালের পরামর্শ ও উপদেশ মতই সুলতা রাত্রে নিদ্রাকে এড়াবার জন্য কফি পান করছিল এবং হত্যাকারী যে উপায়েই হোক সেই কথাটি জানতে পেরে পূর্বাহ্নে সেই সুযোগটি চর্কার কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। অপূর্ব চাতুর্যের সঙ্গেই সে নিদিষ্ট একটি সময়ের পরিপূর্ণ ভাবেই সুযোগ নিয়েছে। ভাবতেও বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয় কি অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য দুঃসাহস ও ক্ষিপ্তার পরিচয় সে দিয়েছে এক্ষেত্রে।

আর রায়বাহাদুর যদি সত্যিই—তা সে যে ভাবেই হোক, জেনে থাকেন তাঁর এই মৃত্যুর ব্যাপারটা, তারপর তাঁকে ঠিক পূর্বাহ্নে এভাবে জ্বাল করে কেউ যে এমনভাবে পরিকল্পনানুযায়ী হত্যা করতে পারে এ যেন কিরীটির স্পন্দেরও অতীত।

কিন্তু সুলতা কর, তার কথাগুলো কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য?

সত্যি কি সুলতা কর গত রাত্রের কফি পরিবেশনকারীকে চিনতে পারেনি, না হচ্ছে করেই অর্থাঁ কথাটা জেনেও গোপন করে গেল?

মনে মনে কিরীটি গত রাত্রের ব্যাপারটা আর একবার পর্যালোচনা করে। রায়বাহাদুর ঘরের যে অংশে রোগশয়ায় শায়িত ছিলেন সেখানে নীল বাতিটা ভোজ ঢাকা থাকার দক্ষণ হানাটি তেমনি সুস্পষ্ট ভাবে আলোকিত ছিল না। ঘরের অন্য অংশ হতে সেই হানাটি একটা ভারি কালো পর্দা টাঙিয়ে ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং যে সময় হতাকাণ সংঘটিত হয়—ঘরের মধ্যে অসুস্থ, ওষুধের প্রভাবে নিষ্ঠিত রায়বাহাদুর ও পার্শ্বে একটি চেয়ারে ঐ একই ভাবে ওষুধের প্রভাবে নিষ্ঠিত নার্স সুলতা কর বাতীত আর কোন তৃতীয় প্রাণীই অকুছানে ছিল না। এবং রাত্রি সাড়ে তিনটে হতে চারটে বাজবার মধ্যে যে আধ

ঘন্টা সময়, এই সময়ের মধ্যেই কোন এক মুহূর্তে কৌশলে সুলতা করকে ঘুম পাড়াবার জন্য ঘুমের কোনো তীব্র ওষধিভিত্তিত কফি পান করানো হয়েছিল তার অজ্ঞাতেই। তারপর নিশ্চয়ই সুলতার কফি পানের পর নিদ্রাভিভূত হতে অস্তত মিনিট দশ-বারো সময় তো লেগেছে। তাহলে বাকি থাকে কেবল হিসেবমত এই আধ ঘন্টার মধ্যে মিনিট পনের, যে সময়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

যাত্র পনের মিনিট সময়। এবং গতরাত্রের এই পনের মিনিট সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় অন্তরের ব্যাপারে। কাজেই এখন খৌজখবর নিয়ে দেখতে হবে এই পনের মিনিট সময় অর্থাৎ রাত্রি পোনে চারটে থেকে রাত্রি চারটে পর্যন্ত এই বাড়ির সকলে কে কোথায় কোন অবস্থায় ছিল। এই পনের মিনিট সময়ের মধ্যেকার প্রত্যেকের গতিবিধি চেক করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এই পনের মিনিট সময়ের মধ্যেকার প্রত্যেকের গতিবিধি বা অবস্থানই বর্তমানে এই হত্যা-ব্যাপারের রহস্যাদ্বাটনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সূত্র।

॥ বারো ॥

কিরীটী পকেট থেকে তার নোট বুকটা বের করল এবং নিম্নলিখিত কথাগুলো মনে মনে পর্যালোচনা করে এক, দুই, তিন ক্রমিক নম্বর দিয়ে পর পর লিখে যেতে লাগল।

১। রায়বাহাদুর যে গতরাত্রে ঠিক চারটের সময় নিহত হবেন সেটা তিনি অস্তত এখন বোৰা যাচ্ছে জানতেন।

[টীকা : তাঁর একান্ত বদ্ধমূল ধারণা হওয়ার সত্যি কোন কারণ ছিল কি? না ডাক্তার যা বলছেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একটা hallucination—তাই? এবং তা যদি হয়ও তাহলে কেন হল এই রকম একটা hallucination এবং তার কারণ কি?]

২। ধারণা থেকে আর যাই হোক রাত্রি পোনে চারটে থেকে চাবটের মধ্যে যে তিনি নিহত হয়েছেন এ স্বতঃসিদ্ধ।

[টীকা : কাজেই ব্যাপারটা যেখানে স্বতঃসিদ্ধ সেখানে hallucination-এর theory কতদূর প্রয়োজ্য?]

৩। এই পনের মিনিট সময়ের মধ্যে বাড়ির প্রত্যেকেই কে কোথায় ছিল এবং কে কি অবস্থায় ছিল?

[টীকা : প্রত্যেকের জবানবন্দি কি বিশ্বাসযোগ্য? গান্ধারী দেবীর জবানবন্দির মধ্যে প্রায় সবটাই মিথ্যে। তিনি জেগেই ছিলেন এবং কেন ছিলেন? জেগে থাকবার কি তাঁর কোন কারণ ছিল?]

৪। এই সময় গান্ধারী দেবীর শয়নঘরের পাশের ঘরে ঝটিলা কি করছিল?

[টীকা : যতদূর মনে হচ্ছে এই সময় কেউ না কেউ তার ঘরে এসেছিল কে তার ঘরে এসেছিল? সমীরবাবু কি?]

৫। ঝটিলা ও সমীরবাবুর মধ্যে সত্যিকারের কোন ভালবাস understanding আছে কি?

[টীকা : সম্ভবত পরম্পরার পরম্পরাকে ভালবাসে না। গান্ধারী দেবীর কথাবার্তা থেকেই সেটা কিছু প্রমাণিত হয়েছে। আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। একটা ব্যাপারে কেবল যেন সম্ভেদ হয়। ডাঃ সমর সেনকে দেখে ঝটিলা অমন করে তাকিয়ে ছিল বেন?]।

৬। এই পনের মিনিট সময়ের মধ্যে কে সুলতা করাকে কফি দিতে এসেছিল সত্ত্ব সত্ত্ব? সুলতা বলছে আবিষ্ট ডাঃ সানিয়ালই তাকে কফি দিতে এসেছিলেন। কিন্তু তা অসম্ভব। কর্মসূচি জুঃ সানিয়াল তখন তার ঘরেই ছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে কে ডাঃ সানিয়ালের ছদ্মবেশে তাকে গতবাবে কফি দিতে গিয়েছিল? আর ছদ্মবেশেরাকে সুলতা কর চিনতেই বা পারল না কেন? না চেনবার তো কথা নয়।

জ্ঞানেরকেও একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

[টাকা : বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান সূত্র।]

৭। হত্যার ব্যাপারে এ বাড়ির কার কার interest থাকা সম্ভব।

[টাকা : বলতে গেলে রায়বাহাদুরের আত্মীয়দের মধ্যে প্রত্যেকেরই। কিন্তু তাহলেও কার ওদের মধ্যে interest সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল বা থাকতে পারে।

দ্বিতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।]

৮। রায়বাহাদুরের সত্ত্ব কোন উইল আছে কি?

[টাকা : থাকাটাই সম্ভব। তবে হয়ত এখন আর পাওয়া যাবে না খুঁজে।]

৯। শকুনি ঘোষের ঘরের মধ্যে প্রাণ্তি কাপড়ের মধ্যে রক্তের দাগ ছিল। রক্ত কোথা থেকে এল তার সেই পরিত্যক্ত পরিধেয়ে বন্দে এবং সেই বন্দু সিঙ্কেই বা ছিল কেন?

[টাকা : রক্তের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে।]

১০। গান্ধারী দেবী শকুনির নিকট কাকে এই হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করেন বলতে এসেছিলেন, এবং ঘরের মধ্যে তাকে দেখতে পেয়ে ব্যাপারটা চেপে গেলেন।

[টাকা : বিশেষ উল্লেখযোগ্য তৃতীয় সূত্র।]

বর্তমানে সর্বাগ্রে এই দশটি পয়েন্টের মীমাংসার একটা আশু প্রয়োজন।

এই পয়েন্টগুলোর একটা সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারটা একটা রহস্যের অঙ্ককারে অস্পষ্টই থেকে যাবে।

কিরীটী চিন্তা করতে থাকে— এখন কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

বাইরে এই সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুঃশাসন চৌধুরী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কিরীটীর দুঃশাসন চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, এক বাবের শেষের দিকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই যেন ভদ্রলোকের মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। চোখে মুখে একটা সুস্পষ্ট ঝাঁঞ্চির ও দুর্চিন্তার আভাস যেন স্পষ্ট।

আসুন মিঃ চৌধুরী। কিরীটী আহ্বান জানায়, বসুন।

নির্দিষ্ট চেয়ারটার ওপর বসতে বসতেই ঝাঁঞ্চি অবসন্ন কঢ়ে দুঃশাসন চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা কি হল বলুন তো মিঃ রায়? শেষ পর্যন্ত দাদার অনুমানই সত্ত্ব হলুমাকি! সত্ত্ব কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন এখনও ঠিক ব্যাপারটার মাথায়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

আপনি এসেছেন মিঃ চৌধুরী ভালই হল। পুলিসের সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি হাতে নেওয়ার আগে আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে আর একবার খোলাখুলি আলোচনা করব ভেবেছিলাম।

বলুন কি জানতে চান। আর সত্ত্ব কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন সত্ত্বই puzzled হয়ে আছি।

পাজল্ড শুধু আপনিই নন দুঃশাসনবাবু, প্রত্যেকেই হয়েছেন।

আচ্ছা আপনার এ ব্যাপারে কি ধারণা বলুন তো মিঃ রায়?

সে কথা বলবার প্রস্তুতি একবার আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি আলোচনা করে নিতে চাই। দালাল সাহেব বিকেলেই আসবেন বলে গেছেন। তাঁর আসবার আগেই এ ব্যাপারটা আমি শেষ করে দিতে চাই।

বলুন আমাকে কি করতে হবে?

প্রত্যেকের সঙ্গে আমি আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করব। এবং আপনাকেই সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বেশ।

অনুগ্রহ করে তাহলে পনের মিনিট বাদে ডঃ সানিয়ালের ঘরে এলে আমি খুশি হব।

বেশ তাই হবে।

দুঃশাসন চৌধুরী অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন কেমন শ্রদ্ধ ক্লান্ত পায়ে।

কিরীটীর মনে হয়, হঠাৎ দুঃশাসন চৌধুরী তার ঘরে কেন এসেছিলেন? কোন কথা বলতে কি?

কি কথা?

দুঃশাসন চৌধুরী কি কিছু জানেন এবং জেনে বিশেষ কারণেই সেটা গোপন করে যাচ্ছেন? লোকটা ধূর্ত নিঃসন্দেহে এবং বর্মায় নিজের ব্যবসা গুটিয়ে বাংলা মূলুকে চলে এসেছেন—শুধু মাত্র কি রায়বাহাদুরের অনুরোধেই, না অন্য কোন কারণে?

॥ তের॥

ডঃ সানিয়ালের ঘরে বসেই কিরীটী অপেক্ষা করছিল এবং মিনিট পনের-কুড়ি বাদেই দুঃশাসন চৌধুরী সেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী আহান জানায়, আসুন, বসুন।

দুঃশাসন চৌধুরীর জবাববন্দি।

কিরীটী প্রশ্ন করছিল এবং দুঃশাসন চৌধুরী জবাব দিচ্ছিলেন।—

সর্বপ্রথম একটা কথা আপনার সম্পর্কে আমার জানা প্রয়োজন মিঃ চৌধুরী!

বলুন?

আপনি গতকাল রাতে বলেছেন মৌচীতে আপনার মাইকার ব্যবসা ছিল এবং আপনি সে ব্যবসা আপনার দাদা রায়বাহাদুরের ইচ্ছেয় তুলে দিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন। প্রাতঃ কয়েক মাস হল, তাই তো?

হ্যাঁ।

সেখানে আপনার ব্যবসা কেমন চলছিল?

ভালই।

কিছু মনে করবেন না, যখন ব্যবসা তুলে দিয়ে এখানে চলে আসেন তখন হাতে আপনার liquid cash কত ছিল?

প্রশ্নটা দাদার হত্যার ব্যাপারে একান্তই অবাঞ্ছর নয় কি মিঃ রায়? দুঃশাসনের কঠিনরটা একটু উগ্র বলেই মনে হয় যেন কিরীটীর।

অবাঞ্ছর হলে অবশ্যই এ প্রশ্নটা আপনাকে আমি করতাম না মিঃ চৌধুরী।

কিন্তু যদি জবাব না দিলে

অবশ্য জবাব দেওয়ানো দেওয়াটা আপনার একান্ত ইচ্ছাধীন, তবে আমার প্রশ্নের জবাবটা দিলে কিছুটা সন্দেহের হাত থেকে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন।

সন্দেহ! কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাচ্ছে, আমার ধারণা রায়বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডটা সম্পূর্ণ অর্থঘটিত। অথই অন্য ঘটিয়েছে।

আপনি তাহলে বলতে চান যে, সম্পত্তির লোভেই দাদাকে কেউ হত্যা করেছে?

নিশ্চয়ই। হঠাতে কঠোর শোনায় যেন কিরীটীর কঠস্বরটা।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর দুঃশাসন চৌধুরী চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, আমাকেও কি তাহলে আপনি ঐদিক দিয়েই সন্দেহ করছেন মিঃ রায়?

শুধু আপনাকেই নয় মিঃ চৌধুরী, এ বাড়ির প্রত্যেককেই—এখানে গতরাত্রে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ করে নিহত রায়বাহাদুরের আপনারা আঞ্চলিক-স্বজনের দল সে সন্দেহের দিক থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না পুলিসের বিচারে বা বিশ্লেষণে।

কিন্তু আপনি!

আমিও ঐ কথাই বলব।

বলছেন কি? তাহলে আপনার কি ধারণা আমরাই, দাদার আঞ্চলিকস্বজনদের মধ্যে কেউ-না-কেউ দাদাকে হত্যা করেছি অর্থের লোভে কাল রাত্রে?

অতীব দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় ভাষণ আমাকে করতে হচ্ছে মিঃ চৌধুরী, আপনার অনুমানই সত্য।

মুহূর্তকাল দুঃশাসন চৌধুরী, চুপ করে যেন কতকটা হতভম্বের মতই বসে রইলেন। তাঁর বাকশক্তি যেন লোপ পেয়েছে। কিরীটীও চুপ করে বসে থাকে।

হঠাতে আবার দুঃশাসন চৌধুরীই প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমাকেও আপনি দাদার হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন?

তার আগে আমি জিজ্ঞাসা করি, এ ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?

কিরীটীর প্রশ্নটা যেন অতর্কিতে দুঃশাসন চৌধুরীকে একটা নাড়া দিল। কতকটা হতচকিত ও বিহুল কঢ়েই দুঃশাসন চৌধুরী জবাব দেন, আমি!

হ্যাঁ। আপনার কি কারও ওপর সন্দেহ হয়?

না। একটু ইতস্তত করেই জবাবটা দিলেন দুঃশাসন চৌধুরী।

আচ্ছা আপনার দাদার কোন শক্র ছিল বলে আপনার মনে হয়?

বলতে পারি না।

ইদানীং কিছুকালের মধ্যে বা পূর্বে আপনার দাদার সঙ্গে এ বাড়ির কারও কোন মনোমালিন্যের কোন কারণ ঘটেছিল বা ছিল বলতে পারেন?

তেমন কিছু বলতে পারি না। তবে মধ্যে মধ্যে শকুনির সঙ্গে দাদার খ্রিটিমিটি হত। তাহাড়া আর কারও সঙ্গে কিছু শুনিনি। একটা কথা অবিশ্য—ইদানীং দাদা তো সকলের প্রতিই বীতরাগ হয়ে উঠেছিলেন।

শকুনিবাবুর সঙ্গে খিটিমিটি হবার কারণ কি? জানেন কিছু?

বলবেন না ওটার কথা। একটা হতচাড়া scoundrel। এই যে বাড়িতে দাদার রোগশয়ার পাশে নার্স দেখেছেন—ঐ মেয়েটাকে শকুনি বিয়ে করতে চায়। এক পয়সার মুরোদ নেই, মামাদের ঘাড়ে বসে থাবে, তার ওপর বিয়ের শখ বাবুর!

কেন, শকুনিবাবু কি কিছুকরেন না?

আজ্জা দেওয়া ছাড়া কিছু করে বলে তো জানি না। যেমন হয়েছেন আমাদের কাকা সাহেবটি তেমনি এ হত্তছাড়া বোম্বেটে শকুনিটা। একজন বসে বসে বাঁচ্চী আর মদে টাকা ওড়াচ্ছেন। আবৰ একজন ক্লাব থিয়েটার আর আজ্জাবাজি করে টাকা ওড়াচ্ছেন।

কিন্তু আমি যতদূর রায়বাহাদুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম, আপনাদের কাকা অভিনবশাস্ত্রের প্রতি রায়বাহাদুরের কোন বিত্তশণ বা বিরাগ ছিল বলে তো মনে হয়নি।

এই তো হয়েছিল মুশকিল! একটা অসম্ভব faith ছিল কাকার প্রতি দাদার, এবং দাদা কেক বরাবরই প্রশ্নয়ই দিয়েছে।

ষ্ঠ। কিরীটী অতৎপর কিছুক্ষণ আঘাতিস্তাতেই বোধ হয় বিভোর হয়ে থাকে।

আবার প্রশ্ন শুরু করে কিরীটী।

আপনি কাল রাত্রি সাড়ে তিনটে থেকে আপনার দাদার হত্যাসংবাদ পেয়ে দাদার ঘরে আসবার আগে রাত চারটে পর্যন্ত সময়টা কোথায় ছিলেন?

নিজের ঘরে জেগেই ছিলাম।

কেন, আপনি তো ঘুমের ওযুধ খেয়েছিলেন, তাতেও আপনার ঘুম হয়নি?

না।

আর একটা কথা, আপনি ডাঃ সানিয়ালের ঘরে কাল রাত্রে যখন ঘুমের ওযুধ চাইতে আসেন, তখন বলেছিলেন গত এক মাস ধরে আপনি এ বাড়িতে আসা অবধি নাকি অনিদ্রা রোগে ভুগছেন, আবার দালাল সাহেবের কাছে কিছুক্ষণ পরেই জবানবন্দিতে বললেন, মাত্র দশদিন আপনি এখানে এসেছেন। কোন্ কথাটা আপনার সত্যি?

দুটোই সত্যি। হির কঠে দুঃশাসন চৌধুরী বললেন।

কি রকম? বিস্তি দৃষ্টিতে কিরীটী চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

মাসখানেক হল আমি বর্মা থেকে এখানে এসে পৌছেছি এবং এই জায়গায় থাকলেও এ বাড়িতে ঠিক আমি ছিলাম না।

কি রকম?

এখানে থেকে মাইল পনের দূরে আমাদের একটা কোলিয়ারিতে গোলমাল চলছিল, এখানে এসে পৌছবার পরই সেখানে আমাকে দাদা অসুস্থ বলে তার নির্দেশে চলে যেতে হয়। এই সবে সেখান থেকে দিন দশকে হল এই বাড়িতে ফিরে এসেছি।

কিরীটী দুঃশাসন চৌধুরীর জবাবে কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে, তারপর আবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন শুরু করে, দালাল সাহেবের কাছে জবানবন্দিতে আপনি কুঠিয়া দেবীর কথায় অঙ্গীকৃতি জানিয়ে বলেছেন, আপনি রায়বাহাদুরের নিহত রঞ্জয়ার সংবাদটা নাকি তাঁকে অঙ্গী দেননি। অথচ কুঠিয়া দেবী জোর দিয়ে বলেছেন—

সে মিথ্যে কথা বলছে। আমি কেবল বৃহস্পতিকে সংবাদটা দিয়েছিলাম।

ষ্ঠ। আছ্জা রায়বাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যে ডুত্যাটিকে আপনি দেখেছিলেন তার নাম কি?

কেরালাপ্রসাদ।

কতদিন সে এখানে আছে?

দাদার খাসস্তৰ্য, উনেছি বছর পাঁচেক সে এ বাড়িতে কাজ করছে, ইদানীং বোগীর ঘরের যাবতীয় ফাই-ফরমাশই সে খাটিত।

লোকটা বিশ্বাসযোগ নিশ্চয়ই ?

হাঁ, সেই রকমই ছে মনে হয়।

আচ্ছা আপনি যদি রচিতো দেবীকে সংবাদটা না দিয়ে থাকেন, তাঁকে কে ঐ সংবাদটা দিতে পারে বলো আপনার মনে হয় ?

বলতে পারি না।

আপনি কি বিয়ে করেছেন ?

কিরীটির প্রশ্নটা যেন অত্যন্ত অতর্কিত ভাবেই আসে। এবং প্রশ্নের জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে মা দিয়ে একটু যেন ইতস্তত করেই দুঃশাসন চৌধুরী বললেন, না।

আর একটি কথা মিঃ চৌধুরী, রায়বাহাদুরের যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল গতকাল রাত ঠিক চারটোর সময়ই তাঁর মৃত্যু হবে বা কেউ তাঁকে হত্যা করবে—এ ধরনের বদ্ধমূল ধারণা হবার কোন কারণ ছিল বলে আপনি জানেন কিছু ?

না। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, ব্যাপারটাকে তো আমি শোনা অবধি হাস্যকর বলেই কোন গুরুত্ব দিইনি গোড়া থেকেই।

আচ্ছা আপনি এবার যেতে পারেন। বৃহস্ত্র চৌধুরীকে একটিবার পাঠিয়ে দিন এ ঘরে।

দুঃশাসন চৌধুরী অতঃপর ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

বৃহস্ত্র চৌধুরী ও কিরীটির মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

গতরাত্রে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ পেয়েই আমি যখন রায়বাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানে আপনার কাকা ও আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু একটু পরে লক্ষ্য করে দেখি আপনি ঘরে নেই। হঠাৎ ঘর থেকে চলে গিয়েছিলেন কোথায় আর কেনই বা গিয়েছিলেন !

আমার ঘরে—কাকা যখন আমার শোবার ঘরে গিয়ে বাবার নিহত হবার সংবাদটা দেন আমি একেবারে হতভব হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কাকার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকি কিন্তু পরে ঐ ভীষণ দৃশ্য দেখেই সমস্ত মাথাটা যেন কেমন আমার বৌঁ বৌঁ করে হঠাৎ ঘুরে উঠল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি আবার ঘর থেকে বের হয়ে যাই, তারপর আবার দালাল সাহেব ডেকে পাঠাতে ফিরে আসি।

রাত্রি সাড়ে তিনটো থেকে আপনার কাকা আপনাকে ডাকতে যাওয়া পর্যন্ত আপনি কি করছিলেন ?

গতকালই তো আমি বলেছি; শরীরটা আমার বিশেষ ভাল না থাকয় সঙ্গে থেকেই প্রায় আমি আমার ঘরেই ছিলাম! বিছানাতেই শুয়ে ছিলাম, তবে ঠিক ভাল ভাবে ঘুমেইনি। একটা আধো ঘুম আধো জঁগ অবস্থা।

একটা কথা বৃহস্ত্রবাবু, আপনি কি সত্যিই আপনার বাবার কোন উইল আছে বলে জানেন না ?

যতদূর জানি বাবার কোন উইল নেই। আর থাকলেও আমার সেটা জানা নেই মিঃ রায়।

আপনি বলতে পারেন আপনার কাকা দুঃশাসন চৌধুরীর প্রতি আপনার বাবার ঠিক মনোগত ভাবটা কেমন ছিল ?

কিরীটীর প্রশ্নে স্পষ্টই বোঝা গেল বৃহস্ত্র চৌধুরী যেন একটু ইতস্ততই করছেন। জবাবটা দিতে তেমন যেন একটু সংকোচ ও দ্বিধা বোধ করছেন।

অবশ্য আপনি যতটুকু জানেন, ততটুবুই আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে বৃহস্ত্রাবাবু!

কাকা তো মাত্র মাসখানেক হল ফিরে এসেছেন। এই সময়ের মধ্যে তেমন বিশেষ কিছু আমার চোখে পড়েছে বলে তো কই আমার মনে পড়েছে না। তবে ইতিমধ্যে কাকা এখানে আসবার পরই একদিন রাত্রে, জানি না কি কাবণে বাবা ও কাকা দুজনের মধ্যে একটা বচসা ও কথা-কাটাকাটি হয়েছিল এবং পরদিন সকান্দেই এখান থেকে মাইল পনের দূরে একটা কোলিয়ারীতে কাকা চলে যান।

সে বচসার বিষয়বস্তু কি ছিল কিছুই জানেন না ?

না।

সে ঘরে আর কেউ ছিল ?

না।

আপনি সে কথা জানলেন কি করে ?

কি একটা স্টেটের কাজেই এ সময় বাবার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। দরজার কাছাকাছি যেতেই শুনলাম কাকা খুব যেন রাগত ভাবেই চেঁচিয়ে কথা বলেছেন।

শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর কোন কথা ? মনে করে বলতে পারেন কিছু ?

হ্যাঁ, একটা কথা কেবল শুনতে পেয়েছিলাম, কাকা বলছিলেন, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। এভাবে বঞ্চিত করবার তোমার কোন আইনগত অধিকার নেই জানবে। তার পরই কাকা দেখলাম ঘর থেকে দ্রুত চঙ্গল পদেই যেন বের হয়ে গেলেন। বাবার ঘরে চুকে দেখি বাবাও যেন তখন বেশ উত্তেজিত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঐ সংপর্কে আমার কোন কথাই হয়নি সে-সময়ে।

হ্যাঁ। আপনার প্রতি আপনার কাকার মনোগত ভাবটা তো ভাল বলেই মনে হল, তাই না ?

হ্যাঁ, কাকা আমাকে চিরদিনই একটু বেশী স্নেহ করেন। বিদেশে থাকাকালীন একমাত্র আমার কাছেই তিনি যা চিঠিপত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন।

মৌচার মাইকার বিজনেস তুলে দিয়ে বাণিজ্যে ফিরে আসবার জন্য আপনার কাকাকে শুনলাম আপনার বাবাই নাকি পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কথাটা সুন্তি।

হ্যাঁ। বাবা কাকাকে একমাত্র ভাই বলে চিরদিনই বিশেষ একটু স্নেহ করতেন। কাকার বিদেশ যাওয়াটা শুনেছিলাম বাবার অমতেই হয়েছিল।

বিদেশ যাওয়ার আপনার কাকার কোন কারণ ছিল বলে জানেন ?

বিদেশ যাওয়ার আগে কাকা বাবার ব্যবসাতেই কাজ করতেন। তারপর সঠিক আমি জানি না আসল ব্যাপারটা কি, তবে মনে হয় ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই বোধহয় কি একটা গোলমাল হয়। তারপরই কাকা বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে মৌচাতে তাঁর এক বন্ধু মাইকার বিজনেস করছিলেন সেই বিজনেসে গিয়ে যোগ দেন। এবং শুনেছি বাবসাতে নাকি তাঁর খুব উন্নতি হয় এবং যথেষ্ট অর্থাগমও হতে থাকে।

একটা কথা, আশা করা কিছু মনে করবেন না বৃহস্পতিবাবু, আপনার কাকার বর্তমান অর্থিক অবস্থাটা কেমন বলতে পারেন?

সঠিক আমি জানি না, তবে নগদ টাকা বেশ কিছু তাঁর হাতে আছে বলেই আমার তো ধারণা।

কেমন আপনার এ ধারণা—বলতে আপনার আপত্তি আছে কি কিছু?

এখনে এসে অবধি তিনি আমাকে প্রায়ই বলেছেন কোডার্মাতে আবার তিনি মাইকার বিজনেস বড় করেই শুরু করবেন। ইতিমধ্যে দু'একবার কোডার্মায় গিয়ে ঘুরেও এসেছেন আচ্ছা আপনি আপনার পিতার হত্যার ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন কি?

না। ধীর সংযত কঠে জবাব দিলেন বৃহস্পতি চৌধুরী।

আপনি এবাবে যেতে পারেন মিঃ চৌধুরী। আপনার দাদু অবিনাশবাবুকে যদি এ ঘরে একবার দেখা করতে আসতে বলি, আসবেন কি?

যদি মনে কিছু না করেন মিঃ রায়, আমার মনে হয় যদি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান তাহলে তাঁর ঘরে গেলেই বোধ হয় ভাল হয়, কারণ তাঁকে ডাকলে যে তিনি আসবেন আমার তো মনে হয় না।

ডাঃ সানিয়ালের ঘর থেকে বের হয়ে ডাঃ সময় সেন কতকটা অন্যমনক্ষ ভাবেই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু অন্যমনক্ষ ভাবে—সিঁড়ি যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এসে পৌছতেই যেন হঠাত চমকে ওঠেন।

ঠিক সামনেই তাঁর দাঁড়িয়ে রুচিরা। বোধ হয় নিচে গিয়েছিল। সেই সময় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিল।

রুচিরা!

রুচিরা ডাঃ সেনের ডাকে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকায় একটু যেন চমকেই।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল রুচিরা।

নিচে বাইরের ঘরে এস।

চল।

রুচিরাকেই অতঃপর অনুসরণ করে ডাঃ সেন পূর্বরাত্রের সেই নিচেকার বিরাট খালি ঘরটার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কাল রাত্রে দেখা গিয়েছিল ঘরের জানলা-দরজাগুলো বন্ধ, কিন্তু আজ দেখা গেল জানলাগুলো খোলা। একটা খোলা জানালার সামনে দুজন এসে দাঁড়ায়।

রুচিরাই প্রথমে কথা বলে মন্দ হেসে, তোমাকে কাল রাত্রে বাড়িতে দেখেও কেন আচেনবার ভাব করেছি তাই জিজ্ঞাসা করবে তো?

হ্যাঁ, তাছাড়া—

তাছাড়া আবার কি?

তাছাড়া সমীরবাবুর সঙ্গে যে অলরেডি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে সেইটাই বা এতদিন জানাওনি কেন?

রুচিরা ডাঃ সেনের কথার জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

ডাঃ সেন আবার বলেন, এইজন্যই যে এতদিন বাবু তোমার কাছে প্রোপোজ করা সম্ভেদ আমায় কোন জবাব দাওনি তাও বুঝালাম, কিন্তু এর তো কোন প্রয়োজন ছিল না রুচিরা!

ରୁଚିରା ତଥାପି ଚୁପ୍ତ
କି, ଜବାବଦିଷ୍ଟିଲା ଯେ ?

ଯେ ଜବାବଦିଷ୍ଟିଲା ଦିଇ ନା କେନ, ତୁମି ତୋ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ନା ସମର ।
ବିଶ୍ୱାସ କେବେବ ନା !

ମାତ୍ରା ତାରପର ଏକଟୁ ଥେମେ ଆବାର ବଲେ, କାର କାହେ ତୁମି କି ଶୁନେଛ ତା ଜାନି ନା, ତବେ
ଆମି ଭେବେଛିଲାମ ତୁମି ଅନ୍ତତ ଆମାକେ ଏତଦିନେ ବୁଝାତେ ପେରେଛ ।

ହଁ, ବୁଝେଛି ବୈକି । ବଡ଼ଲୋକ ସାମୀର ଲୋଭ ତୁମି ଛାଡ଼ାତେ ପାରନି ବଲେଇ ଗରୀବ ଆମାକେ
ନିଯେ ତୁମି ଏତଦିନ ଧରେ ଖେଳା ଖେଳଛ !

ସମର !

ହଁ, ହଁ, ତାଇ । କିନ୍ତୁ ଏର କି ପ୍ର୍ୟୋଜନ ଛିଲ ବଲତେ ପାର ରୁଚିରା ଦେବୀ ?

ତୋମାର ଆର କୋନ କଥା ଯଦି ନା ଥାକେ ତୋ ଏବାରେ ଆମି ଯାବ !

ଯାବେ ବୈକି । ଖେଲାଟା ଯଥନ ଜାନତେ ପେରେ ଗେଛି—

ସମର ସେନେର କଣ୍ଠାଟା ଶେଷ ହଲ ନା, ସରେର ମଧ୍ୟେ କିରୀଟିର ଗଲା ଶୋନା ଗେଲ, ସମରବାସ୍ୱ !

ଦୁଜନେଇ ଚମକେ ଆଦୁରେ ଉପହିତ କିରୀଟିର ଦିକେ ତାକାଯ । କିରୀଟି ଯେ ଇତିମଧ୍ୟେ ନିଜେର
ଘର ଥେକେ ବେଳୁବାର ମୁଖେ ଦାଁଡ଼ିର ସାମନେ ଓଦେର ଦୂର ଥେକେ ଦେଖେ ଏକେବାରେ କାହାକାହି ଏମେ
ଦାଁଡ଼ିଯେ ଓଦେର କଥାଞ୍ଚଲୋ ଶୁନେଛେ ସେଟୀ ଦୁଜନେର ଏକଜନଙ୍କ ଟେର ପାଯାନି ।

କିରୀଟି ଅତଃପର ବଲଲ, ଆପନାରା ଦୁଜନେଇ ଏକଟୁ ଭୁଲ ବୁଝେଛେ ଦୁଜନକେ । ଡାଃ ସେନ,
ଆପନାର ଏଟା ଅନ୍ତତ ବୋବା ଉଚିତ ଛିଲ ଯେ ରୁଚିରା ଦେବୀର ମା ଏଥାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ !

ଆମି ଜାନି ତା ମିଃ ରାଯ, ଡାକ୍ତର ସେନ ବଲଲେନ ।

କିରୀଟି ଆବାର ଯେନ କି ବଲତେ ଯାଚିଲ, ଏବାର ରୁଚିରା ବାଧା ଦିଲ, ମିଃ ରାଯ !

ନା ରୁଚିରା ଦେବୀ, ମିଥ୍ୟେ ମନଗଡ଼ା ମନୋମାଲିନ୍ୟେର ବୋବା ଟେନେ ଲାଭ ନେଇ । ଶୁନୁମ ଡାଃ
ସେନ, ଓର ମା ସମୀରବାବୁର ସଙ୍ଗେ ଓର ବିଯେର ସବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ କରଲେଓ ଓର ମତ
ପାନନି—ବଲେଇ ହଠାତ ଘୁରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ମୃଦୁ ହେସେ ବଲେ, ଝଗଡ଼ାଟା ତାହଲେ ଏବାର ମିଟିଯେ
ଫେଲୁନ, ଆମି ଚଲି ।

କିରୀଟି ସ୍ଥାନତ୍ୟାଗ କରେ ।

॥ ପନ୍ଦର ॥

ଅବିନାଶ ଚୌଥୁରୀର ଘରେର ଦରଜା ଭେତର ହତେ ଭେଜାନୋଇ ଛିଲ ।

ଦରଜାର ଗାୟେ ମୃଦୁ କରାଯାତ କରେ କିରୀଟି । ଭେତର ହତେ ସୁମିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷ ଆମ୍ବେ କେ ?

ଆମି କିରୀଟି ।

ଆସୁନ । ଭେତର ଥେକେ ଆହାନ ଆସେ ।

ଦରଜା ଠେଲେ କିରୀଟି ଘରେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରଲ ।

ଖୋଲା ଦରଜାର ଦିକେ ମୁଖ କରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଛିଲେନ ଅବିନାଶ ଚୌଥୁରୀ ।

ହାତ ଦୁଟି ତାର ପଶ୍ଚାତେର ଦିକେ ନିବନ୍ଧ । ପରିଧାନେ ଦାମୀ ଶାନ୍ତିପୂରୀ ମିହି ଧୂତି । ଗିଲେ କରା
କୋଚାଟା ମେଘେତେ ଲୁଟୋଛେ । ଗାୟେ ଏକଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗେର କାନ୍ଧୀରୀ କଲକା-ତୋଳା ଦାମୀ ଶଳ ।

ମେଘେତେ ପୁରୁ ଦାମୀ ଗାଲିଚା ବିଛାନେ । ଏକପାଶେ କରେକଟି ବାଦ୍ୟନ୍ତ୍ର ଏଲୋମେଲୋ ପଡ଼େ
ଆହେ ।

দেয়ালের দিকে ঘেঁষে একটি কাঁচের আলমারি। ভেতরে সুন্দরভাবে সাজানো নানা বই।

অবিনাশ চৌধুরী গ্রন্থবার ফিরেও তাকালেন না। যেমন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিরীটি ও নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আবস্থার রায় মশাই, কি মনে করে আমার ঘরে? মনু শাস্ত কঠে এক সময় অবিনাশ চৌধুরী আগের মত দাঁড়ানো অবস্থাতেই প্রশ্ন করলেন।

আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল কাকা সাহেব!

কথা?

আজ্ঞে।

আবার কিছুক্ষণ পীড়াদায়ক স্তুক্তা।

কেবল ঘরের দেয়ালে বসানো একটি সুদৃশ্য দামী জার্মান ক্লক সময়-সমুদ্রের বুকে একটানা শব্দ জাগিয়ে চলেছে টক্ টক্ টক্ টক্।

বলে ফেলুন, শুনি কি কথা! পুনরায় কিছুক্ষণ বাদে অবিনাশ চৌধুরীই নিষ্ঠকতা ভঙ্গ করলেন।

আপনি বোধহয় বুঝতেই পেরেছেন কাকা সাহেব, কি সম্পর্কে এবং কি কথা আমি বলতে চাই? কিরীটি বলে।

আমি তো অন্তর্যামী নই যে আপনার মনের কথা জানতে পারব মশাই। তবে যা জিজ্ঞাসা করতে চান একটু চটপটি করলে বাধিত হব।

সামান্য কয়েকটা কথাই আমি জিজ্ঞাসা করব, বেশীক্ষণ আপনাকে আমি বিরক্ত করব না। আমি বলছিলাম রায়বাহাদুরের—

সহসা এতক্ষণে ফিরে দাঁড়ান অবিনাশ চৌধুরী এবং ক্ষণকাল তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নিঃশব্দে।

সত্যিই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি সেই রহস্যাভেদী না? দুর্যোধনের অফটন-পটিয়সী অজ্ঞত শক্তিধর কিরীটি রায়! তা বেশ, দুর্যোধনের হত্যার রহস্যাভেদের জন্য লেগেছেন বুঝি? কিন্তু পারবেন—ধরতে পারবেন দুর্যোধনের হত্যাকারীকে? পারবেন—ধরতে?

কিরীটির ওষ্ঠপ্রাণে মনু একটু হাসি ফুটে ওঠে। মনু হাস্যোদীপ্ত কঠে বলে, চেষ্টাক্ষেত্রে দেখি।

কিরীটির কথায় কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অবিনাশ চৌধুরী বললেন, করুন চেষ্টা তবে। হ্যাঁ, পারেন যদি আমি নিজে আপনাকে একটা reward দেব। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

না, আপনাকে বেশী বিরক্ত করব না। দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যাব।

দু-চারটে কেন, হাজারটা করুন না! হ্যাঁ, আমি ও ভাবছিলাম ব্যাপারটা ঠিক কি হল! আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও যেন একটা দংশ্বর্মণেই মনে হচ্ছে। দুর্যোধন সত্য-সত্যিই শেষ পর্যন্ত নিহত হল! কিন্তু কেন? কেন—কেন সে এমন brutally নিহত হবে—শেষের দিককার কথাগুলো কতকটা যেন আঘাত ভাবেই উচ্চারণ করে অবিনাশ চৌধুরী ঘরের মধ্যে আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

ନିଃଶବ୍ଦେ ଗଲିଚା-ବିଶ୍ଵତ୍ତ ସରେର ମେବୋତେ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ପରିକ୍ରମଣ କରଛେନ । ପୂରେଇ ମତି ହାତ ଦୁଟି ତାଁର ପଞ୍ଜାତେର ଦିକେ ନିବନ୍ଦ ।

ଆଉଗତ ଭୁବେଇ ଯେଣ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆବାର ବଲତେ ଲାଗଲେନ, It's a curse! ବୁଲାଳେ, curse—ଏଭିଶାପ । ଏକଟା ଦିନେର ଜନ୍ୟଓ ମେଯେଟାକେ ଶାସ୍ତିତେ ଥାକତେ ଦେଯନି । ଏକଟା ଦିନେର ଜନ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତି ଦେଯନି ।

କଥା କଥା ବଲଛେନ କାକା ସାହେବ ? କିରୀଟୀ ମୁଁ କଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ ।

କିରୀଟୀର ପ୍ରଶ୍ନେ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଯେଣ ଚମକେ ଓଠେନ, ଅଁ, କି ବଲଲେନ ! ନା, କାରାଓ କଥାଇ ନାଁ । କିନ୍ତୁ ଆପନି—ଆପନି ଏଖାନେ କି ଚାନ ? କି ପ୍ରୟୋଜନ ଆପନାର ? ଶେଷେର ଦିକେ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀର କଠ୍ସରାତ୍ରି ଯେଣ ବଦଳେ ଗେଲ । ରୁକ୍ଷ, କରକ୍ଷ ।

ଏବଂ ପରକଣେଇ—ମହାବୀର ସିୟ ! ମହାବୀର ସିୟ !—ବଲେ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଚିଢ଼କାର କରେ ଭୃତ୍ୟକେ ଡାକେନ ।

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରେର ଭେତର ଦିକେର ଏକଟା ଦରଜା ଖୁଲେ ଗେଲ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଗୋଛେର ଏକଜନ, ବୋଧ ହୁଯ ରାଜପୁତ, ସରେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରଲ, ଜି ମହାରାଜ !

ବାଙ୍ଗଜୀ ! ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ବଲଲେନ ।

ମହାବୀର ସିୟ ଆବାର ପୂର୍ବଦ୍ୱାରପଥେଇ ଅନ୍ତହିର୍ତ୍ତ ହେଁ ଗେଲ ।

ଏବଂ ମହାବୀର ସିୟ ଘର ଛେଡ଼େ ଚଲେ ଯାବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବାର କିରୀଟୀର ଦିକେ ତାକିଯେ ଅବିନାଶ ରୁକ୍ଷ ସ୍ଵରେ ବଲେନ, ଏଥନ୍ତି ଦାଢ଼ିଯେ ଆଛେନ !

ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଗୋଟାକତକ କଥା ଯିଃ ଚୌଧୁରୀ—

କଥା ! କି କଥା ? ଏଥନ ଆମାର ସମୟ ନେଇ କୋନ କଥା ଶୋନବାର ବା ବଲବାର ।

କିନ୍ତୁ—

ଆଃ ବଲଛି ନା ସମୟ ନେଇ !

ବୈଶିକ୍ଷଣ ଆମି ସମୟ ନେବ ନା ।

ଏକ ମିନିଟ ସମୟରେ ଆମାର ନେଇ ।

ମୁନ୍ମା ବାଙ୍ଗଜୀ ସରେର ମଧ୍ୟେ ଏସ ଏମନ ସମୟ ପ୍ରବେଶ କରଲ ।

ଅତି ସାଧାରଣ ଏକଥାନି ରଙ୍ଗଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ରପାଡ଼ ବାସନ୍ତୀ ରଙ୍ଗେର ଖଦରେର ଶାଡ଼ି ପରିଧାନେ । ଅନୁରାପ ରଙ୍ଗଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଟିନେର ହାଫ-ହାତା ବ୍ଲାଉଜ ଗାୟେ । ବିକିର୍ଣ୍ଣ-କୁଷ୍ଟଳା । ଚୋଖେର କୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁର୍ମାର ଟାନ ।

ସର୍କର ସର ଚାଁପାର କଲିର ଯତ ଆଙ୍ଗଳୁଣ୍ଠିଲେ । ନଥ ହତେ ଯେଣ ରଙ୍ଗ ଚିଁ୍ଯେ ଚିଁ୍ଯେ ପଡ଼ିଛେ । ଆମାର ଡାକଛିଲେନ ଚୌଧୁରୀ ମଶାଇ ?

ଏସ ମୁନ୍ମା । ଏବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କଠ୍ସର । ଯେଣ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ନାଁ ।

ଆଜ ସକାଳେ ତୁମି ଯେ ଭୈରୋ ରାଗଟା ଧରେଛିଲେ, କିଛୁତେଇ ମନେର ମଧ୍ୟେ ଆର ସେ ମୁରଟାକେ ଝୁଁଝେ ପାଛି ନା । ମୁରଟାକେ ଫିରିଯେ ଆନତେ ପାର ବାଙ୍ଗଜୀ !

ମୁନ୍ମା ବାଙ୍ଗଜୀ ନିଃଶବ୍ଦେ ଏଗିଯେ ଗାଲିଚାର ଓପର ହତେ ଝାଣଟା କୋଲେ ଟେନେ ନିଯେ ତାରେ ମୁଁ ଆଘାତ କରଲ ।

ତାରେର ବୁକେ ରିନିବିନି ଶବ୍ଦ ଜାଗେ । ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗେ କଥା ବାଙ୍ଗଜୀର ଗୁଣଗୁନିଯେ ଓଠେ । ଅବିନାଶ ଗାଲିଚାର ଓପରେ ବସେ ଏକଟା ତାକିଯା କୋଲେର କାହିଁ ହାତ ବାଢ଼ିଯେ ଟେନେ ନିଯେ, ନିଜେକେ ତାକିଯାର ଓପର ଏଲିଯେ ଦିଯେ ଚୋଥ ବୁଝଲେନ ।

॥ ঘোল ॥

কিরীটী কিন্তু যেস্মৰ দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে।

সে নিজে আকাস্ত সঙ্গীতপিপাসু হলেও, বর্তমানে তার সমগ্র চিঞ্চারাজ্যকে মহন করে যে চিঞ্চা ঘণ্টারত রচনা করেছিল—সঙ্গীতের সুর তার মধ্যে যেন কোনমতেই প্রবেশ করতে পারে না। এতটুকু স্পর্শও যেন করে না।

অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। কতকগুলো প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছ থেকে পেতেই হবে। কিন্তু অবিনাশ চৌধুরীর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, অত সহজে তাঁর কাছ থেকে কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া বোধহয় যাবে না। এ অবস্থায় ঠিক কি ভাবে অবিনাশ চৌধুরীর কাছে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে তাঁর জবাব পাওয়া যায়।

বাঁজী তখনও গুণগুণ গলায় তান তুলে ভৈরো রাগটা আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করছে। কিরীটী কতকটা অনন্যোপায় হয়েই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এতক্ষণ সে তার স্বভাববিরক্ত ভাবেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেও, অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করেই অবিনাশ চৌধুরীকেই পর্যবেক্ষণ করছিল।

ঘরের চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে সহসা তার দৃষ্টি দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো কতকগুলো ফটো ও চিত্রগুলো দেখতে থাকে।

তাঁক্ষে দৃষ্টিতেই কিরীটী ফটো ও চিত্রগুলো দেখতে থাকে।

চিত্রগুলো সব বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের।

নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ, দানবীবু, অর্ধেন্দু মুস্তফী, শিশির ভাদুড়ি, কৃষ্ণভামিনী, তারাসুন্দরী, বিনোদিনী, কুসুমকুমারী প্রভৃতির। আর সেই সঙ্গে কয়েকটি ফটো—বিখ্যাত সব নাটকের কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্রের রূপসজ্জায়। সাজাহানের উরংজীব, প্রফুল্লর রমেশ, চন্দ্রগুপ্তের চানক্য, প্রতাপাদিত্যের ভবানন্দ ইত্যাদি।

একসময় কিরীটীর অভিনয় দেখবার প্রচণ্ড নেশা ছিল ছাত্রজীবনে। এক গিরিশ ঘোষ ও সেই সময়কার দু-একজন ব্যতীত প্রায় সব নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই সে প্রায় চেনে। কিন্তু বিশেষ ঐ বিভিন্ন রাপে সজ্জিত অভিনেতাটিকে তো কখনও ইতিপূর্বে কোন নাট্যালয়ে দেখেছে বলে কই স্মরণ করতে পারছে না।

হঠাৎ একটি ফটোর সামনে কৌতুহলভরেই সে এগিয়ে গেল। উরংজীবের রূপসজ্জায় ফটোটি। মুখটা বিশেষ করে চোখ দুটি চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে যেন। কে ঐ অভিনেতা? কে? সহসা যেন বিদ্যুৎ-চমকের মতই মানসপটে একটা সত্ত্বাবনা উঁকি দিয়ে যায়।

তবে কি—

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায় কিরীটী। এবং ঘুরে দাঁড়াতেই অবিনাশ চৌধুরীর কৌতুহলী দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময় হয়।

কি দেখছেন মিঃ রায়! অবিনাশ চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

আপনারই রূপসজ্জার ফটো বোধ হয় এগুলো? প্রশ্ন করে কিরীটী।

এতক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে যার উপহিতিকে অবিনাশ চৌধুরী দ্রুক্ষেপমাত্রও করেননি—ফিরে তাকাননি পর্যন্ত তার দিকে, কিরীটীর ঐ শেষের প্রশ্নে সেই অবিনাশ চৌধুরী যেন সচকিতে মুখ তুলে তাকালেন ওর দিকে এবং এতক্ষণের মৌনতা ও বিরক্তি যেন সহসা মুহূর্তে এক নিখিল নিখিল কৌতুকে হাসিতে রূপান্তরি হল।

নিখিল প্রসন্ন কঠে চৌধুরী বললেন, হ্যাঁ। এককালে আমার ঐ থিয়েটার করা একটা

প্রচণ্ড নেশা ছিল রায় মশাই—বলতে বলতে সহসা উপবিষ্ট অবিনাশ গালিচা ছেড়ে উঠে কিরীটির একেবারে পশ্চাত্তে এসে দাঁড়ালেন।

আপনি কখনও প্রায়লিক স্টেজে অভিনয় করেছেন?

না। সাধারণ রঙমধ্যে পেশাদারী ভাবে অভিনয় আমার ধাতে ঠিক খাপ খেত না রায় মশাই। স্টেজ ও অভিনয়ের ব্যাপারে আমার যেমন আগ্রহ কৌতুহল ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না তেমনি অর্থব্যয়ও কম করিনি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, ওদের দেশের অভিনয়, অভিনেতা ও ওখানকার রঙমঞ্চ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করবার জন্য ওদের দেশেও গিয়েছি এবং জীবনে এক সময় অভিনয়কেই পেশা বলে গ্রহণ করব ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না রায় মশাই, এদেশের অভিনয়শিল্পের সঙ্গে যে সব পুরুষ ও নারী সংশ্লিষ্ট, বলতে গেলে তাদের মধ্যে সকলেরই প্রায় অত বড় একটা শিল্পের প্রতি যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা থাকা দরকার তার বিন্দুমাত্রও আদৌ নেই। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত রঙমঞ্চ ও অভিনয়কে ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি।

দোষটা হয়ত এক পক্ষেরই নয় চৌধুরী মশায়। কিরীটি মৃদু হেসে বলে, জনসাধারণের কাছ থেকেই বা অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কতটুকু সম্মান পেয়ে থাকেন আমাদের দেশে বলুন!

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হয়, অর্জন করতে হয় মিঃ রায়। ভিক্ষুকের মত হাত পেতে তা দেলে না।

কিরীটি ও অবিনাশ চৌধুরীর কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে কখন এক সময় বাঁজী গুণগুণ করে কঠে যে তাল তুলেছিল স্টো মারপথেই থামিয়ে দিয়ে কখন এক সময় ওদের কথাবার্তায় কান দিয়েছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে অন্যমনক্ষভাবে ক্রোড়স্থিত বীণার তারে মৃদু মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিল।

মধ্যে মধ্যে রিনবিন একটা মিষ্টি তারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

অবিনাশ চৌধুরী যেন কিরীটির প্রতি সহস্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠেন।

অবিনাশ ও কিরীটি অভিনয়-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় এতটা তন্ময় হয়ে ওঠে যে, বাঁজী যে একপ্রকার বাধ্য হয়েই একসময় ক্রোড়স্থিত বীণাটি গালিচার ওপরে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অবিনাশ চৌধুরীরও যেন স্টো নজরেই পড়ে না।

কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনায় নিবিষ্ট থাকলেও, তার মনের মন্ত্রের অংশটা কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—কখন কোন ফাঁকে সে তার আসল মন্ত্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করবে।

সুযোগে করে দিলেন অবিনাশ চৌধুরী নিজেই। সহসা তিনিই কিরীটিকে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি যেন প্রয়োজন ছিল আমার কাছে রায় মশাই, আপনি বলছিলেন—

না না থাক, সে অন্য সময় হবে'খন।

উঁহ! স্বর্ণসঙ্কাধিপতি রাবণের থেদেক্তি শোনেন্তি আজি নয় কাল এই করে করে স্বর্গের সীড়ি শেষ পর্যন্ত তাঁর তৈরি করাই হল না। বললেন, out with it!

বিশেষ তেমন কিছু না। আপনি তো জানেন, মৃচ্ছাত্মে ভীত হয়েই রায়বাহাদুর আমাকে এখানে আনিয়েছিলেন। এখন যদি তাঁর হত্যাকারীকে—

কথাটা কিরীটী শেষ না করেই হেমে গেল এবং সঙ্কোচের সঙ্গে অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকায়।

অবিনাশ চৌধুরীও যেন হঠাতে ঐ কথায় কেমন কিছুক্ষণের জন্যে গুম হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, কিন্তু মনে হয় অবিনাশ চৌধুরী কেমন যেন একটু চিপ্তি—তাঁর প্রশংসন উন্নত লম্বাটে কয়েকটা চিঞ্চার রেখা জেগে উঠেছে।

এক সময় ধীরে ধীরে অবিনাশ চৌধুরী বলতে শুরু করলেন, কি জানেন রায় মশাই, সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। নচেৎ বয়েস হয়েছে আমার, যাবার কথা তো আমারই। কিন্তু চলে গেল দুর্যোধন। অবিশ্বাস আপনারা বলবেন সে তো অসুস্থ ছিলই। তা ছিল—ঐ ভাবে না মরে যদি সে অসুখেই মারা যেত, তবে তো দুঃখটা এত হত না। এত Painful হত না ব্যাপারটা। ওরা তো জানে না, এই বিরাট কোলিয়ারীর বিজনেস দুজনে মিলে আমরা গায়ের রক্ত জল করে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অক্রান্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে কি ভাবে গড়ে তুলেছিলাম! এই মাত্র বছর দুই হল কাজ থেকে অবসর নিয়ে একটু বিশ্রাম নিছি। দুর্যোধন যে আমার কতখানি ছিল, ভাইপো হলেও সে আমার বৰু বলতে বৰু, সুহুদ, পরামর্শদাতা, সঙ্গী সাথী—একাধারে সে-ই আমার সব ছিল। দুর্যোধনই ছিল এ গোষ্ঠির মধ্যে মানুষের মত মানুষ। নচেৎ এই চৌধুরী-বাড়িতে আর মানুষ বলতে একটা প্রাণীও আছে নাকি? ওর একমাত্র ছেলে ঐ বহুলা, ওটা তো মেয়েমানুষের অধম—effiminate, মেরুদণ্ডীন। একমাত্র ঐ ভাই দুঃশাসন, ওটার কিছু বুদ্ধি ছিল; কিন্তু ওটার মাথায়ও পোকা আছে।

পোকা আছে! কিরীটী প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায় অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে।

তা নয় তো কি? নইলে ও হতভাগটার মধ্যেও পার্টস ছিল। এককালে চমৎকার গান-বাজনার শখ ছিল। কিন্তু সব গোলায় দিয়ে বসে আছে।

কেন, এখন আর গান-বাজনার শখ নেই বুঝি?

না, এখন কেবল এক নেশা হয়েছে—টাকা, টাকা আর টাকা! দিবারাত্রি কেবল ফন্দিফিকির আঁটছে কিসে টাকা আসবে!

আচ্ছা শুনছিলাম মেঁচীতে বিজনেসে নাকি বেশ টাকা উনি রোজগার করছিলেন, তবে চলে এলেন কেন হঠাতে?

বেশ টাকা রোজগার করছিল না ঘোড়ার ডিম! সেখানকার ব্যবসা নষ্ট করে এখন এখানে বসে সব লঙ্ঘণ করবে এই মতলব। মরুক গে। দুর্যোধন গেল। আমিও আর কটা দিনই বা! থাকলে ওর আর বহুলারই থাকত। বহুলাটা একটা হস্তীমূর্খ। এখন সুবিধেই হল, দুদিনে সব তচ্ছন্দ করে দেবে।

কিন্তু গতরাত্রে আপনি তো বলছিলেন রায়বাহাদুরের উইল আছে—

উইল! হ্যাঁ, উইল একটা আছে। আর আমি জানি সে উইলে একটা কপি করেও নষ্ট করার ক্ষমতা নেই এমন ভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সাত-সাতটা কোলিয়ারীর দেখাশোনা করবে কে? কাঁচা পয়সা কোলিয়ারীতে। ওরা কাকা-ভাইপের তো দেখবে সব। দিনের আলোয় পুকুরচার হলেই বা ঠেকাছে কে?

আচ্ছা উইলটা কি রেজিস্ট্রি করা আছে?

তা জানি না, সংবাদ রাখি না।

আচ্ছা কাকা সাহেব, রায়বাহাদুর যে নিহত হবেন গত রাতে রাত চারটের সময়, এই বন্ধমূল ধারণটা তাঁর কেন হয়েছিল বলতে পারেন কিছু? কোন কারণ ছিল কি?

কিরীটীর প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, কোন জবাবই দেন না।
তারপর শাস্ত কঠো বললেন না। বলতে পারিন না।

আর একটা কথা। গভীরাত্রে কে আপনাকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদটা দেয়?

প্রসাদই তো কেবল।

প্রসাদ।

হ্যাঁ।

কোন রাত সাড়ে তিনটে থেকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত
আপনি কোথায় ছিলেন?

রাত তিনটে নাগদ বাস্টী চলে যায়। তারপর পাশের ঘরে আমি শুতে যাই। কিন্তু
ঘুম আসছিল না বলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম।

প্রসাদ ঠিক কটায় আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছিল জানেন? মনে আছে আপনার?
রাত তখন প্রায় সাড়ে চারটে হবে বোধ হয়।

তখন কি আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন?

ঠিক ঘুম নয়, বোধ হয় একটু তপ্রামত এসেছিল, এমন সময় প্রসাদ এসে ডাকতেই—
ও-ঘর থেকে ফিরে এসে আপনি বোধ হয় আর শুতে যাননি?

না। মনটা এমন অস্তির লাগতে লাগল দুর্যোধনকে ঐভাবে নিহত হতে দেখে বে বাধা
হয়ে মুঘাকে এ-ঘরে তখুনি আবার ডেকে পাঠালাম? মুঘাও আবাক হয়ে গিয়েছিল।
ঘণ্টাখানেক আগে মাত্র তাকে রাত্রির মত বিদায় দিয়েছিলাম।

মুঘাবাঙ্গি তখনও জেগেই ছিলেন?

হ্যাঁ। ও এসে বললে, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ও নিজেও বিছানায় শুয়ে ছটফট
করছিল। আমার চাকর গিয়ে ডাকতেই উঠে এসেছিল।

হঠাৎ এমন সময় দেওয়াল ঘড়িটাং ঢং ঢং করে বেলা এগারটার সময়-সঙ্কেত শোনা
গোল। অনেক বেলা হয়ে গেল, আর আপনাকে বিরক্ত করব না কাকা সাহেবে।

কাকা সাহেবও যেন কিরীটীর কথায় চমকে ওঠেন। এবং অকস্মাৎ একটা প্রশ্ন করে
বসেন, আচ্ছা রায় মশাই, দুর্যোধনের মৃতদেহটা কি ওরা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে?
প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণের জন্য অবিনাশ চৌধুরী।

হ্যাঁ, ময়নাতদন্তের জন্য পুলিস মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছে।

সংকার হবে না?

ময়নাতদন্ত হয়ে গেলেই আপনারা সংকারের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিরীটী মৃদুকষ্ট
প্রত্যন্তের দেয়।

তার আয়োজন কিছু ওরা করেছে জানেন?

আমি এখুনি গিয়ে বৃহস্পতি ও দুঃশাসন চৌধুরীর কাছে সংবাদ নিচ্ছি।

দয়া করে ওদের বলে দেবেন, আমাকে যেন ওর মধ্যে কোর তা টানে। আর একটা
কথা বলে দেবেন, অস্তিটা যেন গঙ্গায় ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।

বলব।

দুঃখ যেমন দিয়েছে তেমনি নিজেও দুঃখ কর পায়নি। দিক অস্তিটা গঙ্গাতেই বিসর্জন
দিক। তবু যদি মরার পর গিয়ে শাস্তি পায়।

কথাগুলো বলে অবিনাশ চৌধুরী যেন হঠাৎ আবার কেমন অনামনক্ষ হয়ে যান। এবং
নিশ্চলে ঘরের মধ্যে আবার পায়চারি শুরু করেন।

তারপর আবার একসময় পায়চারি থামিয়ে অবিনাশ চৌধুরী বলেন, মৃত্যুর পরে এসব প্রেতলোকটোক অগ্রন্তি মানেন রায় মশাই?

হিন্দুর ছেলে ধৰ্মন্তরণ চিরস্তন সংস্কারকে একেবারে এড়াব কেমন করে বলুন! বিশ্বাস করেন তাহলে?

কিরীটি প্রস্তুতরে মৃদু হাসে।

এই সব লোকে বলে অত্পুর বাসনা বা কামনা নিয়ে মরলে বায়বীয় সন্তা সেই বাসনা বা কামনার জন্য এই পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে, বিশ্বাস করেন এসব কথা? কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে অতঃপর না তাকিয়ে পারে না। বিশেষ করে অবিনাশ চৌধুরীর কঠস্বর শুনে। অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে হঠাতে যেন ওর মনে হয় একটা অলিখিত ভয় ও শঙ্কা যেন সে মুখের রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন?

অবিনাশ চৌধুরী অতঃপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে প্রলম্বিত একখানি নিজেরই ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে যেন কি দেখতে লাগলেন। আর একটি কথাও কিরীটির সঙ্গে বললেন না।

কিরীটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু অবিনাশ চৌধুরী পূর্ববৎ পায়চারি করতে লাগলেন।

কিরীটি ঘর হতে বের হয়ে আসবার জন্য অতঃপর দুয়ারের দিকে পা বাঢ়ায়।

কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর ঘর থেকে বের হয়ে কি ভেবে আবার রায়বাহাদুর দুর্যোধনের ঘরের দিকে অগ্রসর হয় এবং চুকতেই হঠাতে রায়বাহাদুরের শূন্য খাটকার নিচে কি একটা বস্তু চিকচিক করছে তার নজরে পড়ে। কৌতুহলে এগিয়ে নিয়ে তুলে নেয় নিচু হয়ে বস্তুটি। একটা লাল সূতোয় বাঁধা সোনার লকেট। লকেটটা খুলতেই ভেতর থেকে প্রকাশ পেল অপরূপ সুন্দরী একটি তরুণীর মুখচ্ছবি। কে? কার ফটো?

॥ সত্ত্বে ॥

অবিনাশ পায়চারি করছেন আর মৃদুকষ্টে আবৃত্তি করে চলেছেন—

নির্মম নিয়তি। অস্তিম সময়ে

একি মহা বিশ্঵রণ! শুরুদো!

শুরুদেব!—ক্ষমা কর। ক্ষমা

কর প্রভু। অস্ত্র আবাহন মন্ত্র

দাও প্রভু ফিরাইয়া মোরে।

নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন গাঙ্গারী দেবী। কাকামণি!

কে? ফিরে তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ চৌধুরী।

আমি গাঙ্গারী।

আয় মা। দুর্যোধন—দুর্যোধনকে কি ওরা নিয়ে গেল?

হ্যাঁ। এই আধগন্টাটক আগে পুলিসের লোক এসে মৃতদেহ নিয়ে গেছে।

অভিশাপ—বুবলি মা, এ সুরমার অভিশাপ।

সতী নারী দেছে অভিশাপ।

তীব্র মিরাশায় কেটে যাবে দিন

সুষ্ঠু বান্ধব মাঝে রহিব একাকী—

আমার মনের ব্যথা কেহ বুঝিবে না,

কণ্টক হইবে শয়া—

কাঁদতে পারছি না মা—আমি কাঁদতে পারছি না। সুরমাই আমার সমস্ত চোখের জল
মচে নিয়ে গিয়েছে।

একটু থেমে অবিনাশ চৌধুরী আবার বলতে থাকেন, ঢার বছর আগে এই বাড়ি থেকে
যেদিন সুরমার মৃতদেহটা পালক্ষের ওপর থেকে নিয়ে ওরা বের হয়ে গেল, সেই
দিন—সেই দিনই এ-বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য বিদায় নিয়েছিল চিরদিনের মতই। একটা দিনের
জন্য তাকে শাস্তি দেয়নি ওই দুর্যোধন। টাকা—টাকাই কেবল চিনেছিল। কিন্তু পারলি নিয়ে
যেতে সঙ্গে সেই টাকা? একটা পয়সা নিয়ে যেতে পারলি? এত চিকিৎসা, এত আয়োজন
সবই মিথ্যে হয়ে গেল তো?

আপন মনেই এবং আপন খেয়ালেই যেন অবিনাশ কথাগুলো বলে যান। গান্ধারী
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনতে থাকে।

মেজাজী ও অত্যন্ত খেয়ালী প্রকৃতির খুল্লতাতকে গান্ধারী দেবী বেশ ভাল করেই
চেনেন। নিজের চলার পথে আজ পর্যন্ত এটুকু বাধাও অবিনাশ কখনও সহ্য করেননি।
কারও উপদেশ বা পরামর্শকে কোনদিন গ্রহণ করেননি। নিজের বিচারবুদ্ধিতে চিরদিন যা
ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। তাঁর কথার মধ্যে কোনরূপ মস্তব্য প্রকাশ করলে বা কথা
বললে মুহূর্তে যে তিনি বারুদের মত জলে উঠবেন গান্ধারী দেবী তা ভাল করেই জানেন।
তাই বোধ হয় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন গান্ধারী দেবী।

কথাগুলো বলে অবিনাশ আবার আপন মনেই ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন
নিঃশব্দে। তারপর হঠাতে একসময় যেন অদ্বৰ্দ্ধে নিঃশব্দে দণ্ডয়মান গান্ধারী দেবীর প্রতি
দৃষ্টিপাত করে বলে ওঠেন, গান্ধারী, তুই আবার এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?
কি চাস?

একট কথা বলতে এসেছিলাম কাকামণি!

কি বলবি বলে ফেল! হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?

আশ্চর্য, এ যেন সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ।

একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে কাকামণি—

কি—কি হয়েছে?

বলছিলাম, শকুনি পালিয়েছে—

শকুনি পালিয়েছে! সে কি? হঠাতে সে হতভাগাটা আবার পালাতে গেল কেন? কিন্তু
তুই—তুই সে কথা জানলি কি করে?

এই কিছুক্ষণ আগে কৈরালা এসে প্রসাদকে বলেছে কথাটা। প্রসাদ আমাকে বলে
গেল। বৃহমলার টু-সিটার গাড়িটা নিয়ে সে পালিয়েছে।

ইডিয়েট! গর্ডন!

কিন্তু তার পাশাপাশি ছাড়া আর উপায়ই যা ছিল কি?

মাথামুণ্ডু কি বলছিল তুই!

উভরে গান্ধারী দেবী কিষ্টিক্ষণ নিঃশব্দে চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকেন।

অবিনাশ খিচিয়ে ঘুমেন, জবাব দিছিস না কেন? বল না, হঠাৎ সে গর্ভটা পালাতেই
বা গেল কেন?

কাল বাত্রে—গান্ধারী ইতস্তত করতে থাকেন।

কিষ্টিক্ষণ বাত্রে কি? উত্তেজিত ব্যাকুল কঠে প্রশ্ন করেন অবিনাশ।

কাল বাত্রে তখন বোধ করি রাত পৌনে চারটে হবে, ওর পাশের ঘরের লাগোয়াই
আমার শোবার ঘর, একটা ছপ্পচ্প জলে কাপড় কাচার শব্দ শুনে সন্দেহ হওয়ায়
আমার ঘরের লাগোয়া যে পেছনের বারান্দা আছে সেই বারান্দা দিয়ে ওর ঘরে বক্ষ
জানলার কপাটের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি—

কি—কি দেখেছিস তুই?

ঘরের কুঁজো থেকে জল ঢেলে ঢেলে তাড়াতাড়ি করে শেকে একটা কাপড় ধূচে।
আর মাঝে মাঝে আলোর সামনে তুলে ধরে কাপড়টা দেখছে। সে সময় আমি দেখেছি—

কি—কি দেখেছিস?

দেখলাম কাপড়ের সেই অংশে ছোপ ছোপ রঙের লাল দাগ। আজও সে কাপড়টা
ঘরের কোণেতেই পড়ে ছিল। সকালে কিরীটিবাবু ওর সঙ্গে কথা বলে চলে আসবার পর
কাপড়টা পরীক্ষা করে দেখেছি, ধূলেও তাতে অস্পষ্ট রঙের দাগ লেগে রয়েছে এখনও।

রক্ত! কিসের রক্ত? রক্ত আবার কোথা থেকে এল তার কাপড়ে?

আমি ভেবেছিলাম প্রথমে ছোড়দাই বোধ হয়—

গান্ধারী! চাপা কঠে একটা যেন গর্জন করে ওঠেন অবিনাশ রোষকষায়িত লোচনে
গান্ধারীর দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ কাকামণি, আমি ভেবেছিলাম ছোড়দাই হয়ত—তুমি তো জান না, দিন কুড়ি-পঁচিশ
আগে একদিন বেলা তখন দুটো কি আড়াইটে হবে, দাদা সেই সময়টা দু-চার দিন সুইহ
ছিলেন—নাস সব সময় বড় একটা কাছে থাকত না, ডাক্তার সানিয়ালও ঐদিন দুপুরে
ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি নিয়ে শহরে গিয়েছিলেন, ওদিকটা একরকম খালিই ছিল, দাদা একটু
আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। দরজা দিয়ে
ভেতরে চুক্তে থমকে দাঁড়ালাম।

অবিনাশের চেখের তারা দুটো তৌক্ষ অনুসন্ধিৎসায় ছুরির ধারাল ফলার ন্যায় চকচক
করতে থাকে। মুখের শিরা-উপশিরাগুলি যেন সজাগ হয়ে ওঠে। চাপা উত্তেজিত কঠে প্রশ্ন
করেন অবিনাশ, কেন? দাঁড়ালি কেন?

ছোড়দার গলা শুনে।

ছোড়দা—মানে দুশ্শাসন?

হ্যাঁ। তাই মনে হয়েছিল।

ঠিক মনে আছে তোর দুঃশাসনের গলাই শুনেছিলি?

হ্যাঁ, তেমনি কর্কশ ভাঙা-ভাঙা। চাপা উত্তেজিত কঠে কথা বলছিল। ছোড়দাই দাদার
সঙ্গে কথা বলছিল।

কি—কি দলছিল সে? উত্তেজনায় অবিনাশের কঠের স্বর যেন বুজে আসে।

বলছিল, বিশ্বাস কর তুমি, ও চিঠি তোমাকে আমি দিইনি। দাদা জবাব দিলেন,

হতভাগা, তুই ভাবিস ক্ষেত্র হাতের লেখা আমি চিনি না? কিন্তু আমি এতটুকুও কেয়ার করি না। কিরীটী রায়কে আনাব। যেই চিঠি লিখে থাকুক, সব জারিজুরি সে ভেঙে দেবে।

তারপর!

ছোড়া তার জবাবে বললে, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি বলছি আমি বিন্দু বিমলগু জানি না। তবে এও তোমাকে বলছি, তুমি তোমার উইল যদি না বদলাও তোমার ক্ষমালে সত্যসত্যই অপঘাতে মৃত্যু আছে।

শয়তান! বলছিল শয়তানটা ও কথা?

হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে বোধ হয় সেটা ছোড়ার গলা নয়—
তবে?

বোধ হয়—এখন মনে হচ্ছে সেটা শেকোর গলা।

শুকুনির গলা!

হ্যাঁ। আমি আর দাদার সঙ্গে দেখা করতে সাহস পেলাম না। কারণ পরমহৃতেই দাদা যেন মনে হল অত্যন্ত চটে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এলাম। তারই আধঘণ্টাটক পরে আবার যখন দাদার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি দেখি মুখ লাল করে শেকো দাদার ঘর থেকে বের হয়ে আসছে। এবং আমার পাশ দিয়েই গজর গজর করতে করতে চলে গেল।

হ্যাঁ। কিরীটীবাবু এসব কথা জানেন, না জানেন না?

না বলিন। কিন্তু শেকো পালিয়েই তো সর্বনাশ করল। পুলিসের লোকেরা বিশেষ করে মিঃ রায় ওকেই এখন দাদার হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করবেন হয়তো—

ননসেন্স! সন্দেহ করলে হল? চুপচুপ থাক, কোন কথা কাউকে বলব না খবরদার।

সহসা এমন সময় যেন ঘরের মধ্যে ব্রজ্জপাত হল।

ভেজানো দুয়ার ঠেলে কিরীটী ঘরের মধ্যে পা দিল, ক্ষমা করবেন চৌধুরী মশাই, ক্ষমা করবেন গান্ধারী দেবী। গান্ধারী দেবী, আপনাকে এ-ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই দূর থেকে বাধ্য হয়েই আমাকে interrupt করতে হল আপনাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তার মধ্যে। আমি আপনাকে অনুসরণ না করে পারিনি। দরজায় কান পেতে আপনাদের সব কথাও আমি এতক্ষণ শুনেছি।

সহসা যেন কিরীটির কথায় বাকুন-স্তুপে অগ্নিশূলিঙ্গ পড়ে। চিৎকার করে উঠলেন অবিনাশ চৌধুরী, বেশ করেছেন শুনেছেন! বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে এই মুহূর্ত। হামবাগ—

বৃথা আপনি উন্নেজিত হচ্ছেন চৌধুরী মশাই। অবশ্যস্তাবাকে কেউ রোধ করতে পারে না।

গান্ধারী দেবী যেন পায়াগে পরিগত হয়েছেন। নিশ্চল হানুর ন্যায়দাঙ্গিয়ে থাকেন নিঃশব্দে।

কিরীটী বলতে থাকে, যে কাজে আমি হাত দিয়েছি সে কাজ আমি শেষ করে যাবাই—

রায় মশাই! কিরীটীর কথা শেষ হল না, তৌক্ষ অনুভূ পঞ্চে অবিনাশ চৌধুরী যেন একটা চিৎকার করে ওঠেন।

চৌধুরী মশাই, যাচ্ছি আমি চলে; তবে একটা কথা কেবল যাবার আগে বলে যাই। আড়ি পেতে শুকিয়ে আপনাদের ঘরোয়া কথা শোনবার মধ্যে আমার দিক থেকে অসৌজন্য

হয়তো কিছুটা প্রকাশ পেতে থাকবে, কিন্তু ন্যায়ত ও ধর্মত যে স্বর্গত আত্মার কাছে আমি সত্যবদ্ধ—দারী, প্রেরণা না পালন করে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আমার উপায় নেই। তাই আশা করি ক্ষেত্রে পৈচার করে আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।

অভ্যন্তর ও শাস্তি ভাবে কথাওলি বলে অতৎপর কিরীটী সত্ত্ব সত্যিই ঘর থেকে বেতে ছায় গেল এবং যাবার মুখে হাত দিয়ে ঘরের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল পেছন থেকে।

আর ঘরের মধ্যে নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইলেন অবিনাশ চৌধুরী ও গান্ধারী দেবী। দুজনেই নির্বাক, কারও মুখে কথা নেই।

কিরীটী সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকে দরজাটা ভেঙ্গিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে সোনার লকেটটা বের করল।

কার প্রতিকৃতি লকেটের অভ্যন্তরে সবত্ত্বে বক্ষিত? কে ঐ নারী? এ বাড়ির কোন মুখের সঙ্গেই তো মিল নেই। আর রায়বাহাদুরের ঘরের খাটের তলায়ই বা এটা এল কি করে? লকেটটার সঙ্গে বাঁধা লাল সুতোটা পুরনো হয়ে গিয়েছিল, তাই বোধহয় ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে লকেটটার মালিকের অঙ্গাতে। কিন্তু কার হাতে বাঁধা ছিল লকেটটা?

রায়বাহাদুরের কি? সন্তুষ নয়, কারণ তাঁর হাতে বাঁধা থাকেল তিনি লকেটটা পড়ে গেলে নিশ্চয়ই জানতে পারতেন।

তবে কে?

দুঃশাসন-বৃহমলা-ডাঃ সমর সেন-সুন্তাতা কর-ডাঃ সানিয়াল-অবিনাশ চৌধুরী, কে—কার হাতে ছিল?

১১ নং পয়েন্ট : মৃত রায়বাহাদুরের ঘরে লাল সুতো বাঁধা সোনার লকেটে সুন্দরী তরণীর প্রতিকৃতি।

টাকা : কোন ব্যর্থ প্রেমিকের গোপন প্রেমের নিদর্শন নয় তো ঐ লকেট!

॥ আঠার ॥

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিভিল সার্জেনের কাছে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, অতএব সে কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে সৎকারের কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না। তথাপি আজ হোক বা কাল হোক সৎকার তো করতেই হবে। দুঃশাসন ও বৃহমলা সেক্রেটারি প্রাণতোষবাবু ও তহশীলদার কুণ্ডলেশ্বর শর্মার সঙ্গে নিচের মহালে বাইরের ঘরে তারই ব্যবস্থার জন্য নিম্নস্বরে আলাপ-আলোচনা করছিলেন পরম্পরের মধ্যে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাধারণত গৃহস্থদের যে স্বাভাবিক কানাকাটি ও শোকপ্রকাশ কয়েকটা দিন ধরে চলে অব্যাহত গতিতে তার কিছুই যেন নেই এক্ষেত্রে।

কে জানে, স্বাভাবিক মৃত্যু না হয়ে হত্যা বলেই হয়ত এই স্তুতি। গত বার্ষিক প্রাপারটা জানাজানি হবার পর হতে কেউ হয়ত একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি কাহু। তো দুরের কথা। অথচ স্বাভাবিক ভাবে সকলেরই হয়ত শোক করা কর্তব্য ছিল।

শোক নেই তবু যেন বাড়ির মধ্যে সর্বত্র একটা শাসরোধৰ্মী বিষয়তা থমথম করে। সবাই যেন কেমন ভীতসন্ত্রস্ত।

সকলেই যেন কান পেতে আছে একটা কিছু শৌন্ধৰ্মী জন্যে, অবশ্যান্তৰ্বী একটি পরিণতির আশঙ্কায় প্রত্যেকেই যেন শক্তি, ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুনছে।

নিহত হবার আগে গ্রেগরিয়ায় শুয়ে অসুস্থ রায়বাহাদুর গত কয়েকদিন ধরে বলতে গেলে দিবারাত্রি যে দুঃস্মের দেখছিলেন জাগ্রত ও নিন্দিত সকল অবস্থাতেই, সেই দুঃস্মেরই অশরীরী পেটটা যেন এখন এ বাড়ির প্রত্যেকের মনের উপর চেপে বসছে। যেন সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কিরীটীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেলা দুটো ঘোষণা করে।

কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ডাঃ সানিয়ালের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। একটু আগে সে দালাল সাহেবের প্রেরিত অনুচরের মুখে সংবাদ পেয়েছে পলাতক শুকুনি ঘোষ শেষ পর্যন্ত পুলিসের চোখ এড়িয়ে বেশীদূর পালাবার আগেই ধরা পড়েছে ও তাকে থানার নিয়ে গিয়েছে।

ধরেছেন তাকে অবশ্য দালাল সাহেব নিজেই। কিছুদূরে একটা কোলিয়া বীতে জরুরী একটা তদন্তে নিজের গাড়িতে করে দালাল সাহেব যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মধ্যে একেবারে দুখানা গাড়ি দুইটি হতে মুখোমুখি হওয়ায় শুকুনি ঘোষের অবস্থা। সঙ্গীন হয়ে ওঠে এবং একপ্রকার বাধ্য হয়েই দালাল সাহেবের পূর্ব নির্দেশকে আমান্য করে স্থানত্যাগ করবার অপরাধে ধৃত হয়ে সরাসরি একেবারে সশন্ত্র প্রহরীর হেপাজতে হাজতে প্রেরিত হয়েছে। সংবাদটা অবশ্য একমাত্র কিরীটী ও ডাঃ সানিয়াল ব্যতীত এ দ্বিতীয় একটি প্রাণীও জানে না বা কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি।

কিছুক্ষণ পূর্বে কিরীটী ও ডাঃ সানিয়ালের মধ্যে শুকুনি ঘোষ সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল। —তবে কি শুকুনিবাবুই অপরাধী মিঃ রায়? প্রশ্ন করেন ডাঃ সানিয়াল।

মনে ঘনেও অস্তুত তিনি কিছুটা অপরাধী বৈকি। নচেৎ ওভাবে হঠাতে তিনি পালাবার চেষ্টাই বা করবেন কেন? কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়।

আপনার কি সত্যিই মনে হয় স্পষ্ট করে বলুন মিঃ রায়। আপনার ধারণা কি তাহলে শুকুনি ঘোষই কাল রাত্রে—কথাটা বলে ব্যগ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ডাঃ সানিয়াল কিরীটীর মুখের দিকে।

প্রশ্নটা আপনার বজ্জ্বল direct ডাক্তার, একেত্রে অবিশ্য সত্যিকারের সংবাদটা গোপন করে যাওয়াটাও একটা মন্তব্য অপরাধ। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে, নিজের হাতে হত্যা না করলেও উনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হত্যাকারীকে সাহায্য করেছেন। বিচারের দৃষ্টিতে ও আইনে murder ও abetment of murder—দুটো charge কি একই পর্যায়ে পড়ে না?

তবে কি—

ক্ষমা করবেন, অত স্পষ্ট করে কিছুই আমি বলতে চাই না ডাক্তার, তবে শুকুনি ঘোষ যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন একথাও আমি বলব, তাছাড়া এটা হ্যাত উপর জান ছিল না, বাঘে একবার কামড়ালে আঠারো জায়গায় ঘা হয়। ও বড় মানুষক ছাঁয়া। বলতে হঠাতে প্রসঙ্গাত্মকে উপস্থিত হয়ে কিরীটী ডাক্তারের চোখ রেখ বলে, কিন্তু আপনাকেও যে আমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞাস্য ছিল ডাক্তার!

আমাকে?

হ্যাঁ।

কি বলুন তো?

অবশ্য কথাটা সম্পূর্ণই আমার ও আপনার মধ্যেই আবক্ষ থাকবে, কোন তৃতীয় ব্যক্তি
জানতে পারবে না।

বলুন না কি জিম্মেচান মিঃ রায়।

কথাটা সুলভ কর সম্পর্কে।

সুলভ!

কথাটা কলাৰ সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ সানিয়ালেৱ মুখখানা যেন রক্তিম হয়ে ওঠে। আপনা
হতেই দুটোখেৰ দৃষ্টি নত হয়ে আসে ডাক্তারেৱ।

কিৱীটী মনে মনে না হেসে পারে না। এবং কৌতুকেৱ লোভটাও সম্ভৱণ কৰতে পারে
না।

শ্বিত কঠে বলে, ডাক্তার, মনেৱ খৌজ নিয়ে মন দিয়েছিলেন তো?

লাজৱক্ষিম মুখটা তুলে ডাক্তার বলেন, যাঃ, কি যে বলেন মিঃ রায়! Simply I
liked that girl, বেশ মেয়েটো!

সে বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ, তবু বলব মনটা দেবাৰ আগে বোধহয় একটু যাচাই
কৰে নিলে পারতেন।

ডাঃ সানিয়াল যেন চমকে ওঠেন কিৱীটীৰ শেষেৰ কথায়।

তাই-ই ডাক্তার, কাৰণ মহাভাৱতেৱ উপাখ্যানেৰ সঙ্গে এখানে সামান্য একটু
উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছে। মাতুল না হয়ে এখানে হয়েছেন ভাগিনীয়। দুর্যোধন মাতুল,
ভাগিনীয় শুকুনি।

বিশ্বিত দৃষ্টিতে ডাক্তার কিৱীটীৰ মুখেৰ দিকে তাকায়।

শুকুনি!

হ্যাঁ। সংবাদটা কিন্তু আপনার রাখা উচিত ছিল।

শুকুনি?

তাই। আশচৰ্য, এই সহজ ব্যাপারটা আপনার চোখে পড়েনি! সুলতা দেবীৰ প্রতি
শুকুনিৰ চাউনিটাই তো ইতিপূৰ্বে আমাৰ কাছে সংবাদটা ব্যক্ত কৰেছিল ডাক্তার!

কিন্তু সুলতা—

তা অবশ্য আমাৰ চাইতে আপনারই বেশী জানবাৰ কথা। কিন্তু রাত্ৰে কফি দিতে গিয়ে
যে এদিকে আপনি একটা প্ৰচণ্ড জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰে ফেলেছেন!

জটিলতা!

হ্যাঁ। প্ৰতি রাত্ৰেই তাকে আপনি কফি দিয়ে আসতেন ইদানীং, তাই তো?

ডাক্তার সানিয়াল লজ্জায় আবাৰ দৃষ্টি নত কৰলেন।

সুলতা দেবী বলেছেন, গতৱাত্ৰেও নাকি আপনিই তাকে কফি দিয়ে এসেছেন অথচ
তাৰ জানা নেই যে আমাৰ আপনার ঘৰে ঠিক গতৱাত্ৰে ঐ সময়তাৰ উপস্থিত
থাকায়—লজ্জা এসে আপনাকে আপনার চৱণ ধৰে বাধা দিয়েছিল।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! আমি তো কাল—

জানি। আপনি তাকে কফি দেননি—অস্তত গতকাল বাত্ৰে। অথচ মজা কি জানেন,
আপনি না দিলেও লোকে জেনেছে আপনিই দিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, যাকে দিয়েছেন
তাৰও সুনিশ্চিত ধাৰণা তাই।

সে কি!

হ্যাঁ। একেই বলে শয়তানীর চাতুরী....

কিন্তু কিরীটীর কস্তব্য শেষ হল না, বাইরে থেকে বদ্ধ দরজার কপাটের গায়ে অত্যন্ত মৃদু একটা করাঘাত শোনা গেল।

নিশ্চয়ই রুচিরা দেবী! আপনি একটু অনুগ্রহ করে বাইরে যান ডাক্তার ওপাশের ছুটুজাটা দিয়ে, ওর সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে।

নিশ্চয়ই। ডাঃ সানিয়াল আর কোনরূপ মস্তব্য না ব্যবেষ্ট কিরীটীর নির্দেশমত ঘরের কিটোয় দ্বার পথে বের হয়ে গেলেন।

এবং পরক্ষণেই দরজার গায়ে আবার মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

আসুন রুচিরা দেবী। কিরীটী মৃদু কঠে আহান জানায়।

রুচিরাই।

রুচিরা দ্বার ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিরীটী মৃদু শাস্ত কঠে বলে রুচিরাকে, আসুন। বসুন ঐ চেরারটায় রুচিরা দেবী।

রুচিরা নিঃশব্দে কিরীটী-নির্দিষ্ট চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারেকের জন্য কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে একেবারে কিরীটীর মুখোমুখি বসল।

খোলা জানালাপথে শীতের পড়স্ত রৌদ্রালোক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে। দিনশেষের শেষ লিপি যেন।

কিরীটী রুচিরার দিকে চেয়ে থাকে নিঃশব্দে

রুচিরার পরিধানে একটা গেরুয়া রঙের দামী মিলের শাড়ি। গায়ে একটা ফিকে আকাশ-নীল রঙের দামী কাশ্মীরী শাল জড়ানো। মাথায় তৈলহীন রুক্ষ চুল এলো খোপা করে বাঁধা অবস্থায় কাঁধের একপাশে স্তুপাকার হয়ে আছে। সত্তিই অপূর্ব সুন্দরী রুচিরা।

কিরীটী তৌক্ষ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে রুচিরাকে দেখছিল। গতরাত্রে প্রথম দৃষ্টিতে যাকে বোল-সতের বছরের যুবতী বলে মনে হয়েছিল, সুস্পষ্ট দিনের আলোয় তাকে পুনর্বার ভাল করে দেখতেই যেন তার সে ভুল ভেঙে যায়। মুখখনি অতীব কমনীয় ও ঢলচলে হলেও রুচিরার বয়স তেক্ষণ-চৰিশের কম নয়, বরং দু-এক বছর বেশীও হতে পারে।

অতঃপর কিছুক্ষণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে অতিবাহিত হবার পর কিরীটী প্রশ্ন করে সর্বপ্রথমে আপনি তো কলকাতায় বেথুনে পড়েন রুচিরা দেবী?

হ্যাঁ, আমার ফোর্থ ইয়ার।

যদি কিছু মনে না করেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনার বর্তমানে বয়স কত হল?

বোধ হয় চৰিশ। মৃদু অনাস্ত কঠে রুচিরা জবাব দেয়।

আপনার পদবী?

মিত্র।

আবার কিছুক্ষণ স্মৃতি। কিরীটী মনে মনে নিজেকে বোধ করি উচ্চয়ে নেবার চেষ্টা করে—কি ভাবে তার আসল বজ্রব্যাটা এবারে সে শুরু করলে? কিন্তু তার আগে সুযোগ রুচিরাই করে দেয়। সে-ই এবারে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আমাকে আপনি ডেকেছিলেন কেন মিঃ রায়?

ও হ্যাঁ, বিশেষ ত্যেন কিছুই নয় রুচিরা দেবী। গত রাত্রের সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু তার আগে আপনার—

কিছি কিরীটির মুখের দিকে তাকায়।

মন্দু হেসে কিরীটি বলে, আপনার মাকে বুঝি জানাননি যে ডাঃ সেনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

কেন বলুন তো!

কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম এইজন্য যে, মিথ্যে তাহলে আর হয়ত আপনাকে অন্যত্র উনি বিবাহের জন্য পৌত্রপীড়ি করতেন না।

আমার মাকে আপনি জানেন না মিঃ রায়, কোন একটা ব্যাপারে মা একপ্রকার সিদ্ধান্ত দিলে তাঁকে সে সিদ্ধান্ত থেকে টলানো দুঃসাধ্য।

কিন্তু তাতে করে জটিলতা কি আরও বাড়ে না? যাক সে কথা, কিন্তু সমীরবাবুকে অন্তত সে কথাটা জানিয়ে দিলেও হয়ত—

সেরকম বুবলে জানতেই হবে।

আমি বলব?

প্রয়োজন নেই। যা করবার আমিই করব।

বেশ। এবার তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক।

কিন্তু যা আমি জানতাম সবই তো দালাল সাহেবকে কাল রাত্রেই বলেছি!

বলেছেন সত্যি, তবে আরও আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বিশ্বিত সপ্তশ দৃষ্টিতে তাকাল রঞ্চিরা কিরীটির মুখের দিকে।

দেখুন মিস মিত্র, যে প্রশংগলো আপনাকে আমি করব, জানবেন তার জবাবের ওপর আপনার বড়মামা রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করছে।

কি প্রশ্ন?

প্রশংগলো অবশ্য কিছুটা গত রাত্রেই পুনরুক্তি বলতে পারেন। তবু বলছি এজন্য যে কিছু কিছু ব্যাপার আরও স্পষ্ট করে আমি জানতে চাই।

কি জানতে চান বলুন?

গত রাত্রে আপনার মামার নিহত হবার কথাটা জানবার আগে আপনি কোথায় ছিলেন ও কি অবস্থায় ছিলেন? অর্থাৎ ঠিক ঐ সময়টাতে—সোয়া তিনটে থেকে পৌনে চারটে পর্যন্ত আপনি জেগে ছিলেন, না ঘুমিয়ে ছিলেন?

মুহূর্তকাল কিরীটির মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত মন্দু কঢ়ে রঞ্চিরা জবাব দেয়, আমি আমার ঘরে তখনও জেগেই ছিলাম। ঘুম আসছিল না বলে শুয়ে শুয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিলাম।

কিরীটির মনে হয় রঞ্চিরা যেন শেষের দিকে একটু ইতস্তত করে কথাটা শেষ করব।

হ্যাঁ, কাল তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিলেন যে আপনি ঐ সময় ঘুমোছিলেন। যাক গে, কাল রাত্রের মতই এমনি রাত জেগে উপন্যাস পড়াটাই কি আপনার অভ্যন্তর?

না তবে ঘুম না আসা পর্যন্ত পড়ি।

পাশের ঘরে আপনার মা ঘুমিয়ে ছিলেন?

হ্যাঁ।

কিরীটি শ্বশকাল আবার চুপ করে থাকে। অতঃপর বলে, কেউ আপনার ঘরে ঐ সময় আর ছিল না?

রঞ্চিরা মুহূর্তকাল যেন আবার একটু ইতস্তত করে, তারপর বললে, না।

জবাবটা মদু। হঠাৎ কিরীটী বলে ওঠে, শুনুন রুচিরা দেবী, সকালবেলা তখন নটা-দশটার সময়ই হবে, আপনি যখন আপনার ঘরে ছিলেন না, সেই সময় আপনার ঘরের মধ্যে আপনার বিনান্মতিতেই আমাকে একবার বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল—

আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন! বিশ্বিত দৃষ্টিতে তাকায় রুচিরা কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ শুধু আপনার ঘরেই নয়—আপনাদের প্রত্যেককেই না জানিয়ে প্রত্যেকের ঘরেই আমাকে যেতে হয়েছিল। অবশ্য ক্ষমা চাইছি সেজন্য। এবং জানেন না আপনারা কেউ যে, প্রত্যেকের ঘরেই আমি কিছু-না-কিছু সূত্রের সন্ধান পেয়েছি।

সূত্রের সন্ধান!

হ্যাঁ।

আমার ঘরে? রুচিরা হঠাৎ যেন প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ, আপনার ঘরেও। বলতে বলতে কিরীটী পকেটের মধ্যে সহসা হাত ঢুকিয়ে কয়েকটি দঞ্চাবশেষ সিগারেটের অংশ বের করে প্রসারিত হাতের পাতার উপর রেখে হাতটা রুচিরা দেবীর চোখের সামনে এগিয়ে ধরল এবং মৃদুকঠে বললে, এই বিশেষ সিগারেটের দঞ্চাবশেষগুলো আপনার ঘরের ঘেরেতে কুড়িয়ে পেয়েছি মিস মিত্র। Special Turkish brand সিগারেট! নিশ্চয়ই আপনার ধূমপানের অভ্যাস নেই?

স্তুপ্তি নির্বাক, অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রুচিরা কিরীটীর প্রসারিত হাতের উপর রক্ষিত সিগারেটের অংশগুলির দিকে চেয়ে থাকে।

সামান্য শব্দও তার কষ্ট থেকে নির্গত হয় না।

আরও বলছি শুনুন, খোঁজ নিয়ে জেনেছি গতরাত্রে এ বাড়িতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সমীরবাবুই brand-এর সিগারেটে অভ্যন্ত এবং একটু বেশী মাত্রাতেই ধূমপান করে থাকেন তিনি।

নিষ্করণ ও কঠোর কিরীটীর অস্তুত শাস্ত কষ্টস্বর।

অব্যর্থ তীক্ষ্ণ শর সে যেন নিষ্কেপ করেছে।

শরাহত পক্ষগীর দৃষ্টি রুচিরার দুই চোখের তারায় ঘনিয়ে ওঠে। একটা বোবা যন্ত্রণা যেন তার চোখমুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রুচিরা দেবী! আবার কিরীটীর কষ্টস্বর শোনা গেল, এবারে বলবেন কি, অত রাহে সমীরবাবু কেন আপনার ঘরে গিয়েছিলেন? এবং কথনই বা গিয়েছিলেন, আর কতক্ষণই বা সেখানে মানে আপনার ঘরে ছিলেন?

তথাপি নির্বাক রুচিরা।

জবাব দিন রুচিরা দেবী! রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারে একবার যাই আপনি তালিকার মধ্যে এসে যান, আপনারও অবস্থা ঠিক আপনার মাসতৃত্বে ভাই শকুনির মতই হবে—হাজত—

একটা অস্ফুট আর্ত শব্দ কেবল রুচিরার কষ্ট হতে নির্গত হল। কিন্তু কোন কথাই সে বলতে পারল না।

কিরীটী আবার বলে, শুনুন, যিথে আপনি নিজেকে গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছেন। হত্যার ব্যাপারে সম্পোর্ত—এ ঠিক মাকড়সার বিষাক্ত রস-গরল। গরল গায়ে শাগলেই যা দেখা দেবে। Come out with it! বলুন—

বিশ্বাস করুন মি: রাম প্রাতিই আমি মামার হত্যার ব্যাপারের কিছুই জানি না।
অত্যষ্ট দ্রুত কথাধূলি বলে ঝচিচা যেন হাঁপাতে থাকে।

সে কথা তো আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিনি। আমি জিজ্ঞাসা করছি কাল রাত্রে
কখন সমীরবাবু আপনার ঘরে গিয়েছিলেন এবং কতক্ষণই বা ছিলেন? কেনই বা
গিয়েছিলেন এবং তিনি স্ব-ইচ্ছায়ই গিয়েছিলেন, না আপনিই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?
বলুন জ্বাল দিন!

জ্বাল—আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

আপনি?

হ্যাঁ।

কখন গিয়েছিলেন তিনি?

রাত তিনটে বাজার বোধ হয় কয়েক মিনিট পরেই। বই বন্ধ করে আমি শুতে যাব,
ঠিক এমনি সময় তিনি আমার ঘরে এসে ঢোকেন।

অত রাতে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

না, সন্ধ্যার সময় ডেকেছিলাম—এসেছিলেন এই সময়।

হ্যাঁ, তাহলে রায়বাহাদুরের ঘর থেকে বের হয়ে সোজা তিনি আপনার ঘরেই এসে
চুকেছিলেন! কতক্ষণ ছিলেন?

বোধ করি আধগঠটাক হবে।

আধ ঘণ্টা, না ঘণ্টাখানেক?

তা ঘণ্টাখানেকও হতে পারে।

হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক যদি হয় তাহলে রাত তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত আপনারা দুজনে
আপনার ঘরেই ছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

সমরের কথাটা বলতেই।

বলেছেন তাঁকে?

না।

কেন?

সুযোগ পাইনি।

কেন?

কেবলই তিনি অন্য কথা বলতে লাগলেন!

এবাবের কিরীটির দ্বিতীয় শর নিষ্কিপ্ত হল ঝচিচার প্রতি, দ্বিতীয় প্রশ্ন।

এবাবের বলুন রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদটা আপনাদের কে দিয়েছিল?

সে তো কালই বলেছি, ছোটমামা!

দৃঢ়শাসনবাবু?

হ্যাঁ।

দৃঢ়শাসনবাবু যখন আপনাকে ঘৰটা দেন, সে সময় সমারবাবুও সেখানে উপস্থিত
ছিলেন কি?

কিরীটির প্রশ্নে ঝচিচা কেমন যেন একটু ইতস্তত করতে থাকে।

বলুন ?

না, মামার পায়ের শুভ্র শুনে ঘরে কেউ আসছে টের পেয়ে চট করে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল সমীর।

ইঁ। দুঃশাসনমূলু আপনাকে কি বলেছিলেন ?

বলেছিলেন, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—দাদাকে ছোরা দিয়ে কে যেন হত্যা করেছে, শীঘ্ৰগতি আয়—বলেই তিনি ঘর থেকে চলে যান।

তারপর ?

কিন্তু সংবাদটা এত আকস্মিক যে কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম ! তারপর ?

তারপর মাকে গিয়ে সংবাদ দিই।

আপনার মা ঐ সময় জেগে ছিলেন, না ঘুমিয়ে ছিলেন ?

ঘুমিয়েই ছিলেন বিছানায়।

আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন, আপনার মা কি গরম জামা গায়ে দিয়েই রাত্রে বিছানায় ঘুমোন ?

না, কেন বলুন তো ?

না, তাই বলছিলাম। আপনি হয়ত জানেন না বা লক্ষ্য করবারও সময় পাননি রুচিরা দেবী, গতরাত্রে আপনি যখন আপনার মাকে দুঃসংবাদটা দিতে যান তিনি তখন জেগেই ছিলেন। অর্থাৎ ঘুমের ভান করে শ্যায় শুয়েছিলেন মাত্র। তবে এখন বুঝছি আপনার কথাই সত্যি !

রুচিরা কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গতরাত্রে সে যখন তার মাকে ডাকতে যায়, মা তাহলে জেগেই ছিলেন ? বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে থেকেও ঘুমের ভান করে ছিলেন ? কিন্তু কেন ? তবে কি—রুচিরার চিঞ্চাওতে বাধা পড়ল কিরীটীর প্রশ্নে !

এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, গতরাত্রে আপনার ও সমীরবাবুর মধ্যে যে আলোচনাই হয়ে থাক—সমস্ত কিছুই তিনি পাশের ঘরে জেগে থাকার দরুন শুনতে পেয়েছেন !

কিন্তু কেন—মা তা করতেই বা যাবেন কেন ?

কিরীটী এবারে হেসে ফেলে, তারপর শিতকষ্টে বলে, তা কেমন করে বলি বলুন ! আপনাদের সাংসারিক ব্যাপার তো আমার জানা সম্ভব নয় !

But I hate—I simply hate this sort of spying ! এ ধরনের কারও কথা আড়ি পেতে শোনা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। অত্যন্ত বিরক্তিমুক্তি রূক্ষকষ্টে প্রত্যাত্তর দিল রুচিরা।

কিরীটী তার অনুমানকে যাচাই করবার এমন সুবর্ণ সুযোগটি হেলাই যেতে দিল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, হয়ত তাঁর ইচ্ছা আপনি সমীরবাবুকেই বিদাই করেন, তাই !

রুচিরার গোপন ব্যথার স্থানে অতর্কিতেই আঘাত করে কিরীটী। মুহূর্তে রুচিরার সমগ্র চোখমুখ রাগে ও উত্তেজনায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করে।

তিন্ত কঠোর কষ্টে রুচিরা আর অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করেই বলে ওঠে, তাঁর ইচ্ছা ! নিজের ভালমন্দ বিবেচনা করবার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। কারোর ইচ্ছাকে

আমার ইচ্ছার বিকল্পে মেনে নেই—তা সে যিনি হোন না কেন, অস্তত ঝচিরার দ্বারা তা হবে না।

শাস্ত হোন ঝচিরা দেখা, এসব ব্যাপারে বৃথা উত্তেজিত হয়ে তো কোন লাভ নেই। আপনি সমীরবাবুকে বিবাহ করতে চান না সে কথা সুস্পষ্টভাবে আর কাউকে না পারেন সমীরবাবুকেও তো অস্তত জানিয়ে দিতে পারতেন একদিন। আর সেই কথাই আমি একটু আগে বলেছিলাম।

কিন্তু তেই আমার কথা শুনতে চাইছিল না। যাক গো, না শোনে না শুনুক—তাহাড়া আজ আর বড়মামাও বেঁচে নেই, দায় থেকে আমিও মুক্ত। মার এবং বিশেষ করে তাঁরই ইচ্ছায় এ ব্যাপারটা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল। এইখানেই এর শেষ।

আপনার বড়মামা রায়বাহাদুরই বুঝি এই বিবাহে ইচ্ছুক ছিলেন?

হ্যাঁ। সমীরের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে বড়মামা এই সমীরের গ্রাস থেকে একটা কোলিয়ারী বাঁচাতে চেয়েছিলেন। মাত্র দিন-দুই হল দাদুর মুখে আমি কথাটা জানতে পেরেছি। আগে তো জানতেই পারিনি।

কে? অবিনাশবাবু আপনাকে বলেছিলেন ও-কথা?

হ্যাঁ। আমি অবিশ্বিয় প্রথম থেকেই কথাটায় আমল দিইনি। কিন্তু বিশেষ করে ঐ কথাটা করেকদিন আগে জানবার পর কাল রাত্রে খোলাখুলি ভাবেই আমার অমত জানিয়ে দেব ভেবেছিলাম সমীরকে ডেকে এনে।

ঝচিরার গতরাত্রের স্যন্ত্ররচিত গোপনতার আড়ালটুকু কিরীটি সুকৌশলে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিল। ঝচিরা সব কিছু অতৎপর প্রকাশ করে দিল।

আর একটা কথার জবাব চাই আমি আপনার কাছ থেকে মিস মিত্র!

কি?

গতকাল আপনার ছেটমামা যখন আপনাকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদটা দেওয়ার কথা অঙ্গীকার করলেন তখন আপনি তাঁকে বলেছিলেন—তাঁর কীর্তির কথা নাকি কারও জানতে বাকি নেই! কেন তাঁকে সে কথা আপনি বলেছিলেন বলবেন কি?

কি আর—এই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ওঁর এইখানে আসা অবধিই তো বড়মামার সঙ্গে নিত্য প্রায় থিটিমিটি চোঁচামেচি হত, বড়মামা যে অসুস্থ এই সামান্য কথাটাও যেন উনি ভুলে যেতেন—

তাই কি?

শুধু কি তাই! বলতে লজ্জা হয় মিঃ রায়, মার মুখে শুনেছি—একদিন নাকি উচ্চবেশে ব্যাপারে ছেটমামা threaten পর্যন্ত করেছেন!

॥ উনিশ ॥

কিরীটি ঝচিরাকে বিদায় দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে মুঘা বাস্তীকে

মুঘা বাস্তী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

বসুন, নমস্কার। কিরীটি চোখের ইঙ্গিতে তার মন্ত্রখন্ডে শুন। চেয়ারটি দেখিয়ে দিল।

মুঘা নিঃশব্দে উপবেশন করে।

আমাকে আপনি ডেকেছিলেন মিঃ রায়? প্রতিনমস্কার করে মুঘা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। গতরাত্রে এ বাড়িতে যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে, সব শুনেছেন বোধ হয়?

হ্যাঁ।

কার কাছে বললেন?

বাবুর মুখেই শুনেছি। গত রাত্রেই সব আমাকে তিনি বলেছেন।

সেই সঙ্গেকেই আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই।

বিষয়?

কাল কত রাত পর্যন্ত আপনি গানবাজনা করেন?

রাত বোধহয় তিনটে বাজবার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত।

তারপর বুঝি আপনি শুতে যান?

হ্যাঁ।

আবার কখন কাকাসাহেব আপনাকে ডেকে পাঠান তাঁর ঘরে?

বোধ হয় রাত সাড়ে চারটে কি পৌনে পাঁচটা হবে তখন, আকাশ ফিকে হয়ে আসছে—

অবিনশ্বাবুর ঘরে চুকে কি দেখলেন?

দেখলাম ঘরের মধ্যে তিনি অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। আমার পদশব্দেও তাঁর খেয়াল হয়নি। আমিই তখন গলাখাঁকরি দিয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম। এবারে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, ‘কে, ও মুনা—এস। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে মুনা। দুর্যোধন—দুর্যোধনকে কে যেন হত্যা করেছে?’ রায়বাহাদুর অসুস্থ, আমি তিনি মাস আগে এখানে আগেরবার মুজরা নিয়ে আসি তখন শুনে গিয়েছিলাম। এবারেও এসে শুনেছিলাম তাঁর অবস্থা নাকি একই রকম।

এবার কতদিন হল এসেছেন এখানে?

দিনপাঁচকে হল এসেছি।

সহসা এমন সময় দ্বারে করাঘাত শোনা গেল বাইরে থেকে।

কিরীটী প্রশ্ন করল, কে?

আমি দুঃশাসন। দালাল সাহেব এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন।

কিরীটী বলে, আসুন মিঃ চৌধুরী—ভিতরে আসুন।

দুঃশাসন চৌধুরী দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেই, মুনা নিজের অঙ্গাতেই চোখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়েছিল।

দুঃশাসনও মুনা বাঁজীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই যেন সহসা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরম্পর পরম্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ব্যাপারটা কিরীটীর তাঁক্ষণ্য সজাগ দৃষ্টি এড়ায় না, সেও ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুঃশাসন চৌধুরীই সর্বপ্রথম যেন কতকটা আগ্রাগত ভাবেই অস্ফুট কষ্টে বললেন, কে?

কিন্তু সেই সঙ্গে তার মুখের চেহারাটাই সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

সুস্পষ্ট একটা আতঙ্ক যেন ফুটে ওঠে সমস্ত মুখখানিতে। সহসা বিচ্ছিন্ন একটা হাসি যেন বাঁজীর অমন সুন্দর মুখখানিকেও বীভৎস করে তুলল। চাপ্টা কষ্টে বাঁজী বলে, হ্যাঁ। খুব আশচর্য হয়ে গেছেন মিঃ চৌধুরী এখানে আমায় সেঁপে না! মরিনি, চেয়ে দেখুন আজও বেঁচেই আছি।

বাঁজীর দিকে চেয়ে কিরীটীই এবার প্রশ্ন করল, আপনি তাঙ্গে জানতেন না দুঃশাসনবাবু এই বাড়িতেই থাকেন?

না।

বলেন কি প্রিয়াপ্রসাদের পূর্বপরিচয় থাকা সত্ত্বেও জানতেন না? কিরীটী দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে।

না।

আশ্চর্য! সাবিত্রী তুমি এখানে? এতক্ষণে কোনমতে কথাটা উচ্চরণ করলেন যেন শাস্ত্রবল্টে দুঃশাসন চৌধুরী।

সাবিত্রী হঠাত হেসে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই হস্তিটা থামিয়ে বলে, সাবিত্রী—সাবিত্রী তো অনেকদিন আগেই মারা গেছে চৌধুরী মশায়। এ যা দেখছেন বলতে পারেন তার প্রেতাত্মা। অধীনের নাম মুমা বাঁজী।

বিযাঙ্গ একটা কর্দর্য শ্লেষ যেন বাঁজীর কঠস্বরে প্রকাশ পায়।

মুমাৰ জবাব শেষ হওয়াৰ সঙ্গে সঙ্গেই যেন আকস্মাত দুঃশাসন চৌধুরী মুমাৰ দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিরীটীৰ দিকে চেয়ে মৃদুকষ্টে বললেন, মিঃ রায়, দালাল সাহেবেৰ বোধ হয় আপনাকে ডাকছেন।

বোৱা গেল দুঃশাসন চৌধুরী যে কারণেই হোক ঘৰ ত্যাগ কৰিবাৰ জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, যান দুঃশাসনবাবু, দালাল সাহেবকে এ-ধৰেই ডেকে নিয়ে আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে দুঃশাসন চৌধুরী ঘৰ থেকে বেৰ হয়ে গোলেন। মনে হল তিনি যেন বাঁচলেন।

মুমা বাঁজী নিৰ্বাক নিশ্চল তথনও বসে আছে। হঠাত কিরীটী বাঁজীকে প্ৰশ্ন কৰে, কত দিনেৰ আলাপ আপনাদেৱ পৰম্পৰেৱ, মুমা দেবী?

অ্যাই!.....যেন চমকে ওঠে বাঁজী।

শুনেছি মিঃ দুঃশাসন চৌধুরী গত পাঁচ বছৰ ধৰে ভাৰতবৰ্ষে ছিলেন না, আপনাদেৱ আলাপ বুঝি তাৰও আগে?

হ্যাঁ। তা পাঁচ বছৰ হবে বৈকি। হ্যাঁ, পাঁচ বছৰ। অস্পষ্ট ভাবেই বাঁজী কথাকঠি উচ্চৱাণ কৰে।

কিরীটী লক্ষ্য কৰে বাঁজী অন্যমনক্ষ ও চিঞ্চিত। সে আবাৰ প্ৰশ্ন কৰল, ইতিমধ্যে আৱ আপনাদেৱ পৰম্পৰেৱ দেখাসক্ষাৎ হয়নি বুঝি?

না। মৃদু কষ্টে প্ৰত্যুষ্টিৰ দিল বাঁজী।

এমন সময় বাঁহৰে দালাল সাহেবেৰ ভাৱী জুতোৱ মচ মচ আওয়াজটা পাওয়া গৈল। এদিকেই আসছেন তিনি বোৱা গেল।

আপনি আপাতত যেতে পারেন, তবে আপনি আপনাৰ ঘৰে থাকলেন মুমা দেবী। আমি ঘণ্টাখানেক বাদেই আপনাৰ ঘৰেই আসছি আবাৰ। আপনাৰ সঙ্গে আমাৰ আৱও কথা আছে। দালাল সাহেবেৰ সঙ্গে কথা বলেই আমি আসছি।

দৱজা ঠেঙে দালাল সাহেব ঘৰেৱ মধ্যে এসে প্ৰবেশ কৰলেন এবং বাঁজী ঘৰ চৰণে বেৰ হয়ে গৈল।

আসুন দালাল সাহেব, বসুন। কিরীটী দালাল সাহেবকে আহান জানাল।

দালাল সাহেব চেয়ারটাৰ উপৰে বসতে বসতে বললেন, ইয়ে বছত তাজ্জব কি বাত হ্যায় মিঃ রায়, শকুনিবাবু তো কই বাত নেহি মানতা।

কি ব্যাপার, কি মানচে রাখিসে?

ও মুনেহি খুলতা হয়ে আপকে হাম জরুর কঁহতে হে, ওই রায়বাহাদুরকে জান লিয়া—

বলেন কি?

হাঁ হাঁ

স্তুতি পুরু দুজনের মধ্যে নিম্নলিখিত আলোচনা শুরু হয়।

শকুনিবাবুকে ধরে এনে হাজতের মধ্যে বন্দী করা অবধি সেই যে লোকটা মুখ বন্দ করেছে এখন পর্যন্ত একটি কথাও ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি করিংকর্মা দালাল সাহেব।

কিন্তু এও আপনাকে বলে দিচ্ছ মিঃ রায়, দালাল সাহেব বলতে লাগলেন, রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছে ওই শকুনিই। লোকটার চেহারা আর চোখের চাউনি দেখেছেন, একেবারে পাকা ক্রিমিন্যালের মত।

দালাল সাহেব কিরীটীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

কিরীটী দালাল সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কেবল প্রশ্ন করে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেছে মিঃ দালাল?

হ্যাঁ। ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। একেবারে হাঁট পর্যন্ত ছুরি গিয়ে ঢুকেছে।

Stomach content chemical analysis-এর জন্য পাঠানো হয়েছে?

হ্যাঁ। কিন্তু হত্যাকারীকেই যখন আমারা মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, তখন—

মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন—কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণ করতে পারবেন কি উনিই রায়বাহাদুরের হত্যাকারী?

প্রমাণ? আমাদের ওর পেটের কথা টেনে বের করতে হবে। সে tactics আমার জানা আছে মিঃ রায়। তাছাড়া কিছু কিছু প্রমাণও already আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই তো এসেই গেছে।

কি রকম? কি কি প্রমাণ পেয়েছেন বলুন তো, যাতে করে আপনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে উনিই অপরাধী, রায়বাহাদুরের হত্যাকারী?

প্রথমত ধরুন, উনি অপরাধী না হলে অমন করে না বলে কয়ে হঠাৎ ওভাবে পালাতেই বা যাবেন কেন? দ্বিতীয়ত অপরাধীই যদি উনি না হন এমনি করে মুখ বজেই বা থাকবেন কেন? সাফ সাফ সব কথা যা জানেন খুলে বললেই তো পারেন।

আমি আপনাকে বলতে পারি মিঃ দালাল, ঠিক অপরাধী বলে নয়, স্বেফ ভয় পেয়েই হয়ত উনি পালাবার চেষ্টা করেছিলেন।

তয় পেয়ে! কিসের জন্য তয় পেয়ে?

কাপড়ে তাঁর রক্তের দাগ ছিল বলে।

রক্তের দাগ! কোন কাপড়ে?

তাঁর ঘরেই যে ধূতিটা এক কোণে পড়েছিল তাতেই রক্তের দাগ ছিল। কিন্তু একটা কথা হয়ত এখনও আপনি শোনেননি মিঃ দালাল, মৃত রায়বাহাদুর নিহত হবার ক্ষয়ক্ষণে আগে টাকাকড়ি ও উইলের ব্যাপার নিয়ে রায়বাহাদুর ও দুঃশাসন চৌধুরীর মধ্যে বিশ্রী একটা বচসা হয়ে যায়, এমন কি দুঃশাসন চৌধুরী রায়বাহাদুরকে নাকি threaten পর্যন্ত করেছিলেন!

বলেন কি? এখনি তাহলে একবার দুঃশাসন চৌধুরীকে ডেকে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত?

তাতে করে বিশ্বে কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। Most probably he will deny the whole story.

কিন্তু তাই বলে তাকে আমরা সহজে নিন্দিতি দোব না। কিন্তু কার মুখে কথাটা শুনলেন? শ্রেফ ঘটনাটাকেই ব্যাপারটা জানা সম্ভব হয়েছে। আড়ি পেতে শুনেছি গান্ধারী দেবী কাকাসাহেবকে যখন কথাটা বলছিলেন।

কাকাসাহেব মানে ঐ বুড়েটা?

হ্যাঁ। রায়বাহাদুরের কাকা অবিনাশ চৌধুরী।

আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

যান না। তিনি বোধহয় এখন তাঁর ঘরেই আছেন।

দালাল সাহেব অতঃপর হস্তদণ্ড হয়েই অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী মুম্বা বাঁজীর ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

॥ কুড়ি ॥

কথাটা আর চাপা রাখা গেল না।

দালাল সাহেবই সকলকে ঢাক ঢেল পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, রায়বাহাদুরের হত্যাপরাধেই শকুনি ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামার হত্যাপরাধে শকুনি ধৃত হয়েছে এবং বর্তমানে সে হাজতে বাস করছে।

শীতের বেলায় শেষ আলোর ম্লান রশ্মিটুকু একটু একটু করে ক্রমশ ধরিত্রীর বুক থেকে যেন মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া বাদুড়ের মত ডানা মেলে যেন চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে একটা কালো পর্দার মত শ্রীনিলয়ের উপরে। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কা দুঃস্বপ্নের মত সকলেরই মনকে যেন আচম্ভ করে ফেলেছে।

সন্ধ্যা নাগাদ ডাঃ সেনও এসে শ্রীনিলয়ে উপস্থিত হলেন।

কিরীটীর ঘরের মধ্যে সকলে উপস্থিত হয়। একমাত্র দালাল সাহেব বাদে, কাকাসাহেবের অবিনাশ চৌধুরী, দুঃহাসন চৌধুরী, বহুলা চৌধুরী, তার স্ত্রী পদ্মা দেবী, গান্ধারী দেবী, তাঁর মেয়ে রুটিরা দেবী, সমীর বোস, নার্স সুলতা কর, ডাঃ সানিয়াল, ডাঃ সম্বৰ সেন এবং কিরীটী নিজে।

একমাত্র কিরীটী ছাড়া ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য সকলের মিথেয়খেই কেমন একটা যেন আতঙ্কের ভাব। কিরীটী তার পাইপটা হাতে নিয়ে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন আপনাদের সকলকে কেন এ-সময় এ-ঘরে আমি ডেকে এনেছি—একটু খেয়ে বলে, আপনারা সকলেই দালাল সাহেবের মুখে শুনেছেন রায়বাহাদুরের হত্যা-অপরাধে বোধহয় শকুনিবাবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিস অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে কোন কথাই বের

করতে পারেনি। অথচ আপনিয়া জানেন না কিন্তু আমি জানি, শকুনিবাবু যদি মৃথ থাগেন হত্যারহস্যটা জলের মত হয়ে যাবে এখনি। কারণ তিনি এই হত্যার ব্যাপারে এমন কতকগুলো মারাত্মক কথা জানেন যা একবার পুলিসের গোচরীভূত হলে হত্যাকারী আর তখন আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না।

কিরীটীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধারী দেবী প্রশ্ন করে, তবে কি শেকে দাদাকে হত্যা করেনি?

না। ত্রজকঠিন কিরীটীর কঠস্বর, কিন্তু আমি জানি হত্যাকারী কে! হত্যাকারী যতই চতুর্থ-হোক এবং যত বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়ে থাক না কেন, এমন একটি মারাত্মক চিহ্ন সে রায়বাহাদুরের শয়ার পাশে রেখে গিয়েছে গতরাত্রে হত্যা করতে এসে, যেটি আজ দুপুরে সেই ঘরটা পুনরায় গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময়ই আমার নজরে পড়েছে। সেটি কি জানেন?

সকলেই চেয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে।

কিরীটী বলে, যে ছোরটা গতরাত্রে রায়বাহাদুরকে হত্যা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল তারই শূন্য খাপটা। তাড়াতাড়িতে হত্যাকারী খাপটা ঘরের মধ্যে ভুলে ফেলে এসেছিল। সেই শূন্য চামড়ার খাপটার গায়েই হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে যা থেকে সহজেই প্রমাণ করা যাবে হত্যাকারী কে?

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কটি নরনারীই একেবারে যেন বোবা। সূচ পতনের শব্দও বোধ হয় শোনা যাবে। কারও মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই।

কিরীটী আবার বলতে থাকে, আপনাদের সকলের কাছেই আমার শেষ অনুরোধ এবং সেইটুকু জানবার জন্যই আপনাদের সকলকে আমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, এখনও যদি আপনাদের কারও কিছু জানা থাকে যা এখনও আপনারা গোপন করে রেখেছেন আমাকে বলুন। অন্যথায় পুলিস আপনাদের প্রত্যেককেই নাজেহালের একেবারে চূড়ান্ত করবে। অপমান ও লাঞ্ছনিক অবধি হয়ত রাখবে না। দালাল সাহেব সহজে আপনাদের কাউকে নিঙ্কতি দেবে না জানবেন।

কিন্তু তথাপি সব নিশ্চৃপ। কারও বাক্যস্ফূর্তি নেই। বোবা ভীত দৃষ্টিতে কেবল পরম্পর পরম্পরের মুখ চাওয়াওয়ি করে।

একজন পুলিশ অফিসার ঘরের বাইরে দ্বারের নিকট প্রহরায় দাঁড়িয়েছিল, সে এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কিরীটীর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নস্বরে যেন কি কুলাল কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্মোধন করে বলে, বেশ, আপনাদের আমি আধ ঘটা সময় দিচ্ছি, পরম্পর আপনারা আলোচনা করে দেখুন। নিচের থেকে আমি আধ ঘটার মধ্যেই কাজ সেরে আসছি।

চলুন। কিরীটী পুলিস অফিসারটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিচের একটি ঘরে নিঃশব্দে পুলিসের প্রহরায় মাথা নিচু করে একটা চেয়ারে শকুন ঘোষ বসেছিল। কিরীটীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল চেয়ের ইঙ্গিতে কিরীটী পুলিসের সোকটিকে ঘর ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেই সে ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে আর ঢৃষ্টীয় প্রাণী নেই। কিরীটী আর শকুন ছাড়া।

কিরীটীকে একা ঘরের অধো পেয়ে এতক্ষণে সহসা শুনি কান্দায় যেন ভেঙ্গে পড়ে।
অশ্রবন্ধ কঁঠে বলে, আমাকে বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি—আমি মামাকে খুন করিনি।
কিন্তু পুলিস কথি কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না!

কেন—কেন? আমি নির্দোষ, আমি জানি না, কিছুই জানি না।

কিন্তু আপনার ঘরের কোণে একটা ধূতি পাওয়া গিয়েছে, তাতে রক্তের দাগ এল কি
করে?

শুনি নিশ্চৃপ।

তাছাড়া গতকাল রাত্রে সাড়ে তিনটে থেকে রাত সাড়ে চারটে পর্যন্ত আপনি কোথায়
ছিলেন? ঘরে ছিলেন না তো?

আমি—

অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আমি বলছি আপনি ঘরে ছিলেন না—কোথায়
ছিলেন? এখনও বলুন? কথার জবাব দিন?

কুণ্ডলেশ্বরবাবুর ঘরে গিয়েছিলাম। দ্বিধাজড়িত কঁচে শুনি জবাব দিল।

কেন গিয়েছিলেন সেখানে?

আমি—মানে—

মদ খেতে, তাই না?

শুনি চুপ।

কতদিন ধরে মদ্যপান করছেন?

মদ্যপান!

হ্যাঁ। শর্মাই বোধ হয় ঐ ব্যাপারে আপনাকে রপ্ত করিয়েছেন। আজ সকালেও আপনার
কথা বলবার সময় মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ পেয়েছি।

বছরখানেক হবে।

হ্যাঁ। তারপর কখন ফিরে আসেন সেখান থেকে কাল রাত্রে?

রাত সাড়ে চারটে হবে বোধ করি তখন।

সাধারণত কি আপনি ঐ সময়েই শর্মার ঘরে যেতেন মদ খেতে?

হ্যাঁ। পাছে জানাজানি হয়ে যায় তাই ঐ সময়েই যেতাম তার ঘরে।

পয়সা কে যোগাত, আপনি নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ।

ঘরে ফিরে এসে কি দেখেন?

রক্তাঙ্গ আমারই পরনের একটা ধূতি ঘরের কোণে মেঝেতে পড়ে আছে। প্রথমটা
আমারই পরিধানের একটা ধূতিতে রক্ত দেখে এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে কি করি
বুঝে উঠতে পারিনি। তারপর রক্তের দাগগুলো কুঝোর জল দিয়ে ধুয়ে মেলি কাপড়
থেকে।

হ্যাঁ। আচ্ছা রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ আপনি গতবারেই পেয়েছিলেন, তাই
না?

না।

গতবারে পাননি সংবাদটা?

না।

তবে?

আজ সকালে ঘুম অঙ্গুর পর জানতে পারি।

সেই রাতেই শুভ বোধ করি পৌনে চারটে হবে।

নিঃশব্দ নিবৃত্ত শীতের রাত। কেবল একটুক্ষণ আগে নাইট কিপার হয় সিংয়ের খবরদস্তির চিকারটা শোনা গিয়েছে।

সেই ঘর। গতকাল রাত্রে এই ঘরের মধ্যেই রায়বাহাদুর ছুরিকাঘাতে আততায়ীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন।

আজ শূন্য সেই শয়া। কেবল গত রাতের নীল ঘেরাটোপে ঢাকা বাতিটা আজ নেভানো।

ঘরের একধারে ক্যাম্পখাটের উপর নিদ্রাভিভূত কিরীটি। আর কেউ ঘরের মধ্যে এই মুহূর্তে নেই। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দেয়াল-ঘড়িটার একঘেয়ে টক্টক্ শব্দ কেবল শূন্য ঘরের মধ্যে যেন সজাগ সর্তকবাণী উচ্চারণ করে চলেছে অঙ্ককারের মধ্যে। কিরীটি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। সহসা নিঃশব্দে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। তারপরই ঘরের মধ্যে অতি-সতর্ক পদসঞ্চারে প্রবেশ করল এক ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় নিহিত কিরীটির শয়ার দিকে।

অল্প পরে আর একটি ছায়ামূর্তি প্রবেশ করে সেই একই পথে। প্রথমে ছায়ামূর্তি টেরও পেল না দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি যে তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঐ মুহূর্তে তার পেছনেই প্রবেশ করল অঙ্ককারে।

শায়িত কিরীটির শয়ার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল প্রথম ছায়ামূর্তি, আর ঠিক সেই মুহূর্তে যেন চোখের পলকে ভোজবাজির মত কিরীটি একটা গড়ান দিয়ে একেবারে শয়া থেকে নিচে পড়ে গেল এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা আর্ত করণ চিংকার অঙ্ককারকে চিরে দিয়ে গেল।

মাটিতে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটি এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গিয়ে সুইচটা টিপে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকেই ফিট করা হাজার শক্তির বৈদ্যুতিক বাতিটা জুলে ওঠে। মুহূর্তে ঘরের অঙ্ককার দূর হয়ে উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ঝলমল করে ওঠে।

দলাল সাহেব কিরীটির পূর্ব-নির্দেশমত এতক্ষণ তার খাটের তলাতেই ওঁ প্রেতে ছিলেন। তিনিও ততক্ষণে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন কিরীটির পাশে।

রক্তাঙ্গ কলেবরে সামনের মেরেতেই বসে হাঁপাচ্ছেন দৃঃশ্যাসন চৌধুরী। সছনে রক্তমাখা হাতে তখনও দাঁড়িয়ে বাস্তুজী মুম্বা, তার দুঁচোখ হিংসার আঙুর যেন জুলছে। সহসা মুম্বা বাস্তুজী পাগলের ন্যায় থিলথিল করে হেসে ওঠে, তি তি। প্রাচ বছর ধরে তোকে খুঁজে বেড়িয়েছি। প্রতিশোধ—এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছি। কেমন—কেমন হয়েছে!

What's all this Mr. Roy? এতক্ষণে বিহুল হতচক্রিত দালাল সাহেবের কঠে স্বর ফোটে।

কিরীটি দালাল সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে দৃপতিত দৃঃশ্যাসনের ক্ষতস্থান থেকে বিজ্ঞ ছোরাটা টেনে ঘের করতে করতে বলে, চট করে ডাক্তারকে পাশের ঘর থেকে এখনি একবার ডেকে আনুন, মিঃ দলাল!

দালাল সাহেব ডাক্তারকে আঁকতে ছুটলেন।

প্রচুর রক্তপাতে দুঃশাসন চৌধুরীর অবস্থা তখন ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে আসছে।

মুমা বাঙ্জী তখন যেন কেমন হঠাত নিযুম হয়ে গিয়েছে—বিড়বিড় করে বলে চলেছে, কেমন ভাস্ক! কেমন প্রতিশোধ! পাঁচ—পাঁচ বছর ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি!

ডাঃ সানিয়েল ছুটে এলেন হস্তদণ্ড হয়ে, কি ব্যাপার মিঃ রায়?

দেখুন তো! He has been stabbed!

বিস্তু দেখবার আর তখন কিছুই ছিল না। নিদারণ ভাবে আহত ও প্রচুর রক্তপাতে চৌধুরীর অবস্থা তখন প্রায় সকল চিকিৎসার বাইরে চলে গিয়েছে। ক্রমেই নিষ্ঠেজ হয়ে আসছে ও নাড়ি তার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে; তথাপি পরীক্ষা করে বিষয়ভাবে মাথা নেড়ে ডাক্তার মৃদুকষ্টে বলে, আশা নেই, কিন্তু কেন এমন করে স্ট্যাব করল দুঃশাসনবাবুকে মিঃ রায়?

জবাব দিল মুমা বাঙ্জী, আমি—আমি প্রতিশোধ নিয়েছি নারীহত্যার—vendetta. কয়েকটা হেঁকি তুলে চৌধুরীর দেহটা স্থির হয়ে গেল।

মরেছে। এবার আপনারা আমায় ধরতে পারেন। শুনুন পুলিস সাহেব, আমার আসল নাম সাবিত্রী। একদিন ঐ নরপিশাচ দুঃশাসন আমার নারীত্বকে এমনি করেই হত্যা করেছিল, তারই প্রতিশোধ নিতে আমি তাকে হত্যা করেছি। আমি ধরা দিচ্ছি, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে এবারে, আমি ফাঁসি যেতেও প্রস্তুত।

ভুল করেছেন সাবিত্রী দেবী। গভীর কঠিন কষ্টে কিরীটী হঠাত বলে।

চকিতে মুমা বাঙ্জী কিরীটীর কথায় ফিরে কিরীটীর মুখের প্রতি তাকাল, ভুল করেছি! হ্যাঁ, ভুল করেছেন। উনি তো দুঃশাসন চৌধুরী নন!

কিরীটীর কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল এবং ঘরের মধ্যে উপস্থিত যুগপৎ সকলেই একই সময়ে বিশ্঵বিশ্ফারিত নেত্রে কিরীটীর দিকে তাকায়।

হতভম্ব দালাল সাহেবেই সর্বপ্রথম কথা বললেন, কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? উনি—উনি দুঃশাসন চৌধুরী নন?

না।

তবে কে? কে উনি?

॥ একুশ ॥

রায়বাহাদুরের হত্যাকারী! ফৌজ নিয়ে দেখুন এতক্ষণে হয়ত তীব্র কোন ঘুমের ওষ্ঠের প্রভাবে আসল ও সত্যিকারের দুঃশাসন চৌধুরী তাঁর ঘরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছেন। দুঃশাসন চৌধুরীর ছদ্মবেশ উনি নিয়েছেন মাত্র।

এ কি বিস্ময়! সকলেই বাক্যহারা, নিষ্পল্ল।

তবে উনি কে? দুঃশাসন চৌধুরী উনি নন? তবে কাকে—কাকে আমি হত্যা করলাম? বলতে বলতে পাগলের মতই মুমা বাঙ্জী মৃতদেহটার উপর লাঞ্ছিয়ে পড়তে উদাত হতেই, চকিতে ক্ষিপ্রস্তে কিরীটী বাঙ্জীকে ধরে ফেলে। তারপ্রথম শাস্ত কষ্টে বলে, শুধু আপনারই নয় সাবিত্রী দেবী, ভুল আমারও হয়েছে। ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এমনি দাঁড়াবে আমিও তা ভাবতে পারিনি—নইলে এই হত্যাকাণ্ডটা হয়ত ঘটত না। উঃ What a mistake—What a mistake!

কিরীটী বলছিল : হত্যাকারী যে কেবল অসাধারণ ক্ষিপ্ত ও চতুর তাই নয়, মুদ্রক একজন অভিনেতাও। সম্মানগোড়াই সে দুঃশাসন চৌধুরীকে ধ্বংস করবার জন্য এমন চমৎকার ভাবে প্ল্যান করে হত্যার কাজে অবর্তীণ হয়েছিল, যাতে করে রায়বাহাদুরের হত্যাপরাধের সমস্ত সন্দেহ নিঃসন্দেহে হতভাগ্য দুঃশাসন চৌধুরীর উপরে গিয়ে পড়ে। আর হয়েছিলও তাই। ব্যাপারটা অবশ্য আমি গতকালই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সবটাই আমার অনুমানের উপরে ভিত্তি বলে গতকাল রাত্রের ঐ ফাঁটা পেতেছিলাম— ছেরুর খাপের চার ফেলে। এবং রায়বাহাদুরেরই ঘরে নিজের শয়নের ব্যবস্থা করেছিলাম— শুধু জানবার জন্য, কোন পথে হত্যাকারী আগের রাত্রে ঐ ঘরে প্রবেশ করে হত্যা করে গিয়েছিল। অবশ্য এটা স্থির জানতাম আমি, হত্যাকারী যত চতুরই হোক না কেন, রাত্রে সেই মারাত্মক একমাত্র হত্যার নির্দশন ছোরার খাপটি সংগ্রহ করতে তাকে আসতে হবেই। কেননা হত্যাকারীর নিশ্চয়ই স্থিরবিশ্বাস হবে অত বড় মূল্যবান হত্যার প্রমাণটা আমি অন্য কোথাও না রেখে সবর্দী নিজের কাছে কাছেই রাখব। এখন আপনারা সকলেই বুঝতে পেরেছেন বোধ হয় যে আমার গণনার ভূল হয়নি। সে আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে— এসেছে সে, কিন্তু এটা ভাবিনি ঐ সঙ্গে যে সাবিত্রী অর্থাৎ মুরা বাঞ্জী, যার নারীত্বের মর্যাদা একদা দুঃশাসন চৌধুরী লুঠন করেছিল, প্রতিশোধ স্পৃহায় সে গানের মুজরা নিয়ে এ দুঃশাসনেরই খোঁজে দেশদেশাস্তরে গত পাঁচ বছর ধরে তীক্ষ্ণ ছোরা কোমরে শুঁড়ে প্রতীক্ষায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং এও বুঝিনি যে দুঃশাসনকে খুঁজে পাওয়া মাত্রই তাকে হত্যার প্রথম সুযোগেই সাবিত্রী ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একেই বলে নিয়তি। কেউ তা রোধ করতে পারে না। ভবিতব্য অলঝনীয়। অনিবার্য। কিন্তু তবুও বলব হত্যাকারীর প্ল্যানটা নিঃসন্দেহে অপূর্ব। অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে খুনী হত্যার ব্যাপারে। আগে থেকেই সমস্ত আটবাটি বেঁধে মাত্র পনের থেকে বিশ মিনিট সময়ের মধ্যে অন্য একজনের ছদ্মবেশে হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে আবার সে তার নিজের জায়গায় ফিরে এসে ছদ্মবেশ ছেড়ে সব হত্যার চিহ্ন নিজের গা থেকে যেন মুছে ফেলেছে। তাহলে গোড়া থেকেই বলি। রায়বাহাদুরের কেন ধারণা কোন এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মারা যাবেন! হত্যাকারী তাঁকে চিঠি দিয়ে সেকথা জানিয়েছিল।

রায়বাহাদুরের মুখেও আমি শুনি কথাটা এবং পরে একদিন সৌভাগ্যক্রমে লুকিয়ে আড়ি পেতে গান্ধারী দেবী ও কাকা সাহেবের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছিলাম আমি, রায়বাহাদুরকে হত্যাকারী একটি চিঠি দিয়েই কোন একটা নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হত্যা করবার ভয় দেখিয়েছিল যদি না তিনি তাঁর উইল পরিবর্তন করেন। কিন্তু কেন? ঐভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে হত্যার ভয় দেখিয়েছিল কেন? খুব সম্ভব যাতে করে রায়বাহাদুর কথাটা সকলকে বলেন, ও হত্যার প্রতিশোধের জন্য ব্যবস্থা করেন। অস্তত আমার ধারণা তাই। তাহলেও এ থেকে দুটো জিনিস ভাববার আছে। প্রথমত অসুস্থ রায়বাহাদুর ঐ ধরনের কথা বললে চট্ট করে সহজে কেউই বিশ্বাস তো করবেই না ব্যাপারটা—অর্থাৎ তাঁর কথার কোন শুরুত্বই দেবে না কেউ। ইয়েছিলও তাই।

এ বাড়ির কেউ সেকথা বিশ্বাসই করেননি, এমন কি আমিও করতে পারিনি প্রথমটায়। ডাঙ্গারমাও বলেছে ওটা hallucination-এর ব্যাপার।

ষষ্ঠীয়ত, খুনীর নির্বিশে হত্যা করবার একটা চমৎকার সুযোগ হাতে আসবে, এই ধরনের একটা কথা চাউর করে দিতে পারলে। কিন্তু যা বলছিলাম, ওদিকে তারপর খুনী

হত্যার সমস্ত সন্দেহ দুঃশাসন চৌধুরীর উপরে চাপিয়ে দেবার জন্য দুঃশাসনের ছদ্মবেশে একবার গিয়ে রায়বাহাদুরকে ~~hreacen~~ পর্যন্ত করে এসেছিল এবং সন্দেহটাকে ঘনীভূত করে তোলবার জন্ম ছিল এ সময়টিতেই গান্ধারী দেবীকেও রায়বাহাদুরের ঘরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। জানলা দরজা বন্ধ থাকায় ঘরটা ছিল অঙ্গুকার তাই হ্যাত রায়বাহাদুর ছদ্মবেশে ঘৰীকে চিনতে পারেননি এবং গান্ধারী দেবীও শেষ পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ না করবার ক্ষমতা ব্যাপারটা রহস্যবৃত্তই থেকে গিয়েছিল। হত্যার রাত্রে খুনী প্রথমত ডাঃ সানিমান্যের ছদ্মবেশে নার্স সুলতা করকে কফির সঙ্গে তীব্র কোন ঘুমের ওষুধ পান করিয়ে তাকে গভীর নিদ্রাভিভূত করে ফেলে। তারপর দুঃশাসনের ছদ্মবেশে রায়বাহাদুরের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে রায়বাহাদুরকে হত্যা করে। হত্যার সময় তার পরিধেয় বন্দে রক্ত এসে লাগে। সেই রক্তমাখা বন্দ্রটা তড়িৎপদে এসে শকুনির অবর্তমানে তার ঘরের মধ্যে ছেড়ে রেখে নিজেদের জায়গায় আবার ফিরে যায়। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি শকুনির ঘরের বাথরুমের জানলাপথে নেমে কার্নিশ দিয়ে রায়বাহাদুরের কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করা যায় খুব সহজেই। শুধু তাই নয়, হত্যা করবার পর দুঃশাসনেরই ছদ্মবেশে ঝটিলা দেবীর ঘরে গিয়েও তাকে হত্যার সংবাদটা দিয়ে আসে হত্যাকারী।

স্তুপ্তি নির্বাক সকলে। কারও মুখে একটি কথা নেই।

দালাল সাহেবেই আবার প্রশ্ন করেন, তবে হত্যাকারী কে?

কিরীটী এবারে মৃদুকঠে জবাব দিল, এখনও আপনারা বুঝতে পারছেন না! মহামান্য কাকাসাহেবের শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী!

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

কিরীটী বলে, গতকাল সকালে কাকাসাহেবের ঘরে প্রবেশ করে ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো কয়েকখানা ফটো দেখেই প্রথমে তাঁর ওপর আমার সন্দেহ হয়। এককালে অবিনাশ একজন সুদক্ষ অভিনেতা ও রূপসজ্জাকর ছিলেন। ঐটিই প্রথম কারণ ও দ্বিতীয় কারণ তাঁকে সন্দেহ করবার হচ্ছে, তিনটে থেকে রাত চারটে পর্যন্ত এই এক ঘন্টা সময়ে তার movements-এর কোন satisfactory explanation-ই তিনি দিতে পারেননি। তৃতীয়ত, তাঁর ঘরের বাথরুমের সংলগ্নই হচ্ছে শকুনিবাবুর ঘরের বাথরুম। বাহিরের ঢওড়া কার্নিশ দিয়ে এই বাথরুমে যাওয়া খুবই সহজ। চতুর্থত, হ্যাত উইল। উইলের ব্যাপারটা এখনও আমি জানি না তবে নিশ্চয়ই অবিনাশ চৌধুরীর ভাগে খুব সামান্যই পড়েছে। তাতেই হ্যাত তিনি উইলটার অদলবদল চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর ভয় ছিল দুর্যোধন চৌধুরীর মৃত্যুর পর হ্যাত অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গীতপিপাসা ও খেয়ালের শীর্ষে মেটাতে রাজী থাকবে না তাঁর মত।

দুঃশাসন চৌধুরী এবারে এখানে ফিরে আসা অবাধিই এই ব্যাপারটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে রায়বাহাদুরের সঙ্গে বচসা করতেন। তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না ঐভাবে অন্যথক প্রতি মাসে কতকগুলো টাকা নষ্ট হয়। কিন্তু নির্মম নিয়তিই এক্ষেত্রেও প্রবল হয়ে দেখা দিল। কাকা-সাহেবকে তাঁর পাপের প্রায়শিক্তি চরিষ্ণ ঘন্টার মধ্যেই করতে হল প্রাণ দিয়েই। একেই বলে বিধাতার বিচার বোধ হয়। কিন্তু I pity—এই সাবিত্রী দেবীকে! কিরীটী চুপ করে।

সাবিত্রী এক রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী! কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে।

শেষ পর্যন্ত কিরীটীর মধ্যস্থায় ডাঃ সমর সেনের সঙ্গে ঝটিলার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু আজও ডাক্তার সেন মধ্যে মধ্যে দৃঃস্থপ্ত দেখে জেগে ওঠে। তাকিয়ে আছে
পলকঙ্গীন প্রি নিষ্কম্প, বিভীষিকাময় কার দুটি চক্ষু তার দিকে যেন।

হাউজাগানো বলিরেখাক্ষিত মুখ, ফ্যাকাশে রক্তহীন হলদেটে চামড়া বিস্রস্ত, কাঁচাপাকা
চুলঙ্গলি কপালের উপর নমে এসেছে।

বুকে বিঁধে আছে একখানি কালো বাঁটওয়ালা ছোরা সমূলে। তারপরই যেন কানে
আসে কে ডাকছে তাকে।

হজুর, হজুর!

ডাক্তার জেগে ওঠে, কে—কে?

বনমরালী

bookinboi.net

॥ এক ॥

বাড়িটা তৈরি হয়েছিল বছরগুলিনকে আগেই।

একেবারে সামান্য অ্যাভিন্নুর উপর বাড়িটা। তিনতলার ছাদে উঠলে লেক চোখে পড়ে। জায়গাটা গগনবিহারী—কর্ণেল গগনবিহারী চৌধুরী কিনেছিলেন চাকরি-জীবনেই। ইচ্ছা ছিল বিটাঘার করার পর বাকি দিনগুলো কলকাতা শহরেই কাটাবেন গগনবিহারী, স্ত্রী নির্মাল্যা তাই একান্ত ইচ্ছা ছিল।

ইম্ফ্রেডমেন্ট ট্রাস্ট যখন ওই তল্লাটে জমিগুলো বিক্রি করছিল তখনই কিনেছিলেন জমিজা। সাড়ে চার কাঠা জমি।

চাকলি যখন আর বছর ছয়েক বাকি তখন বাড়িটা শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে বাড়িটা তৈরি হয়েছে প্রায় চার বছর ধরে।

দোতলা বাড়ি।

উপরে চারখানা ঘর—নৌচে চারখানা ঘর। একতলা ও দোতলার ব্যবস্থা সবই পৃথক। যদি কখনও একতলাটা ভাড়া দেন সেই মতলবেই সব ব্যবস্থা আলাদা করেছিলেন গগনবিহারী।

মিলিটারি চাকরির জীবনে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর্মির ইনফ্যান্ট্রি অফিসার কর্ণেল চৌধুরী। কিন্তু ছাত্রজীবনে কলকাতার যে স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল কোনদিন তা বুঝি ভুলতে পারেননি।

কলকাতার একটি অন্তরুত আকর্ষণ ছিল তাঁর মনের মধ্যে চিরদিন।

প্রায়ই বলতেন গগনবিহারী, দুর দুর, শহর বলতে কলকাতা শহর। বোৰ্সাই মাদ্রাজ দিল্লি আবার একটা শহর নাকি? প্রাণের স্পন্দন বলতে কিছুই নেই ওসব জায়গায়!

স্ত্রী নির্মাল্যা হেসেছে।

নির্মাল্যা বরাবর ইউ. পি.-তেই মানুষ। সে কিন্তু বলেছে, কলকাতা আবার একটা শহর! ঘিঞ্জি, ধূলো, মানুষের ভিড়।

কর্ণেল চৌধুরী জবাবে বলেছেন, তবু শহর কলকাতা—কলকাতা শহরই!

বাড়িটা মনের মত করেই তৈরি করেছিলেন গগনবিহারী—সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, ফুলের বাগান থাকবে, তারপর ছোট ঘোরানো একটা গাড়িবারাদা।

নৌচে ও উপরে বড় বড় দুটো হলঘর।

চওড়া সাদা পাথরের সিঁড়ি।

দোতলায় হলঘরটার সামনে খানিকটা খোলা ছাদের মত—টেরেস। নামকরা এক আর্কিটেক্টকে দিয়ে বাড়ির প্ল্যানটা করিয়েছিলেন।

কন্ট্রাক্টারকে বলেছিলেন বাড়ি তৈরি শুরু সময় গগনবিহারী, মিঃ বোস ভাড়াতাড়ি বাড়িটা কমপ্লিট করে দেবেন। যতদিন না অবসর নিই চাকরি থেকে ছাটায় ওখানে গিয়ে থাকবো।

কন্ট্রাক্টার মিঃ বোসও সেই মতই অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু বাড়ি তৈরি শুরু হবার মাস আগেই পরে হঠাত নির্মাল্য একটা মোটোর আক্সিডেন্ট আরা গেল।

স্ত্রীকে অভ্যন্তর ভালোবাসতেন কর্ণেল চৌধুরী। স্ত্রীর আকশিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুটা

তাই তাঁকে খুবই আঘাত দিল। জীবনটাই যেন অতঃপর তাঁর কাছে মিথ্যে হয়ে গেল।

একমাত্র সন্তান ছেলে বাজীৰ বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে আৱ ফিরল না। গগনবিহারীৰ বাড়িতৈরি কৰিবাৰ ইচ্ছেটাই যেন অতঃপর কেমন বিমিয়ে গেল। কন্ট্রাটোৱ মিঃ বোসকে তখন শললেন, তাড়াছড়োৱ কিছু নেই, ধীৱে-সুষ্ঠে কমপ্লিট হোক বাড়ি।

মিঃ বেসও অতঃপর কাজে চিলা দিলেন।

ধীৱে ধীৱে শস্ত্ৰকগতিতে কাজ চলতে লাগল। এবং বাড়ি শেষ হল দীৰ্ঘ চাৰ বছৰ বাদে একদিন।

তথ্যনও চাকৰিৰ মেয়াদ দু'বছৰ বাকি রয়েছে।

নতুন বাড়ি তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে রইল। একজন কেয়াৱটেকাৰ বইল—জার্নাল সিং। আৱও দু'বছৰ পৰে চাকৰি থেকে অবসৱ নেওয়াৰ পৰ গগনবিহারী মাস-চাৰেক এদিক ওদিক ঘূৱে অবশ্যে এসে উঠলেন তাঁৰ বাড়িতে। এক শীতেৱ অপৰাহ্নে।

মালপত্ৰ সব আগেই চলে এসেছিল। ভাষ্টে আৱ ভাইপো—সুবিনয় সান্যাল ও সুবীৱ চৌধুৱীকে চিঠিতে লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন গগনবিহারী কিছু আসবাবপত্ৰ কিনে বাড়িকে সাজিয়ে পৰিষ্কাৰ কৰে রাখতে।

চিঠিতে ওদেৱ আৱও লিখেছেন, ওৱা যেন অতঃপর তাদেৱ মেসেৱ বাসা তুলে দিয়ে ইথানেই এসে থাকে।

সুবিনয় সান্যাল আৱ সুবীৱ চৌধুৱী একজন মামাৰ ও অন্যজন তাৱ কাকাৰ নিৰ্দেশ পেয়ে মনে মনে খুশিই হয়েছিল।

বালিগঞ্জ অঞ্চলে লেকেৱ কাছে বড় রাস্তাৰ উপৰে অমন চমৎকাৰ বাড়ি—খুশি তো হৰাই কথা।

দুজনেৱই অবস্থা যাকে বলে অতি সাধাৱণ।

সুবিনয় বি.এস.সি পাস কৰে এক ওষুধ কোম্পানীতে মেডিকেল রিপ্ৰেজেন্টেটোৱেৰ চাকৰি কৰে—মাইনে শ-দুই টাকা।

গ্রামেৱ বাড়িতে বিধবা মা ও বছৰ পনেৱোৱ ছেট একটি বোন। মীৰ্জাপুৱ স্তৰীটেৱ একটা মেসে ফোৱ-সিটেড় রুমেৱ একটা সীটে থাকত। আৱ সুবীৱ চৌধুৱী আই.এ. পাস কৰে শৰ্টহ্যান্ড টাইপৱাইটিং শিখে একটা দেশী ফাৰ্মে চাকৰি কৰে। সে-ও থাকত হাজৱা রোডেৱ একটা বোর্ডিং হাউসে।

তাৱ আয়ও সামান্য। মাসাস্তে শ-দেড়েক টাকা মাত্ৰ।

তবে তাৱ সংসাৱে কেউ ছিল না।

গগনবিহারীৰ স্কুলমাস্টাৱ বড় ভাই বিজনবিহারীৰ ছেলে ঐ সুবীৱ বিজনবিহারীৰ অনেকে দিন আগে মৃত্যু হয়েছিল।

স্বামীৰ মৃত্যুৰ বছৰ ছয়েকেৱ মধ্যেই স্তৰীও মৃত্যু হয়েছিল।

গগনবিহারী সুবীৱকে মধ্যে মধ্যে অৰ্থসাহায্য কৰতেন তবে সে সাহায্যেৱ মধ্যে খুব একটা আগ্রহ বা প্ৰাগ ছিল বলে সুবীৱোৱ কথনও মনে ছয়নি।

সুবীৱও তাৱ কাকা কৰ্নেল চৌধুৱীকে জীবনে দু-একবাৱেৱ বেশী দেখেনি।

দুজনকেই আলাদা আলাদা কৰে চিঠি দিয়েছিলেন কৰ্নেল চৌধুৱী।

তাৱ চিঠি পেয়ে সুবীৱই মিৰ্জাপুৱ স্তৰীটোৱ মেসে গিয়ে এক সঞ্চায় সুবিনয়েৱ সঙ্গে দেখা কৰে।

মফঃস্বল থেকে দু'দিন টুর করে সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে সুবিনয় ফিরেছে। ফিরেই
সে মামার চিঠিটা পেরেছে।

এক কাপ চাষপাতা করতে করতে সুবিনয় মামার চিঠিটার কথাই ভাবছিল।

মামা বড়লোক। মিলিটারিতে বড় অফিসার। তাদের সম্পর্যায়ের মানুষ নন। তাছাড়া
ঐ মামার সঙ্গে তার বাবা কল্যাণ সান্যালের বিশেষ কোন একটা প্রীতির সম্পর্কও
কেন্দ্রিয়িকৃত ছিল না।

১০৮ বলা যায় বরাবর একটা মন-কষাকষি ছিল।

১০ কাবণ ছিল তার।

তার বাবার সঙ্গে তার মায়ের বিয়ের ব্যাপারটা কর্নেল চৌধুরী কখনও ক্ষমার
চোখে দেখেননি।

ঐ একটিমাত্র বোন তার মা বাসস্তী দুই ভাইয়ের।

গগনবিহারী মিলিটারির চাকরিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন ভারতবর্ষের সর্বত্র। বড় ভাই
বিজনবিহারী বর্ধমান জেলায় এক ছোট জায়গায় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। সামান্য
আয়।

স্ত্রী, বিধবা মা ও ছোট ঐ বোন বাসস্তী। ছোট সংসার। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন
গগনবিহারী মধ্যে মধ্যে দুশো-একশো করে টাকা পাঠাতেন। মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র আনত
তবে সে চিঠি গগনবিহারীর লেখা নয়, তাঁর স্ত্রী নির্মাল্যর।

চাকরি-জীবনে গগনবিহারী যখন কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে পোস্টেড, সেই সময়ই
ওখানকার এক ধনী কন্ট্রাক্টর পুরোপুরি সাহেবী ভাবাপন্ন নির্মাল্যর বাবা যতীন মিত্রের
সঙ্গে আলাপ হয়।

আলাপটা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে মিত্র সাহেবের একমাত্র কনভেন্টে পড়া বিদুষী
কন্যা নির্মাল্যকে কেন্দ্র করে। সেই ঘনিষ্ঠতার ফলেই পরবর্তীকালে বিবাহ।

বিবাহের পূর্বে কিছু জানাননি মাকে বা দাদাকে গগনবিহারী। জানানো বোধ হয়
প্রয়োজনও বোধ করেননি। বিবাহের পরে একটা চিঠিতে দুলাইনে লিখে সংবাদটা
দিয়েছিলেন মাত্র। মা এবং ভাই দুজনেই অবিশ্য আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন গগনবিহারী ও
নির্মাল্যকে।

তারই কিছুদিন বাদে নির্মাল্যর চিঠি এল শাশ্বতির কাছে তাঁকে প্রণাম দিয়ে। শাশ্বতি
জীবিত থাকবার সময় বার-দুই নির্মাল্য বর্ধমানের সেই অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিল।
একবার দশদিন ও একবার সাতদিন কাটিয়েও এসেছিল সে শুশ্রবাড়িতে।

সুর্বীরের বয়স তখন বারো কি তেরো। স্কুলের ছাত্র।

আর একমাত্র বোন বাসস্তীর বয়স বছর-কৃত্তি। প্রাইভেটে সে মাত্রিক পাপ করে
বাড়িতে বসে লেখাপড়া, ছুঁচের কাজ ও অন্যান্য ঘরের কাজ করে।

সুবিনয়ের বাবা কল্যাণ সান্যাল ঐ সময় বিজনবিহারীর স্কুলে বাড়ুন টিচার হয়ে যান।
সেই সুত্রেই কল্যাণ সান্যালের সঙ্গে বিজনবিহারীর পরিচয় ও পুরু ঘনিষ্ঠতা হয়।

কল্যাণ সান্যাল বাসস্তীকে বিবাহ করে।

বিবাহ হ্রিৎ হওয়ার পর বিজনবিহারী ভাইকে চিঠি দিয়েছিলেন সব কখা জানিয়ে।
ছেলেটি যদিও স্কুলমাস্টার, সামান্য মাঝেনে পায়, তাহলেও লেখাপড়ায় ও চরিত্রে আদর্শ
মনে হয়েছিল বিজনবিহারীর।

গগনবিহারী, বলাই বাহ্য, সে চিঠির জবাব দেননি। তবে নির্মালা দিয়েছিল চিঠির জবাব ও পাঁচশো টাকা মনিপত্র করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এসব কথা সুবিনয়ের বন্ধু মামার মুখেই শোনা।

ঐ কাহিনী শেষের পর থেকেই সুবিনয়ের মনে ঐ মিলিটারি অফিসার বড়লোক মামার প্রতি কেমন যেন একটা বিত্তব্যর ভাব গ্রহণ জেগে ওঠে।

পরে আবিষ্টি এ মামার সঙ্গে বার-দুই দেখা হয়েছে তার।

একবার দিন্দীতে বছর সাতেক আগে, আর শেষবার লক্ষ্মৌতে বছর দুই আগে। এবং ঐ দেখ হওয়া মাত্রই—তার বেশি কিছু না।

গগনবিহারী তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন সুবিনয়কে— সে যেন তার মা ও ছোট বোনকে নিয়ে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতেই এসে ওঠে। গ্রামের বাসা আর রাখার দরকার নেই।

সুবিনয় চা পান করতে করতে তার মামার চিঠিটার কথাই ভাবছিল, এমন সময় সুবীর তার মামাতো ভাই এসে ঘরে ঢুকল।

সুবীর বলতে গেল তার চাহিতে বছর তেরোর বড়। কিন্তু ছোটবেলায় পাশাপাশি একই জায়গায় মানুষ হওয়ায় দীর্ঘদিন থেকেই পরম্পরের মধ্যে রীতিমত একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কলকাতায় দুজনে দু'জায়গায় থাকলেও মধ্যে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হত।

সুবীর ঘরে ঢুকতেই সুবিনয় বলে, এই যে সুবীরদা, এস। চা হবে নাকি!

বল।

সুবিনয় উঠে গিয়ে মেসের চাকরকে চেঁচিয়ে এক কাপ চা উপরে দিয়ে যেতে বলে আবার এসে চোকিটার উপর বসল।

সুবিনয় বললে, একটু আগেই তোমার কথাই ভাবছিলাম সুবীরদা।

সুবীর সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, কাকার একটা চিঠি পেয়েছি আজ সুবিনয়।

তাই নাকি? আমিও মামার একটা চিঠি পেলাম আজ ফিরে এসে।

কি লিখেছেন রে কাকা তোকে?

সুবিনয় চিঠিটা বালিশের তলা থেকে বের করে সুবীরের হাতে দিল, পড়ে দেখ না।

সুবীর চিঠিটা পড়ল। পড়ে ফিরিয়ে দিল আবার সুবিনয়কে।

ইতিমধ্যে চাকর এসে এক কাপ চা রেখে যায় ওদের সামনে।

সুবীর পকেট থেকে তার চিঠিটা বের করে সুবিনয়কে দিল, পড়ে দেখ আমি চিঠিটা।

মোটামুটি ঐ একই বয়ান দুটি চিঠির। দুজনের ওপরেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে তারা যেন অবিলম্বে গিয়ে বাড়ির কেয়ার-টেকার জার্নাল সিংহের সঙ্গে দেখা করে এবং বালিগঞ্জ টেরেসে গিয়ে গগনবিহারীর বন্ধু সোমেশ্বর বানাজীর সঙ্গে দেখা করে টাকা নিয়ে কিছু আসবাবপত্র পছন্দয়ত কিনে বাড়িটাকে সাজিয়ে বেশে। টাকার জন্মে যেন কৃপণতা কোন রকম না করা হয়। যে টাকাই লাগুক সোমেশ্বর দেবেন। তাকে চিঠিতে তিনি সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন কি করবে? সুবীর জিজ্ঞাসা করে।

সুবিনয় বলে, সব যত্নস্থা করতে হবে।

তাহলে?

সুবিনয় বললে, মামা সার্কিস মানুষ—সেরকম ব্যবস্থাই করতে হবে। এক কাজ কর
সুবীরদা!

কি?

তুমি কটা দিনের ছুটি নাও, আমিও নিই। দুজনে মিলে সব ব্যবস্থা করে ফেলি।

সুবিনয় ও সুবীর দুজনে মিলে ভাল নাম-করা ফার্নিচারের দোকান থেকে সব কিনে
এনে গগনবিহারীর সাদার্ন অ্যাভিনুর বাড়িটা সাজিয়ে ফেলল সাতদিনের মধ্যেই।

জানালা-সরঞ্জাম পর্দা, মেঝেতে কাপেট, বসবার ঘরে সোফা সেট, খাবার ঘরে ডাইনিং
ক্রিবেচ একটা ফ্রিজ, কিছু ক্রকারিস—কিছুই বাদ দিল না।

এবং দুজনে নির্দেশমত একদিন সাদার্ন অ্যাভিনুর বাড়িতে এসে উঠল।

একজন রাঁধুনী বামুন প্রিয়লাল ও ভৃত্য রতনকেও খুঁজেপেতে নিষ্কুল করল।

কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল, গগনবিহারীর দেখা নেই। কোন
চিঠিপত্রও আর এল না।

আরও দু'মাস পরে পৌষের এক সন্ধিয়ায় গগনবিহারী সোজা দিল্লী থেকে গাড়ি নিয়ে
এনে হাজির হলেন।

সুবীর তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। বাড়িতে সুবিনয় একাই ছিল।

সে রাত্রে কি রান্না হবে প্রিয়লালকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ গাড়ির হর্ণ শুনে উঠে দাঁড়াল সুবিনয়, কে এল আবার!

একতলার জানালাপথে উঁকি দিল সুবিনয়। নজরে পড়ল ধুলোভর্টি বিরাটি এক দঙ্গ
গাড়ি গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে নামল দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি। পরনে গরম সুট, মাথায় একটা মিলিটারি
ক্যাপ। মুখে পাইপ। আন্দজেই অনুমান করতে পেরেছিল আগন্তুক কে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বাইরে গেল সুবিনয়।

জানালা সিং ড্রাইভার বাহাদুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত
তখন।

সুবিনয় সামনে গিয়ে প্রণাম করতেই গগনবিহারী ওর মুখের দিকে তাকালেন, তুমি!

আজ্জে আমি সুবিনয়।

মনুর ছেলে তুমি?

সুবিনয়ের মায়ের ডাকনাম মনু।

আজ্জে।

আমার চিঠি পেয়েছিলে?

আজ্জে।

সব ব্যবস্থা করে রেখেছ?

হ্যাঁ।

চল। বেশ ভরাট গান্ধীর গলা।

দুজনে ডিতরের হলঘরে গিয়ে ঢোকে।

দাঁতে পাইপটা চেপে ধরে গগনবিহারী একবার চারিসিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেখতে
লাগলেন। লম্বা-চওড়া পুরুষ গগনবিহারী।

এককালে রীতিমত গৌরবণ্ণ ছিলেন, সুপুরুষ যাকে বলে দেখতে ছিলেন। কিন্তু এখন

যেন গায়ের রঙ কেমন তামাটে মনে হয়। মুখে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাঢ়ি।

চোখে কোন জ্বলান নেই। ছোট ছোট চোখ, খাড়া নাক, দুপাশে গালের হনু দুটো একটু সজাগ।

কপালে ব্যাসের বলিরেখা জেগেছে, যদিও দেহের মধ্যে কোথাও বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা যায়না। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল যেন সুবিনয়ের গগনবিহারী খুব অখুশি হননি, কিন্তু মডে সেটা প্রকাশ করলেন না।

চিরদিনই একটা চাপা প্রকৃতির মানুষ গগনবিহারী। কথাবার্তা কম বলেন, অবিশ্য সেটা পরবর্তী চারমাসেই বেশ জানতে পেরেছিল সুবিনয়। অতি বড় দুঃখেও যেমন কোন বাহিংপ্রকাশ নেই, তেমনি আনন্দের ক্ষেত্রেও তাই।

সিডি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন গগনবিহারী। সুবিনয় পিছনে পিছনে উঠতে লাগল।

সুবীরবাবু কই, তাকে দেখছি না?

এখনও অফিস থেকে ফেরেনি, সুবিনয় বললে।

আর কোন প্রশ্ন করলেন না। উপরে উঠে সব ঘুরে দেখলেন। তারপর গিয়ে শোবার ঘরের সংলগ্ন বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন।

পাইপটা বোধ হয় নিভে গিয়েছিল, পকেট থেকে একটা দামী লাইটার বের করে পুনরায় তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, সুবিনয়বাবু, আমার ড্রাইভার বাহাদুরকে একবার ডাকতে পার!

সুবিনয় তখনি গিয়ে নীচ থেকে বাহাদুরকে ডেকে নিয়ে এল।

বাহাদুরেরও বয়স হয়েছে, চাঁপিশের উর্ধ্বে বলেই মনে হয়। চ্যাপ্টা মঙ্গোলিয়ান টাইপের মুখ তবে নেপালীদের মত পরিষ্কার রঙ নয়, খানিকটা কালোর দিকে ঘেঁষা। চ্যাপ্টা নাক, খুদে খুদে চোখ। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় লোকটা সতর্ক ও ধূর্ত।

পরনে বট্ল-গ্রীন রঙের মিলিটারি ইউনিফর্ম। কোমরে খাপেভরা একটা ছোট ভোজালি। বাহাদুর সেলাম দিয়ে দাঁড়াল, সাব, আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। বাহাদুর, তুই নিচের তলায় থাকবি আর রামদেও এই ঘরের পাশের যে ঘরটা সেই ঘরে থাকবে। তোর সমনপত্র গুছিয়ে নে গিয়ে—

বহুত আচ্ছা সাব।

গাড়ি গ্যারেজ করে দিয়েছিস?

না সাব, গাড়ি পুঁছে পরিষ্কার করে গ্যারেজে তুলব।

ঠিক আছে, যা।

বাহাদুর চলে গেল।

তারপর সুবিনয়বাবু, তোমার মাকে আমার চিঠির কথা জানিয়েছিমে?

হ্যাঁ।

তা সে এল না কেন?

গগনবিহারী বুবাতে পেরেছিলেন বোধ হয় তাঁর বোন ক্ষেমের বাড়ি ছেড়ে আসেনি।

এলে সে ইতিমধ্যে এসে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।

মা শ্বামের বাড়ি ছেড়ে এসেন না, মনু গলায় সুবিনয় বললে।

কেন? ভদ্রমহিলার প্রেস্টিজে লাগত বুঝি?

সুবিনয় কোন জবাব দেয় না।

ভূয়ো প্রেস্টিজের মূল্য নেই, বুঝেছ! ঠিক আছে। আসেনি যখন তার আর আসার দরকার নেই। তা তোমাদের আমার এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

না। কষ্ট বিসের!

হ্যাঁ, নিজের বাড়ি এটা মনে করলেই আর কোন বামেলা থাকে না। তা এখানে রান্নাখানার কুকি ব্যবস্থা?

প্রবজন ভাল কুক পেয়েছি—প্রিয়লাল।

ও ইংলিশ ডিশ করতে জানে কিছু না বোল ভাল চচড়ি পর্যন্ত বিদ্যে?

জানে—সব রকম রান্নাই জানে।

এই সময় একটা গাড়ি এসে থামবার আওয়াজ পাওয়া গেল নীচে। তারপরই গুরুগঙ্গার একটা কুকুরের ডাক।

সুবিনয়ের হতচকিত ভাবটা কাটিবার আগেই বাঘের মত একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

কাম হিয়ার জ্যাকি!

কুকুরটা এগিয়ে এসে গগনবিহারীর কোলের উপরে দু'পা তুলে দিয়ে নানাভাবে তার প্রভুকে আদর জানাতে লাগল।

একটু পরে এসে ঢুকল রামদেও, গগনবিহারীর বহুদিনের পুরাতন এবং খাসভূত্য।

রামদেও জ্যাকিকে নিয়ে ট্রেনেই এসেছে।

রামদেও লক্ষ্মীর লোক।

দুপুরে জ্যাকি কিছু খেয়েছিল রে? জিজ্ঞাসা করলেন গগনবিহারী।

জী হাঁ।

জ্যাকি ইতিমধ্যেই গগনবিহারীর কাছে বসে পড়ে পা চাটছিল নিজের।

রামদেও?

জী সাব!

তুই এই ঘরের পাশের ঘরটায় থাকবি।

বহুৎ খুব সাব!

নিচে রান্নাঘরে গিয়ে দেখ ঠাকুর কি কি এনেছে, চিকেন না থাকলে চিকেন নিয়ে আয়, আর জ্যাকির জন্য মাংস।

সুবিনয় বলে, আমি টাকা দিচ্ছি—

তাহলে তাই যাও। টাকা দিয়ে দাও গো। আর চাকরটাকে বল ওর সঙ্গে যিচে বাজারটা চিনিয়ে দিতে।

চল রামদেও।

চলিয়ে সাব।

সুবিনয় এগুচ্ছিল, গগনবিহারী আবার ওকে ডাকলেন, শোন সুবিনয়বাবু!

কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ। সুবীরবাবুর ফিরতে কি এর চাইত্বেও বেশি রাত কর্য।

ঘড়িতে তখন রাত পৌনে আটটা।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে রাত দশটাও হয়ে যায় ফিরতে।

আর তোমার ?

আমারও হয়।

দেখ একটা কৃষ্ণ মনে রেখো আর সুবীরবাবুকেও বলে দিও, রাত চিক সাড়ে দশটায়
কিন্তু আমি জানান সিংকে কাল থেকে গেট বন্ধ করে দেবার জন্য বলব।

বেশ বলব।

আচ্ছা যাও।

সেবাত্তে সুবীর এল প্রায় পৌনে এগারোটায়। গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল
সুবীর, দোতলার উপর থেকে জ্যাকি গর্জন শুরু করে দিয়েছে। মুখ তুলে তাকাল সুবীর
দোতলার বারান্দার দিকে।

বারান্দার আলোয় চোখে পড়ল ড্রেসিংগাউন গায়ে কে একজন দীর্ঘকায় ঝুঁকি
বারান্দার রেলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে বাঘের মত একটা কুকুর ঘেউ
ঘেউ করছে।

উপর থেকেই ভারী গলায় সাড়া এল, হ কামস দেয়ার ?

সুবীর সাড়া দেয়, আমি সুবীর।

সুবিনয় জেগেই ছিল সুবীরের প্রতীক্ষায়, সে ততক্ষণে বের হয়ে গেটের কাছে এগিয়ে
গিয়েছে।

কে, সুবীরদা ?

হ্যাঁ।

এস ভেতরে।

কাকা এসে গেছেন বলে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ।

জ্যাকির ডাকাতাকি তখন থেমে গিয়েছে।

॥ দুই ॥

নিচের তলায় দুটো ঘরে সুবিনয় ও সুবীর নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সুবীর এসে
সুবিনয়ের ঘরে ঢুকল।

কখন এল রে ?

সন্ধ্যাবেলা। সুবিনয় বলল।

ঐ বাঘের মত কুকুরটাও সঙ্গে এনেছে নাকি ?

হ্যাঁ। আরও আছে—

আর কে এল আবার ?

ড্রাইভার কাম বডিগার্ড মেপালী বাহাদুর, আর এক্স-মিলিটারী প্যাস্টোরাল রামদেও।
হ্যাঁ।

সুবীর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে, তা থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে
তাতে অগ্নিসংযোগ করল। নিঃশব্দে গোটা-দুই টান দিল।

এখনও জেগে আছেন ?

বোধহয় তোমার ফেরবার প্রতীক্ষাতেই জেগে ছিলেন।

তাই নাকি।

তাই তো মনে হচ্ছে।

কেন?

বলে দিয়েছেন কাল গোটা নাকি রাত ঠিক সাড়ে দশটায় গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

গেট বন্ধ হয়ে যাবে!

হ্যাঁ।

তাহলুক এখানে আমার পোষাবে না সুবিনয়।

কটা দিন একটু তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা কর না।

আম তো তুই। রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটার আগে কোন ভদ্রলোক আজকালের দিনে বাড়ি ফিরতে পারে নাকি? ওসব আমার দ্বারা হবে না।

সুবিনয় মডু হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কিছু সুবিধে হল?

সুবীরের চাকরিটা টেম্পোরারী ছিল, মাসখানেক হল চাকরি গিয়েছে, সে আবার একটা চাকরির চেষ্টা করছে।

না।

নটরাজনের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

করেছিলাম।

কি বললে সে?

বললে এখনও কিছু স্থির হয়নি। এই পোষ্টার জন্য তোদের অফিসে দিন পনেরো বাদে একবার খোঁজ নিতে বলেছেন।

ঠিক আছে। আমাদের সার্কুলেশন ম্যানেজার মিঃ গিল বস্বে থেকে ফিরুক, তাকে আবার আমি বলব।

কবে ফিরবে রে?

দিন সাত-আট বাদে বোধ হয়।

এদিকে পকেট তো আমার গড়ের মাঠ! নেহাঁ থাকা-থাওয়ার ভাবনা নেই এখন—
পরশু পঁচিশ টাকা নিলে যে!

পঁচিশ টাকা একটা টাকা নাকি?

তা এত রাত হল কেন ফিরতে?

মিত্রাণীকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম।

সুবীর চরিত্রে একটু ঢিলেচালা, দিলদরিয়া ভাব, যা উপার্জন করে দু'হাতে খরচ করে।
কাল কি হবে তার জন্য কোন চিন্তাই নেই যেন।

পোশাক-পরিচ্ছদেও একটু বাবু গোছের।

সুবিনয় কিন্তু সুবীরের ঠিক বিপরীত। সঘঘী, গোছানো চিরদিনই
সুবিনয়!

কি?

কাল আমাকে আরও কিছু দিতে পারিস?

কত?

এই গোটা কুড়ি টাকা।

দেব।

মাসের শেষ, তোর অসুবিধা হবে না তো আবার?

না। চল ওঠ, এবার শুবে চল। না খেয়ে এসেছ!

বিশেষ কিছু থাইলি—একটা কাট্লেট আর এক কাপ চা। চল, খিদে পেয়েছে দারুণ।
ডাইনিং হলে দুজনে খেতে বসে।

চিকেন স্টুড পুড়িং দেখে খেতে বসে সুবীর বলে, আরে বাবা, এ যে রাজকীয়
ব্যাপার। জিম্মাল, এসব কখন রাঁধলি রে!

ক্ষমাত্তে কভাবাবুর বেয়ারা রেঁধেছে—রামদেও।

আই সি!

সুপ থেকে একটুকরো চিকেন তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে সুবীর বলে, রেঁধেছে তো
খাসা!

সুবীর চিরদিনই একটু ভোজনবিলাসী।

এই সময় জ্যাকি এসে ঘরে চুকে সুবীরের গায়ের গন্ধ শুঁকতে থাকে। ভয়ে সুবীর
সিঁটিয়ে ওঠে। হাত থেমে যায় তার।

বলে, ওরে বাবা, এটা আবার এখানে কেন?

সুবিনয় বললে, কিছু বলবে না। গন্ধ শুঁকে টিনে নিচ্ছে।

বিশ্বাসও নেই কিছু—সুবীর বলে।

জ্যাকি গন্ধ শুঁকে চলে গেল ঘর থেকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে ঘর থেকে বেরল। বারান্দায় আসতেই অন্ধকারে নজরে
পড়ে বারান্দার শেষপ্রাণে কে যেন আবছায়া দাঁড়িয়ে আছে।

সুবীর প্রশ্ন করে, কে? কে ওখানে?

আমি বাহাদুর হজুর।

সেই নেপালীটা বুঝি সুবিনয়? সুবীর শুধায়।

হ্যাঁ।

যে যার ঘরে গিয়ে অতঃপর খিল তুলে দিল।

জামা-কাপড় বদলে সুবীর ফিলিং-সুটো পরে নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের
আলো নিভিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

ভাল লাগছে না সুবীরের, কাল এখান থেকে চলে যেতে পারলে ভাল হত কিন্তু
উপায় নেই।

গত মাস থেকে চাকরি নেই। টেম্পোরারি চাকরি অবিশ্বি যাবে জানতই, তাছাড়া
ডেপুটি ম্যানেজার মিঃ সিংয়ের সঙ্গে আদৌ বনিবনা হচ্ছিল না।

হয়ত এত তাড়াতাড়ি চাকরিটা যেতও না, আর মাস দুই থাকত—কিন্তু সিং-এর সঙ্গে
হঠাতে সেদিন চটচটি হতেই পরের দিনই চাকরিটা গেল।

পরের দিন অফিসে গিয়েই নোটিস পেল। ডেপুটি ম্যানেজারের মোটিস।

মাইনে বুঝে নিয়ে তাকে চলে যেতে বলা হয়েছে।

সুবীরও চলে এসেছিস সোজা টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে।

চাকরি আজও একটা জোটেনি। তাহলেও এখানে সে থাকবে না।

থাকতে সে পারবেও না। তবে একটা চাকরি চাই সম্ভাগে। এখানে অস্তত থাকা—
খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিষ্ট ছিল সে। তাছাড়া মিআগীর হোস্টেলটাও কাছে।

শ্যামবাজার থেকে মাস দুই হল মিআগী কাছেই এখানকার একটা মেয়েদের হোস্টেলে

উঠে এসেছে।

হেঁটে যেতেই পারায় মিত্রাণীর হোস্টেলে।

মিত্রাণীর কথামনে পড়তেই অন্ধকারে সুবীরের ঠোটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে, বয়স কত হল মিত্রাণীর? মনে মনে একটা হিসাব করে সুবীর।

খুব কম ক্ষয়ও বিশেষ কাছাকাছি তো হবেই। চাকরিই তো করছে দশ বছর। এখনও মিত্রাণী ঘৰ বাঁধার স্বপ্ন দেখে। বেচারী! আজকের দিনে ঘর বাঁধার ব্যাপারটা যেন এতই সহজ!

মিত্রাণী এখনও জানে না বছর দুই আগেই তার পার্মানেন্ট চাকরিটা গিয়েছে। তারপর দু জায়গায় টেম্পোরারি কাজ করল। শেষ চাকরিটাও মাসখানেক হল গিয়েছে।

ব্যাপারটা জানলে অত উৎসাহের সঙ্গে বলত না, আমি আড়াইশো মত পাই, তুমিও তিনশো সাড়ে তিনশো পাও। দুজনের বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। একটা দুঃঘরওয়ালা ফ্ল্যাট।

নাঃ, একটা চাকরি যোগাড় করতে হবেই।

পরের দিন দেখা হল সুবীরের গগনবিহারীর সঙ্গে।

সামান্যই কথাবার্তা হল।

তার মধ্যে বিশেষ যে কথাটা সেটা হচ্ছে তার চাকরি ও উপার্জন সম্পর্কে।

তাহলে বি.এ.টা ও পাস করতে পারনি? গগনবিহারী বললেন।

পরীক্ষা দিইনি।

দিলে অন্তত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হত না। তা কোথায় চাকরি করছ?

ঐ একটা মার্চেন্ট অফিসে। কোনমতে ঠোক গিলে কথাটা উচ্চারণ করল সুবীর কতকটা যেন ভয়ে-ভয়েই।

মাইনে কত?

শ-দুই মত।

ঠিক আছে, যোগজীবন আসুক, তাকে বলব'খন তোমার কথা।

আমি তাহলে উঠি?

হ্যাঁ, এস।

সুবীর উঠে দু'পা এগিয়েছে, পিছন থেকে গগনবিহারী ডাকলেন, হ্যাঁ শোন, আর একটা কথা—

থেমে ঘুরে তাকাল সুবীর গগনবিহারীর মুখের দিকে।

রাত ঠিক সাড়ে দশটায় আজ থেকে কিন্ত গেট বন্ধ হয়ে যাবে, বুবেহঁ।

হ্যাঁ।

যাও।

সুবীর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নিচে এসে নিজের ঘরে ঢুকতেই দেখে সুবিনয় বসে আছে।

সুবিনয় জিজ্ঞাসা করল, কি বললেন মামা, সুবীরপা?

সুবীর খাটের উপর থপ করে বসে পড়ে বললে, ইল্পসিব্ল।

কি হল?

এখানে বাস করা আমার চলবে না সুবিনয়। এত কড়াকড়ি, এত নিয়মকানুন—এ তো কয়েদখানা!

একটা কথা বলুন সুবীরদা?

কি?

বলছিলাম ভাল একটা যা হোক চাকরিবাকরি না পাওয়া পর্যন্ত—

তাহলে আগেই মৃত্যুরেব ন সংশয়!

পাগলামি করো না সুবীরদা। যা বলি শোন, ছট করে একটা কিছু করে বসো না।
তাছাড়া রাজীব ওদেশ থেকে আর ফিরবে না, মামার যা কিছু তো তুমিই পাবে।

আমি?

হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কে আছে বল?

তাহলে বলুন সুবিনয় তুমি ভুল করেছ।

ভুল করেছি!

হ্যাঁ। আমি ঐ টীজটিকে এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে।

তার মানে?

মানে অতীব সরল, অতীব প্রাঞ্জল।

হেঁয়ালি রাখ তো।

শোন, ঘরে চুকে কি দেখলাম জান?

কি?

যত রাজ্যের বিলিতী আমেরিকান আর ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিন।

হ্যাঁ, সঙ্গে দু-বাক্স ভর্তি ম্যাগাজিন ও বইপত্র এসেছে কাল দেখছিলাম।

ঐ ম্যাগাজিনগুলো কিসের জানো?

কিসের?

যত নগ মেয়েদের মানে ন্যাংটো মেয়েদের ছবিতে ভরা। আর সেই ছবিগুলো বসে
উল্টে উল্টে দেখছেন তোমার মামাবাবু।

সত্যি!

এক বর্ণ মিথ্যে নয়। ঐ ম্যাগাজিনগুলো দেখে বুঝে নিয়েছি, ওঁর মনের অলিতেগলিতে
এই বয়সেও কোন রসের প্রবাহ চলেছে।

কিন্তু—

ছি ছি, বুড়ো হয়েছেন, সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছেন, এখনও ঐসব পর্ণগামী
নিয়ে মজে আছেন! এই মানুষ দেবে আমায় সম্পত্তি? একটি কপর্দকও নয়!

সুবিনয় আর কোন কথা বলে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যাই উঠি, অফিসের বেলা হল।

টাকাটা দিয়ে যেও কিন্তু—

হ্যাঁ, মনে আছে।

সুবিনয় উঠে পড়ল।

দিমচারেক বাদে এসেন যোগজীবন সাম্যাল, কলেজ-জীবনের সহপাঠী গগনবিহারীর
এবং দুজনের ঘণ্টে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। যোগজীবনও দীর্ঘদিন সেঁটুলের বড় চাকরি

করে রিটায়ার করেছেন। যোগজীবন একা আসেননি, সঙ্গে তাঁর ছাবিশ-সাতাশ বছরের
বোন শমিতা।

শমিতার গায়ের রংটা কালো হলোও সারা দেহ জুড়ে যেন একটা অপূর্ব যৌবনশ্রী।
যৌবন যেন সারা দেহে টেলমল করছে।

যেন উপচে পড়ছে কানায় কানায়। বেশভূষাও অনুরূপ।

শমিতা এম.এ পাশ—কোন এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপিকা।

ভালবেসে একজনকে বিবাহ করেছিল, কিন্তু সে বিবাহ দু'বছরের বেশি টেকেনি,
ডিন্ডোর্স হয়ে পিয়েছিল—সেও আজ বছর পাঁচকের কথা।

শমিতা এসেছিল নিজেই ইচ্ছা করে গগনবিহারীর সঙ্গে দেখা করতে, কারণ
যোগজীবনের বাড়িতে গগনবিহারীর ছাত্রজীবনে যখন যাতায়াত ছিল তখন থেকেই
বালিকা শমিতাকে চিনতেন গগনবিহারী।

যোগজীবনের ছেট বোন ওঁকেও দাদা বলে ডাকত। গগনবিহারী ভালও বাসতেন।

শমিতা যোগজীবনের সঙ্গে গগনবিহারীর ঘরে চুকে একেবারে হৈ-হৈ করে উঠল,
তোমার উপরে ভীষণ রাগ করেছি গগনদা।

কেন বল তো? গগনবিহারী হাসতে থাকেন।

চারদিন এসেছ অথচ একটিবার আমাদের ওখানে গেলে না দেখা করতে।

আর দু'দিন অপেক্ষা করলে না কেন? দেখতে যেতাম কিনা?

সত্ত্ব বলছ যেতে?

পরীক্ষা করা উচিত ছিল আগে।

যোগজীবন বলেন, শমির সঙ্গে তুমি কথায় পারবে না গগন।

গগনবিহারী নিঃশব্দে মন্দু মন্দু হাসেন আর দু'চোখের দৃষ্টি দিয়ে স্বল্প বেশবাসের ফাঁকে
ফাঁকে শমিতার যে উগ্র যৌবন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই যৌবনকে যেন উপভোগ করতে
থাকেন।

শমিতা এ সময় বলে, শোন গগনদা, দাদার সঙ্গে তোমার এখানে আসার আমার
আরও একটা উদ্দেশ্য আছে কিন্তু—

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

তা উদ্দেশ্যটা কি?

আমাদের একটা ক্লাব আছে—

ক্লাব! তা ক্লাবের নাম কি?

ক্লাবের নাম মরালী সঞ্জু।

বেশ নামটা তো!

যোগজীবন বলেন, ঐসব করছে আর কি! তা বাপু বলেই মেলে না গগনকে কি
করতে হবে!

পেট্রোন হতে হবে।

পেট্রোন?

হ্যাঁ।

গগনবিহারী হাসতে হাসতে বলেন, তা দক্ষিণ কত?

পেঁজ্জনের কোন ধার্য দাঙ্গণ্ড নেই—তাঁরা যা-ই দেবেন তাই গ্রহণীয় হবে।

সুবীর একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে।

যোগজীবন অঞ্চলে বলে গগনবিহারী তাকে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সুবীর দেখছিল তার কাঁকার দুচোখের লুক দৃষ্টি কেমন করে লেহন করছে শমিতার ঘোবনকে।

ঠিক আছে, বস—আসছি।

গগনবিহারী উঠে গেলেন এবং একটু পরে চেক-বইটা হাতে ঘরে এসে খস খস করে একটা দেড় হাজার টাকার চেক লিখে শমিতার দিকে চেকটা ছিঁড়ে এগিয়ে ধরলেন, নাও। চেকটায় একবার চোখ বুলিয়ে শমিতা বললে, মেনি মেনি থ্যাংকস। আজ সন্ধ্যায় তাহলে আসছ?

কিন্তু আমি তো তোমাদের ক্লাব চিনি না।

আমি নিজে এসে নিয়ে যাব, শমিতা বললে।

বেশ, কখন আসবে?

সাড়ে সাতটায়। আমি তাহলে এখন উঠি গগনদা!

এখুনি উঠবে কি, চা-টা খাও। সুবীর?

কাকা!

রামদেওকে চা দিতে বল।

সুবীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তার সমস্ত মনটা জুড়ে তখন একটা ভরস্ত উজ্জ্বল ঘোবন যেন নানা রংয়ের তুলি টেনে চলেছে!

চা-পর্ব শেষ হবার পর শমিতা চলে গেল।

গগনবিহারী তখন সুবীরের পরিচয় দিলেন, যোগজীবন, এই ভাইপোটির একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পার? তোমার তো অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে!

কতদুর লেখাপড়া করেছে? যোগজীবন প্রশ্ন করেন।

আরে তাহলে আর ভাবনা ছিল কি! আই-এ. পাস করে শর্টহ্যান্ড টাইপ-রাইটিং শিখেছে। অবিশ্য একটা অফিসে কাজ করছে, মাইনে তেমন সুবিধার নয়।

যোগজীবন বললেন, বলব'খন দু-একজনকে।

সুবীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তারপরও ঘন্টাখানেক দুই বন্ধুতে আলাপ-সালাপ হল।

দুজনেই স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে।

গগনবিহারীর তবু এক ছেলে আছে, যোগজীবনের তাও নেই।

যোগজীবন একসময় জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের খবর কি তোমার, ফিরতে কবে? সে আর ফিরবে না।

সে কি হে!

হ্যাঁ, সেখানেই বিয়ে-থা করে সংসার পেতেছে। যাক গে যা থুলি তার করুক।

আমার তো তবু শমিকে নিয়ে একরকম জীবন ক্রেতে আছে। তোমার তো তাহলে দেখছি একা একা খুবই কষ্ট হবে হে।

সেই জন্যেই তো ভাগ্নে আর ভাইপোটাকে এখানে এনে রেখেছি। গগনবিহারী বললেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় শমিতা এলু পগনবিহারীকে নিতে নিজেরই গাড়িতে।

সুবীর নিচের বামভাষ্য একটা আরাম-কেদারায় বসে একটা পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিনের পাতাটি উচ্ছেষ্ঠ।

মনে মনে সেও হির করে রেখেছিল কাকা গগনবিহারী বের হয়ে যাবার পরেই সে বেরবে।

শমিতা এল সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রায়। দূর থেকে দেখতে পেল সুবীর শমিতাকে। সকানের বেশভূষায় তবু তার কিছু আকৃ ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার বেশভূষায় সুবীরের মনে হল অঙ্গ বুঝ নেই।

পরচুলা দিয়ে উঁচু করে খোপা বাঁধা। পরনে ফিলফিলে দামী আমেরিকান নাইলনের শাড়ি, গলা ও বগলকাটা অনুরূপ এক জামা গায়—যার তলা থেকে ব্রেসিয়ার ও দেহের প্রতিটি ভাঁজ ও উদ্ধৃত উচ্ছল ঘৌবন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শমিতা তার সামনে দিয়ে উপরে চলে গেল এবং মিনিট কয়েক বাদে গগনবিহারীকে নিয়ে নেমে এল। গগনবিহারীও সাজের কসুর করেননি। দামী ঝু রংয়ের টেরিউল স্যুট, গলায় দামী টাই। দুজনে গাড়িতে উঠল, গাড়ি চলে গেল।

তারপর তিনটে মাস।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় গগনবিহারী বের হয়ে যান মরালী সঙ্গে এবং ফেরেন রাত সাড়ে এগারোটায়। রাত সাড়ে দশটায় গেট বন্ধ হয়ে যায়, তবে রাত সাড়ে এগারোটায় একবার খোলে। কাজেই সুবীরের কোন অসুবিধাই হয় না।

তাছাড়া যোগজীবনের চেষ্টায় সুবীরের একটা ভাল চাকরিও জুটে গিয়েছিল ইতিমধ্যে।

গগনবিহারী যেন এক নতুন মানুষ হয়ে উঠেন।

সুবীর ও সুবিনয় আরামেই কাটায়। গগনবিহারীর সঙ্গে তাদের বড় একটা দেখাই হয় না। ওরা যে দুজন ঐ গৃহে আছে তাও যেন গগনবিহারীর মনে পড়ে না।

মধ্যে মধ্যে গগনবিহারী যেদিন ঝুঁকে যান না শমিতাই আসে। রাত সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত থাকে সে এবং ঐ সময়টা একমাত্র রামদেও ব্যক্তিত কারও উপরে যাবার হকুম নেই।

সিঁড়ির নিচে বাহাদুর বসে থাকে।

সুবিনয় ও সুবীরের সঙ্গে জ্যাকির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে।

আরও তিন মাস পরে হাত্তাং আর একজনের আবির্ভাব ঘটল ঐ বাড়িতে। রামদেওর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কুক্সিণী।

কুক্সিণীর বয়স সতের কি আঠার। সবে ঘোবনে পা দিয়েছে। ঘোবন যেন টলমল করছে কুক্সিণীর সারা দেহে। দেহাতী গাঁয়ের মেয়ে হলে কি হবে কুক্সিণী বীতিমত চুল। লাজলজ্জার তেমন বালাই নেই। সারা বাড়ি সে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যায় সাজগোজ করে, খোপায় ফুল গোঁজে। শুনগুন করে শান গায়। কুক্সিণীর হান হল উপরেই রামদেওর ঘরে।

কুক্সিণী ঐ গৃহে আসবাব দিন কুড়ি-বাইশ বাদেই আকস্মিক ঘটনাটা ঘটল।

একদিন প্রাত্যুষে—

হঠাৎ বাহাদুরের চেঁচামেচিতে সুবিনয়ের ঘূমটা ভেঙে গেল।

সুবীর গতাত্ত্বে গৃহে ফেরেনি। সুবিনয়কে সে বলেই গিয়েছিল, রাত্রে হয়তো ফিরবে না—কোথায় এক বক্ষ বিয়েতে বরষাত্রী হয়ে যাবে।

সুবিনয় বাহাদুরের চেঁচামেচিতে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে জিঞ্জাসা করল, কি রে, ব্যাপ্তি কি?

সাব

বাহাদুর আর বলতে পারে না। গলা আটকে যায়।

কি হয়েছে সাহেবের?

সাব খতম হো গিয়া—

খতম হো গিয়া! সে কি রে!

হী। চলিয়ে—উপরমে চলিয়ে—

ত্বরিত শ্বলিত পদে সুবিনয় উপরে উঠে গেল।

গগনবিহারী আসবার পর থেকে আর সে উপরে ওঠেনি। প্রয়োজনও হয়নি তার।

গগনবিহারীর শয়নকক্ষে ঢুকে থমকে দাঁড়াল সুবিনয়।

ঘরের মেঝেতে গগনবিহারীর মৃতদেহটা পড়ে আছে। পিঠে একটা ছোরা বসানো আমূল—চাপ চাপ রক্ত চারদিকে জমাট বেঁধে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বোজে।

॥ তিন ॥

প্রায় মিনিট দশ-পনেরো লাগে সুবিনয়ের নিজেকে সামলে নিতে।

ধীরে ধীরে একসময় নিজেকে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সুবিনয়। আবার মেঝের দিকে তাকায়, পরনে গগনবিহারীর পায়জামা ও ড্রেসিংগাউন।

খালি পা। পায়ের চপ্পল জোড়ার একটা খাটের সামনে পড়ে আছে, অন্যটা মৃতদেহের পায়ের অঞ্চল দূরে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছেন গগনবিহারী। একটা হাত ছড়ানো, অন্য হাতটা দেহের নিচে; ঘরের মধ্যে সেন্ট্রাল টেবিলটা উল্টে পড়ে আছে। একটা অর্ধসমাপ্ত হোয়াইট হর্সের বোতল, একটা ভাঙা কাঁচের গ্লাস, গোটা-দুই সোডার বোতলও মেঝের মধ্যে পড়ে আছে।

সুবিনয় ভেবে ঠিক করতে পারে না অতঃপর তার কি কর্তব্য। সব যেন গেলমাল হয়ে যাচ্ছে।

বাহাদুর পাশেই দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। সে-ই বলে, অব কেয়া হোগা দাদাবাবু!

রামদেও কোথায়? এতক্ষণে যেন নিজেকে অনেকটা গুছিয়ে নিয়ে পেষ্টা করে সুবিনয়।

রামদেও!

হ্যাঁ, রামদেও কোথায়? সে তো রাত্রে পাশের ঘরেই থাকে?

রামদেও নেই হ্যাঁ।

নেই হ্যাঁ? কোথায় গেল সে জান?

মুঝে মাঝুম নেই হ্যাঁ দাদাবাবু। সুবেসেই উসকা পাত্তা নেই।

ওর বৌ জলিলী?

ଉ ତୋ ହାୟ ।

କୋଥାୟ ?

ଉସିକା କାନ୍ଦିଯାମେହି ହାୟ, ନିଦ ଯାତା ହାୟ ।

ଅଭିତକ ନିନ ଯାତା ହାୟ ! ଓକେ ଡେକେ ଆନ ।

ରାଜୁନ୍ଦର ଚଲେ ଗେଲ ଏବଂ ଏକଟୁ ପରେ ରଙ୍ଗିଳୀକେ ନିଯେ ଏସେ ଘରେ ଢୁକଲ । ରଙ୍ଗିଳୀ ଘରେ
ପା ଦିଲେହି ଭୃପତିତ ଗଗନବିହାରୀର ରଙ୍ଗାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାଣ ଦେହଟାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଅର୍ଧଶୁଟ ଏକଟା
ଚିତ୍କାର କରେ ଓଠେ, ଏ ମାଇୟା—ହାୟ ରାମ !

ଏହି ରଙ୍ଗିଳୀ, କାଳ ରାତ୍ରେ ତୁଇ ପାଶେର ଘରେହି ଛିଲି ତୋ ?

ହଁ, ଛିଲାମ ।

କୋନ ଶକ୍ତ ବା ଚିତ୍କାର ଶୁନିସନି ?

ହାୟ ରାମ ! ନେହି ଦାଦାବୁ, କୁଛ ନେହି ଶୁନା ।

ମିଥ୍ୟେ କଥା । ସୁବିନ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରେ ଓଠେ, ସତ୍ୟ କଥା ବଲ ?

ହାୟ ରାମ ! ସାଚ ବଲଛି ଦାଦାବୁ, ତୋର ଗୋଡ଼ ଲାଗି, ଆମି କିଛୁ ଜାନି ନା, କିଛୁ ଶୁନିନି ।

ରାମଦେଇ କୋଥାୟ, ତୋର ସ୍ଵାମୀ ?

କେନ, ମେ ତୋ ବାଡ଼ିତେହି ଆଛେ ।

ନା, ତାକେ ଦେଖି ନା । କୋଥାୟ ଗିଯେଛେ ମେ ?

କୋଥାୟ ଆବାର ଯାବେ ! ହୟତୋ ବାଜାରେ ଗିଯେଛେ ।

ଏତ ସକାଳେ ବାଜାରେ ?

ତବେ କୋଥାୟ ଯାବେ ?

ଏ ସମୟ ସୁବୀର ଏସେ ଘରେ ଢୁକଲ ହୃଦୟ ହେଲା । ମେ ବାଡ଼ି ଫିରେଇ ନିଚେ ଚାକର ଓ
ପ୍ରିୟଲାଲେର ମୁଖେ ଦୁଃସଂବାଦଟା ପେଯେଛି ।

ଘରେ ପା ଦିଯେ ସୁବୀର ବଲଲ, ଏ କି, କଥନ ହଲ !

ସୁବିନ୍ୟ ବଲଲେ, ମାଥାର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ଯେନ କେମନ କରଛେ ସୁବୀରଦା । ଚଲ ଚଲ, ଏ ଘର
ଥେକେ ବେର ହୟେ ଚଲ—ଏଥାନେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକା ଭାଲ ନୟ ।

ପୁଲିସେ ଏକଟା ଖବର ଦିଯେଛ ? ସୁବୀର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

ପୁଲିସ !

ହଁ, ଖୁନ--ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆମାଦେର ପୁଲିସକେହି ଖବର ଦେଓଯା ଉଚିତ । ଏମ । ଏହି ରଙ୍ଗିଳୀ,
ବାହିରେ ଯା !

ରଙ୍ଗିଳୀ ବାହିରେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ସୁବିନ୍ୟ ପାଶେର ଘରେ ଗିଯେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥାନାଯ ଏକଟା ଫୋନ କରେ ଦିଲ ଏବଂ ଥାନାଯ
ଫୋନ କରାର ପର ଯୋଗଜୀବନବାବୁକେଓ ଏକଟା ଫୋନ କରେ ଦିଲ ।

ଫୋନ କରେ ଦୁଜନେ ନିଚେ ଏସେ ବସଲ ସୁବିନ୍ୟର ଘରେ ।

ସୁବିନ୍ୟ ବଲଲେ, ଏଥନ କି ହବେ ସୁବୀରଦା ?

ପୁଲିସ ଏସେ ଯା ବ୍ୟବହା କରେ ତାଇ ହବେ ।

କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବେ ଝଟାଲି କେ ମାମାକେ ଖୁନ କରଲ ।

ଯେ ଭାବେ ବୁଡ଼ୋ ବ୍ୟାସେ ମାମା ମେଯେମାନ୍ୟ ନିଯେ ବେଳେଇଥିଲା ଶୁରୁ କରେଛିଲେନ, ଏମନ ଯେ
ଏକଟା କିଛୁ ହବେ ଆମି ବୁବାତେହି ପେରେଛିଲାମ । ତା ରାମଦେଇ ରଙ୍ଗିଳୀ କି ବଲେ—ଓରା ତୋ
ରାତ୍ରେ ପାଶେର ଘରେହି ଥାକେ ।

কুক্কুণী বললে মেঁ কিছু জানে না।

বললেই অমনি হল? পাশের ঘরে একটা মানুষ খুন হয়ে গেল, আর ওরা কিছুই জানে না? রামদেও কি বলে?

রামদেও নেই।

মেঁ জানে?

শাওয়া যাচ্ছে না তাকে সকাল থেকে।

তবে হয়তো ঐ বেটারই কীর্তি!

কি বলছ তুমি সুবীরদা?

কাকাবাবুর যা চরিত্র ছিল—হয়তো ঐ ছুকরি রামদেওর বোটার দিকে হাত বাঢ়িয়েছিলেন, দিয়েছে বেটা খতম করে!

না, না—

নচেৎ বেটা গায়েবই বা হবে কেন?

হয়তো ব্যাপারটা জানতে পেরে ভয়ে নার্ভাস হয়ে পালিয়েছে!

সুবীর মদু হাসল, ভূলে যেও না সুবিনয়, বেটা এককালে মিলিটারিতে চাকরি করত। কিন্তু ও তো মামার কাছে অনেকদিন থেকেই আছে।

হঁ, মেয়েমানুষের ব্যাপারে বিশ্বাস! দুনিয়াটা অত সহজ রাস্তায় চলে না হে সুবিনয়। অত্যন্ত জটিল। আমি তোমাকে বলে রাখছি, ঐ কুক্কুণী ছুঁড়াকে নিয়েই ব্যাপারটা ঘটেছে। তা গতরাত্রে মিস শ্রমিতা সান্যালাটি আর একটি চিজ!

শুনলাম তো এসেছিলেন কাল রাত্রে—

কে বললে?

রামদেওই বলছিল।

ঐ মিস শ্রমিতা সান্যালাটি আর একটি চিজ!

আধগন্টার মধ্যে থানা অফিসার অরুপ মুখাজ্জী এসে গেলেন। অরুপ মুখাজ্জী একেবারে ইয়ং নয়—বয়স প্রায় চালিশের কাছাকাছি, লম্বাচওড়া চেহারা। সঙ্গে জনাচারেক সিপাহীও আছে।

পুলিসের জিপের আওয়াজ পেয়েই সুবীর সুবিনয়কে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এন্দুড়িয়েছিল।

অরুপ মুখাজ্জী জিজ্ঞাসা করলেন, থানায় ফোন করেছিলেন কে?

সুবীর বললে, আমি স্যার।

আপনি?

আমি এই বাড়িতেই থাকি, আমার কাকা এক্স-মিলিটারি অফিসার কলেজ গগনবিহারী চৌধুরী খুন হয়েছেন।

কি করে খুন হল?

খুব সন্তুষ্ট স্ট্যাব্ড টু ডেথ।

ডেড বডি কোথায়?

দোতলায়।

চলুন।

ঐ সময় হঠাৎ দূরে কোথা থেকে ক্ষীণ একটা কুকুরের ডাক যেন কানে এল সিঁড়ি
দিয়ে উঠতে গিয়ে থাম-অফিসার অরূপ মুখাজ্জীর।

ডাকটা সুবীর ও সুবিনয়ের কানেও এসেছিল।

অরূপ মুখাজ্জী বললেন, একটা কুকুরের ডাক শুনছি যেন! এ বাড়িতে কোন কুকুর
আছে নাকি?

চুবিনয় বলে, হঁ স্যার, একটা আলসেসিয়ান কুকুর আছে।

কুকুরটা কার সুবিনয়বাবু?

মামার পোষা কুকুর।

মানে যিনি খুন হয়েছেন?

হঁ।

আশ্চর্য! এ বাড়িতে একটা কুকুর ছিল তাহলে? তা কোথায় কুকুরটা?

সুবিনয় বললে, তাই তো, কুকুরটা কোথায়?

সুবিনয় ও সুবীর তখন দুজনেই জ্যাকির নাম ধরে ডাকতে শুরু করে, জ্যাকি জ্যাকি!

কিন্তু জ্যাকি আসে না! জ্যাকির দেখা পাওয়া যায় না।

সুবীর বলে, আশ্চর্য, সত্তিই এতক্ষণ আমাদের একবারও জ্যাকির কথা মনে পড়েনি!
জ্যাকি কোথায় গেল?

একটা বাধের মত কুকুর।

জ্যাকির ডাক আবারও শোনা গেল।

ওরা সকলে সিঁড়ি থেকে নেমে এল। একতলাটা তরাতম্ব করে খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির
পিছনে মালির জন্য যে ঘর তৈরি করা হয়েছিল, অথচ কোন মালি না থাকায় এতদিন
যে ঘরটা খালি পড়েছিল সেখানে সকলে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির পিছনে যে জায়গাটা খালি পড়েছিল সেখানেই ছিল ঘরটা। ঘরটার মধ্যে বাড়ি
তৈরির সব জিনিসপত্র, কোদাল, শাবল, চুপড়ি, বালতি, লোহার রড, বাঁশ, দড়ি স্তুপীকৃত
করা ছিল এবং বাইরে থেকে তালা লাগানো ছিল। দেখা গেল সেই ঘরের তালা নেই,
একটা দড়ির সাহায্যে কড়া দুটো দরজায় শক্ত করে বাঁধা আর সেই ঘরের ভিতর থেকে
কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে, দরজার গায়ে নথের আঁচড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ডাকটা এবারে বেশ স্পষ্ট।

অরূপ মুখাজ্জী থমকে দাঁড়ালেন দরজার সামনে এসে।

কুকুরটা আপনাদের চেনে তো! সুবীর ও সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন
হঁ, স্যার। সুবীর বললে।

তাহলে আপনারই কেউ দরজাটা খুলুন তো!

সুবীরই এগিয়ে গিয়ে দরজাটার দড়ি খুলে দিল। ঘরটা অক্ষকার, একটা বিশ্বা ভাপসা
গন্ধ দরজাটা খুলতেই ওদের নাকে এসে যেন ঝাপটা দেয়।

জ্যাকি ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বের হয়ে এল দরজাটা খুলে দিতেই। কিন্তু তার
তেজ ও গতির ক্ষিপ্ততা যেন নেই আর।

কেমন যেন একটা মিয়ানো ভাব।

কুকুরটা কিন্তু ওদের দিকে তাকালও না, একবার অরূপ মুখাজ্জীর সামনে এসে ওর
গন্ধ ওঁকে সোজা ভিতরের দিকে চলে গেল।

সকলে ওরা অনুসরণ করে জ্যাকিকে।

জ্যাকি আগে চলেছে, ওরা তিনজন পিছনে পিছনে।

জ্যাকি ভিতরে চুকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে থাকে। পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওরা তিনজন।

জ্যাকি এসে একেবারে খোলা দরজাপথে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গগনবিহারীর শয়নভৱনে প্রবেশ করল, ওরাও ঘরে গিয়ে চুকল।

জ্যাকি ঘরে চুকে সোজা গিয়ে ভূপতিত গগনবিহারীর মৃতদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক শুঁকলো দেহটা, তারপর ইঁটু গেড়ে বসে পড়ল মৃতদেহের কাছেই একেবারে।

তারপরই হঠাৎ মুখ তুলে জ্যাকি কয়েকবার ডাকল। ডাকল শ্বীণ, ক্লান্ত কিন্তু দীর্ঘায়ত। মনে মনে যেন প্রভুর মৃত্যুতে কাঁদছে।

আশ্চর্য, জ্যাকির চোখে সত্যিই জল! সত্যিই জ্যাকি কাঁদছে!

তিনজনেই সেই করণ দৃশ্য দেখে একেবারে নির্বাক। বোবা যেন!

॥ চার ॥

যোগজীবন যখন ফোন্টা পেলেন সে সময় তিনি একা ছিলেন না। ঘরের মধ্যে দুজন ছিলেন। তিনি আর কিরীটী।

যোগজীবনের খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস বরাবরই, লেকের কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করার পর থেকে প্রত্যহ খুব ভোরে রাত থাকতে উঠে বেড়াতে চলে যেতেন লেকে।

সারাটা লেক হেঁটে চুক্র দিতেন এবং সূর্যোদয়ের আগেই ফিরে আসতেন আবার। কি গ্রীষ্ম, কি শীত—কখনও বড় একটা তাঁর ঐ রুচিমের ব্যতিক্রম হত না।

কিরীটি তার নতুন বাড়ি গড়িয়াহাটায় চলে আসবার পর খুব ভোরে উঠে লেকে বেড়াতে যেতে শুরু করেছিল।

সেইখানেই অনেকের সঙ্গে আলাপ।

যোগেশবাবু, দীরেনবাবু, মাস্টারমশাই প্রমোদবাবু, ফগীবাবু, দীনেশবাবু ও যোগজীবন—সবারই রিটায়ার্ড লাইফ।

অবসর জীবন যাপন করছেন।

যোগজীবনের সঙ্গেই কিরীটির একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে।

মধ্যে মধ্যে যোগজীবন আসতেন কিরীটির গৃহে, কিরীটি ও যেত যোগজীবনের গৃহে।

কিরীটির মাথায় আবার নানা ধরনের ফুলের গাছের শখ চেপেছিল, যোগজীবনেরও ফুলগাছের শখ। যোগজীবন প্রায়ই গাড়ি নিয়ে এদিক-ওদিক কলকাতার বাস্তু সব নাস্বারীতে যেতেন ফুলগাছের সঙ্কামে।

কিছুদিন আগে ক্রেটন ফুলের একটা চারা এনেছিলেন যোগজীবন। তাতে প্রথম ফুল ধরেছে—কথাটা লেকে বেড়াতে বেড়াতে শুনে কিরীটি যোগজীবনের সঙ্গে তার গৃহে এসেছিল দেখতে টবে ফোটা ফুলটা।

ফুল দেখার পর কিরীটি বললে, এটা ক্রেটন নয় যোগজীবনবাবু।

নয়! কিন্তু নাস্বারীর লোকটা যে বললে!

হয় সে ক্রেটন চেনে না, না হয় আপনাকে ঠকিয়েছে।

যোগজীবন হা হা করে হেসে ওঠেন, যাক গে, না জেনে ঠকেছি দৃঢ় নেই।

ভৃত্য এসে ঐ সময় বললে—চা দেওয়া হয়েছে।

যোগজীবনের লেক থেকে বেড়িয়ে সর্বাংগে এক কাপ চাওয়ের প্রয়োজন হয়। তিনি কিরীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন রায় সাহেব, চা খাওয়া যাক।

চলুন।

দুজনে বসে গল্প করতে করতে চা পান করছেন, ঐ সময় এল ফোন।

চক্ষুর এসে ফোনের কথা বললে।

যোগজীবন শোবার ঘরে গিয়ে চুকলেন।

ফোনে গগনবিহারীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তো একেবারে থ যোগজীবন! তাও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—খুন!

যোগজীবন মিনিট দশক বাদে বসবার ঘরে ফিরে আসতেই কিরীটি যোগজীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটু বিস্মিতই হয়।

কি ব্যাপার যোগজীবনবাবু? ফোনে কোন দুঃসংবাদ ছিল নাকি? ইউ লুক ভেরী মাচ পেল অ্যাণ্ড ডিস্টার্বড!

যোগজীবন চেয়ারটার ওপর বসতে বসতে বললেন, সত্যিই দুঃসংবাদ রায় সাহেব। আমার এক দীর্ঘদিনের বন্ধু, মাত্র কয়েক মাস আগে মিলিটারি থেকে রিটায়ার করে সাদান্ব অ্যাভিনুতে বাঢ়ি করে বসবাস করতে এসেছিল, সে—

কি হয়েছে তাঁর?

হি হাজ বিন কিল্ড!

কিল্ড! মানে হত্যা করেছে তাঁকে? কিরীটি প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, স্ট্যাবড টু ডেথ!

কোথায়?

তার শোবার ঘরেই, আমাকে তার ভাইপো সুবীর এখনি একবার যেতে বললে। আপনি বসুন, প্রস্তুত হয়ে আসি। ড্রাইভার তো এত তাড়াতাড়ি আসেনি, একটা ট্যাক্সি নিয়েই যাব ভাবছি।

যোগজীবন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটি তার পকেট থেকে চুরুট ও দেশলাই বার করে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করল।

যোগজীবন মিনিট পাঁচকের মধ্যেই ফিরে এলেন, চলুন।

রাস্তায় বের হয়ে কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। এমনিই হয়। দরকারের সময় হাতের কাছে কখনই একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

চলুন না, কাছেই তো। হেঁটেই যাওয়া যাক, কিরীটি বললে।

চলুন।

দূজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন।

রাস্তায় তখনও একটা বড় লোক-চলাচল শুরু হয়নি। খুব বেশ মাঝে সাড়ে-চুটা হবে।

আপনার বন্ধুর বাড়িতে কে কে ছিল যোগজীবনবাবু?

ওর স্ত্রীর আগেই মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র ছেলে বিশেষে সেকেন্ড করেছে—ইঞ্জিনিয়ার।

বাড়িতে এক ভাগে আর এক ভাইপো তাদেরই এনে রেখেছিল।

ভাড়া দেননি বুঝি?

না।

ফেন করেছিল একটু আগে আপনাকে আপনার বন্ধুর ভাইপোই না?

হ্যাঁ।

কি করেন ভদ্রলোক?

আমিই কিছুদিন আগে এক মারোয়াড়ী ফার্মে ভাল চাকরি করে দিয়েছি।

বয়স কত?

ত্রিশ বৎসর ইবে।

বিবাহিত?

নয়। বিয়ে-থা করেনি সুবীর আজও।

আর ভাগ্নে?

সুবিনয় সুবীর থেকে বছর দুই-তিনের বোধহয় ছোট। কোন একটা নামকরা ঔষধের প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, শুনেছি ভালই মাইনে পায়।

বাড়িতে চাকর-বাকর আছে কজন?

গগনের সঙ্গেই এসেছিল তার নেপালী ড্রাইভার বাহারুর—ভৃত্য রামদেও। রামদেও লোকটা মিলিটারিতে চাকরি করত, খুব বিশ্বাসী এবং গগনের খুব প্রিয়। কেয়ার-টেকার ও দারোয়ান জার্নাল সিং আর এদেশীয় ভৃত্য রতন ও কুক প্রিয়লাল। হ্যাঁ, আর একটি জীব আছে।

জীব?

একটি আলসেসিয়ান কুকুর—জ্যাকি।

কুকুরটা কার?

গগনেরই। গগনের সঙ্গেই এসেছে। বাঘের মতন কুকুর।

আশ্চর্য!

কি বললেন?

বলছি অমন একটা কুকুর বাড়িতে, তবু ঐ রকম দুর্ঘটনা ঘটল!

আমিও তো তাই ভাবছি রায় সাহেব।

মানুষটি এমনিতে কেমন ছিলেন—মানে বলছি কোন রকমের ভাইস ছিল কি?

না। সে রকম কিছু আমি অজ্ঞ জানি না। অবিশ্য এমনিতে একটু সেলফসেন্টার্ড, লোকজনের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। তবে ইদানীং শুনতাম শমিতাদের ক্লাবে প্রতাহ প্রায় যেত।

শমিতা কে?

আমার বোন।

বয়স কত?

বেশি নয়, বছর ছাবিশ-সাতাশ হবে। ভবতারিণী কলেজে ইংলিশের প্রফেসার।

ক্লাবটার নাম কি?

মরালী সঙ্গ।

মরালী সঙ্গের নাম শুনে কিরীটী যোগজীবনের দিকে তাকাল, কারণ ক্লাবটার নাম সেও শুনেছিল। বালীগঞ্জ অঞ্চলেই ক্লাবটা। শহরের অঞ্চল ধরী প্রোচ ও তথাকথিত অভিজ্ঞাত পরিবারের যুবক-যুবতী মিলে ক্লাবটা গড়ে তুলেছে। ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবাই। ক্লাবে কিরীটী শুনেছিল নানা ধরনের খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে

চালোয়া মদাপানও চলে। মধ্যে মধ্যে আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করে।

সাধারণ স্তরের লোকের সেখানে প্রবেশ অধিকার পায় না।

আপনার বোন বুবি ক্লাবের মেম্বার?

মেম্বার মানে—জিন প্রধান পাণ্ডা। লেখাগড়া আর ক্লাব নিয়ে তো আছে হে-টে
করে! আমিও আপত্তি করিনি। থাক।

বিয়ে থা হ্যানি?

হ্যানি, কিন্তু বছর দুই হল ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।

আবার বিয়ে-থা করলেন না?

না। ভালবেসে বিয়ে করেছিল কিন্তু তাও টিকল না দু'বছরের বেশি।

কিরীটী কোন কথা আব বলে না। ইতিমধ্যে ওরা গগনবিহারীর বাড়ির গেটের সামনে
পৌছে গিয়েছিল।

যোগজীবন বলেন, এই বাড়ি।

কিরীটী লক্ষ্য করল দুজন লাল পাগড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। তারা ওদের প্রবেশে
বাধা দিল না।

বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা করুণ দীর্ঘায়ত কুকুরের ডাক ওদের কানে
এল। কিরীটী বললে, কুকুরটা কাঁদছে!

যোগজীবন কিছু বললেন না।

দুজনে এগিয়ে গিয়ে গাড়িবান্দায় উঠল।

ভৃত্য রতন ও বাহাদুর সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। যোগজীবনকে দেখে বাহাদুর সেনাম
দিল, বাবুজী!

বাহাদুর?

সাব চলা গিয়া বাবুজী! বাহাদুরের গলায় কান্নার আভাস। চোখে জল।

কেইসে হ্যা কুছ পাতা মিলা বাহাদুর?

নেই বাবুজী, আভিতক সময় মে নেই আতা হ্যায় এইসা কেইসে হো সেকতা!

তুমি তো কাল রাত্রে বাড়িতে ছিলে?

জী।

রামদেও-ও কিছু জানে না? সেও কিছু বলতে পারছে না? যোগজীবন আবার প্রশ্ন
করলেন।

রামদেওকো পাতাই নেই মিলতা বাবুজী সুবেসে!

কেন, সে কোথায় গিয়েছে?

কা জানে কিধার গিয়া, আভিতক নেই লোটা।

ওর বৌ—জেনানা কোথায়?

উপরমে হ্যায়।

ওর বৌ তো পাশের ঘরেই থাকত, সেও কিছু বলতে পারছে না?

নেই বাবুজী, বেচারী রোকা হ্যায় শুনকর।

কিরীটী এ সময় প্রশ্ন করে, রামদেওর বৌ এখনে থাকত নাকি?

হ্যায়। বেটার তৃতীয় পক্ষের বৌ, কিছুদিন হল এসেছে এখানে।

বয়স তো তাহলে থুব আৱ?

Ganbeij.net

হ্যাঁ, ঘোল-সতের হবে।

দেখতে কেমন?

দেখতে মোটামুটি ভাট্টাই।

চলুন উপরে যাওয়া যাক, কিরীটী বললে।

সিডি দিয়ে উপরে উঠে বারান্দায় পৌছতেই সুবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এটি যে স্থার, আপনি এসে গিয়েছেন, যান ভিতরে গিয়ে দেখুন, কাকা—কথাটা শেষ করতে পারে না সুবীর, কারায় যেন তার গলাটা বুজে আসে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবীরকে দেখছিল।

বেশ সুন্দরই চেহারা, তবে রোগা। গায়ের রং সুবীর বংশের ধারা অনুযায়ীই পেয়েছিল। রীতিমত ফর্মা। মাথাভর্তি চুল ব্যাকব্রাস করা, তারই মধ্যে দু-একটা রূপালী চুল চোখে পড়ে। চোখ দুটি বড় বড়, টানা টানা। উন্নত নাসা। ধারালো চিবুক। চোখে সৌখিন ফ্রেমের চশমা।

পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। ইতিমধ্যে সুবীর বাইরের বেশ বদলে ফেলেছিল।

কিরীটাই প্রশ্ন করে, বাইরে পুলিস দেখলাম, থানার ও সি এসেছে বোধহয়?

হ্যাঁ, মিঃ মুখাজী।

অরূপ, না?

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সুবিনয় বাইরে এল এই সময় ঘর থেকে।

রায় সাহেব—এই সুবিনয়, গগনের ভাগ্নে।

কিরীটী তার অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নেয় সুবিনয়ের সর্বাঙ্গে।

বেশ হস্তপুষ্ট চেহারা। গায়ের রংটা একটু চাপা। মাথার চুল রুক্ষ, বিশ্রস্ত। চোখেমুখে একটা দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে যেন। পরণে একটা লুঙ্গি, গায়ে গেঁঞ্জি। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিমুণ্ড।

আপনি এসেছেন! যোগজীবনের দিকে তাকিয়ে বলে সুবিনয়, যান ভিতরে যান, থানা-অফিসার ভেতরেই আছেন। কথাটা বলে সুবিনয় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকায়।

কিরীটী যোগজীবনকে বললে, চলুন সান্যাল মশাই, ভেতরে যাওয়া যাক।

হ্যাঁ, চলুন।

দুজনে এগিয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

মৃতদেহ পরীক্ষাপ্রস্তুতি অরূপ মুখাজী তখন ঘরের চারদিকে সবকিছু খুটিমেখুটিয়ে পরীক্ষা করছিল। যোগজীবন আগে ও পরে কিরীটী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

পদশব্দে চোখ তুলে তাকাতেই অরূপের সঙ্গে কিরীটীর চোখাচোখ হল, অরূপের চোখের তারা দুটো যেন আনন্দে চকচক করে ওঠে।

মিঃ রায়, আপনি।

নতুন থানায় বদলি হয়ে এসে অরূপ কিরীটী তার অলাকাতেই আছে জানতে পেরে নিজেই একদিন গিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করে এসেছিল।

কাজেই পরম্পরার পরম্পরারের কাছে তারা অপরিচিত নয়।

কিরীটী যোগজীবনকে দেখিয়ে বললে, হ্যাঁ অরূপ, উনি আসবার সময় আমায় ধরে নিয়ে এলেন, ফোনটা যখন আমি ওঁর ওখানে বসে চা খাচ্ছিলাম।

খুব ভাল হয়েছে আপুনি এসেছেন। কিন্তু উনি—ওঁর পরিচয়? অরূপ যোগজীবনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলে,

যোগজীবন সন্মাল, রিটায়ার্ড লাইফ লিড করছেন। কাছাকাছিই বাড়ি। গগনবিহারীর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আইসি! আপনাকে বুঝি ফোনে সংবাদ দিয়েছিল কেউ? যোগজীবনকে প্রশ্ন করে অরূপ।

হ্যাঁ। ফোন পেয়েই তো আসছি।

কে ফোন করেছিল?

সুবীর, গগনের ভাইপো।

কিরীটী ইতিমধ্যে ভূপতিত মৃতদেহটার সামনে এগিয়ে গিয়েছিল।

মৃতদেহের সামনে তখন জ্যাকি বসে আছে।

সে তাকালও না।

পৃষ্ঠদেশে ছোরাটা আমূল বিন্দু হয়ে আছে। খানিকটা বাঁদিক ঘেঁষে ছোরাটা বিন্দু করা হয়েছে। বোঝা যায় ঐ ছুরিকাঘাতেই সন্তুষ্ট মৃত্যু হয়েছে গগনবিহারীর।

একটু দূরে দামী খাট, উপরে আধুনিক ডিজাইনের শয়া, শয়ার চাদর এলোমেলো, বালিশ দুটোও যথাস্থানে নেই। খাটের নিচে খানিকটা জায়গা জুড়ে মেঝেতে দামী একটা কাপেটি বিছানো, বাকি মেঝেটায় কোন কাপেটি নেই।

সাদা কালো ডিজাইনের মোজাইক টাইলসয়ের মেঝে ঘরে। বাকঝাকে পরিষ্কার মেঝে। খাটের হাত পাঁচেক দূরে মৃতদেহটা উত্তর-দক্ষিণ ভাবে কোণাকুণি পড়ে আছে।

বড় সাইজের মিরার বসানো একটা গডরেজের স্টীলের আলমারির গা ঘেঁষে।

কিরীটী নিচু হয়ে বসল মৃতদেহের সামনে। ঢোকেমুখে মৃতদেহের যেম একটা সুস্পষ্ট যন্ত্রণার চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে আছে।

বুকের ছোরাবিন্দু রক্তাঙ্গ ক্ষতহৃন্ত ছাড়া মৃতের ডানদিককার গালে একটা সরু লম্বা ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ল, তান হাতটা মৃতের মুঠো করা।

হাতের পাতায় খানিকটা রক্ত জমে আছে কালো হয়ে।

কিরীটী মৃতদেহের বন্ধ মুঠি খোলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। কি যেন একটা চকচক করছে মুঠির মধ্যে, ওর নজরে পড়ে। রাইগার মটিস সেট ইন করেছিল মৃতদেহে

চকচকে বস্তুটি কোনমতে বন্ধ মুঠি থেকে বের করতে গিয়ে ভেঙে গেল।

কিরীটী সেই ভাঙা বস্তুটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার দেখল ভাল করে জিনিষটা কি? ঠিক বুঝতে পারল না।

অরূপ পাশেই দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল, জিঞ্জাসা করল, কি ওটা কি? রায়!

মনে হচ্ছে একটা ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো।

ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো!

তাই তো মনে হচ্ছে।

কিরীটী রেখে দিল পকেটের মধ্যে ভাঙা চুড়ির টুকরোটা।

হাতের মুঠোর মধ্যে কোথা থেকে এল ওটা?

কিরীটী মুদু হেসে বললে ক্ষয়তো কোন পলাতকা প্রেয়সীর চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল
তদলোকের হাতের মুঠোর মধ্যে !

কি বলতে চান্ত মিং জায় ?

কিরীটী কিন্তু অক্ষেপ মুখার্জীর সে প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। সে তখন ঘরের
চারিদিক তৈরী সম্পত্তি দেখছে।

ঘরটা বেশ বড় সাইজের। দক্ষিণ ও উত্তরমুখী দুটো দুটো করে বড় সাইজের ডবল
পান্নার জানালা, জানালায় গ্রিলস বসানো। ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। ঘরে দুটো দরজা,
একটা পাশের ঘরে যাবার তার মধ্যে।

কিরীটী বাথরুমের মধ্যে গিয়ে চুকল ঘর থেকে। ইটালিয়ান টাইলস দিয়ে বাথরুমের
দেওয়ালের অর্ধেকটা মোড়া, মেঝে মোজাইকে। মন্ত বড় একটা বাথটব। আয়না বসানো
দেওয়ালে। আয়নার নিচে কাঁচের সেলফ। সেলফের উপরে সেভিং সেটস—সেভিং ক্রিম,
ব্রাস, টুথপেস্ট, টুথব্রাস, টাংগ ক্লিনার, চিরনি ও ব্রাস, সেভিং লোসন, ল্যাভেণ্ডার প্রে,
নেইল কাটার সয়ন্নে সাজানো।

সবই পরীক্ষা করে দেখল কিরীটী—দামী ও বিলিতি। খুঁ রংয়ের একটা বেসিন।
টাওয়েল র্যাকে খুঁ রংয়ের একটা টার্কিশ টাওয়েল এলোমেলো ভাবে বোলানো।
টাওয়েলটা তুলে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে নজরে পড়ল কিরীটীর, ফিকে লালচে
অনেকটা ব্রাউন রংয়ের ছোপ ছোপ দাগ টাওয়েলের মধ্যে।

কিরীটী ঝুঁকে পড়ে বেসিনটা দেখতে লাগল। বেসিনের কলটা ভাল করে বোধ হয়
টাইট করা নেই, ক্ষীণধারায় জল পড়ে যাচ্ছিল তখনও।

বেসিনের সাইডে সাবান রাখবার জায়গায় সাবানটাও ঠিকভাবে রাখা নেই মনে হয়
যেন। সাবানটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে দেখল কিরীটী, দামী গুরুত্বালা সাবান। সাবানটাও
বিলিতি মনে হয়।

বাথরুমের ফ্লোরে এখানে ওখানে জল তখনও জমে আছে।

ব্র্যাকেটে একটা ড্রেসিংগাউন ঝুলছে।

পুনরায় কাঁচের সেলফটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ কিরীটীর নজরে
পড়ল মাথার চিরনির গায়ে কয়েকটা বড় বড় চুল আটকে আছে।

চিরনি থেকে চুলগুলো ছাড়িয়ে একটা কাগজে মুড়ে কিরীটী পকেটে রেখে দিয়ে
বাথরুম থেকে বের হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বাথরুমে মেখরদের যাতায়াতের যে দরজাটা তার পান্না দুটো ভেজানো থাকলেও
ভিতর থেকে খিল দেওয়া নেই। খোলা।

কিরীটী দরজার পান্না দুটো টেনে খুলতেই নজরে পড়ল ঘোরানো বোতাম সিডিটা।
এ সিডিই মেখরদের বাথরুমে আসা-যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাথরুমের দরজাপথেই কিরীটীর নজরে পড়ে বাড়ির পিছনদিকে বেশ খানিকটা
খোলা জায়গা, ঘাস ও আগাছায় ভর্তি। দূরে প্রাচীর ঘেঁষে ঘোৰাবাবে ছোট একটা ঘর।

চারিদিকে দেখে কিরীটী দরজাটা টেনে দিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এল আবার।
ঘরের চারিদিক নজর করে আবার দেখে, একটা দামী সিঙ্গল থাট, একটা গোদরেজের
আলমারি, ওয়ারড্রোব, তার উপরে একটা বৃক্ষমূর্তি ও একটা কাঠের হাতি।

অরাপ।

কিছু বলছিলেন? কিরীটির ভাকে ওর দিকে তাকাল অরূপ কথাটা বলে।
তোমার সব জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছে?

না।

তাহলে শুরু করে দাও!

আপনি এখন চলে যাবেন?

না। তোমার জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হোক, তারপর যাব।

তাহলে চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

চিঠি বড়ি সরাবার ব্যবস্থা করেছ?

করেছি, ফোন করে দিয়েছি।

পাশের ঘরে এসে সকলে বসল। ওটাই বসবার ঘর। চমৎকার ভাবে সাজানো।
একপাশে ফোনও আছে।

যোগজীবনবাবু কাঁদছিলেন। চোখ দুটো তাঁর লাল হয়ে উঠেছিল। কিরীটি যে
সোফাটার বসে, যোগজীবনবাবু সে সোফাতেই কিরীটির পাশ যেঁধে বসলেন।

রায় সাহেব! যোগজীবনবাবু রংবু গলায় ডাকলেন।

বলুন?

এ কি হল বলুন তো! গগনকে এমন নিষ্ঠুরভাবে কে হত্যা করল? যোগজীবন যেন
কানা রোধ করতে পারছিলেন না।

আমি বুঝতে পারছি সাম্যাল মশাই, বন্ধুর মৃত্যুতে খুব শক্তি হয়েছেন, তবে—
কি তবে?

ওঁর মৃত্যুর—মানে আপঘাত মৃত্যুর জন্য আমার মনে হচ্ছে যেন উনিই দায়ী!

গগন নিজে দায়ী?

তাই তো আপত্ত মনে হচ্ছে আমার।

কেন?

কিরীটির জবাবটা আর দেওয়া হল না, সুবিনয় এসে ঘরে ঢুকল।

অরূপ সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বসুন সুবিনয়বাবু।

সুবিনয় বসল।

আপনিই তো প্রথম দেখেন মৃতদেহ, তাই না?

না মিঃ মুখার্জী, আমি না, বাহাদুর। সেই প্রথমে দেখে, দেখে আমাকে ডেকে আজুন
হঁ। কাল রাত্রে আপনি তো বাড়িতেই ছিলেন?

হ্যাঁ। কাল শনিবার ছিল, বেলা চারটো নাগাদ অফিস থেকে ফিরে আসি^{টারঙ্গ} আর
বের হইনি। নিচে নিজের ঘরেই ছিলাম।

কথন শুতে যান?

আমার বরাবর একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াই অভ্যাস রাখে। দশটা নাগাদ শুয়ে
পড়েছিলাম।

আর সুবীরবাবু?

সে বিকেলেই সেজেগুজে বের হয়ে গিয়েছিল, আজ সকালে ফিরেছে। রাত্রে বাড়িতে
ছিল না।

আর আপনার মামা গগনবাবু? তিনি কাল বের হননি কোথাও?

মামাও কাল বের হননি
কেউ তাঁর কাছে এসেছিল?

হ্যাঁ। রাত তখন বোধ কুরির সাড়ে নটা কি পৌনে দশটা হবে—ঠিক সময়টা মনে নেই,
আমার খাওয়া হয়ে ঘুমোবার পরই শমিতা দেবী এসেছিলেন।

কথাটা সুবিনয় শেষ করল একবার আড়চোখে কিরীটীর পাশ্বে উপবিষ্ট যোগজীবনের
দিকে তাকিয়ে।

অত রাত্রে শমিতা দেবী এসেছিলেন!

হ্যাঁ, প্রায়ই তো আসতেন। তবে ইদানীং হণ্টাখানেক আসছিলেন না, মামাও বের
হত্তেন না সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে দেখছিলাম।

শমিতা দেবী কে? অরূপ প্রশ্ন করল।

যোগজীবনবাবুর বোন!

অরূপ যোগজীবনবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

যোগজীবনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার বোন। গগন ওকে ছোটবেলা থেকেই চিনত।
তাছাড়া শমিতাদের মরালী সঙ্গের পেট্রোন ছিল গগন।

গগনবাবুর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের পরিচয় বলুন তাহলে?

হ্যাঁ, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আমাদের পরম্পরের।

আচ্ছা, শমিতা দেবী বিবাহিত, না অবিবাহিত?

জবাবটা দিল সুবিনয়ই, বিবাহ করেছিলেন তবে বছর দুই আগে ডিভোর্স হয়ে
গিয়েছে। মামাবাবুর সঙ্গে বেশ ভাল পরিচয়ই ছিল শমিতা দেবীর।

তা কখন শমিতা দেবী চলে যান আবার রাত্রে?

বলতে পারি না। আমি ঘুমোবার পর হয়তো চলে গিয়েছিলেন। বাহাদুর বলছিল—
কি বলছিল?

রাত এগারোটা নাগাদ নাকি কাল গিয়েছিলেন শমিতা দেবী।

আপনি জানতে পারেননি কখন গিয়েছেন?

না।

আপনি তাহলে জানতেই পারেননি কখন শমিতা দেবী চলে গেলেন? কিরীটীই প্রশ্নটা
করে আবার।

না।

আচ্ছা সুবিনয়বাবু—

বলুন।

আপনার মামার একমাত্র ছেলে তো বিলেই সেটেলড। শুনেছিলাম আর ফিরবে
না?

সেই ব্রকমই শুনেছি।

আপনার মামাকে তাঁর সম্পর্কে কখনও কিছু বলতে শুনেছেন?

না।

তিনি চিঠিপত্র তিখতেন না তাঁর বাবাকে?

না, শুনিনি কখনও।

তাহলে তো দেখা যাচ্ছে গগনবাবুর যা কিছু আছে, এই বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি

Digitized by srujanika@gmail.com

টাকাকড়ি সব কিছুর ওয়াবিশন আপনি ও সুবীরবাবুই?

তা আমি কি করে বলব কাকে তিনি সব কিছু দেবেন বা না দেবেন!

উইল-টুইল কিছু করেছিলেন?

মাসখানেক আগে শুনেছি উইল করেছিলেন মামাবাবু।

কার কাছে শুনলেন?

সুবীরবাবু খুঁথে।

তিনি কেমন করে জানলেন কথাটা?

জানি না।

জিজ্ঞাসা করেননি?

না।

আরূপ, সুবিনয়বাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

আপাতত না। আপনি সুবিনয়বাবু এখন যেতে পারেন। সুবীরবাবুকে পাঠিয়ে দিন এ ঘরে।

সুবিনয় চলে গেল, আর একটু পরেই সুবীর এসে ঘরে ঢুকল।

আরূপই প্রশ্ন শুরু করে, সুবীরবাবু, কাল রাত্রে শুনলাম আপনি এ বাড়িতে ছিলেন না?

না।

কোথায় গিয়েছিলেন?

এক বন্ধুর বানের বিয়েতে বেলগাছিয়ায় গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরতে পারিনি। সকালে ফিরেই তো ব্যাপারটা জানতে পারলাম।

কিরীটি ঐ সময় বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় থানায় ফোন করেন!

ঠিক তখনি ফোন করিনি, কিছুক্ষণ বাদে করি।

আচ্ছা সুবীরবাবু, শমিতা দেবীকে আপনি চিনতেন?

চিনতাম বৈকি। তিনি তো এখানে কাকার কাছে প্রায়ই সন্ধ্যায় আসতেন!

দিনের বেলায় আসতেন না?

হ্যাঁ, আসতেন।

আপনার কথনও কোন কোতৃহল হয়নি, কেন ঘন ঘন শমিতা দেবী আপনার কাকার কাছে আসতেন!

শুনেছিলাম ওঁদের ঝাবের উনি পেট্রোন একজন। তা ছাড়া ওঁদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। দুজনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না?

সুবীর ইতস্তত করে। কিরীটির পার্শ্বে উপবিষ্ট যোগজীবনের দিকে তাকায়।

বলুন না। ওঁকে দেখে কোন সংকোচের আপনার কারণ নেই। যা বলতে চান বলুন!

আপনি যখন বললেন বলতে বলছি, ওঁর বন্ধু—আমার পজনীয় কাকা, তা হলেও বলব তাঁর অঞ্জ বয়সের ত্রীলোকদের ওপরে কেমন একটা দুর্ভাগ্য ছিল, প্রশ্ন ছিল।

আপনার চোখে কথনও কিছু পড়েছে?

না।

তবে? একথা আপনার মনে হয়েছিল কেন?

চোখে না পড়লেই কি সব কথা সব সময় অঙ্গীকার করতে পারি আমরা। সুবীর

বললে।

তা অবিশ্য ঠিক। তুম বুঝতেই পারছেন আমি আর একটু স্পষ্ট করে শুনতে চাই। কথাটা আপনার মুখ থেকে!

সুবীর এবাবে একধারে একটা বুক-কেসের উপরে সাজানো ম্যাগাজিনগুলো দেখায়ে বলে, এ—ম্যাগাজিনগুলো একবার উল্টেপাল্টে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। সব নূড় পিকচার্স ভর্ত— সর্বক্ষণই ঐসব নিয়ে মশগুল থাকতেন কাকা।

কিরীটা উঠে গিয়ে সবত্তে রক্ষিত ম্যাগাজিনের থাক থেকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে সেটা পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিয়ে সোফায় এসে বসল।

দেখলেন!

হ্যাঁ। সব ম্যাগাজিনগুলোই অমনি জানলেন কি করে আপনি? আপনি ও নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে আপনার কাকার অ্যাবসেন্সে ম্যাগাজিনগুলো উল্টেপাল্টে দেখেছেন! তাই কি?

না। ওসব নোংরা জিনিস আমি হাতে ধরি না।

॥ হয় ॥

কিরীটী সুবীরের কথায় মৃদু হাসল।

আচ্ছা সুবীরবাবু, এ শমিতা দেবী ও তাঁর কনাবের ব্যাপার এবং এ ম্যাগাজিনগুলো ছাড়া আর কখনও কিছু আপনার কাকার ব্যাপারে চোখে পড়েছে?

কেন, এ যে রামদেওর যুবতী তৃতীয় পক্ষের বৌটা! সে তো সব সময়ই এ ঘরে থাকত শুনেছি!

কিরীটী আবার মৃদু হাসল।

এসব কারণে আপনি মনে হচ্ছে আদৌ আপনার কাকার উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না!

সুবীর কিরীটীর কথার কোন জবাব দেয় না।

ভাল কথা, সুবিনয়বাবু বলছিলেন, আপনি নাকি তাঁকে বলেছিলেন আপনার কাকা উইল করেছেন?

শুনেছি।

আপনিও শুনেছেন?

হ্যাঁ, শোনা কথা আমারও।

কার কাছে শুনলেন?

রামদেওই বলেছিল।

রামদেও মানে সেই চাকরটা?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আপনার খুব কথাবার্তা হত, তাই না সুবীরবাবু?

মানে?

তার মুখ থেকেই সব খবরাখবর উপরের তলার নিতেন আপনি?

ও ধরনের প্রবৃত্তি আমার নেই।

কিরীটী আবার মৃদু হাসল। তারপর বললে, শিক্ষা আছে। আপনার উপরে কাকার মনোভাবটা কেমন ছিল?

কেন, ভালই! হি লাইক্রড মি ডেরি মাচ।

সুবীরবাবু, এবার আর একটা পঞ্জের আমার জবাব দিন।

বলুন?

আপনার কাকার হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

কাকে সন্দেহ করব!

কেন, বামদেওকে?

আমদেও!

তো, আপনিই তো একটু আগে বলছিলেন তার যুবতী স্ত্রীর প্রতি আপনার কাকার দ্রুততা ছিল, রামদেও হয়ত সে কথা জানতে পেরে আক্রোশের বশে আপনার কাকাকে ছেরা মেরে পালিয়েছে!

বিচিত্র নয় কিছু।

বলছেন?

আপনিই তো তাই বলছেন!

আমি আপনার ওপিনিয়নটা নিছিলাম।

সুবীর যেন কেমন একটু বিরত বোধ করে।

অরূপ, তুমি আর ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও নাকি? কিরীটী বলে।

না, আপনি যেতে পারেন। বাহাদুরকে পাঠিয়ে দিন।

বাহাদুর ঘরে এসে ঢুকল। কেঁদে কেঁদে বাহাদুরেরও চোখ দুটো ফুলে গিয়েছে।

বাহাদুর, কতদিন তুমি সাহেবের কাছে আছ? অরূপ প্রশ্ন করে।

কমসে কম দশ সাল।

কাফি বরষ।

জী সাব।

তোম বাংলা বাত সমবরতে?

জী। থোড়ী থোড়ী বলনে ভি সেকতা।

তোমার বাবুর কাছে এ বাড়িতে আসার পর কে কে আসত বলতে পার? অরূপই প্রশ্ন করে।

এ বাবুজী আসতেন, আর—

আর?

দিদিয়ণি আসতেন, এ বাবুর বহিন।

প্রায়ই আসতেন?

হ্যাঁ।

কতক্ষণ থাকতেন?

তা দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা। কখনও তিন ঘণ্টাও থাকতেন।

কখন আসতেন?

বাতের বেলাতেই বেশি।

কালও এসেছিলেন?

হ্যাঁ।

কখন?

রাত তখন সোয়া নটা হবে।

তুমি জানলে কি করে?

আমি রামদেওর মুখে পুষ্টি সে নিচে এসে আমায় বলে, আবার আজ সেই দিদিমণি
এসেছে সাত রোজ বাবু।

সাত রোজ! তুম আগে বুঝি আসেননি দিদিমণি?
না।

কি করে জানলে?

বাবুদেউই বলেছিল, দিদিমণির সঙ্গে নাকি কি কথা-কাটাকাটি হয়েছিল খুব সাহেবের।
তাৰপৰ সাত রোজ দিদিমণি আসেননি, সাহেবও ক্লাবে যাননি।

হঠাতে কিরীটী ঐ সময় যোগজীবনের দিকে ফিরে বললে, সান্যাল মশাই, আপনি কিছু
জানেন?

যোগজীবন মাথাটা নিচু করলেন।

অবিশ্যি আপনার বলতে আপনি থাকলে—

না, রায় সাহেব। একটু আগেও সুবীর যা বলেছিল গগন সম্পর্কে আমিও ঐ ধরনেরই
একটা রিপোর্ট পেয়েছিলাম।

কার কাছে?

শ্রমিতাই বলছিল।

কি বলেছিলেন তিনি?

বিশেষ কিছু বলেনি, কেবল বলেছিল, তোমার বন্ধুটি যে দাদা এমন একটা ক্ষট,
ফিলদি ক্যারাকটারের জানতাম না আমি।

আপনি কি বললেন?

ইট ওয়াজ ব্যাদার শকিং টু মি! বুঝতেই পারছেন রায় সাহেব, তবু আমি জিজ্ঞাসা
করেছিলাম, ব্যাপার কি? কিন্তু শ্রমি কিছু ভেঙে স্পষ্ট করে বলেনি আর।

আপনি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেননি কিছু?

না।

কেন?

আপনিই বলুন কেমন করে জিজ্ঞাসা করি!

আপনি আপনার বোনকে কিছু বলেননি ঐ কথাটা শোনার পর?

হ্যাঁ, বলেছিলাম একটা কথা!

কি?

গগনের বাসায় আর না যাওয়ার জন্য। তবে ঐ ঘটনার কিছুদিন আগে কথায় কথায়
ও একদিন আমাকে বলেছিল, শীঘ্রই হয়ত ও আবার বিয়ে করতে পারে।
তাই নাকি? কাকে?

বলেছিল সময় হলেই জানাবে, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিনি কিছু আর।

তাৰপৰ বিয়ের কথায় কিছু বলেননি আপনি?

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

কি বলেছিলেন?

বলেছিলাম, ইফ ইউ রিয়েল হ্যাউড সেটলড—ব্যাপারটা শেষ করে ফেল।

কি জবাব দিলেন তিনি?

কোন জবাব দেয়নি।

তাহলে শমিতা দেবী প্রশ্নাবুর ওপরে ঐ ধরনের remark pass করার ব্যাপারটা আর বেশি কিছু খন্ডে বলেননি আপনাকে স্পষ্ট করে? না।

কিরীটি এবার বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, বাহাদুর, রামদেওর জেনানা সব সময় তাঁরার সাহেবের ঘরে থাকত শুনলাম, জান কিছু তুমি?

আমিও দেখেছি বাবুজী।

আর কিছু দেখনি?

হাসিমস্করা হত, কিন্তু ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগত না বাবুজী!

কেন?

রামদেও ভীষণ রাগী লোক। সেরকম কিছু হলে ও সাহেবকে হয়ত খুনই করে দেবে! আচ্ছা বাহাদুর—

জী!

তোমার সাহেবকে কে খুন করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

কেমন করে জানব বাবুজী! একমাত্র পশুপতিনাথই জানেন।

কিরীটি এবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

জ্যাকিকে কে খাবার দিত বাহাদুর? কিরীটি জিজ্ঞাসা করে।

জ্যাকি সাহেব ও রামদেওর হাতে ছাড়া কারও হাতে খেত না। সাহেবকে ও বড় ভালবাসত বাবুজী, খুব চোট লেগেছে ওর দিলে।

রামদেও কতদিন ছিল তোমার সাহেবের কাছে?

কমসে কম চোদ সাল। মিলিটারিতে বরাবর সাহেবের ব্যাটম্যান ছিল শুনেছি। তারপর সাহেব যখন ছুটি নিয়ে আসেন, ওকেও ছুটি করিয়ে নিয়ে আসেন।

ঠাকুর প্রিয়লাল আর ভৃত্য রতন ওপরে আসত না?

না বাবুজী, ওদের ওপরে আসবার কোন হকুম ছিল না।

দাদাবাবুরা?

দাদাবাবুরা আসত না ওপরে বড় একটা সাহেব না ডাকলে।

সাহেব ডাকতেন না?

এক-আধিদিন হয়ত ডাকতেন।

তোমার সাহেব খুব মদ খেতেন?

হ্যাঁ। এক বোতল সাধারণত দেড়দিন কি বড়জোর দু'দিনের বেশি কখনও খেত না।

যে দিদিমণি আসতেন, তিনি?

রামদেওর মুখে শুনেছি তিনিও নাকি খুব খেতেন সরাব।

আর রামদেওর স্ত্রী?

কে, রঞ্জিণী?

হ্যাঁ!

হ্যাঁ বাবুজী, ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খেত।

সুবিনয়বাবু, সুবীরবাবু?

বলতে পারি না।

ঠিক আছে, তুমি এবাবে রঞ্জিণীকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও গো।

বাহাদুর চলে গেল—

অরূপ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, একটা কথা আপনাকে কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছি মিঃ ব্রাই

কি বলতে ?

জ্ঞানার কথা—

মানে এ যে সাদা বাঁটের ছোরাটা যা দিয়ে গগনবাবুকে হত্তা করা হয়েছে ?

হা, ছোরাটা নাকি ওরই মানে গগনবাবুই !

কে বললে ?

বাহাদুরই বলছিল। ছোরাটা ওরই শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ড্রারে থাকত।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

এ সময় রঞ্জিণী এসে ঘরে চুকল।

ছিপছিপে দেহের গড়ন, দেহে ঘোবন যেন কানায় কানায় উপছে পড়ছে। দেহের প্রতিটি ভাঁজ, প্রতিটি চেউ স্পষ্ট, মুখৰ। বেশভূঝা আদৌ দেহাতী স্ত্রীলোকদের মত নয়। বরং অনেকটা শহরের আধুনিকাদের মত। মাথায় সামান্য ঘোমটা।

এ ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মুখখানা। মুখখানা একটু ভোঁতা-ভোঁতা হলে কি হবে, দুটি চোখ যেন চকিতপ্রেক্ষণ ! ইঙ্গিতপূর্ণ !

পাতলা দুটি ঠোঁটে ও ধারালো চিবুকে যেন একটা চাপা হাসির চেউ খেলে যাচ্ছে।

অল্পপ জিজ্ঞাসা করে, কি নাম তোর ?

রঞ্জিণী।

চাপা হাসির চেউটা যেন কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সারাটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আরও স্পষ্ট হল।

তোর মৰদ রামদেও কোথায় ?

হায় রাম ! আমি কি করে জানব ?

তুই জানবি না তো জানবে কে ? তোরই তো জানবার কথা ! তোর মৰদ !

কে জানে, হয়তো বাজারে গিয়েছে।

এত সকালে বাজারে ?

আর কোথায় যাবে তবে ?

তা বাজারে গেলে এখনও ফিরছে না কেন ?

আমি কি করে জানব ?

জানিস না ?

না।

এখানে তুই কি কাজ করিস ? কি করতে হয় তোকে ?

কিছুই করিব না। আবার সেই চাপা হাসির চেউ ছড়িয়ে শেশ দুই ওষ্ঠে ও চিবুকে।

কিছুই করিস না ?

না।

বলে থাকিস ?

বসে থাকব কেন?

তবে? কাজ করিস মা—টা কি করিস সারাদিন? মাইনে দিত না তোকে তোর সাহেব?

মাইনে—বনমরা শুনতে গলার সেই চাপা হাসির ঢেউ সারা মুখে ওর ছড়িয়ে পড়ল।
বললে, না, তাৰ সাহেব এখানে থাকতে দিত, আমাকাপড় খাওয়া দিত আৱ মধ্যে মধ্যে
দু-চার টাক ব্যাশ দিত।

বুঝিবুঝি!

গয়না দিত না?

একটা হার দিয়েছে—আবাৰ সেই চাপা হাসির ঢেউ ছড়িয়ে গেল মুখে।

শুনলাম সাহেবের ঘৰেই তুই সব সময় থাকতিস?

সাহেব ডাকলে আসতাম।

কখন ডাকত সাহেব? সক্ষেপেলো?

হঁা, ডাকত।

রামদেও তোৱ মৱদ জানত যে তুই সাহেবের ঘৰে আসতিস?

না।

জানত না? সে তো পাশেৱ ঘৰেই থাকত।

ওকে তো প্ৰায়ই সাহেব ঐ সময়টা এটা ওটা আনতে পাঠাতো—

আৱ সেই সময়ই বুঝি ডাকত তোকে তোৱ সাহেব?

আবাৰ সেই হাসিৰ ঢেউ সারা মুখে ছড়িয়ে গেল।

সাহেব তোকে খুব পছন্দ কৱত বুঝি?

বোধ হয়।

কেন, জানিস না?

আবাৰ সেই চাপা হাসিৰ ঢেউ সারা মুখে ছড়িয়ে গেল।

তুই তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে তোৱ স্বামীকে না জানিয়ে তোৱ সাহেবেৰ ঘৰে আসতিস
বল?

হঠাৎ ঐ সময় কিৱাটী হাতেৱ বাহাৰে রেশমী চুড়িগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কৱে, তোৱ
হাতেৱ ঐ চুড়িগুলো তোকে তোৱ সাহেব কিনে দিয়েছিল বুঝি?

না তো! ও তো আমাৰ মৱদ কিনে দিয়েছে!

কৰে?

এই তো সেদিন।

কাল রাত্ৰে বাইৱেৰ সেই দিদিমণি তোৱ সাহেবেৰ কাছে এসেছিল, জানিস?

জানি তো।

কখন চলে যায় জানিস সেই দিদিমণি?

অনেক রাতে।

কখন?

আমি কি ঘড়ি দেখতে জানি?

তুই তখন কোথায় ছিলি?

আমাৰ ঘৰে।

আর রামদেও ?

সে নিচে ছিল ।

নিচে ?

হাঁ, ও এ সময়টা দারু পিত ।

দারু ? কোথায় পেত দারু ?

পুরুষের আলমারি থেকে সরাত । আমিও নিয়ে দিতাম—মধ্যে মধ্যে—
আহেব টের পেত না ?

পাবে কি করে—চাবি তো ওর কাছেই থাকত দারুর আলমারির !

খুব দারু খেত বুঝি রামদেও ?

মাঝে মাঝে খুব পিত । মাতোয়ালা হয়ে যেত ।

কাল রাত্রে কোন গোলমাল বা চেঁচামেটি শুনেছিলি তোর সাহেবের ঘরে ?
না ।

কেন, তুই পাশের ঘরেই তো থাকিস ?

কাল রাত্রে আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।

অতঃপর বাকি ছিল দারোয়ান জার্নাল সিং । তাকেও কিছু প্রশ্ন করে ওদের তখনকার
মত কাজ শেষ হল ।

॥ সাত ॥

মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে কিরীটীর নির্দেশমত সুবীর সুবিনয় বাহাদুর প্রিয়জাল ও অন্যান্য
ভৃত্যদের আপাতত পুলিসের বিনানুমতিতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যেতে বলে বাড়িটা
পুলিস পাহারায় রেখে অরূপ ও অন্যান্য সবাই বাড়ি থেকে বের হয়ে এল ।

কিরীটী আর যোগজীবন পাশাপাশি হাঁটছিল ।

সান্যাল মশাই !

বলুন !

শ্রমিতা দেবীকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, অবিশ্য যদি আপনার আপত্তি না
থাকে ?

আপত্তি হবে কেন ? বলুন শ্রমিকে—

আমি বিকেলের দিকে যাব আপনার ওখানেই—উনি যদি সে সময় থাকেন !

বলুন দেব থাকতে ঐ সময় ।

যোগজীবনকে কিরীটীর মনে হল যেন বেশ কেমন একটু অনামনক ।

তাহলে এবারে আমি চলি—বলুন কিরীটী উষ্টেদিকে পা বাড়তেই যোগজীবন
ডাকেন, রায় সাহেব !

কিরীটী ঘুরে দাঁড়াল, কিছু বলছিলেন ?

হ্যাঁ—একটা কথা ।

বলুন ?

আচ্ছা আপনি কি গগনের হত্যার ব্যাপারে আমার কোন শ্রমিকে কোন রকম সন্দেহ
করছেন ?

সেখন সান্যাল মশাই, ওকে আমি দেখিনি আজ পর্যন্ত—তবে আপনাদের সকলের

সেখন সান্যাল মশাই, ওকে আমি দেখিনি আজ পর্যন্ত—তবে আপনাদের সকলের

মুখ থেকে যেটুকু জানতে পারলাম তাতে করে—

কি রায় সাহেব?

তার চরিত্রে কিছুটা বেজ্জিটারিতা ও উচ্ছ্বাস্তা আছেই।

না না—সে রকম যা আপনি ভাবছেন তেমন কিছু নয়। ক্লাব নিয়ে হৈচে করে, একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করে তিনিই কিন্তু সে সত্যিই সেরকম উচ্ছ্বাস প্রকৃতির বলতে যা বোবায় সে ধরনের মনে নয়। তাছাড়া আজকালকার দিনে ওরকম তো প্রায়ই দেখা যায় বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

আপনি কিছু ভাবেন না সান্যাল মশাই—সত্যিই গতরাত্রের ব্যাপারের সঙ্গে যদি তার কোন সম্পর্কে না থাকে তো কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর একটা কথা—

কি?

আপনি যদি চান তো আমি আপনার বন্ধুর হত্যার ব্যাপার থেকে একেবারে সরে দাঁড়াতে পারি!

না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই। দৈবক্রমে ঘটনাক্রমে যখন আপনি ব্যাপারটার মধ্যে গিয়েই পড়েছেন, আপনার করণীয় অবশ্যই আপনি করবেন।

আমিও ঐ উভরটাই আপনার কাছে আশা করেছিলাম সান্যাল মশাই।

সত্য আর গরলকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না চিরদিন, একদিন-না-একদিন সে প্রকাশ হয়ে পড়েই—তাছাড়া শমিতা যেমন আমার সহোদরা বোন তেমনি গগনও ছিল আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আমার—হ্যাঁ, আমারও কিছু দোষ আছে বৈকি। গগন আর শমিতা সম্পর্কে আমার কানে ইদনীং কিছুদিন ধরে অনেক কথাই আসছিল, কিন্তু তবু আমি সতর্ক হইনি।

হওয়া বোধ হয় উচিত ছিল আপনার সান্যাল মশাই!

এখন বুঝতে পারছি উচিত ছিল। তবে বিশ্বাস করুন রায় সাহেব, এতটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

এবারে বাড়ি যান সান্যাল মশাই।

যোগজীবন বিদায় নিয়ে গৃহের দিকে চলা শুরু করলেন।

কিরীটীও তার গৃহের দিকে পা পাড়াল।

বেলা দশটা প্রায় হয়ে গিয়েছিল সেদিন কিরীটীর গৃহে ফিরতে। কৃষ্ণ উদ্ধিষ্ঠ হয়ে আর-বার করছিল—সুরুতকেও ফোন করে আনিয়েছিল।

কিরীটী এসে যখন গৃহে প্রবেশ করল, জংলী তথম আবার কিরীটীর সঙ্গে চতুর্ধবার লেকের দিকে যাচ্ছিল। কিরীটীকে দেখে সে দাঁড়াল, বাবুজী, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?

কেন রে?

মহিজী খুব ব্যস্ত হয়েছে—যাও। উপরে যাও।

দেড়তলার বসবার ঘরে তুক্তেই সুরক্ষ ঘলে শুটে, কি রে, কোথায় গিয়েছিলি? কেন?

কেন মানে? সেই সকাল শাঢ়ি তিমটোয় লোকে বেঝাতে গিয়ে আর পাঞ্চ মেই? কৃষ্ণ বলে, সত্যি—আশ্চর্য মানুষ তুমি!

কিরীটী সোফাৰ উপৰ বুদ্ধতে বসতে বললে মন্দ হেসে, হারিয়ে ঘাব না সে তো
জানতেই প্ৰিয়ে—আৱ সেৱকৰ্ম কোন একটা দুষ্টিনা ঘটলৈছ আগে সে সংবাদ পেতে।
থাক। আৱ বাহাদুরিতে প্ৰয়োজন নেই। তা চা খেয়েছ, না তাও পেটে পড়েনি এখনও?
পড়েছিল সেই প্ৰটোতন্ত্ৰিক আগে এক কাপ, তাও সম্পূৰ্ণ নয়। এক কাপ পেলে মন্দ
হত না।

কৃষ্ণ উঠে গেল।

সুজুক আৱাৰ জিজাসা কৰে, কিন্তু কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

আৱ বলিস কেন! গিয়েছিলাম অবিশ্বি একটি রেয়াৰ ফুল দেখতে—অবশেষে জড়িয়ে
পড়লাম এক খুনেৰ ব্যাপারে।

খুন! কোথায়? কে?

ধীৱেৰ বন্ধু ধীৱে। তাৱপৰ একটু থেমে কিৰীটী বলে, নিহত হয়েছেন এক এক্স আৰ্মি
কৰ্নেল। মৃতুৱ কাৱণ ছুনিকাঘাত—হ্লান অনতিদূৰে, সাদাৰ্ন অ্যাভিনুতে!

তা তুই তো গিয়েছিলি লেকে বেড়াতে—

বললাম যে, বেড়ানো শেষ হ্বাৱ পৱ গিয়েছিলাম সান্যাল মশাইয়েৰ গৃহে একটা
রেয়াৰ ফুল দেখতে!

সান্যাল মশাই কে?

লেকেৱ অৰমণবন্ধু—এক প্ৰোচ রিটায়াৰ্ড ভদ্ৰলোক এবং যিনি নিহত হয়েছেন তাৱই
ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তাৱপৰ?

সান্যাল মশাইয়েৰ ওখানে কোন এল বন্ধুটি তাৱ নিহত। তখন তিনি—মানে তাৱই
অনুৱোধে তাৱ সঙ্গে যাই।

চায়েৰ কাপ হাতে কৃষ্ণ ঘৰে ঢুকতে ঢুকতে বলে, তা সেখান থেকে একটা কোন কৱে
দিতে কি হয়েছিল?

ক্ষমা কৱো দেবী—মনে পড়েনি।

তা মনে পড়বে কেন? খুনখাৱাপিৰ গন্ধ পেলে কি আৱ কিছু মনে থাকে?

কিৰীটী কৃষ্ণৰ হাত থেকে চায়েৰ কাপটা নিয়ে কাপে চুমুক দিতে দিতে মন্দ মন্দ হাসে।
শোন, বস—খুব ইন্টাৱেস্টিং ব্যাপার।

থাক তোমাৰ ইন্টাৱেস্টিং ব্যাপার, আমাৰ শোনাৰ প্ৰয়োজন নেই। কৃষ্ণ বলে
প্ৰসীদ দেবী! তুমি মুখ ভাৱ কৱলে এ অভাজনকে নিজগৃহেই যে পৱবাসী হতে হৈলো!
ঘটনাটা সত্যই রোমাঞ্চকৱ। শোনাই না।

না—ও শোনায় আমাৰ কোন লাভ নেই।

বল কি? আমাকে যাবা ভালবাসে তাৱা শুনলে যে তোমায় শিক্কাজ দেবে! কিৰীটী—
কাহিনী শুনতে চায় না এমন মতিছেম্ব যাব হয়েছে তাকে—

সেই তো একঘেয়ে ব্যাপার। হয় টাকাপয়সা—না হয় প্ৰতিহিসা—না হয় কোন এক
ক্ৰীলোকেৱ বা পুৱেৰে প্ৰেমেৰ জ্ৱালা। বিয়ে হওয়াল অৱধি তোমাৰ মুখে ঐসব শুনতে
শুনতে!—

থাক গিয়ে। তা ও ছাড়া আৱ ত্ৰাইম জগতে কি আছে বল? পাপিষ্ঠ-পাপিষ্ঠাৰ দল
ঐ পাকচক্রেই ঘৰ্ণিপাক থাক্কে যে অহৰহ!

সুব্রত হাসছিল। এবাবে বললে, নে, বল শুনি তোর এঞ্চ আর্মি অফিসারের নিম্ন
ব্যাপারটা!

তুইও সুব্রত— দাউ ট কাস! তুইও ব্যাপারটাকে লাইট করে নিছিস?
কিন্তু ব্যাপারটা বললে তো?

কিরীটী অতশ্চেষমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করে যাও।
সব শুনে সুব্রত বলে, এ তো মনে হচ্ছে—

কি বলুন?
বিকৃত এক লালসার পরিণতি।

আমারও যেন মনে হচ্ছে তাই। কারণ লালসা বস্তু মানুষের অন্যতম রিপু
হিসাবে—অর্থাৎ নারী-পুরুষের চরিত্রের অচেন্দ্য এক ধর্ম, ওটা বাদ দিয়ে মানুষ যেমন
কোন যুগেই চলতে পারেনি এ যুগেও পারবে না, এবং ভবিষ্যতেও বোধ হয় কখনও
পারবে না।

কথাটা শেষ করল সুব্রত, তাই খুনখারাপি হবেই। কিন্তু গগনবিহারীর অমন মতিচ্ছন্ন
হল কেন?

আরে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দলই তো ঐ ধরনের বিকৃত লালসার বড় ভিকটিম হয়!
কিন্তু একটা ব্যাপারে কেমন যেন আমার খটকা লাগছে কিরীটী! সুব্রত বললে।
ঐ অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা তো?

হ্যাঁ। হত্যাকারী কুকুরটাকে ম্যানেজ করল কি করে?

সে আর এমন দুরাহ ব্যাপার কি! আগে থেকেই হয়ত কুকুরটাকে সরিয়ে ফেলেছিল
কৌশলে। তবে এও ঠিক, শেষ পর্যন্ত হয়ত এই কুকুরটাই হবে তার মৃত্যুবাণ। ভাল কথা
মনে করিয়ে দিয়েছিস—বলতে বলতে উঠে গিয়ে কিরীটী অরূপকে ফোনে ডাকল।

বালীগঞ্জ থানার ও. সি. কথা বলছি—সাড়া এল অপর প্রান্ত থেকে।

অরূপ—আমি কিরীটী। একটা কথা তখন তোমাকে তাড়াতাড়ি বলতে ভুলে
গিয়েছি—

কি কথা?

একজন ভেটানারী সার্জেনকে দিয়ে কুকুরটাকে একবার পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে
পার?

কেন পারব না? অরূপ বললে।

হ্যাঁ দেখাও, আমার মনে হয় কুকুরটাকে খাবারের সঙ্গে কোন তীব্র ঘমের ঘেঁথ
দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আর একটা কথা, কুকুরটার উপরে যেন কনস্ট্যান্ট ওয়াচ
রাখা হয়।

অরূপকে নির্দেশ দিয়ে কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

সারাটা দুপুর কিরীটী কোথাও বের হল না। নিজস্ব লুইভেনী থেকে আলসেসিয়ান
কুকুর সম্পর্কে এক বিশেষজ্ঞের বই নিয়ে তারই মধ্যে ঝুঁকে রইল।

বিকেলের দিকে যোগজীবনের ওথানে যাবে বলেছিল। কিন্তু বেরতে সম্ভা হয়ে গেল।

সুব্রতকে কিরীটী বলে দিয়েছিল বিকেলে তার ওথানে চলে আসতে। দুজনে একসঙ্গে
যোগজীবনের ওথানে যাব।

সুব্রত যথাসময়েই এসে হাজির হয়েছিল।

কিন্তু সুব্রত এসে দেখল কিরীটী কি একটা বই নিয়ে তার মধ্যে ঢুবে আছে, কাজেই
তাকে আর বিরক্ত করেন।

বইটা শেষ করে কিরীটী যখন উঠে দাঁড়াল বেলা তখন গাড়িয়ে গিয়েছে—বাইরের
আলো জ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার ধূসূরজায় নামছে ধীরে ধীরে।

কি বেশ প্রেরণ না? সুব্রত শুধাল

হ্যাঁ চাই।

সুব্রত তার গাড়ি এনেছিল। সেই গাড়িতেই চেপে দুজনে যোগজীবনের গৃহের দিকে
বশেমা হল।

গাড়িতে উঠে কিরীটী বললে, চলু একবার থানায় ঘুরে যাই। রামদেওর কোন পাতা
পাওয়া গেল কিনা জেনে যাই। আর অরূপ যদি থাকে তো তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

থানার সামনে এসে ওদের গাড়ি যখন থামল সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তখন। রাস্তার
আলো জুলে উঠেছে। অরূপ থানাতেই ছিল।

অরূপের অফিস-ঘরে ঢুকেই কিরীটী জিজাসা করল, রামদেওর কোন খবর পেলে
অরূপ?

না।

থবরটা যে চাই।

প্রতাপগড়ে ওর দেশে খোঁজ নেবার জন্য ইউ, পি-র ইনটেলিজেন্স ব্রাফে ফোন করে
দিয়েছি। বেটার একটা ফটো পেলে সুবিধা হত।

রঞ্জিণীর কাছে খোঁজ করে দেখো—পেতে পার।

দেখি, কাল একবার যাব। হ্যাঁ ভাল কথা, সুবীর চৌধুরী ফোন করেছিল।

কেন?

সে বাইরে বেরুতে চায়। আমি বলে দিয়েছি, আপাত চার-পাঁচদিন ঐ বাড়ির বাইরে
কোথাও তার যাওয়া চলবে না।

তারপর?

চেঁচামেচি করেছিল ফোনে। আমরা কি তাকেই গগনবিহারীর হত্যাকারী বলে সন্দেহ
করছি নাকি ইত্যাদি।

কিরীটী মৃদু হাসে।

আমার কিন্তু মনে হয় মিঃ রায়—অরূপ বলে।

কি?

ঐ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সুবীর চৌধুরী জড়িয়ে আছে।

কেন?

আমার মনে হয় ঐ বরফাত্তি যাওয়ার ব্যাপারটা একটা তার আবাসিক মাত্র।

হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু হত্যা সে করবে কেন তার কাছকে? কি উদ্দেশ্য থাকতে
পারে?

কি আবার, গগনবিহারীর সমস্ত সম্পত্তির সেইটা তো প্রকৃতপক্ষে জিগাল
উত্তরাধিকার।

তা তো নাও হতে পারে অরূপ।

কিন্তু—

কিরীটী বলে, এমনও ক্ষেত্রে পারে গগনবিহারী উইলে তাকে কিছুই দিয়ে যাননি।
না অরূপ, গগনবিহারীর হত্যার সঙ্গে আর যাই থাক অর্থের কোন সম্পর্ক আছে বলে
আপাতত আমার মূলে হচ্ছে না।

তবে কি—

অবিশ্বাস আসি নিজেও এখনো কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছাতে পারিনি। তবে আমার
মনে হয়ে গগনবিহারীর হত্যার মূলে আছে অন্য কিছু—অর্থ নয়।

আপনি কি বলতে চান মিঃ রায়!

তবে হত্যাকাণ্ডের আশেপাশে যারা ছিল—তাদের মধ্যে ভেবে দেখছ কি, শমিতা আর
কুক্কুলী যে দুটি মেয়ে গগনবিহারীর জীবনে এসেছিল—মনে করে দেখ তাদের দুজনেরই
রূপ ও যৌবনের কথা। গগনবিহারী দুজনের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল।

তাহলে?

সে-সব পরে বিচার করা যাবে। আপাতত তোমার হাতে যদি কোন জরুরী কাজ না
থাকে তো চল, এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

কোথায়?

যোগজীবনবাবুর ওখানে।

সেখানে কেন?

শমিতা দেবীর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি, চল না!

বেশ তো, চলুন।

অরূপ উঠে পড়ল।

॥ আট ॥

যোগজীবনবাবু তাঁর বাইরের ঘরেই বসেছিলেন একাকী।

কিরীটী আসবে বলেছিল তাই আর তিনি বেরোননি ঐ দিন বিকালে। কিরীটীরা যখন
এসে পৌছল তখন সাতটা বেজে গিয়েছে।

আসুন রায় সাহেব। দেরী হল যে? আপনি—

কথাটা যোগজীবন আর শেষ করেন না। কিরীটীর সঙ্গে সুব্রত আর থানা-অফিসার
অরূপ মুখার্জীকে দেখে থেমে গেলেন।

কিরীটী বসতে বসতে খললে, অরূপকে সঙ্গেই নিয়ে এলাম সান্যাল মশাই, ~~অটুন~~
মেনে চলাই ভাল।

সপ্তপ্ল দৃষ্টিতে তাকালেন যোগজীবন কিরীটীর মুখের দিকে।

বুঝতেই তো পারছেন, ব্যাপারটা খুব delicate হলেও শমিতা দেবীর সঙ্গে যখন
গগনবাবুর পরিচয় ছিল এবং তাঁর গগনবাবুর গৃহে যাতায়াত ছিল, পুলিস তাকে নিয়েও
টানাটানি করলে ছাড়বে না। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা যদি একটা ঘৰোয়া পরিবেশে শেষ করে
ফেলা যায়, সব দিক দিয়েই ভাল হয়।

যোগজীবন কোন জবাব দেন না।

তাঁর সমস্ত মুখে যেন একটা দুর্ঘিতার কালো ছায়া।

কিরীটী বললে, তাই অরূপকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলাম।

উনিও—মানে মিঃ মুখজ্জিও কি শমিকে প্রশ্ন করতে চান? যোগজীবন ফীণ গলায় প্রশ্ন করেন।

না, না—উনি কেবল উপস্থিত থাকবেন। যা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আপনার ভগী বাড়িতেই আছেন তো?

আছে।

গুগমুরাবুর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

শুনেছি।

কে বলল? আপনি?

না—আমি বলিনি।

তবে?

সুবীর তাকে ফোনে জানিয়েছে।

কিরীটী যেন একটু চমকেই ওঠে কথাটা শুনে। বলে, কে? সুবীরবাবু? হ্যাঁ।

কখন ফোন করেছিলেন তিনি?

সকালেই।

সকালে? কখন?

আমি ফোন পেয়ে চলে যাবার পরই।

কিরীটী যেন একটু অন্যমনক্ষ। মনে হয় যেন কি ভাবছে সে। কিরীটী যোগজীবনের কথার পর আর কোন কথা বলে না।

একটু পরে আবার বলে, তাহলে চলুন, ওঠা যাক।

অঁঁ—হ্যাঁ, চলুন।

দোতলায় উঠে যোগজীবন তাঁর শয়নঘরে ওদের বসিয়ে শমিতার ঘরের দিকে পা বাঢ়ান।

বাড়িটা বেশ বড়। দোতলায় পাঁচটি ঘর, তিনতলায় তিনটি ঘর।

তিনতলাতেই একটি ঘর নিয়ে শমিতা থাকে।

একতলাটা ভাড়া দেওয়া একটি ঘর ছাড়া।

শমিতার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল।

খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন যোগজীবন। ঘরের ভিতরে অঙ্ককার একটু ইতস্তত করলেন যোগজীবন, তারপর মৃদু কঠে ডাকলেন, শমি!

কোন সাড়া এল না।

আবার ডাকলেন একটু উচু গলাতেই, শমি?

কে, দাদা? সাড়া এল এবার অঙ্ককার ঘরের ভিতর থেকে।

হ্যাঁ।

এস।

যোগজীবন অঙ্ককার ঘরের মধ্যে এসে চুকলেন, আমের জ্বালাসনি কেন?

খট করে একটা শব্দ হল। ঘরের আলোটা জুলে উঠল পরমুহূর্তেই। যোগজীবন দেখলেন শমিতা একটা আরাম-কেদারার উপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে।

সব সময়ই যে বেশতৃষ্ণা ও প্রসাধন ছাড়া থাকে না তার আজ কোন বেশতৃষ্ণা ও

প্রসাধন নেই। পরনে সাধুশ একটা তাঁতের রঙিন শাড়ি। গেরুয়া রংয়ের হাতকাটা একটা ব্লাউজ গায়ে। মাথার চুল কুকু, চিরুনি পড়েছে বলে মনে হয় না।

চোখেমুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। চোখ দুটো যেন দুর্ঘৎ রঙিম।

সামনে ছোট একটা ত্রিপয়ের উপর কাঁচের প্লাসে রঙিম তরল পদার্থ। প্লাস্টার প্রতি নজর পড়তেই যেন যোগজীবন একটু থমকে গেলেন। প্লাসের রঙিম তরল বস্তুটি যে কী যোগজীবনের স্বরাতে কষ্ট হয় না।

শ্রমিতা ড্রিঙ্ক করে জানতেন তিনি, কিন্তু সে সব কিছুই ক্লাবে। ঘরে বসেও যে শ্রমিতা ড্রিঙ্ক করতে পারে এটা যেন ধারণার অতীত ছিল যোগজীবনের কাছে।

হঠাৎ যেন একটা ক্ষেত্রের উদ্দেক হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন যোগজীবন। তারপর গভীর হয়ে বললেন, রায় সাহেব এসেছেন, আমার ঘরে বসে আছেন—তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

অনিচ্ছা সত্ত্বে যোগজীবনের কঠস্বরটা যেন একটু ক্লাই শোনাল।

কি দরকার আমার সঙ্গে তাঁর? শ্রমিতা একটু যেন কুকু স্বরেই প্রশ্নটা করল।

জানি না। তোমাকে তো সকালেই বলেছিলাম, তিনি আসবেন আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বাট আই ডোট লাইক টু মীট এনিবডি অ্যাট দিস মোমেন্ট!

শোন, শুধু রায় সাহেবেই নন—থানা-অফিসারও এসেছেন।

বাট হোয়াই? কি চান তাঁরা আমার কাছে?

চেঁচিও না, শোন ওঁরা জানতে পেরেছেন গগনের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল—
হোয়াটস টু দ্যাট—পরিচয় ছিল, তাতে হয়েছে কি?

তাছাড়া কাল রাত্রে তুমি ওখানে গিয়েছিলে—

ইটস এ ড্যাম লাই—মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা!

নিশ্চয়ই। গত সাতদিন ধরে তার বাড়ির ছায়াও মাড়াইনি আমি। একটা ডাটি—ফিলদি ক্ষাউনড্রেল!

বিষ যেন উদগারিত হল শ্রমিতার কষ্ট থেকে।

সত্যি—সত্যি শয়ি—তুই কাল গগনের বাড়িতে যাসনি?

সিওরলি নট!

তবে যে গগনের বাড়ির লোকেরা কেউ কেউ বললে, তোকে তারা যেতে দেখেছে গত
রাত্রে গগনের ঘরে?

কে—কে বলেছে?

বললাম তো, গগনের বাড়ির লোকেরা বলেছে।

মিথ্যে কথা। কাল আমি রাত আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা স্বিঞ্চ ক্লাবে ছিলাম।
এভরিবডি নোজ দ্যাট—সবাই সেখানে তার সাক্ষী আছে।

কিন্তু—

ব্যাপার কি বল তো দাদা? তুমি কি বিশ্বাস করছ নো আমার কথাটা?

শ্রমিতা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

না, মানে—

ঠিক আছে, চল, তোমার থানার ও. সি. কি বলতে চায় শুনে আসি। আর তোমার
রায় সাহেবেরই বা কি বলবার আছে শুনি।

চল।

ভাই-বোনে ঘৰ থেকে বের হয়ে এল।

পাশের ঘরে ঢকে যোগজীবন বললেন, রায় সাহেব, এই আমার বোন শমিতা।

কিরীটী চোখ তুলে তাকাল, নমস্কার মিস সান্যাল। বসুন।

আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন? শমিতা প্রশ্নটা করে বসল না, দাঁড়িয়েই
রইলাট।

কিরীটী আবার বললে, বসুন।

না—বসলে হবে না। কি আপনি জানতে চান বলুন আমার কাছে!

রায় সাহেব—

যোগজীবনের কষ্টস্বরে কিরীটী তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। যোগজীবন বললেন, শমিতা
বলছে কাল রাত্রে ও আদৌ ওখানে নাকি যায়ইনি।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শমিতাকে দেখছিল, যোগজীবনের কথায় ফিরে তাকাল না।

কেবল প্রশ্ন করল, আপনি বলছেন কাল রাত্রে গগনবাবুর বাড়িতে যাননি?

না।

কিন্তু—

কি?

রামদেও আর সুবিনয়বাবুরা আপনাকে দেখেছে। কেবল তাই নয়, রুক্ষ্মী আপনার
গলা শুনেছে গগনবাবুর শোবার ঘরে। কিরীটী বললে।

রামদেও বলেছে? সুবিনয় বলেছেন তিনি আমাকে দেখেছেন কাল রাত্রে সেখানে?

সেই কথাই তো তারা-তাদের জবানবন্দিতে বলেছে।

ইটস এ ড্যাম লাই। ডাকুন তো তাদের, আমি জিজ্ঞাসা করছি কখন তারা আমাকে
দেখেছে?

নিশ্চয়ই—জিজ্ঞাসা করা হবে বৈকি। কিন্তু আপনি যে সত্তি-সত্ত্যই কাল রাত্রে
সেখানে যাননি তার কোন প্রমাণ আছে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

নিশ্চয়ই।

কি প্রমাণ? কিরীটী শমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার প্রশ্ন করে।

কাল রাত্রে ক্লাবে আমাদের যারা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন
কথটা আমার সত্তি না মিথ্যে।

আপনি তাহলে বলছেন কাল রাত্রে ক্লাবেই ছিলেন? কিরীটীর গল্প স্বর যেন
অতিরিক্ত শাঙ্গ—ঠাণ্ডা।

হ্যাঁ।

কখন ক্লাবে গিয়েছিলেন আর কতক্ষণ বা কাল রাতে সেখানে ছিলেন, নিশ্চয়ই মনে
আছে আপনার?

নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈকি। আটটায় গিয়েছিলাম, রাত সাড়ে এগারোটায় ফিরে
আসি।

বাড়িতে?

না।

তবে কোথায়?

সে কথা জানবাবুর আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে, মিঃ রায়?

নচেৎ কথাটা আপনাকে আমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতাম না।

অ্যাম সারি সিঃ রায়, আপনার ঐ প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারছি না। দুঃখিত।
আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

গগনবিহারীবাবুর সঙ্গে আপনার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই নয় কি?

আলাপ-পরিচয় ছিল। তাহাড়া ছেটবেলা থেকেই দাদার বন্ধু হিসাবে তিনি আমাদের
পরিচিত ছিলেন।

গগনবাবু আপনাদের ক্লাব মরালী সঙ্গের অন্যতম পেট্রোন ছিলেন, তাই নয় কি?
হ্যাঁ।

আপনি প্রায়ই তাঁর ওখানে যেতেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকতেন—কথাটা কি সত্যি?
একসময় যেতাম, তবে ইদনীং যেতাম না। গত সাত-আট দিন একবারও যায়নি।
কেন? ঝগড়া হয়েছিল কি?

শমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ।

কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল?

শমিতা যেন আবার মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর বললে, ক্লাবেরই কোন
ব্যাপারে মতান্তর হয়েছিল।

কিরীটী মন্দ হেসে বললে, কিন্তু আমি যদি বলি মিস সান্যাল, আপনি সত্যি বলছেন
না?

হোয়াট ডু ইউ মীন! কৈক্ষ ও কঠিন শোনাল শমিতার কঠস্বর।

কথাটা আমার অস্পষ্ট নয়, আর দু'রকম অর্থে তার হয় না এবং আপনিও যে সেটা
বুঝতে পারেননি তাও নয়। কিরীটীর গলার স্বরটা শাস্ত কিন্তু কঠিন।

শমিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটীও কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থাকে শমিতার মুখের দিকে। তারপর বলে, আপনার
বাঁ হাতের কঙ্গিতে একটা দেখছি প্লাস্টার লাগানো আছে। কি হয়েছে ওখানে মিস
সান্যাল? কেটে গিয়েছিল বোধহয়?

কিরীটীর কথায় শমিতা যেন হঠাৎ কেমন একটু হকচকিয়ে যায়, মনে হল কিরীটীর
সঙ্গে সঙ্গে যেন তার প্রশ্নের জবাবটা দিতে পারল না শমিতা।

একটু যেন বিরত—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য—পরক্ষণেই বলে, হ্যাঁ, সামান্য একটু
কেটে গিয়েছিল, তাই একটু প্লাস্টার লাগিয়ে দিয়েছিলাম। বলতে বলতে শমিতা যেন
কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে হাতটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

কি করে কাটল? কবে কাটল?

ঠিক মনে নেই, পরশ-তরণ হবে।

আপনার হাতে সরু একজোড়া সোনার রশ্মি দেখছি। এ সোনার রশ্মি ছাড়া আর কিছু
বোধহয় আপনি কখনও হাতে পরেন না!

না।

মিস সান্যাল, আপনি সুবীরবাবু ও সুবিনয়বাবুকে নিশ্চয়ই চেনেন, গগনবাবুর

বাড়িতে যখন আপনার যাত্রাপ্রস্তুত ছিল? কিরীটি প্রশ্নটা করে আবার তাকাল শমিতার মুখের দিকে।

সুবীরবাবুর সঙ্গে প্রয়োগ হয়েছিল সামান্যই আমার। শমিতা বললে।

সুবিনয়বাবুর সঙ্গে হয়নি? কিরীটি আবার প্রশ্ন করে।
না।

গগনবাবুর একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে আপনি জানেন নিশ্চয়ই
জানি জ্যাকি।

মধ্যে মধ্যে তাকে আপনি এটা-ওটা খেতে দিতেন?
না। আই হেট ডগ্স।

গগনবাবু সেটা জানতেন?

তা জানতেন বৈকি। কিন্তু আপনার যা জিঞ্জাসা করবার শেষ হয়েছে কি? মে আই
লিভ দিস রুম? শরীরটা আমার ভাল নেই।

নিশ্চয়ই। আপনাকে এখনি আমি ছেড়ে দোব। আর একটা প্রশ্নের জবাব দিলেই—
বলুন? কি প্রশ্ন আপনার?

আপনার সঙ্গে গগনবাবুর বিয়ে প্রায় সেট্টল হয়ে গিয়েছিল মিস সান্যাল, তাই নয়
কি?

প্রশ্নটা এমনি আকস্মিক ও সকলের মেখানে যারা উপস্থিত তাদের চিন্তারও বাইরে
ছিল যেন। সকলেই যেন শমিতার মুখের দিকে তাকায়।

বিশেষ করে যোগজীবনবাবু যেন বোবা। কিছুটা বিহুলও।

শমিতাও যেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে যায়। তার মুখ থেকেও কোন শব্দ
নির্গত হয় না। ঘরের মধ্যে অভূত একটা স্তুতি যেন থমথম করে।

কিন্তু হঠাৎ সেই স্তুতা ভেঙে খিলখিল করে হেসে ওঠে শমিতা। তারপর বলে,
সত্যিই, মিঃ রায়, আই মাস্ট অ্যাডমিট আপনার কল্লনা-শক্তি আছে। একটা ওল্ড ভালচার!
তার সঙ্গে বিয়ে?

হয়নি সেরকম কোন কথা তাহলে কথনও আপনাদের মধ্যে—মানে এনি
আভারস্ট্যাণ্ডিং?

না মশাই—আমার তো কিছু মাথার গোলমাল হয়নি!

তাহলে—

কি তাহলে?

তার সমস্ত কিছু আপনার নামে লিখে দিয়ে গেলেন কেন?

আমার নামে দিয়েছেন?

কেন, জানেন না আপনি কথাটা বলতে চান?

শমিতা হঠাৎ যেন আবার চুপ করে গেল। থমকে গিয়েছে যেন শমিতা।

কিরীটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তখনও শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় সে বলতে
থাকে, নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের পরম্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে
চলেছিল বলেই আপনাকে তিনি তার সবকিছু উইল করে দিয়েছেন।

থামুন থামুন—হঠাৎ যেন চিংকার করে উঠল শমিতা। তারপরে ঝড়ের মতই যেন
ছুটে থর থেকে বের হয়ে গেল। ওদের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

ঘরের মধ্যে অকশ্মাং যেন একটা হিমশীতল স্তৰতা নেমে এল। সবাই নিশ্চুপ—
একেবারে যেন পাথর।

যোগজীবনবাবুর মিথ্যামী যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

কিরীটী দীরে দীরে উঠে দাঁড়াল, যোগজীবনবাবু, আজ যাই!

অ্যাঁ! চমকে উঠলেন যেন যোগজীবন।

আমরা যাই!

যাইলেন?

জ্ঞান চল অরূপ, চল সুব্রত।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল, আর যোগজীবন তখনও পাথরের মত বসে রইলেন।

॥ নয় ॥

রাত্রি তখন প্রায় সোয়া নটা হবেই।

কিরীটী অরূপ সুব্রত সুব্রতের গাড়িতেই চলেছিল থানায় অরূপকে নামিয়ে দেবার জন্য।

শমিতা কিরীটীর বিশ্বকর উক্তির পর সহসা ঘর ছেড়ে বড়ের মত বের হয়ে যাবার পর সকলের মধ্যেই যে স্তৰতা নেমে এসেছিল, চলমান গাড়ির মধ্যেও সেই স্তৰতাই যেন সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

স্তৰতা ভঙ্গ করে অরূপই প্রথমে কথা বলল, মিঃ রায়, গগনবিহারী যে তাঁর উইলে শমিতাকে সব কিছু দিয়েছেন আপনি জানতে পারলেন কখন?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, জানতে তো এখনও আমি পারিনি!

তবে যে আপনি বললেন?

সম্পূর্ণ অনুমানের ওপরে নির্ভর করে অন্ধকারে একটা তিল নিষ্কেপ করেছিলাম মাত্র।

তবে কথাটা সত্য নয়! অরূপের কঠে রীতিমত বিশ্বয় যেন প্রকাশ পায়।

সত্যও হতে পারে—মিথ্যাও হতে পারে। অবশ্য সত্যি—সত্যিই যদি তিনি উইল করে থাকেন। তবে আমার ধারণা—

কি?

আমার অনুমানটা হয়ত মিথ্যে নয়, নচেৎ ঐভাবে হঠাতে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়ে মিস সান্যাল ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন না। শুধু তাই নয়, আরও আমার ধারণা, ওঁদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিবাহের স্তর পর্যন্ত পৌছেছিল।

বলেন কি! অরূপ বললে, শমিতা সান্যালের মত একটি মেয়ে গগনবিহারীর মত এক বৃন্দকে বিবাহ করতে মনস্ত করেছিলেন? এ যে আমি ভাবতেও পারছি না মিঃ রায়!

ভাবতে তো আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে অনেক বিছুটি পার না অরূপ! তবে অনেক কিছুই ঘটে এ সংসারে, আর ঘটছেও। তাই নয় কি?

কিন্তু—

সামান্য পরিচয়ে মিস সান্যালকে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, ওঁরা হচ্ছেন সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক যাঁরা খানিকটা উচ্ছ্বাসভাবে স্বাধীনচেতা এবং যাঁদের কাছে নিরচুশভাবে জীবনটা ভোগ করাই একমাত্র লক্ষ্য। এবং তার জন্য তাঁরা অনেক কিছুই হাসিমুখে তাগ

করতে পারেন। হয়ত বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে ঐখানেই মিস সান্যালের সংঘাত বেধেছিল—যার ফলে ডিভোর্স।

শমিতার শুনেছি যাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁর অবস্থাও ভাল, বড় চাকরিও করেন, তাই হয়ত জীবনটাকে পুরোপুরি ভোগ করার জন্য সব চাইতে যে বস্তুটির বেশি প্রয়োজন—অর্থ—তাঁর অভাব ছিল না। এবং শমিতার স্বামীর হয়ত আবার সেটা পছন্দ ছিল না। ফলে যা অবশ্যজ্ঞাবী ঐ ধরনের স্ত্রীলোকের পক্ষে—তাই হয়ে গেল।

সুন্দর এই সময় বলে, তোর বন্ধু যোগজীবনবাবুর অবস্থাও তো খারাপ বলে মনে হল না।

যোগজীবনবাবু! কিরীটী বললে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং সঞ্চয়ী ছিলেন। তাই হয়ত ঐ বাড়িটা করতে পেরেছেন। কিন্তু আজ তাঁর অবসর জীবন। শমিতা যে অর্থের সচলতার আকাঙ্ক্ষী সেরকম সচলতা যোগজীবনবাবুর কোথায়! থাকা সন্তুষ্টও নয়।

শমিতা দেবীও তো চাকরি করেন!

তা করেন কিন্তু সেটা একান্ত দায়ে পড়েই। ভাইয়ের কাছ থেকে সেরকম অর্থ পাওয়া যাবে না বলেই। এবং তাই বা তাঁর প্রয়োজনের পক্ষে কতটুকু? সেদিক দিয়ে ভেবে দেখ, গগনবিহারীর ক্ষফারান্ত হতে পারলে কত সুবিধা! সামান্য একটু ঘোবনের ছলাকলা দিয়েই তাই হয়ত শমিতা প্রৌঢ় কামুক গগনবিহারীকে ধরাশায়ী করেছিল। অবিশ্য গগনবিহারীকে করায়ত করার আরও কারণ ছিল আমার মনে হয়!

কি? অরূপ প্রশ্ন করে।

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব তো হবেই না, এই সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশভাবে যে জীবনের সঙ্গে সে অভ্যন্ত সে জীবনও সে নিশ্চিষ্টে চালিয়ে যেতে পারবে। ভোগের জীবনে একটানা ভেসে চলতে পারবে। কিন্তু ঐখানেই শমিতা ভুল করেছিল।

ভুল?

হ্যাঁ—গগনবিহারীর চরিত্রের সে সম্যক পরিচয় পায়নি। তাঁর দিকে তাঁর যে হাত প্রসারিত হয়েছিল, অনুরূপ ঘটনা ঘটল যে সেই হাত দুটি আবার অন্যত্রও প্রসারিত হতে পারে সেটাই বুঝতে হয়ত পারেনি শমিতা। আর খটকা লাগছে আমার ঐখানেই।

খটকা?

হ্যাঁ। শমিতার মত মেয়ের সে কথাটা তো না বোঝার কথা নয়। তবে সে গোড়া থেকেই সতর্ক হল না কেন? কিংবা হয়ত এও হতে পারে, তার নিজের উপরে আত্মবিশ্বাসই তাকে শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হেনেছে।

বুঝলে অরূপ, কিরীটী একটু থেমে বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। এবং জেনো, এ জটিলতার গিট খুলতে পারলেই তোমার কাছে বর্তমান হত্যারহস্যের সবচেয়ে উপর্যুক্ত হয়ে উঠবে। কিছুই আর বাপসা অস্পষ্ট থাকবে না, রহস্যাবৃতও মনে হবে না।

গাড়ি ইতিমধ্যে থানার কাছে এসে থেমে গিয়েছিল।

ওরা গাড়ির মধ্যে বসে কথা বলছিল।

আপনি কি বুঝতে পেরেছেন মিঃ রায়, গগনবিহারীর হত্যাকারী কে? হঠাৎ এই সময় প্রশ্ন করে অরূপ।

আনুমান করতে পেরেছি বৈকি কিছুটা।

তবে কি শমিতা দেবীই?

এটা অবিশ্যি মিথ্যে নয় কোন কিছুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেলে প্রত্যেক পুরুষ
ও নারীই তখন কিছুটা হিস্টেরয়ে ওঠে ঠিকই এবং কাউকে হত্যা করতে হলে বিকৃত
একটা মনোবলের প্রয়োজনও হয়। কিন্তু বর্তমান হত্যার ব্যাপারটা—অর্থাৎ যেভাবে
নিহত হয়েছেন গগনবিহারী—সেটার কথা ভুললে তো তোমার চলবে না আরূপ। কে
হত্যা করেছে তাঁকে সে কথাটা চিন্তা করার আগে তোমাকে চিন্তা করতে হবে কার পক্ষে
গতরাতে গগনবিহারীকে হত্যা করা সম্ভব ছিল এবং হত্যার উদ্দেশ্যটাও সেই সঙ্গে মনে
রাখতে হবে। নচেৎ ভুলপথে তুমি নিয়ে পড়বে। ভাল কথা, রামদেওর কোন সংবাদ
পেতে?

†

না।

আর একটা কথা—

বলুন ?

সুবীরবাবুর জবানবন্দী ও সেই সঙ্গে শমিতা দেবীর ও রঞ্জিণীর জবানবন্দীটারও
ভাল করে খোঁজখবর নাও। কারণ আমার ধারণা ওরা তিনজনেই মিথ্যে বলেছে।

শমিতা দেবী যে মিথ্যে বলেছেন সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু সুবীরবাবু আর
রঞ্জিণী—

কেউই সব সত্য প্রকাশ করেনি।

রামদেওটার খোঁজ পেলে হয়ত অনেক কিছুই জানা যাবে।

খোঁজ পেলেও জেনো, সেও হয়তো সহজে মুখ খুলবে না। শোন আরূপ, আরও একটা
কাজ তোমায় করতে হবে।

বলুন !

ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ সত্যিই গগনবিহারী কোন উইল করে গিয়েছেন কিনা? তাঁর আইন-পরামর্শদাতা কে ছিলেন? তাঁর খোঁজ পেলে হয়তো তাঁর কাছেই খোঁজটা
পাবে। সত্যিই যদি উইল একটা হয়ে থাকে তো জেনো এই হত্যা-মামলায় সেই উইলের
একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কিন্তু আর না। আজ চলি—রাত অনেক হল।

ভাবছি ত্রি রঞ্জিণীকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসব। ও মাগী নিশ্চয়ই জানে
রামদেও কোথায় গিয়েছে বা আছে।

তাড়াতড়ে করে কিছু করো না। ঘটনাকে তার স্বাভাবিক গতিতেই চলতে দাও।
ঘটনার স্বাভাবিক গতি আপনা থেকে অনেক কিছুই জানিয়ে দেয়। ঘটনার ধর্মই তাই।
অতঃপর আরূপ গাড়ি থেকে নেমে গেল।

আর ওরা কিরীটীর গৃহের দিকে চলল।

যোগজীবন পাথরের মতই যেন বসেছিলেন।

কিরীটীর শেষ কথাগুলো ও শমিতার ঐ ধরনের ব্যবহার যোগজীবনকে যেন অক্ষমাং
একটা পাহাড়ের ঢ়ুঁড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল।

একমাত্র বোন ত্রি শমিতা। বয়সেও তাঁর চাইতে অনেক ছুটি ও বলতে গেলে সম্ভানের
মতই। চিবিনিই তাই একটু বেশী প্রশংস্য ও ভালবাসাই সে পেয়ে এসেছে যোগজীবনের
দিক থেকে। ভালবেসে নিজের পছন্দমত বিয়ে করেছিল শমিতা এবং সে বিবাহে তাই
কোন বাধা দেননি যোগজীবন।

ভালবাসার বিবাহবন্ধনও টিকলো না, ডিভোর্স হয়ে গেল।

ঘর ভেঙে গেল।

প্রথমটায় ভেবেছিলেন যোগজীবন সব দোষটাই বুঝি শমিতার স্বামী অমলেন্দুরই। সে-ই নিশ্চয়ই মানিয়ে তিতে পারেনি—যার ফলে ভালবাসার বন্ধনটাও ছিঁড়ে গেল। তাছাড়া কে-ই বা আপমজনের দোষ দেখে বা দেখতে চায়! তাই শমিতার দিক থেকে যে কোন দোষ থাকতে পারে সেটা তিনি ভাবতেই চাননি।

ভুলটু ভাঙ্গতে যোগজীবনের খুব দেরি হল না। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে শমিতা তাঁর গৃহে এসে উঠবার পর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন অমলেন্দুর দোষ যতটুকুই থাকুক না কেন বিছেদের ব্যাপারে ঘর বেঁধে কোথাও সুখে বাস করবার নেয়ে নয় শমিতা।

আঞ্চলিক পরায়ণ, উচ্ছ্বৃষ্টি, বিলাসী জীবনের প্রতিই ঘোক বেশি শমিতার।

মনে মনে দৃংখ পেয়েছিলেন যোগজীবন, কিন্তু তবু মুখে কিছু বলতে পারেননি।

শমিতা চাকরি করে। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ক্লাবে হৈ-হৈ করে কাটায়, সেখানে মদ্যপানও করে। কোনটাই তাঁর পছন্দ ছিল না, কিন্তু তবু বোনকে মুখ ফুটে কিছু বলেননি।

ইদানিং গগনবিহারীর সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতার কথাটাও যে কানে আসেনি তাঁর তাও নয়, সেটাও তাঁর কানে এসেছিল এবং তাঁর জন্য শমিতার উপরে যতটা নয় তাঁর চাহিতে বেশি বিরক্ত হয়েছিলেন যোগজীবন গগনবিহারীর উপরেই।

ইচ্ছা হয়েছিল দু-একবার গগনকে কথাটা বলেন—গগন, ব্যাপারটা বড় দৃষ্টিকুটু লাগছে—কিন্তু তাও বলেননি।

সমস্ত ব্যাপারটার কুশ্বাসা তাঁর রুচিবোধকে পীড়িত করলেও কেন যেন মুখ ফুটে কাউকেই কিছু বলতে পারেননি।

তাঁর সহজ সৌজন্য ও স্বাভাবিক রুচিবোধ তাঁকে নিরস্ত করেছে।

কিন্তু আজ কিরীটী যা স্পষ্ট করে সবার সামনে বলে গেল, তারপর লজ্জায় যেন মাথাটা আর তিনি তুলতে পারছিলেন না। কেবলই মনে হচ্ছিল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

একেই তো আঞ্চলিক সময়েই নানা ধরনের ইঙ্গিত করে শমিতার চরিত্র সম্পর্কে। এই ব্যাপার জানাজানি হবার পর তারা নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে এবার নিশ্চয়ই।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল যোগজীবনের পদশব্দে। দেখলেন সাজগোজ করে শমিতা মেরে হয়ে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন যোগজীবন। ডাকলেন, শমি!

শমিতা ঘুরে দাঁড়াল।

এত রাত্রে কোথায় আবার বেরচ্ছ?

দরকার আছে—শমিতা বললে।

যতই দরকার থাক এখন যেও না এই রাত্রে।

কি ব্যাপার বল তো দাদা? রাত্রে কি আজ আমি প্রথম বেরচ্ছি? শমিতা একটু যেন ক্ষুঁপ হয়েই প্রশ্নটা করে।

যা বললাম তাই শোন। যোগজীবনের কঠমর গন্তী।

আমার কাজ আছে—বলে আর দাঁড়াল না শমিতা। সদর গেটের দিকে বারান্দা দিয়ে

হয়।

স্ত্রীকে অত্যঙ্গ ভালবাসাক্ষেত্রে যশোদাজীবন। যোগজীবনের বাবা শ্রীর মৃত্যুর শোকটা
সামলে উঠতে পারছিলেন।

শমিতার সকল দ্বায়িত্ব এসে পড়ল ওঁদেরই উপর। বাচ্চা শমিতা মাত্র চার বছরের
মেয়ে তখন।

যোগজীবনের নিজের প্রথমা কন্যা-সন্তানের চাইতেও দু বছরের ছোট বয়সে।

প্রভাবত্তাইয়ি একসম্মে মানুষ হতে থাকে। মাঝাখানে প্রভাবত্তীর আর একটি সন্তান
হয়েছিল, কিন্তু মৃত। প্রভাবত্তীর আর কোন সন্তান হয়নি।

কন্যা সবিতার সঙ্গেই নামে নাম মিলিয়ে প্রভাবত্তী ছেট ননদিনীর নাম রেখেছিলেন
শমিতা।

সবিতার যখন সতেরো বছর বয়স তখন বিবাহ হয়ে গেল। লেখাপড়ায় তার মন ছিল
না—লেখাপড়া সে করেওনি। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ছিল শমিতা। শমিতা তখন স্কুল
ফাইনাল পাস করে আই. এ. পড়ছে কলেজে।

বিবাহের পর সবিতাকে তার স্বামী সঙ্গে করে সুদূর মালয় দেশে চলে গেল।

শমিতারও বিয়ের চেষ্টা করছিলেন যোগজীবন কিন্তু শমিতা বেঁকে বসল। বললে, না,
বি. এ. পাস না করে সে বিবাহ করবে না।

প্রভাবত্তী বললেন, আহা থাক। সবিতার বিয়ে হয়েছে, কোথায় কোন দূর দেশে চলে
গেছে। দু বছর তিন বছরের আগে আসবেও না। থাক, এর বয়েসই বা এমন কি হয়েছে!
পাস-টাস করুক, তারপর না হয় বিয়ে-দেওয়া যাবে।

শমিতা যখন এম. এ পড়ছে সেই সময় হঠাৎ স্ট্রোকে প্রভাবত্তী মারা গেলেন। শমিতা
এম. এ. পাস করল, তারপর এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিল।

যোগজীবন মধ্যে মধ্যে বিয়ের কথা বলতেন কিন্তু জোরজারি করতেন না। কারণ
মৃত্যুর সময় প্রভাবত্তী স্বামীকে বলে গিয়েছিলেন, বিয়ের ব্যাপারে ওকে যেন চাপাচাপি
না করা হয়। সেটাও এক কারণ ছিল আর শমিতা চলে গেলে একা পড়বেন, তাও এক
কারণ ছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন শমিতা অমলেন্দুকে সঙ্গে করে এনে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তার
এক সহকর্মী বাস্তবীর ভাই।

ভাল বংশের ছেলে, শিক্ষিত, ভাল চাকরি করে। দেখতেও সুন্দী।

ইদনীং শমিতার ব্যাপারে একটু চিন্তিতই যেন হয়ে উঠেছিলেন যোগজীবন। শমিতার
স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা উচ্ছ্বসন্তা দেখা দিয়েছিল। তার চারচতুর্ভু
বেশভূষায়—সব কিছুতেই।

এমন কি বোনের বেশভূষার দিকে তাকাতেও যেন যোগজীবনের কেমন লজ্জা হত।

কিন্তু তবু কিছু তিনি বলেননি কোনদিন বোনকে।

কেমন যেন মায়া হয়েছে, কেমন যেন একটা সংকোচ শৈথি করেছেন।

ঐ ঘটনার বছরখানেক আগে রিট্যায়ার করেছিলেন যোগজীবন কাজ থেকে।

শমিতা অমলেন্দুকে দেখিয়ে বললে, তাকে বিবাহ করবে। তারা পরম্পর পরম্পরকে
কথা দিয়েছে।

যদিও এক জাত নয় তথাপি যোগজীবন সে বিবাহে অমত করেননি শমিতা সুন্দী হবে

ভেবে।

বিবাহ হয়ে গেল।

শমিতা একদিন চলে গেল স্বামীর ঘরে।

কলকাতায় এক বন্দো অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে অমনেন্দ্র। কলকাতাতেই শ্যামবাজার অঞ্চলে বসে করে। মধ্যে মধ্যে দুজনে আসত যোগজীবনের সঙ্গে দেখা করতে।

যোগজীবন তখন নিজের বাড়ির একতলাটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শমিতা এসে মধ্যে মধ্যে দু একদিন থাকত বলে তিনতলাটা ভাড়া দেননি। সেটা খালিই পড়ে ছিল।

দুটো বছরও গেল না বিবাহের পর, ডিভোর্স হয়ে গেল শমিতা ও অমনেন্দ্র।

শমিতা যোগজীবনের কাছে ফিরে এল আবার এক শীতের মধ্যরাত্রে।

সেই সময়ই শমিতা মরালী সঙ্গে নামে ক্লাবটা গড়ে তোলে। এবং কিছুদিন পরে শমিতা আবার চাকরি নিল অন্য একটা কলেজে।

ডিভোর্স করে ফিরে আসবার পর যেন শমিতা আরও বেশি উচ্ছ্বল হয়ে উঠতে লাগল দিনকে দিন।

ক্লাব, পার্টি, হৈ-চৈ, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সর্বক্ষণ ঐ সব নিয়েই মেতে রহিল।

যোগজীবন মনে মনে ভাবলেন, আহা থাক। যাতে সুখী হয় তাই করুক।

কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যোগজীবনের, সেদিন অমন করে রাশটা ছেড়ে না দিলে বোধ হয় এত বড় কলঙ্ক তাঁকে মাথায় নিতে হত না।

যাক চলে গিয়েছে, ভালই হয়েছে।

আর শমিতার মুখদর্শনও তিনি করবেন না।

॥ দশ ॥

শমিতা বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছুদূর হাঁটতেই একটা ট্যাঙ্কি পেয়ে গেল। তখন রাত প্রায় দশটা।

ট্যাঙ্কিওয়ালা শুধায়, কিধার যায়গা মাঝেজী?

গড়িয়া চল। শমিতা বললে।

ট্যাঙ্কিতে উঠেই মনে পড়েছিল বান্ধবী সর্বাণীর কথা। কলেজজীবনে অনেক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল শমিতার, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বলতে বা সত্ত্বিকারের বন্ধুত্ব বলতে একজনের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল—সর্বাণী।

এম. এ ফিফথ ইয়ারে পড়তেই সর্বাণীর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল।

সর্বাণীর স্বামী শিশিরাংশু একজন অধ্যাপক। শাস্ত্রশিষ্ট গোবেচারা মানুষ। হোটেখাটো রোগা। হোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে শিশিরাংশু মামা-মামীর কাছেই মানুষ।

দুটো সাবজেক্টে এম. এ পাস। দুটোতেই প্রথম শ্রেণী। কাজেই একটা অধ্যাপনার কাজ ছাটিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হ্যানি তার।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ডট্টরেটের জ্ঞান প্রস্তুত হচ্ছিল শিশিরাংশু।

কম ভাড়ায় বেশ খোলামেলা চার কাশমার ভালো একটা মোতলা শাড়ির একতলাটা গড়িয়ায় পেয়ে শিশিরাংশু সেখানেই উঠে গিয়েছিল ডবামীপুরের যিঙ্গি ছেট ছেট দুটো

ঘর ছেড়ে দিয়ে।

দুটি বাচ্চা—একটি পেলে, একটি মেয়ে।

কলেজ, ক্লাব, পার্টি-মানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে করতে হঠাতে এক-আধদিন যখন একটা ক্লাস্টি শমিতার—সে চলে যেত সর্বাণীর ওখানে। তিনি-চার ঘণ্টা মেখানে কাটিয়ে আসত।

সর্বাণী বলেছে, কি রে, হঠাতে সূর্য কোন দিকে উঠল?

শমিতা হাসতে হাসতে বলেছে, সূর্যোদয় আজ পর্যন্ত জীবনে কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে বলে মনে পড়ে না, কাজেই আজ যদি অন্য দিকে সূর্য উঠেও থাকে জানতে পারিনি।

তা এভাবে ছুটোছুটি না করে একটা বিয়ে কর না! সর্বাণী বলেছে।

কাকে রে? পাত্র হাতে আছে নাকি তোর? শমিতা বলেছে।

কি রকমটা চাই বল? এখনি খুঁজে এনে দেব। তোর জন্য আবার পাত্রের অভাব? বলিস কি? আজকাল কি তুই তাহলে ঘটকীর প্রফেশন নিয়েছিস?

নেব ভাবছি—অস্তত তোর জন্য। সর্বাণী জবাবে বলেছে।

আহা রে—মরে যাই! এমনি না হলৈ বন্ধু!

তারপর বিবাহের পর একদিন নয়, চার-পাঁচদিন গিয়েছিল শমিতা আমলেন্দুকে নিয়েই সর্বাণীর ওখানে।

সর্বাণী জিজ্ঞাসা করেছে, কেমন লাগছে?

নো খিল। তোর কথা শুনে মধ্যে মধ্যে ভেবেছি, না জানি কি একটা খিল আছে বিবাহিত জীবনের মধ্যে।

বলিস কি?

সত্যি। আমি তো বুঝতে পারি না তোরা কি করে মশগুল হয়ে আছিস!

ন্যাকা!

না ভাই, একবর্ণও মিথ্যে বলছি না।

তাই বুঝি দেখা দিস না?

আগেই বা দেখা কত ঘন দিতুম যে আজ বিরলা হয়ে উঠেছি!

তারপরই হঠাতে একদিন সর্বাণী জানতে পেরেছিল শমিতাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। জানতে পেরেছিল সর্বাণী শমিতার একটা চিঠিতেই। শমিতাই লিখেছিল তাকে—

সর্বাণী, ডিভোর্স হয়ে গেল অমলেন্দুর সঙ্গে। দাদার এখানে ফিরে এসেছি। চারপাশের একটা সন্ধান করছি। কি রে, চিঠিটা পড়ে তোর খুব অবাক লাগছে তো!

কিন্তু তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, সাত-আট মাস বিয়ের পরে যেতে-না-যেতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ শাসন আর বিধিনিয়মের বন্ধনের টোহান্তির মধ্যে বিশ্রী ক্লাস্টির একটা একয়েমেরির মধ্যে থাকা আর যার পক্ষেই সন্তুষ্ট হোক আমার পক্ষে সন্তুষ্পর হবে না। শুধু কি তাই, সর্বক্ষণই যেন একটা সন্দেহের কাটা কিচ কিচ করে বিধছে। তাই ও পাট চুকিয়ে দিলাম। দেখা হলৈ সবিস্তারে তাকে বলতেই হবে—তখনই শুনিস। এই পত্রে আর লিখলাম না। শুধু সংবাদটা দিলাম—ইতি তোদের

শমিতা সানাল

স্তৰ হয়ে গিয়েছিল সর্বাণী শমিতার চিঠিটা পড়ে। কোন জবাব দেয়নি সে চিঠির।

তারপর আরও দুটো বছর ক্রেতে গিয়েছে। এই দু বছরে কিন্তু একদিনও দেখা-সাক্ষাৎ আর হয়নি ওদের।

চলস্ত গাড়ির মধ্যে বসে ভাবছিল শমিতা—সেই চিঠির কোন জবাব দেয়নি সর্বাণী!

সেও অবিশ্বাস আর কোন চিঠি দেয়নি। যায়ওনি এই দু বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যে সর্বাণীদের ওখানে।

সর্বাণীদের ওখানে তো সে চলেছে! সর্বাণী তাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবে কে জানে! বিস্ময়ে করে দুই বৎসরেরও অধিক সময় পরে হঠাতে আজ রাত্রে যাই সে করুক একটা রান্ধির মত আশ্রয় কি সে তাকে দেবে না! দেবে নিশ্চয়ই। কাল সে যা হোক একটা থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে যেখানেই হোক।

প্রায় দশটা চালিশ নাগাদ শমিতার ট্যাক্সিটা এসে সর্বাণীদের বাড়ির দরজায় থামল। রাত্রের আহারাদি সর্বাণীদের তখনও হয়নি। শিশিরাংশু তখনও বাইরের ঘরে বসে তার কাগজপত্র নিয়ে কি সব লিখছিল, সর্বাণী ভিতরের ঘরে ছিল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে কলিং-বেলটা টিপতেই কলিং-বেলের শব্দে সর্বাণীই এসে দরজা খুলে দেয়, এবং বলাই বাছল্য অত রাত্রে এত দিন পরে একটা সুটকেস হাতে দরজার সামনে আবছা আলো-আঁধারিতে হঠাতে শমিতাকে দেখে দে প্রথমটায় ঠিক চিনে উঠতে পারে না তাকে।

বলে, কে? কঠে সর্বাণীর একটা সংশয়।

সর্বাণী, আমি শমিতা—বললে শমিতা।

শমিতা! কি ব্যাপার? এত রাত্রে! সর্বাণী যেন কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলে।

সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়েই ঘরের মধ্যে পা দিল শমিতা।

কি ব্যাপার? শমিতার দিকে তাকিয়ে বিশ্বায়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে সর্বাণী। হাতে সুটকেস, কোথা থেকে আসছিস?

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে শিশিরাংশুও উঠে এসেছিল, কে, সবি!

কিন্তু পরক্ষণেই ঘরের আলোয় শমিতাকে দেখে শিশিরাংশুও চিনতে পারে তাকে। বলে, একি শমিতা দেবী, এত রাত্রে?

হ্যাঁ। যাক চিনতে পেরেছেন তাহলে আপনি আমায়! আমার বান্ধবী তো চিনতেই পারেনি। বলতে বলতে শমিতা হাতের সুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে একটা বেত্তে সোফার উপর বসে পড়ে বলে, শোন সর্বাণী, আজ রাতটা তোর এখানে আমি থাকবেই চাই।

শিশিরাংশু বলে ওঠে, নিশ্চয়ই থাকবেন। আজকের রাতই বা কেন—সত্ত্বদিন খুশি থাকুন না।

শিশিরাংশু উচ্ছুসিত অভ্যর্থনা জানালেও সর্বাণী যেন কেমন স্তুক্ষ হয়ে শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কোন কথাই বলে না। তার চোখে মুখে অভ্যর্থনার কোন আনন্দই নেই যেন। শমিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যাপারটা এড়ায় না।

তাই সে একটু হেসে সর্বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আজকের রাতটা ভাই, কাল সকালেই চলে যাব।

শিশিরাংশুই আবার বলে, আপনি এত কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন শমিতা দেবী?

কিন্তু বেশি কিছু আর বলতে পারে না শিশিরাংশু, হঠাতে তার স্তুর মুখের দিকে নজর পড়ায়। একটু যেন বিরত কোথা করে—বলে, সবি, ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। আমার সামান্য দেরি আছে।

শিশিরাংশু ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শ্রমিতা বললে, আমি বোধ হয় হঠাতে এভাবে এই রাত্রে তোর এখানে এসে পড়ে তোকে একটু বিপ্রত করলাম সর্বাণী, তাই না?

চোখাথা থেকে আসছিস? এতক্ষণে সর্বাণী আবার কথা বলে।

দাদার বাড়ি থেকে চলে এলাম।

চলে এলি মানে?

সে-সব অনেক কথা। দু'কথায় শেষ হবে না। দাদার ওখান থেকে বের হয়ে কোথায় যাই এত রাত্রে ভাবতে গিয়ে তোর কথাই মনে পড়ল তাই সোজা তোর এখানেই চলে এলাম। অবিশ্য কাল সকালেই চলে যাব।

চল এই ঘরে। বলে শ্রমিতাকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে সর্বাণী চুকল।

একটা আরাম-কেদারায় শ্রমিতা বসল।

দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস? সর্বাণী আবার জিজ্ঞেস করে।

না রে।

তবে?

প্লীজ সর্বাণী, এখন কোন কথা নয়। পরে তোকে সব বলব।

সর্বাণী আর কোন প্রশ্ন করে না। কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

একজন সোফায় বসে, অন্যজন অঙ্গ দূরে দাঁড়িয়ে। কারো মুখেই আর যেন কথা নেই। ওদের দেখে মনে হয় কেউ যেন আর বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

যদিও দুজনেই মনে মনে চাইছিল একজন কেউ বলুক যা দুজনেই শুনতে চায়। অথচ দুজনের মধ্যে কি গভীর বন্ধুত্বই না ছিল একসময়!

মাত্র মাঝখানে দুটো বছরের অদর্শন। সময়টা কি এতই দীর্ঘ যে তাদের উভয়কে ঘিরে যে উত্তাপটা দুজনের মনের মধ্যে একসময় ছিল সেটা একেবারেই মিহিয়ে গিয়েছে!

সর্বাণী।

স্তুতা ভঙ্গ করে ডাকল শ্রমিতাই অবশ্যে, কারণ সে সত্যিই যেন বেশ অস্বস্তি ব্রোধ করছিল।

কিছু বলছিল? সর্বাণী বান্ধবীর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

মনে হচ্ছে তোকে খুব অসুবিধায় ফেললাম, তাই না রে! কথাটা বলে শ্রাপনের মুখের দিকে চেয়ে শ্রমিতা হাসবার চেষ্টা করে।

না, অসুবিধা কি? কথাটা যেন নেহাত সৌজন্যের খাতিরেই রাখা হতে করে বললে সর্বাণী।

তা ফেলেছি বৈকি। সত্যি, আমি ভেবেছিলাম—যাক গে, শুধু আজকে রাতটা তোদের বাইরের ঘরে সোফাটা উপরে বসেই আমি কাটিয়ে দিতে পারব। আমি এই ঘরেই যাচ্ছি, বুঝলি?

শ্রমিতা উঠে দাঁড়াল সুটকেসটা হাতে নিয়ে এবং ধীরে ধীরে সত্যি-সত্যিই একটু আগে

যে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল সেই ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

তোকে ব্যস্ত হতে হবে না শমিতা। এক রাত্রের জন্য ব্যবস্থা হয়েই যাবে একটা। তুই
বস।

শমিতা সর্বাণীকে দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, না রে, কিছু অসুবিধা হবে না আমার
সত্তিই। তুই ব্যস্ত হোস না।

শমিতা পাশের ঘরটার মধ্যে চলে গেল। ঘরটার মধ্যে তখনও আলো জ্বলছিল।
শমিতা একটু আগে যে সোফাটার উপর বসেছিল সেই সোফাটার উপরেই এসে বসল
দ্বরজন্তু টেনে দিয়ে।

১০ সর্বাণী তখনও পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরটা ছেট। একধারে একটি ডাইনিং টেবিল—তার পাশে ছেট একটা ফ্রিজ।

খানচারেক চেয়ার আর ক্যাপ্সিসের একটা আরাম-কেদারা। এই ঘরেরই সংলগ্ন
একদিকে বাথরুম, অন্যদিকে কিচেন।

সামনে পাশাপাশি দুটো শোবার ঘর। একটাতে সর্বাণী তার মেয়েছেলেদের নিয়ে
শোয়, অন্যটায় শিশিরাঙ্গ শোয়।

খুশি হয়নি আদৌ সর্বাণী অত রাত্রে শমিতার আকস্মিক আবির্ভাবে। তার কারণও
ছিল। শমিতা কথা বলছিল আর মুখ থেকে যে গন্ধটা বেরছিল সেটা যে মদের গন্ধ
সর্বাণীর সেটা বুঝতে দেরি হয়নি।

দুই বন্ধুর মধ্যে দেখাশুনা না হলেও ইদানীং দুই বৎসর সর্বাণী মধ্যে মধ্যে শমিতার
বর্তমান উচ্ছ্বল্ল জীবনের খবর পেত এর-ওর মুখ থেকে। এবং শমিতা যে ক্লাবে ও
হোটেলে গিয়ে পুরুষ-বন্ধুদের নিয়ে হৈচে করে মদ্যপান করে—খবরটা দিয়েছিল কিছুদিন
আগে তারই আর এক বাস্তবী রমলা।

রমলা ঐ শ্রেণীর মেয়ে না হলেও, তার বড় চাকুরে স্বামী ও তার বন্ধুবন্ধুবদের সঙ্গে
মধ্যে মধ্যে হোটেলে যেত ডিনার খেতে।

সেই দেখেছিল শমিতাকে।

বলেছিল, লেখাপড়ায় অত ভাল মেয়েটা, তার যে এতদূর অধঃপতন ঘটেছে ভাবতে
পারিনি সর্বাণী। যেমন বিশ্রী পোশাক তেমনি নোংরা চালচলন। বরাবরই ও অবিশ্য একটু
চপল ও উচ্ছ্বল্ল প্রকৃতির ছিল।

সত্যি বলছিস? সর্বাণী শুধিরয়েছিল।

নিজের চোখেই যে দেখলাম রে! তাছাড়া কি এক ক্লাব করেছে মরালী সংঘ না
কি—সেখানে শুনেছি একগাদা পুরুষ-মেয়ে জুটৈ মাঝারাস্তির পর্যন্ত বেলেঘাপনা করে।
আমার স্বামী সুহাদ কি বলছিল জানিস?

কি?

ও একটা বেশ্যা; তা সত্যিই তো, বেশ্যা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! এককালে
তো তোর সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ছিল, আসে না এখানে?

না।

ছিঃ ছিঃ, ডিভোর্স করে স্বামীটাকে ছেড়ে এসে একটা শ্রেণীর জীবনযাপন করছে!
ঐজন্যই বোধ হয় ডিভোর্স করেছে!

সর্বাণী কোন কথা বলেনি।

রমলার কথাগুলোই মনে পড়েছিল সর্বাণীর ঐ মুহূর্তে।

হঠাৎ শিশিরাংশুর কঠফরে সর্বাণীর চমক ভাঙে, কই, তোমার বান্ধবী কোথায় সবি? এক কাজ কর। আমার ঘৰটায় ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও বরং। খেয়েদেয়ে এসেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

না।

দেখ যদি না খেয়েদেয়ে এসে থাকেন—কিন্তু কোথায় তিনি?

বাইরের ঘরে।

যাও। দেখ খেয়ে এসেছেন কিনা।

ধীরে ধীরে কিছুটা চাপা গলায় সর্বাণী বললে, বোধ হয় খেয়েদেয়েই এসেছে।

তাহলেও একবার জিজ্ঞাসাটা করা দরকার যাও।

ভাবছিলাম এক কাজ করলে হয় না? অন্য কথা পাড়ল সর্বাণী স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে।

কি?

যে ফোলডিং ক্যাম্প-খাটটা আছে সেটাই বাইরের ঘরে পেতে ওকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলে হয় না?

না, না—সেটা ভাল দেখাবে না।

কেন? ভাল দেখাবে না কেন?

হাজার হোক তোমার সহপাঠিনী—বান্ধবী।

তাতে কি হয়েছে? কবে কলেজে কটা দিন একসঙ্গে পড়েছিলাম! এমন কি সম্পর্ক যে—কথাটা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েই বোধ হয় শেষ করতে পারল না সর্বাণী।

কিন্তু তার গলায় যে চাপা উষ্মাটা প্রকাশ পেল সেটা সেই মুহূর্তে শিশিরাংশুর মত লোককেও যেন বিস্থিত করে দিয়েছিল।

সে বলে, আঃ সর্বাণী, কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি।

আঃ, চুপ কর। থামিয়ে দেয় শিশিরাংশু স্ত্রীকে। যাও, দেখ উনি কি করছেন।

স্বামীর কথায় সর্বাণীও যেন এতক্ষণে খানিকটা সংবিধি ফিরে পায়। নিজের রাঢ় আচরণে খানিকটা থমকে যায়।

সর্বাণী ভেজানো দরজাটা ঠেলে পাশের ঘরে পা দেয়।

॥ এগারো ॥

ঘরে পা দিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ায় সর্বাণী।

ঘরটা অঙ্ককার। আলো নেভানো।

এবটু ইতস্তত করে সর্বাণী, অঙ্ককার ঘরের মধ্যে দাঁড়ায় মুহূর্তের জন্য। তারপরই মৃদুকষ্টে ডাকে, শমিতা!

কিন্তু কোন সাড়া আসে না অঙ্ককারে।

হাত বাড়িয়ে সর্বাণী সুইচটা টিপে ঘরের আলোটা জ্বলে দিল। ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই ওর নজরে পড়ল বড় সোফাটার উপরে পা তুলে চোখ বুজে শুয়ে আছে শমিতা। মনে হল ঘুমোচ্ছে।

একটু ইত্তত করল সর্বাণী। তারপর মৃদুকঠে ডাকল, শমিতা, এই শমিতা? কিন্তু সর্বাণীর ডাকে শমিতা চোখও খুল না, সাড়াও দিল না। এই শমিতা? মুমিয়ে পড়লি নাকি? বেশ মেয়ে তো! এই শমিতা, ওঠ!

তথাপি শমিতার কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সর্বাণী তখাপি কিছুক্ষণ শায়িতা শমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এক সময় ঘরের আলাদা আবার নিভিয়ে ঘরের বাইরে এসে দরজাটা ভিতর থেকে টেনে দিল। কিন্তু? শিশিরাংশু জিজ্ঞাসা করে।

ঘুমিয়ে পড়েছে। সর্বাণী বললে।

ঘুমিয়ে পড়েছে! কোথায়?

সোফাটার উপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ছিঃ ছিঃ, দেখ তো কি ভেবেছেন!

কি আবার ভাববে? আর ভাবে ভাবুক। চল, তোমাকে খেতে দিই। বলতে বলতে সর্বাণী কিচেনে গিয়ে চুকল।

শিশিরাংশুকে খাবার পরিবেশন করে দিল, অথচ সর্বাণী বসল না টেবিলে।

শিশিরাংশু জিজ্ঞাসা করে, তুমি খাবে না?

কিন্তু নেই—তুমি খাও।

খেতে খেতে শিশিরাংশু একসময় বলে, কাজটা ভাল হল না সবি!

কেন!

তা নয় তো কি! একটা রাতের জন্য ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়িতে এলেন—তাছাড়া ঐভাবে কেউ ঘুমোতে পারে নাকি! এদিকে যা মশা—

তা আমি তো আর সোফায় শুয়ে রাত কাটাতে বলিনি!

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল শিশিরাংশু, সর্বাণী।

কি?

মনে হচ্ছে তুমি যেন হঠাতে উনি এভাবে তোমার বাড়িতে আসায় ঠিক সন্তুষ্ট হওনি।

নিশ্চয়ই হইনি।

কিন্তু কেন?

ওর সব কথা তুমি জান না, ইদানীং ও যেভাবে উচ্ছৰ্বল জীবনযাপন করছিল—
কথাটা তোমার আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সর্বাণী।

পরে বলব, এখন খেয়ে নাও।

কিন্তু—

আচ্ছা, তুমি কি কিছুই টের পাওনি?

কি টের পাব?

কেন, কোন গন্ধ পাওনি ওর মুখে?

কিসের গন্ধ?

ওর মুখ থেকে ভড়ভড় করে মদের গন্ধ বেরচিল যখন ও কথা বলছিল! গন্ধ পাওনি তুমি?

সে কি! কই, আমি তো—

আশ্চর্য! তোমার নাকে গন্ধ গেল না! সি ইজ ড্রাঙ্ক! আমার সারাটা গা এখনও বমি-

বমি করছে। প্লান না করে আমি শুতে পারব না।

শিশিরাংশু আর কেনকথা বলে না।

একসময় তারপর প্লানের ঘরের আলো নিতে গেল। সর্বাণী ও তার স্বামীর কথা আর শোনা যায় না। আরও কিছু পরে শমিতা উঠে বসল সোফাটার ওপরে অন্দরকারে ধীরে ধীরে।

এতক্ষণে ভরে অন্দরকারে মশার কামড়ে চোখ-মুখ জুলা করছিল শমিতার। বাকি রাতটুকু হুম হবে না। মশার কামড়ের জুলা না থাকলেও অবিশ্য ঘুম আসত না শমিতার ছেখে।

দাদা যে তাকে অমন স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের উপরেই বলে দিতে পারে তার বাড়িতে আর শমিতার স্থান হবে না ভাবতে পারেনি ও। কাল সকালেই যেখানে হোক একটা ব্যবহা থাকার করে নিতেই হবে তাকে। কিন্তু কোথায়? সেটাই ভেবে কোন কুল-কিনারা পায় না শমিতা।

সর্বাংগে তাকে একবার সমরেশের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কিন্তু সমরেশের কথা মনে পড়তেই মনটা যেন কেমন একটা বিত্তফায় ভরে ওঠে শমিতার। তার প্রতি সমরেশের মনোভাবটা জানতে শমিতার বাকি নেই।

আজ যদি সমরেশের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, সমরেশ তার দুর্বলতার সুযোগটা পুরোপুরিই নেবে। সমরেশের বাহবল্লভনে তাকে ধরা দিতেই হবে। অথচ মনের দিক থেকে এতটুকু সাড়া না মিললেও, সমরেশ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কারো কথাই তার মনে পড়ছে না যে আজ তাকে বাঁচাতে পারে।

আর একজন অবিশ্য পারত, কিন্তু তার নাগাল আর পাওয়ার তার কোন উপায় নেই।

না, অসম্ভব মশা। বসবারও উপায় নেই। শমিতা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে অন্দরকারেই পায়চারি শুরু করল।

সর্বাণী সারাটা রাত ঘুমোতে পারেনি। শমিতার কথাই ভেবেছে। শমিতা এক সময় তার ঘনিষ্ঠতম বাস্তবী ছিল। কিন্তু আজ যেন শমিতাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না।

আশ্চর্য! শমিতার প্রতি এমন যে একটা বিত্তফা তার মনের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছে কখনও সে জানতেও পারেনি। কিছুতেই যেন সর্বাণী মন থেকে শমিতাকে ক্ষমা করতে পারছিল না। এমনই বিচিত্র মানবের মন বটে! যাকে একদিন সর্বতোভাবে সমস্ত মন দিয়ে কামনা করেছে, আজ তারই প্রতি বিত্তফায় মনটা যেন শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

বাকি রাতটুকু শয়ায় ছটফট করে—ভোরের আলো একটু জানালাপথে দেখা দিতেই সর্বাণী উঠে পড়ল শয়া ছেড়ে।

হাত মুখ ধূয়েই চায়ের জল চাপাল। এক কাপ চা তৈরি করে বাইরের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে পা দিয়েই সর্বাণী থমকে দাঁড়াল। ঘর খুল্য। শমিতা নেই—তার সুটকেস্টাই নেই। বাইরের দরজাটা ভেজানো। বুজতে দেরি হয় না সর্বাণীর, শমিতা চলে গিয়েছে।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সামনের স্নেক্টার-টেবিলটার ওপরে। একটা কাগজ ভাঁজ করা

রয়েছে, একটা বই দিয়ে ছাপা দেওয়া। এগিয়ে গিয়ে ভাঁজ-করা কাগজটা তুলে নিল সর্বাণী।

যা ডেবেছিল—তাই শমিতা চিঠি লিখে রেখে গেছে একটা। ঘরের মধ্যে তখনও বাপসা-বাপসা আঙ্ককার।

আলোচনাট্টলে চিঠিটা পড়তে থাকে সর্বাণী।

সর্বাণী

চলে যাচ্ছি ভাই। কাল রাত্রে এসে তোকে যে এতখানি বিরত করব ঠিক বুঝতে পারিনি, বুঝলে নিশ্চয়ই আসতাম না। আমাদের পুরনো দিনের বন্ধুত্বটার যে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই বুঝতে পারি নি রে। যাওয়ার সময় তোকে মুখে বলে যেতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করিস। তোকে কাল রাত্রে বলতে পারিনি, দাদা আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলায়ই অত রাত্রে কোথায় যাই ভাবতে গিয়ে তোর কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়্যায় তোর কাছেই এসেছিলাম। তোর স্বামীকে এ চিঠিটা দেখাস না—ছিঁড়ে ফেলিস। আর হয়ত জীবনে দেখা হবে না।

ইতি—শমিতা

বড় রাস্তায় পড়ে কিছুটা হাঁটবার পরই একটা ট্যাঙ্কি পেয়ে গিয়েছিল শমিতা।

ট্যাঙ্কিতে বসে-বসেই মনে পড়ল আজ অনেক দিন পরে আবার স্বামী অমলেন্দুর কথা।

বছর দুই আগে এক শীতের রাত্রে সেই যে একবন্দে বের হয়ে এসেছিল শমিতা অমলেন্দুর বাড়ি থেকে, তারপর আর কখনও অমলেন্দুর কথা মনে পড়েনি।

অমলেন্দুও আর কোন খোঁজ করেনি তার—সেও করেনি অমলেন্দুর। অমলেন্দু-পর্বতী যেন সে জীবনের পাতা থেকে একেবারে মুছেই দিয়েছিল।

কিন্তু অমলেন্দু কোন খোঁজখবর না নিলেও, অমলেন্দুর খবর মধ্যে মধ্যে ও কিন্তু পেত। তাদের ডিভোর্স হয়ে যাবার কিছুদিন পরেই অমলেন্দুর বাবা মারা যান, তার মাস কয়েক পরেই ভায়ে ভায়ে অমলেন্দুর আলাদা হয়ে যায়।

পৈতৃক গৃহ ছেড়ে অমলেন্দু মিডলটন স্ট্রীটে একটা বিরাট ফ্ল্যাট-বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছে, সংবাদটা পেয়েছিল শমিতা সমরেশের কাছেই। সমরেশ একদিন অমলেন্দুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দু বইয়ের ব্যবসা শুরু করেছিল।

অমলেন্দু যে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি সে খবরটাও পেয়েছিল শমিতা।

চলমান ট্যাঙ্কিতে বসে অমলেন্দুর কথা হাঁটাই মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় অমলেন্দুর কাছে গেলে কেমন হয়! কোন হোটেলে গিয়ে উঠবার মতো তাকা তার হাতে নেই। একটা কোন বোর্ডিংই তাকে খুঁজে নিতে হবে, কিন্তু সেও সমস্তের প্রয়োজন।

একবার মনে হয়, অমলেন্দু কিছু ভাববে না তো! মনে হয়ে ইসবে না তো! কিন্তু অমলেন্দু সে প্রকৃতির মানুষ নয়। মনে মনে সে যাই ভাবুক তার স্বাভাবিক শিষ্টাচারবোধ মুখে তাকে কিছু প্রকাশ করতে দেবে না।

তাছাড়া সেও আর চিরকালের জন্য কিছু সেখানে থাকতে যাচ্ছে না। তার বর্তমান সক্টের সময় কিছুদিনের জন্য একটা আশ্রয় চায় মাত্র সে তার কাছে।

ବିଶେଷ କରେ କିରୀଟୀ ରାୟେ ଶୈନଦୃଷ୍ଟିର ସାମନେ ଥେକେ ମେ ଆପାତତ କିଛୁଦିନ ଦୂରେ ଦୂରେ ଥାକତେ ଚାଯ, ଗଗନବିହାରୀର ବ୍ୟାପାରଟା ଯତଦିନ ନା ମିଟେ ଯାଯ, ମେ ଏକଟା ନିଭୃତ କୋଟର ଚାଯ ଯେଥାନେ ମେ ନିଜେକେ ଆୟାଗୋପନ କରେ ରାଖତେ ପାରେ ନିଶ୍ଚିଷ୍ଟେ ।

ହଁ, ଆଜ ମେ ଆୟାଗୋପନ କରତେଇ ଚାଯ ।

କଥାଟା ମେ ହୋୟାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେମନ ଯେନ ଏକଟା ଭଯେର ଅନୁଭୂତି ତାକେ ଅଟେଗ୍ରାହିତ ମତ ଆଁକଡ଼େ ଧରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ବୁକ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ଯେନ କେମନ କରତେ ଥାକେ ।

କିରୀଟୀ କି ତାକେ ସନ୍ଦେହ କରେଛେ! ତାର ଚୋଥେର ସେଇ ତୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଦୃଷ୍ଟି ଚୋଥେର ମାମନେ ଭେଦେ ଉଠେ ଯେନ ତାକେ ତୀଙ୍କ ଶଲାକାର ମତ ବିନ୍ଦ କରଛିଲ । ଆଜ୍ଞା, ସତିଇ ଗଗନବିହାରୀ ଟୁଇଲ କରେଛିଲ ନାକି?

ଆଶ୍ଚର୍ୟ, ମାନୁଷେର କି ଲୋଭ! କାମୁକ ଲମ୍ପଟ ଗଗନବିହାରୀ ଭେବେଛିଲ ତାର ଅର୍ଥ ଦିଯେଇ ଶମିତାକେ କରାଯାନ୍ତ କରତେ ପାରବେ । ଆର ସେଇ—ସେଇ କାରଣେଇ ହ୍ୟତ ତାକେ ଟେଲିଫୋନେ ଡେକେ ପାଠିଯେଛିଲ ଐ ରାତ୍ରେ ।

କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ୟ, ଏବେ ପାଗଲେର ମତ ଆବୋଲତାବୋଲ କି ସବ ମେ ଭାବଛେ!

କିଧାର ଯାଇଗା ମାଝେଜୀ?

ଟ୍ୟାଙ୍କି-ଡ୍ରାଇଭାରେର ଡାକେ ହଠାତ୍ ସେନ ଶମିତା ଚମକେ ଓଠେ ।

ଗାଡ଼ି ତଥନ ଗଡ଼ିଯାହଟା ବିଜଟା କ୍ରମ କରଛେ, ନିଚ ଦିଯେ ଏକଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟ୍ରେନ ଚଲେ ଯାଚେ—ତାର ଶବ୍ଦ ଓର କାନେ ଆସେ । ଓର ସମସ୍ତ ହୀନ୍ୟ ଯେନ ବିମ୍ବିମ କରେ ଓଠେ ।

ଶମିତା ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବଲେ, ମିଡ଼ଲଟନ ସ୍ଟ୍ରୀଟ ଚଲ ।

ଡ୍ରାଇଭାର ଆର କୋନ କଥା ବଲେ ନା—ସେମନ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଇଛିଲ ତେମନିଇ ଚାଲାତେ ଥାକେ ।

ସବେ ପ୍ରତ୍ୟେରେ ଆଲୋ ଚାରିଦିକେ ଛଢିଯେ ପଡ଼େଛେ । ରାତ୍ରାର ଆଲୋଗୁଲୋ ଏଖନେ ନେବେନି । ରାତ୍ରା ଏକପ୍ରକାର ଖାଲି ବଲଲେଇ ହୁଏ ।

ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପାଶ ଦିଯେ ଏକ-ଆଧଟା ଖାଲି ବାସ, ମିଳି ଭ୍ୟାନ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି ଚଲେ ଯାଚେ । ଦୁ'ଏକଜନ ପଥିକ ଚୋଥେ ପଡ଼େ । ଶମିତାର ଯେନ କେମନ ଶିତ-ଶିତ କରେ ।

ଗାଡ଼ି କ୍ରମେ ରାମକୃଷ୍ଣ କାଲଚାରାଳ ମିଶନ—ଗୋଲପାର୍କ ପାର ହୁୟେ ଟ୍ରୀମ ରାତ୍ରାର ଦିକେ ଚଲେଛେ ।

ହଠାତ୍ କି ଯେନ ଆବାର ମନେ ହୁଏ ଶମିତାର । ଘାଡ଼ ଫିରିଯେ ପିଛନେର ଦିକେ ତାକାନ । କେଉଁ—କେନ ଗାଡ଼ି ତାକେ ଅନୁମରଣ କରଛେ ନା ତୋ? ପିଛନେ ପିଛନେ ଏକଟା ଗାଡ଼ି ଆସଛେ ନା?

କାର ଗାଡ଼ି? ତାର ଟ୍ୟାଙ୍କିଟାକେଇ ଫଳୋ କରଛେ ନାକି?

ନାଃ, ଶମିତା କି ପାଗଲ ହୁୟେ ଯାବେ ନାକି! ଏବେ କି ମେ ଭାବଛେ! ଏବେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଭୟ? କିରୀଟୀ ରାୟେ ସେଇ ଦୁଟୋ ଚୋଥେର ଦୃଷ୍ଟି! ତୀଙ୍କ ଶଲାକାର ମତ ଅନୁଭୂତି!

ପାଶ ଦିଯେ ଏକଟା ଖାଲି ଟ୍ରୀମ ଚଲେ ଗେଲ ପାର୍କ ସାର୍କସେର ଦିକେ । ବଲବେ କି ଶମିତା ଟ୍ୟାଙ୍କି-ଡ୍ରାଇଭାରକେ ମିଡ଼ଲଟନ ସ୍ଟ୍ରୀଟ ନଯ, ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ସେ ଚଲୁକ! ବିଶ୍ଵାସାଧ୍ୟ?

କେନ, ସୋଜା ହାତୋଡ଼ା ସେଟନେ! ତାରପର ସେଥାନ ଥେକେ ଟ୍ରେନ୍-ଚେପ ଦୂରେ—ଅନେକ ଦୂରେ—ଆସାନମୋଳ, ଧାନବାଦ, ଗୋମୋ, ଗ୍ୟା, ମୋଗଲମରାଇ, ବେନାରସ ଛାଡ଼ିଯେ ଆରଓ ଦୂରେ!

କିନ୍ତୁ ତାରପର?

ସମସ୍ତ ଶହରଟା ଏରକମ ଆଶ୍ଚର୍ୟରକମ ଫାଁକା ଫାଁକା କେନ? ଶୁଭରେ ଏତ ଲୋକଜନ କୋଥାଯି ଗେଲ? ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାଙ୍କି-ଡ୍ରାଇଭାରଟା କିଛୁ ଭାବଛେ ନା ତୋ! ଟ୍ୟାଙ୍କି ଡ୍ରାଇଭାରଟା ଯଦି ବଲେ ଦେୟ!

শমিতা আবার একটু হাতচড়ে বসল। কপাল বুকের কাছে পিঠে ঘাম জমছে। হাত দুটো কেমন যেন অবশ্য হাত তুলে একবার নিজের মুখে হাতটা বুলিয়ে নিল শমিতা। কোন সাড় নেই এখন।

হাওয়াম কয়েকগাছি চূর্ণকুস্তল চোখে-মুখে এসে পড়ছে। হাত দিয়ে ওড়া চুলগুলো ঠিক করে দেৱাৰ চেষ্টা কৰল শমিতা, কিন্তু পারল না—হাতেৰ আঙুলগুলোও যেন কেমন অবশ্য হয়ে গিয়েছে।

কেমন যেন অনড় হয়ে বসে থাকে শমিতা। একসময় ট্যাঙ্গিটা ক্যামাক স্ট্রাইট দিয়ে মিডলটন স্ট্রাইটে এসে ঢুকল।

কেতনা নাস্বার মাদ্দজী?

ইধাৰই রোখ।

ড্রাইভার ট্যাঙ্গি থামল। শমিতা ট্যাঙ্গি থেকে নামল সুটকেস্টা নিয়ে। হাতেৰ ব্যাগ খুলে ট্যাঙ্গিৰ ভাড়া মিটিয়ে দিল। ট্যাঙ্গিটা মিটাৰ তুলে সোজা বেৰ হয়ে গেল চৌৰঙ্গীৰ দিকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শমিতা। তাৰপৰ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলল।

নতুন একটা সাততলা বিৱাট ম্যানসন। গেটটা খোলাই। মনে পড়ল শমিতার, কে যেন বলেছিল নতুন একটা ম্যানসনেৰ কোন একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে অমলেন্দু।

কোর্টিহার্ড দিয়ে এগুতেই একজন দারোয়ানকে নজরে পড়ল। দারোয়ানকেই ও শুধায়, ইধাৰ মিঃ এ. মল্লিক কোন ফ্ল্যাটমে রহতা হায় দারোয়ানজী?

মিঃ মল্লিক!

হ্যাঁ।

চারতলা—আঠাৰ নাস্বার ফ্ল্যাট।

সিঁড়ি কিধাৰ হ্যায়?

সিধা যাইয়ে বাঁয়ে তৱফ—লিফট সিঁড়ি দুই হ্যায়।

শমিতা আৱ দারোয়ানেৰ দিকে তাকাল না। সুটকেস্টা হাতে এগিয়ে গেল।

অটোমেটিক লিফট। একজন সুট-পৱিহিত ভদ্ৰলোক লিফট দিয়ে নেমে এল। শমিতা লিফটে চুকে থাৰ্ড ফ্লোৱেৰ বোতামটা টিপে দিল। দৱজা বক্ষ হয়ে গেল, আপনা হতেই লিফট উঠতে লাগল।

চারতলায় এসে লিফট থামল। দৱজা আপনা হতেই খুলে যেতে শমিতা কৱিডেৱে পা দিল।

॥ বারো ॥

আঠাৰ নম্বৰ ফ্ল্যাট।

ফ্ল্যাটেৰ দৱজায় অমলেন্দুৱাই নেমপ্লেট রয়েছে। ডষ্টৰ অমলেন্দু মল্লিক ডি লিট। তাহলে এই ফ্ল্যাটই।

কোনমতে অবশ্য হাতটা তুলে কলিং-বেলেৰ বোতামটা টিপল শমিতা। বাব-দুই বোতাম টিপতে দৱজা খুলে গেল। সামনেই নজরে পড়ে সাজানো-গোছানো একটা ড্রেইংৰুম।

দরজার মুখোমুখি একেবাৰে দেওয়ালে অমলেন্দুৰ একটা এনলার্জড ফটো। ভুল হয়নি তাহলে তাৰ—অমলেন্দুৰই ফ্ল্যাট।

মধ্যবয়সী একটা বিহুৰো ভৃত্য দরজা খুলে দিয়েছিল। জিঞ্চাসা কৰে, কিসকো মাংতা?

মশ্নিক সাৰ হায়!

জী। আভিতো নিদ যাতা হ্যায়।

ওখন্তো!

আপ কিধাৰ সে আতে হে?

এই মানে—কানপুৱ!

কানপুৱ।

হঁ।

আইয়ে, বৈঠিয়ে।

শমিতা এগিয়ে গিয়ে একটা সোফাৰ উপৰ বসল। সুটকেস্টা একপাশে নামিয়ে রেখে দিল।

ভৃত্য দরজাটা বন্ধ কৰে দিয়ে অন্দৰে আদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে—এতক্ষণে যেন একটা দুর্নিৰ্বার লজ্জা তাকে আচ্ছম কৰে ফেলতে থাকে; সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ অবশ্যজ্ঞাবী পৰিণতিটা যেন তাৰ চোখেৰ সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

ছিঃ ছিঃ, ঝোকেৰ মাথায় এ একটা কি কাজ সে কৰে বসল! শেষ পৰ্যন্ত মৰতে এখানে সে আসতে গেল কেন? একটু পৱেই অমলেন্দু হয়ত এই ঘৱে এসে ঢুকবে!

তাৰপৱ?

তাৰপৱ কি একটা নিষ্ঠুৰ ব্যঙ্গেৰ হাসি তাৰ চোখে-মুখে ফুটে উঠবে না?

বলবে না কি, ও, তাহলে তুমি! তা মিস শমিতা সান্যাল এখানে আবাৰ কি প্ৰয়োজনে? দাদা বুঁধি শেষ পৰ্যন্ত গলাধাঙ্কা দিল? জানতাম দেবে। কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি ঝূপ-যৌবন এখনও ফুৱিয়ে যায়নি। আৱ বুঁধি কাউকে গাঁথতে পাৱলে না মিস সান্যাল!

শমিতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে সোফাৰ পাশ থেকে সুটকেস্টা তুলতে যাবে হঠাৎ একটা চপলেৰ আওয়াজ কানে এল শমিতাৰ। একেবাৰে দৰজাৰ গোড়াতোই। থপ কৰে আৱৰ বসে পড়ল শমিতা।

পৰক্ষণেই ঘৱেৰ ভাৰী পৰ্দাটা তুলে অমলেন্দু এসে ভিতৱে প্ৰবেশ কৱল। শমিতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি পড়তোই অমলেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বিশ্বয়ে অৰ্ধশূট কঠে উচ্চাবৰত হস্ত একটিমাত্ৰ শব্দ, তুমি!

শমিতা চেয়ে থাকে অমলেন্দুৰ দিকে।

সদ্য বোধ হয় অমলেন্দুৰ ঘূম ভেঙেছে। গায়ে একটা হেস্ট-গাউন—মাথাৰ চুল বিস্রষ্ট।

শমিতা নিজেৰ অঞ্জাতোই উঠে দাঁড়াচিল আবাৰ কিম্বা অমলেন্দু বাধা দিল। বস,

বস—বলতে বলতে আৱও দু'পা সামনেৰ দিকে এগিয়ে এল অমলেন্দু।

ব্যাপারটা যেন তথনও তাৰ সদ্য-ঘূম-ভাঙ্গা মণ্ডিকে ঠিক প্ৰবেশ কৱছে না। শুধু

আকস্মিক নয়, অভিবিতও ব্যাপারটা তার কাছে। শমিতা তার গৃহে।
কি ব্যাপার বল তো হইল লুক সো শ্যাবি! মনে হচ্ছে যেন কোন দীর্ঘপথ ট্রেন-জানি
করে আসছ—কোথা থেকে আসছ?

অমলেন্দু—

চল চল—তা এখানে বসে আছ কেন? বুধনটা বলল কে একজন মাট্টজী এসেছে
কানপুর থেকে। আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি! চল চল, ভিতরে চল। অমলেন্দুর
কষ্টস্বরে থেনে একটা সাদর আগ্রহ অভ্যর্থনার আত্মীয়তার সূর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

শ্রম।

শমিতা উঠে দাঁড়াল।

শমিতাকে নিয়ে অমলেন্দু শয়নস্থরে গিয়ে ঢুকল তার। একপাশে এলোমেলো শ্যায়া,
একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে একটা ডিভান—অন্যপাশে একটা টেবিলের ওপরে একরাশ বই
কাগজপত্র ছড়ানো।

মাথার কাছে টেলিফোন, সিগারেট প্যাকেট, অ্যাসট্রে, লাইটার, ছেট একটা টেবিল-
কুক।

বস। ডিভানটা দেখিয়ে দিল অমলেন্দু।

শমিতা সত্ত্বাই আর দাঁড়াতে পারছিল না। পা দুটো যেন কাঁপছিল। শমিতা ডিভানটার
উপরে বসে পড়ুল।

এত সকালে—নিশ্চয়ই তোমার চা খাওয়া হয়নি শমিতা? এই বুধন—বুধন!

প্রভুর ডাকে বুধন এসে দেকে, জী।

চা হয়েছে?

জী হাঁ—চা রেডি।

এই ঘরে নিয়ে আয়।

বুধন চলে যাবার পর অমলেন্দু আবার শমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, হাত-মুখ খোয়া
হয়নি এখনও বলেই মনে হচ্ছে। এই যে বাথরুম, যাও।

শমিতা একটা কথাও বলে না। যন্ত্রচালিতের মত উঠে বাথরুমে দেকে।

অমলেন্দু প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। শমিতা! শমিতা! শমিতা
হঠ্যাং এল কেন আবার? মনে হচ্ছে শমিতা খুব চিপ্তিত, ক্লাস্ট। শমিতার কোন খবরাখবর
না নিলেও, এই দুই বৎসর তার সম্পর্কে সকল সংবাদই অমলেন্দুর কানে এসেছে। বিশেষ
করে মরালী সঙ্গের ব্যাপারটা।

শমিতা ইদানীং রীতিমত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছে। তার সম্পর্কে নানা সমস্যের
রসালো কেছা সবই তার কানে এসেছে।

কিন্তু অমলেন্দু কান দেয়নি সে-সব কোন সংবাদে। এককালে শমিতা তার স্তু ছিল।
তারপর ডিভোস হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে তো আর কোন সম্পর্ক নেই। তবু—তবু কেন
যেন মধ্যে মধ্যে অমলেন্দুর মনের ভিতরটা কি এক বেদনায় ক্রিষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে
অমলেন্দু তাকে ভুলতে পারেনি।

ঐ ভুলতে না পারাটাও কি তার কাছে কম লজ্জা হয়ে হয়েছে!

বুধন ট্রিতে চা নিয়ে এল।

একটু পরেই শমিতা বাথরুম থেকে বের হয়ে এল। চোখে মুখে ও কপালের চুলে চূর্ণ

ଜଳକଣ ଲେଗେ ଆଛେ । ଶାନ୍ତିର ଆଁଚଲଟା ଗାୟେ ଜଡ଼ାନୋ, ଶମିତା ଆବାର ଡିଭାନଟାର ଉପରେ
ଏମେ ବସଲ ।

ଅମଲେନ୍ଦୁ ଚା ତୈରି କରେ ଏକ କାପ ଏଗିଯେ ଦିଲ ଶମିତାର ଦିକେ, ନାଓ ।

ହାତ ବାଡ଼ିଯେ ଶମିତା ଚାୟେର କାପଟା ନେଯ । ହାତଟା ଯେନ କାଂପଛେ ।

ଅମଲେନ୍ଦୁ ନିଜର କାପଟା ହାତେ ତୁଳେ ନେଯ । ନିଃଶବ୍ଦେ ଦୁଜନେ କିଛୁକଷଣ ଚା ପାନ କରେ ।
କାରାର ମୁଖେ କୋନ କଥା ନେଇ, ଦୁଜନେଇ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଓ ଆଗେ କଥା ବଲୁକ । ଶମିତା
ଭାବେ ଓ ବୁଝି ତୋ ଜିଜ୍ଞାସା କରାର କଥା । କେନ ଆବାର ହଠାତ୍ ଏଲାମ !

ଅମଲେନ୍ଦୁ ଭାବେ, ନିଶ୍ଚଯାଇ ଶମିତା ବଲାବେ କିଛୁ । ତାର ବଲବାର କିଛୁ ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆଛେ, ଆର
ସେଇ ଜନାଇ ହ୍ୟାତ ଏସେଛେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଜନେଇ ବୁଝାତେ ପାରେ ମନେ ମନେ, ମଧ୍ୟିଖାନେ ଦୁଇ ବ୍ସରେର
ବ୍ୟବଧାନେ ଦୁଜନେ ଦୁଜନେର କାହିଁ ଥେକେ ଅନେକ ଦୂରେ ସରେ ଗିଯେଛେ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଛିଲ ଯା ଏକଦିନ ଆଜ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହ୍ୟୟେ ଦୁଜନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା
ଅଦ୍ଶ୍ୟା ପ୍ରାଚୀର ତୁଲେ ଦାଢ଼ିଯେଛେ କଥନ ଯେନ ।

ଏକ ସମୟ ଚା ଶେଷ ହଲ ବାକ୍ୟାହିନ ଶ୍ଵରତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ।

ଅମଲେନ୍ଦୁ ଏକଟା ସିଗାରେଟ୍ ଧରାଲ । ବୁଧନ ଐ ସମୟ ଐନିଦିନକାର ସଂବାଦପତ୍ରଟା ରେଖେ ଗେଲ
ଓଦେର ସାମନେ । ଅମଲେନ୍ଦୁ ହାତ ବାଡ଼ିଯେ ସଂବାଦପତ୍ରଟା ତୁଲେ ନିଲ । ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ବଡ଼ ବଡ
ହେଲାଇନଙ୍ଗଲୋଯ ଚୋଖ ବୁଲିଯେ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାଟା ଖୁଲିତେଇ ଅମଲେନ୍ଦୁର ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ
ଗଗନବିହାରୀର ନିହତ ହବାର ସଂବାଦଟା ।

ଅମଲେନ୍ଦୁ ଯେନ ଚମକେ ଓଠେ । କାରଣ ଗଗନବିହାରୀର ସଙ୍ଗେ ଶମିତାର ଇଦାନୀଂକାର ଘନିଷ୍ଠତାର
ସଂବାଦଟା ମେ ପେଯେଛିଲ ।

ସଂକଷିପ୍ତ ସଂବାଦ । ଗଗନବିହାରୀକେ ତାର ଶୟନଗୃହେ ମୃତ ରଙ୍ଗାପ୍ଲତ ଅବସ୍ଥା ପାଓଯା
ଗିଯେଛେ ପୃଷ୍ଠେ ଛୁରିକାବିନ୍ଦ । କାଉକେଇ ଏଥନ୍ତ ଗ୍ରେପାର କରା ହ୍ୟାନି । ଗଗନବିହାରୀର ବହଦିନେର
ଭୃତ୍ୟ ରାମଦେଓର କୋନ ସଂବାଦ ପାଓଯା ଯାଛେ ନା ।

ଅମଲେନ୍ଦୁ ଏକବାର ଆଡ଼ିଚୋଥେ ତାକାଳ ପାଶେଇ ଉପବିଷ୍ଟ ଶମିତାର ଦିକେ, ତାରପର ଆବାର
ସଂବାଦପତ୍ରେ ମନୋନିବେଶ କରଲ ।

କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିତେ ପାରଲ ନା । କାଗଜଟା ଭାଁଜ କରେ ଟେବିଲେର ଉପରେ ରେଖେ ଉଠେ ଦାଢ଼ାଲ ।
ଆମି ଏକଟୁ ବେଳେ ଶମିତା !

ବେଳେବେ ? କୋଥାଯ ?

ଏକଟା ବହି ଆଜ ବେଳେବାର କଥା । ଶେଷ ଫର୍ମଟା କାଲ ରାତ୍ରେ ଡେଲିଭାରୀ ଦେବାର କଥା ଛିଲ ।
ଏକବାର ପ୍ରେସେ ଯେତେ ହବେ, ସେଥାନ ଥେକେ ଏକବାର ପ୍ରଫେସାର ଚୌଧୁରୀର ଓଖାନେ ଯାବ ବେଳେ
ରହିଲ—ତୋମାର କୋନ ଅସୁବିଧା ହବେ ନା ।

ଶମିତା ଅମଲେନ୍ଦୁର ପ୍ରଶ୍ନର ଜ୍ବାବ ଦେଯ ନା ।

ଆଧ ସଂଟାର ମଧ୍ୟେ ଅମଲେନ୍ଦୁ ମାନ କରେ ସାଜଗୋଜ କରେ ଯଥନ ବେଳେ ହ୍ୟୟେ ଗେଲ, ଶମିତା
ତଥନ୍ତ ତେମନି ଡିଭାନଟାର ଉପରେ ବସେ ଆଛେ ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !

ଅମଲେନ୍ଦୁ ତୋ ତାକେ କୋନ କଥାଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ ନା ! କେବେ ମେ ହଠାତ୍ ଏଖାନେ ଏସେଛେ,
ତାର କିଛୁ ବଲାର ଆଛେ କିନା ।

କି କରବେ ମେ ? ଚଲେ ଯାବେ ?

କିନ୍ତୁ କୋଥାଯ ଯାବେ ? କଲେଜେ ଏକବାର ଯେତେ ହବେ ବଟେ, ତାହାର ଥାକବାର ଏକଟା

ব্যবস্থাও করতে হবে। অমলেন্দুর এখানে সে থাকতে পারে না। অমলেন্দুই বা তাকে থাকতে দেবে কেন? কি সম্পর্ক আজ আর তার সঙ্গে?

বেলা দুটো নাগাদ অমলেন্দু ফিরে এল।

ঘরে চুক্তি দেয়ে শমিতা তার শয্যায় শয়ে গভীর নিদ্রাভিভূত। শ্বান করে অন্য একটা সাধারণ তাত্ত্বের শাড়ি পরেছে। ভিজে চুলের রাশ বালিশে ছড়িয়ে আছে।

ঘৃণ থেকে বের হয়ে এসে অমলেন্দু বুধনকে ডাকল।

বুধন, মাসজী খেয়েছে?
না।

খায়নি?

না। দুবার তিনবার ডাকতে এসে দেখি মাসজী ঘুমাচ্ছেন। আপনার খানা দেব টেবিলে?

হ্যাঁ, দে।

বুধন চলে যাচ্ছিল, তাকে আবার ডাকল অমলেন্দু, শোন। দুজনের খানাই দে টেবিলে।

বুধন ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল।

অমলেন্দু এসে শয্যার পাশে দাঁড়াল। ডাকল, শমিতা!

কোন সাড়া নেই শমিতার।

শমিতা, ওঠ। খাবে না?

শমিতার ঘুম ভাঙে না।

অমলেন্দু একটু ইতস্তত করে, তারপর শিয়রের ধারে বসে ওর ভিজে চুলের উপরে হাত রেখে তাকে মুদুকঠে, শমিতা, শমিতা ওঠ।

ওঁ!

ওঠ। চল—টেবিলে খাবার দিয়েছে।

শমিতা এবারে উঠে বসে, তুমি? কখন এলে?

এই আসছি—চল টেবিলে খাবার দিয়েছে। যাও বাথরুম থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো।

শমিতা শয্যা থেকে উঠে বাথরুমের দিকে পা বাঢ়ায়।

খাবার টেবিলে বসে শমিতা বলে, একটা কথা বলব ভাবছিলাম অমল—
বল।

আমি যদি কটা দিন তোমার এখানে থাকি, তোমার কি খুব অসুবিধা হবে—
অমলেন্দু কোন জবাব দেয় না।

অবিশ্য বেশি দিন নয়, একটা থাকবার ব্যবস্থা হলেই—

যতদিন খুশি এখানে থাকতে পার শমিতা। অমলেন্দু মৃদু গুলায় জবাব দেয়।
না, না, বেশি দিন তোমাকে বিরক্ত করব না।

বিরক্তির তো কিছু নেই—

তোমার তো অসুবিধা হতে পারে।

অসুবিধা আবার কি?

হবে না?

কেন, অসুবিধা হবে কেন? হ্যাত তোমারই অসুবিধা হতে পারে।
আমার?

হ্যাঁ—এখানে থাকতে
না, অমনেন্দ্ৰ জ্ঞানী—
তবে কি?

আমি ভাইয়েলাম অন্য কথা।

কিন্তু—
না, কিছু না। তারপর একটু থেমে বলে, বুধন—তোমার চাকর কি ভাববে!
ও কেন ভাবতে যাবে?

ভাববে না বলছ?

না। তাছাড়া এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে?

তবুও হ্যাত ভাববে—কে আমি—কোথা থেকে হঠাত এলাম—
ওকে বললেই হবে—

কি বলবে?

তুমি আমার চেনা বস্তু।

বস্তু!

হ্যাঁ—কলকাতায় এসে আমার এখানে উঠেছ। তাছাড়া ও কি ভাববে-না-ভাববে সে
কথা ভেবে তুমি এত সংকুচিতই বা হচ্ছ কেন? তোমার কোন অসুবিধা না হলে তুমি
থাকতে পার। কিন্তু তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না!

খিদে নেই—

তবে জোর করে খেও না।

আচ্ছা অমনেন্দ্ৰ!

কি?

তুমি তো একবারও জিজ্ঞাসা কৰলে না, আমি হঠাত কেন এলাম এতদিন পরে?

তুমি যখন বলনি, নিশ্চয়ই বলবার মত কিছু নেই—তাই জিজ্ঞাসাও কৰিনি।

না অমনেন্দ্ৰ, আছে।

কি?

বলবার অনেক কথা আছে, কিন্তু ভাবছি কি বলব? কেমন করে বলব?

এখন ওসব কথা থাক শয়িতা।

তুমি জান কিনা জানি না—দাদার বস্তু গগনবিহারী চৌধুরী নিহত হয়েছেন
জানি আমি।

জান?

হ্যাঁ।

কেমন করে জানলে?

আজ থবরের কাগজে সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে।

কি—কি লিখেছে তাতে?

লিখেছে—কোন সন্দান করা যায়নি এখনও হতাকারীর—পুলিস হতাকারীর
অনুসন্ধান করছে—আর বিখ্যাত সত্যাষ্টৰী কিরীটি রায় পুলিসকে ঐ বাপারে পরামর্শ

দিচ্ছেন। পুলিস না পারলেও এই ভদ্রলোক যখন ব্যাপারটার মধ্যে মাথা গলিয়েছেন, খুনী ধরা পড়বেই!

পড়বেই!

হ্যাঁ, দেখে নিউ অসাধ্যসাধন করতে পারেন এই ভদ্রলোক। ওঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

শামতাৰ বুকটাৰ মধ্যে থেকে একটা ভয়েৰ শ্ৰেত তাৰ মেৰুদণ্ড বেয়ে শিৱনিৰ কৱে যেন আমাতে থাকে। গলাটা শুকিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ! শমিতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি চলি।

কোথায়? বিশ্বায়ে অমলেন্দু শমিতাৰ মুখেৰ দিকে তাকায়, সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

বস বস শমিতা, মনে হচ্ছে তুমি যেন অত্যন্ত এক্সাইটেড হয়ে পড়েছ—সকাল ধোকেই দেখছি তুমি অত্যন্ত চিন্তিত!

আমি যাই—

কি হয়েছে শমিতা, আমাকে সব খুলে বল।

কি—কি বলব?

তোমাৰ যদি কোন চিন্তাৰ কাৰণ থাকে তো বল। আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য কৱতে পাৰি।

কি সাহায্য তুমি আমাকে কৱবে?

ব্যাপারটা না জানলে কি কৱে বলি! বস—হোয়াই ইউ আৱ সো মাচ ডিস্টাৰ্বড! অমলেন্দু একপ্রকাৰ যেন জোৱ কৱেই শমিতাকে বসিয়ে দিল আবাৱ চেয়াৰটায়।

অমলেন্দু!

বল।

একটা কথা তুমি জান না—

কি?

গগনবিহারীৰ সঙ্গে আমাৰ একসময় ঘথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

আমি জানি।

জান?

হ্যাঁ।

কেমন কৱে জানলৈ?

জেনেছি।

॥ তৈৱো ॥

সুবীৰ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

থানাৰ ও.সি'ৰ কড়া নিৰ্দেশ, আপাতত তাৰা মেজ বাড়ি থেকে পুলিসেৰ বিনানুমতিতে বেৱ হতে পাৰবে না।

পৱেৱ দিন দৃগুৱেৱ দিকে সুবীৰ সুবিনয়েৰ ঘৱে এসে বলে, দিস ইজ সিমপ্লি টৱচাৰ সুবিনয়!

সুবিনয় চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল। সুবীরের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

সুবীর আবার বলে, এভাবে আমাদের এখানে বাড়ির মধ্যে নজরবন্দি করে রাখার মানেটা কি? কাকার মতো ব্যাপারে কি ওরা আমাদের সন্দেহ করেছে নাকি? ডু দে সাসপেন্ট আস!

কিছু তো প্রেটা অস্বাভাবিক নয় সুবীরদা! মন্দু কঠে সুবিনয় জবাব দেয়।

হোয়াট ডু উই মিন?

ভেব দেখ না।

কি ভাবব?

আমরা কজন ছাড়া তো এ বাড়িতে কেউ পরশু রাত্রে ছিলাম না! কাজেই আমাদের ওপরে যদি পুলিসের সন্দেহ পড়েই—

আমরা আমাদের কাকাকে হত্যা করেছি! হাউ ফ্যান্টাস্টিক! বাট হোয়াই? কেন—আমরা তাকে হত্যা করতে যাব কেন!

আজ সকালে মিঃ সেন—মামার সলিসিটার এসে কি বললেন শুনেছ তো তুমি! মামার সম্পত্তি ও টাকাকড়ি নেহাং কম নয়!

কোম্পানির শেয়ার, ইনসুরেন্স, নগদ টাকা ব্যাকের ও এই বাড়ি সব মিলিয়ে লাখ দুয়েকের বেশি—

তাই সেই অর্থের জন্য আমরা কাকাকে হত্যা করেছি!

না করলেও লোকে তাই ভাববে সহজেই, কেননা ঐ ধরনের ঘটনা তো বিরল নয়।

তার জন্য হত্যা করবো তাকে? ওর যা-কিছু তো সব আমরাই পেতাম।

না।

তার মানে?

আর দুটো দিন দেরি হলে কিছুই পেতাম না। শুনলে না মিঃ সেন বলছিলেন, মামা একটা উইল করেছিলেন। তাঁর সব কিছু শর্মিতা দেবীকে দেবার মনস্ত করেছিলেন এবং সেই উইলে এমন কি তাঁর একমাত্র ছেলেকেও বঞ্চিত করে—

দ্যাট বিচ! দ্যাট হারলট! সুবীর বললে, ঔ মেয়েমানুষটাই যত নষ্টের মূল!

সুবিনয় মন্দু হেসে বললে, মামা তাকে বিবাহ করবেন স্থির করেছিলেন।

কি করে বুঝলে?

আমার তাই ধারণা।

খুব হয়েছে। হি গট হিজ রিওয়ার্ড। কিন্তু তাই যদি হয় তো আমাকে তারা এভাবে নজরবন্দী করেছে কেন? আমি তো আর সেরাত্তে এ বাড়িতে ছিলাম না।

তাতেই বা কি?

তার মানে?

পুলিস হ্যাত ভাবতে পারে—

কি? কি ভাবতে পারে?

কোন এক ফাঁকে নিমজ্জন-বাড়ি থেকে এসে—

ডোট টক ননসেজ!

তা তুমি ছটফট করছ কেন সুবীরদা? কটা দিন আমাদের নজরবন্দী করে রাখলাই বা ওরা। চিরদিন তো কিছু আর আমাদের এভাবে রাখতে পারবে না।

কিন্তু আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোন ভদ্রলোক চরিশ ঘটা এভাবে বাড়ির মধ্যে
নজরবন্দী হয়ে থাকতে পারে?

উপায় কি বল অশ্চিত্তা সুবীরদা?
কি?

রামকেও ইষ্টাং কোথায় গেল বল তো?

আমার মনে হয় কি জান সুবিনয়!
কি?

ঐ বাটারই কাজ। টাকাপয়সার ব্যাপার নয়—ওর তৃতীয় পক্ষের তরণী স্তৰী ঐ
রুক্ষিণীর সঙ্গে কাকার নটাট দেখে ও বেটা নিশচয়ই ক্ষেপে গিয়েছিল। তারপরই শেষ
করে দিয়েছে সুযোগমত কাকাকে।

কিন্তু—

সুবীর বলে, তুমি দেখে নিও সুবিনয়, আমি যা বলছি তাই। ঐ বেটাই দিয়েছে মামাকে
খতম করে। তারপর গা-ঢাকা দিয়েছে।

অবিশ্যি অসম্ভব নয় কিছু।

কাকার যেমন কুচি। একটা চাকরের বৌ, তাকে নিয়েও কিনা—

তুমি কি সত্যই মনে কর সুবীরদা, মামার সঙ্গে রুক্ষিণীর কোন একটা অবৈধ সম্পর্ক
হয়েছিল?

হয়েছিল মানে! চরিশ ঘটাই তো ঐ মাণীটা কাকার ঘরে থাকত!

কি জানি! আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

লক্ষ্য করে দেখেছ ইদানীং ঐ মাণীটার বেশভূষা—হ্যাকন-চ্যাকন—

ওদের কথা শেষ হয় না, বাহাদুর এসে ঘরে ঢুকল, বাবুজী!

কি হয়েছে?

জ্যাকি তো কিছু খাচ্ছে না। আজ দুদিন থেকে সাহেবের ঘরের সামনে বসে আছে,
ওঠে না।

বেচারী! অবৈধ প্রাণী—প্রভুর শোকটা ভুলতে পারছে না কিছুতেই। সুবিনয় বলে।

কি করব বাবুজী? না খেয়ে থাকলে তো ও মরে যাবে।

সুবীরদা?

কি?

তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না।

আমি? আমার হাতে ও খেয়েছে নাকি কোনদিন?

চেষ্টা করে একবার দেখতে ক্ষতি কি?

বাইরে ঐ সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল একজোড়া। সুবিনয় আর সুবীর দরজার
দিকে তাকাল। অরূপ ও কিরীটি ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। অরূপের হাতে একটা খোলা।

সুবীর অরূপের দিকে তাকিয়ে বলে, এই যে অরূপবাবু। আমাদের আর এভাবে
কভদ্রিন খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখবেন বলুন তো!

জবাব দিল কিরীটি, আপনারা যে মুহূর্তে সব সাত্য কথা অকপটে বলবেন তখনি
পুলিসপ্রহরা এখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে সুবীরবাবু।

কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাই, সব সত্য কথা এখনও আপনারা স্পষ্ট করে বলছেন না কেন?

কোন কথাটা আবার বল্লিমি? সুবীর বলে।

সে-রাত্রে আপনি রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন সুবীরবাবু?

বলেছি তো আমার বাবুর বোনের বিয়েতে—

আপনার বন্ধু অরিন্দমবাবু বলেছেন—

কি বলেছেন?

রাত পাঁচটা নটা নাগাদ আপনি বরযাত্রীদের দেখাশোনা করবার জন্য দুটো বাড়ির পরের বাড়িতে যেখানে বরযাত্রীরা উঠেছিল সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে আপনি পাঁচদশ মিনিটের বেশি ছিলেন না।

কে বললে?

আমরা খবর পেয়েছি।

বাজে কথা। আমি রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। সুবীর দৃঢ়কষ্টে বলে। না, ছিলেন না।

আপনি যদি জোর করে বলেন মশাই যে আমি ছিলাম না—

জিতেনবাবুকে আপনি চেনেন? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

কোন জিতেন? কে সে?

জিতেন ভৌমিক। আপনার অফিসের সহকর্মী।

হঁয়, চিনি।

তিনি আপনাকে সেরাত্রে দশটা থেকে সোয়া দশটার সময় পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে দেখেছে। কি, কথাটা মিথ্যে?

সুবীর চূপ।

আপনি হোটেল থেকে কখন বের হয়ে যান?

সুবীর চূপ।

কি সুবীরবাবু, জবাব দিচ্ছেন না কেন?

হঁয়, আমি হোটেলে গিয়েছিলাম।

কেন?

ড্রিঙ্ক করতে।

বেশ। কিন্তু সেরাত্রে হোটেল থেকে কখন আপনি বের হয়ে যান?

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

না। তার আগেই বের হয়ে গিয়েছিলেন। কিরীটী শান্তকর্ত্তিন গলায় প্রতিবাদ জনায়।

বলুন কখন বের হয়ে গিয়েছিলেন হোটেল থেকে?

মনে নেই।

বেশ। তাহলে বলুন এবার হোটেল থেকে বের হয়ে কোথায় পিষ্টেছিলেন?

বিয়েবাড়িতে।

না। আবারও আপনি সত্য গোপন করছেন। থাক—~~বলে~~ কিরীটী অলংকারের দিকে তাকিয়ে বললে, অরাপ, জুতোজোড়াটা তোমার ঘোলা থেকে বের কর তো।

কিরীটীর নির্দেশে অরাপ ঝোলা থেকে একজোড়া কালো রংমের ক্রেপ সোলের জুতো দের করল। সুবীর আর সুবিনয় জুতোজোড়ার দিকে নিষ্পত্তক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

জুতোর সোনে কাদা শুকিয়ে আছে।

এই জুতোজোড়া কোথায় পীওয়া গিয়েছে জানেন সুবীরবাবু? এই বাড়ির পিছনে একটা গাছের নিচে বাগানের মালির ঘরটার কাছে যে ঘরে জ্যাকিকে আটকে রাখা হয়েছিল—এ জুতোর ছাষ্ট সেই ঘরটার কাছেই বাগানের মাটিতে পাওয়া গিয়েছে। ধর্মের কল কেমন বাতাসে নড়ে দেখুন! সেদিন দুপুরের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে বাগানের মাটি নরম হয়ে গিয়েছিল এবং মাটিতে জুতোর ছাপ যেমন পড়েছে তেমনি জুতোটও কাদা লেগেছে।

সুবিনয়ও সুবীর দুজনের কারো মুখেই কোন কথাই নেই। দুজনেই যেন একেবারে

বেঁচে

কিরিটি ওদের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, আপনারা কেউ চিনতে পারছেন এ জুতোজোড়া, সুবিনয়বাবু?

না।

সুবীরবাবু, আপনি?

না।

বাহাদুর! তুমি চিনতে পারছ?

জী সাব।

কার এ জুতো?

সাহেবের।

গগনবাবুর?

জী হাঁ।

অরূপ, এবার কোটটা বের কর।

অরূপ খোলা থেকে একটা কালো টেরিউলের প্রিস্ক কোট বের করল।

বাহাদুর, এ কোটটা কার জান?

জী।

কার?

সাহেবের।

সুবীরবাবু, সুবিনয়বাবু—এটাও বাগানে পাওয়া গিয়েছে এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই কোটের গায়ে ও হাতায় রক্ত শুকিয়ে ছিল। সে রক্ত কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে গগনবিহারীর রক্ত বলে।

এতক্ষণে সুবিনয়ই কথা বলে, আপনি এসব কথা আমাদের বলছেন কেন মিঃ ব্রাউন?

আপনার কি ধারণা আমাদেরই মধ্যে কেউ মামাকে হত্যা করেছি?

না। সেজন্য নয়।

তবে?

আচ্ছা আপনারা সেরাত্রে এ ব্যাপারে কোন চিংকার বা চেচেমেচি শোনেননি?

না। তাহাড়া সেরকম কিছু হলে জ্যাকি কি ডাকত না? চুপ করে থাকত?

পুরোর জ্যাকি ওয়াজ ড্রাগড! তাকে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কান ওষুধ খাইয়ে আগে থাকতেই নিষ্ঠেজ করে ফেলা হয়েছিল।

কিন্তু সে তো কারোর হাতে থায় না। সুবিনয় বলে, জ্যাকি তো মামা ও রামদেওর

হাতে ছাড়া আর কারো হাত্তে খেত না।

খেত না ঠিকই। আব সেই যুক্তিতেই হয়ত হত্যাকারী নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার সুযোগ খুঁজবে। কিন্তু একটা কুকুরকে কোন কৌশলে একটা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নিজেকে করা এমন কিছুই কঠ নয় সুবিনয়বাবু।

আমার মুন হয়—

কি মুনুন?

আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তো রামদেওই সে কাজ করেছিল। তার পক্ষেই মোঁ
মুণি সন্তুষ্ট ছিল।

তা ঠিক।

এবং নিশ্চয়ই এখনও তার কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি?

না। তাহলেও তাকে খুঁজে বের করতে পুলিসের অসন্তুষ্ট হবে না।

তাই তো আমি ভাবছি, রামদেও নামক রংয়ের তাসটি যখন হঠাতে টেবিলের উপর
এসে পড়বে তখন সত্যিকারের হত্যাকারীর যে বাঁচার আর কোন সন্তানবাই থাকবে না।

॥ চোদ ॥

সুবীর বলে ওঠে ঐ সময়, আমি হলপ করে বলতে পারি মিঃ রায়, রামদেও-ই কাকাকে
সেরাত্তে হত্যা করেছে। আপনারও কি তাই মনে হয় না!

হোয়াই ইউ আর সো সার্টেন সুবীরবাবু? কিরীটী মন্দু হেসে পালটা প্রশ্ন করে।

কারণ কাকার সঙ্গে রামদেওর যুবতী স্ত্রীর ইলিসিট কনেকশন ছিল।

সেই কারণেই আপনাদের মনে হয় সে হত্যা করেছে তার মনিবকে?

নিশ্চয়। কে সহ্য করতে পারে—মানে কোন পুরুষ সহ্য করতে পারে বলুন নিজের
স্ত্রীকে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী হতে দেখলে রাতের পর রাত?

আপনার ভুলও তো হতে পারে সুবীরবাবু?

ভুল! না, ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। অন্তত আমি রামদেও হলে তো পারতাম না।
খুন করতেন, তাই না?

খুন? সুবীর যেন চমকে ওঠে।

হ্যাঁ—খুন। সুবিনয়বাবু, আপনি?

জানি না।

যাক সে কথা। আপনারও কি সুবীরবাবুর মতই মনে হয় কাজটা রামদেওরই?

সুবীরদা যা বলেছে তাই যদি হয়—

সুবীরদার কথা থাক। আমি আপনার কথা জানতে চাইছি।

মানুষ মনের ঐ অবস্থায়—

হত্যাও করতে পারে। আচ্ছা শমিতা দেবী সম্পর্কে আপনার কি ধীরণ সুবিনয়বাবু?

তাকে তো আমি চিনি না। মানে তাঁর সঙ্গে আমার তো কেমন আলাপ-পরিচয় নেই।
চেনেন না—মানে তাঁর সঙ্গে হয়ত আপনার কোন আলাপ পরিচয় নেই সত্তি, কিন্তু
দেখেছেন তো তাঁকে বহবার। তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছেনও।

এখনে তিনি প্রায়ই আসতেন। কখনও-সখনও দেখেছি।

আপনার মামাৰ সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ছিল বলেই শুনেছি।

শোনেননি তাকে আপনার মামা বিবাহ করবেন বলে স্থির করেছিলেন?

না।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে গগনবিহারীবাবুর রীতিমত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে, কথাটা কার কাছ থেকে শুনেছিলেন?

সুবীরদাস বলেছে।

আর কারো মুখে কথাটা শোনেননি?

রামদেওর মুখেও শুনেছি।

রামদেওর সঙ্গে তাহলে আপনার এই সব আলোচনাও ইত?

কি বললেন?

বলছি হঠাৎ রামদেও সেকথা আপনাকে বলতে গেল কেন? আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কথনও?

এই—মানে কথায় কথায় হঠাৎ একদিন বলেছিল রামদেও।

হঁ। রামদেও তাহলে আপনাদের ঘরে আসত?

তা মধ্যে মধ্যে আসত বৈকি।

রামদেওর স্ত্রী কুঞ্জিনী আসত না?

না।

ভাল কথা সুবিনয়বাবু, আপনি আমার প্রশ্নের জবাবে পুলিসের কাছে জবানবন্দীতে বলেছেন—সেরাত্রে শমিতা দেবী নাকি রাত সাড়ে নটা পোনে দশটা নাগাদ এ বাড়িতে এসেছিলেন!

হঁ।

আপনি তাঁকে আসতে দেখেছিলেন, না কারো মুখে শোনা কথা?

দেখেছি।

কেমন করে দেখলেন? কোথায় দেখেছিলেন?

আমি সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে মাথার যন্ত্রণার জন্য শুয়ে ছিলাম, তারপর রাত সোয়া নটা নাগাদ প্রিয়লাল ডাকতে আসে খাবার জন্য—

রাত্রে বুঝি খাওয়াদাওয়া তাড়াতাড়ি সারতেন?

না। সেদিন বিকেলে এসে কোন জলখাবার খাইনি, তাই ঠাকুর আমাকে একটু আগেই খাবার জন্য ডাকতে এসেছিল।

তারপর?

খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে চুকে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই শময়ই শমিতা দেবীকে একটা ট্যাঙ্কিতে এসে গেটের সামনে নামতে দেখি।

সেরাত্রে কোন জ্যোৎস্না ছিল না, অন্ধকার রাত্রি—আপনার এ ঘর থেকেও গেটটা বেশ দূর, ঠিক কি করে চিনলেন যে তিনি শমিতা দেবীই?

মনে হল। তাছাড়া অত রাত্রে তিনি ছাড়া আর স্তুলোক করে মামার কাছে আসতে পারে?

যুক্তির মধ্যে আপনার কোন ফাঁক নেই দেখতে পাইছি। কিন্তু মন্দ হেসে কথাটা বলে প্রসঙ্গাত্মকে চলে গেল। আচ্ছা সুবিনয়বাবু, আপনি মরালী সঙ্গের নাম শুনেছেন?

শুনেছি।

কার কাছে—আপনা~~ব্যারিস্টা~~মার কাছে, না শমিতা দেবীর কাছে?
ওদের কারো কাছেই না। তবে শুনেছি। ঠিক কার কাছে শুনেছি মনে পড়েছে না।
গেছেন কখনও~~সেখানে~~?
না।

ব্যারিস্টার সত্ত্বেন ঘোষালকে চেনেন?
না।

তিনি মরালী সঙ্গের একজন বড় পেট্রন। নামটা তাঁর শোনেননি তাহলে কখনও?
না।

আমি কিন্তু ভেবেছিলাম শুনেছেন।
কেন?

কারণ শমিতা দেবীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

থাকতে পারে, কিন্তু সেকথা আমি জানব কি করে?

জানা স্বাভাবিক, কারণ শমিতা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল।
আ—আমার?

হ্যাঁ। আপনি মিথ্যে বলছেন যে তাঁর সঙ্গে আপনার কোন পরিচয় ছিল না।

শমিতা দেবী আপনাকে ঐ কথা বলেছেন? সুবিনয়ের কঠিনতে একটা উৎকৃষ্ট প্রকাশ
পায়—যেটা সে চাপা দিতে সক্ষম হয় না।

কিরীটী শাস্ত গলায় বলে, যেমন করেই হোক আমি জেনেছি কথাটা। বলুন সত্য কি
না?

সেরকম কিছু জানাশোনা নেই, তবে—
তবে?

আমার এক বন্ধুর সুপারিশে আমার লেখা একটা নাটক ওঁরা বছরখানেক আগে
ওদের মরালী সঙ্গ থেকে নিউ এম্পায়ারে অভিনয় করেন। সেই সময় দু-চার দিন আমি
রিহার্শাল দেখতে গিয়েছি। সেই সময়ই দু-চারদিন দু-চারটে কথা হয়েছিল।

বন্ধুটির নাম কি?

মনোজিং ঘোষাল। ঐ ব্যারিস্টার সত্ত্বেন ঘোষালের ছোট ভাই।

তবে একটু আগে যে বললেন ব্যারিস্টার সত্ত্বেন ঘোষালকে আপনি চেনেন নাঃ
মনোজিং আমার বন্ধু হলেও তার দাদার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।
ইঁ। তাহলে আপনি একজন নাট্যকারও।

দু-চারটে নাটক লিখেছি।

আপনার মামাবাবু জানতেন কথাটা?

কোন্ কথা?

যে আপনার সঙ্গে শমিতা দেবীর পূর্ব হতেই পরিচয় ছিল?
না। জানতেন না।

শমিতা দেবীও কখনও বলেননি?

বলতে পারি না। তবে ব্যাপারটা এখন কিছু নয় যে তাঁকে বলতেই হবে!

তা ঠিক। আচ্ছা সুবিনয়বাবু, এবাবে আমার আর একটা কথার জবাব দিন।

বলুন ?

শমিতা দেবীর প্রতি আপনার কোন দুর্বলতা ছিল ?

না, না—এমনৰ ক্ষেত্ৰে বলছেন আপনি ?

লজ্জার ক্ষেত্ৰে আছে এতে ? সী ওয়াজ ভলাপচূয়াসলি সেক্সি ! যে কোন পুরুষের পক্ষেই তাকে দেখে—বিশেষ করে তার সাহচর্যে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই তো স্বাভাবিক। আপনার মনেও সেৱকৰ দুর্বলতা যদি কখনও জেগেও থাকে, আপনাকে নিশ্চয়ই তার জন্ম দেওয়া যায় না। কখনও কোন দুর্বলতা তাঁৰ প্রতি আপনার জাগেনি বলতে চান ? কাম অন—আউট উইথ ইট !

না—না—

ঘৰেৰ মধ্যে অন্যান্য সকলে নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে কিৰীটি ও সুবিনয়ের প্রশ্নেতৰ শুনছিল। কিৰীটি যে তার আলোচনাৰ ধাৰাটা কোন দিকে নিয়ে চলেছে—সত্যি কথা বলতে কি অৱশ্য বা সুবীৰ কেউই বুবতে পাৱছিল না।

তাঁকুবুদ্ধি বাকপটু কিৰীটি যে কোন কৌশলে প্ৰশ্নেৰ পৰ প্ৰথম তুলে সহজ স্বচ্ছভাৱে কেমন কৰে সুবিনয়কে একেবাৰে কোণঠাসা কৰে এনেছিল ওৱা সত্যিই প্ৰথমটা বুবতে পাৱেনি। কিন্তু হঠাৎ কিৰীটিৰ শেষ প্ৰশ্নে অৱশ্য যেন সজাগ হয়ে ওঠে।

আপনার চোখমুখ, দ্বিধাগুৰ্বৰ্তন কঠস্বৰই বলছে সুবিনয়বাবু—শমিতা দেবীৰ প্রতি আপনার দুর্বলতা ছিল। অবচেতন মনে তাঁকে ঘিৰে আপনার একটা আকাঙ্ক্ষাও ছিল হ্যাত।

সুবিনয়ও যেন এতকথে হঠাৎ কিৰীটীৰ শেষ প্ৰশ্নে সজাগ হয়ে ওঠে। শান্ত গলায় বলে, না। আপনি যদি তা ভেবে থাকেন তো মিঃ রায় সেটা আপনার ভুল।

ভুল কিৰীটি রায় কৱেনি সুবিনয়বাবু। যাক গে সেকথা। অৱশ্য !

অৱশ্য কিৰীটীৰ দিকে তাকিয়ে বললে, বলুন ?

ওঁদেৱ দুজনকে আৱ নজৰবন্দী কৰে রাখাৰ তোমাৰ প্ৰয়োজন নেই। সুবীৰবাবু, সুবিনয়বাবু—আপনারা কি ?

সুবীৰ বললে, ধন্যবাদ।

চল অৱশ্য, একবাৱ গগনবাবুৰ শোবাৰ ঘৰটা ঘুৱে যাওয়া যাক। কিৰীটি অৱশ্যেৰ দিকে ফিৰে বললে।

চলুন।

দুজনে ওৱা ঘৰ থেকে বেৱ হয়ে গেল।

ওৱা দুজনে সুবীৰ ও সুবিনয় যেন প্ৰস্তুৰমূৰ্তিৰ মত দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কাৰণ মুখেই কোন কথা নেই। হঠাৎ সুবীৰ বলে একসময়, তাহলে তোমাৰ মহেশ্বৰীমতীৰ আলাপ ছিল সুবিনয় ?

ডোস্ট টক ননসেন্স সুবীৱদা !

কিন্তু সত্যি বল তো বাপাৱাটা কী ? কিৰীটীবাবু যা বলে পোছেন—কেমন কেমন যেন মনে হল—

সুবীৱদা, তোমাৰও কি মাথা থারাপ হয়েছে ?

আহা, চটছ কেন সুবিনয়। বাপাৱাটা যদি ঘটেই থাকে সেটা তো এমন কিছু অঘটন নয়। বৱৰং বলতে পাৱ স্বাভাবিকই।

ঐ সব কথা উচ্চারণ করাও পাপ সুবীরদা।

পাপ! কেন?

তুমি জান ওঁৰ প্রতিমার কি মনোভাব ছিল—

ও, এই কথা! তা কাকার তো সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছিল। না হলে ঐ বয়সে ঐ
সব কেছু কেউ করে!

ভালকামুক কোন বয়স নেই সুবীরদা।

ওটাকে ভালবাসা বলে না সুবিনয়, ওটা বিকৃত যৌন-লালসা ছিল কাকার। শব্দের
গ্রেব শুরুজন হলেও কথাটা না বলে আমি পারলাম না।

ওসব আলোচনা থাক সুবীরদা। আমার সত্যিই ভাল লাগছে না।

আমি রাজীবকে বিলেতে সব লিখব।

না, না সুবীরদা। তাছাড়া রাজীবদা একদিন সব নিজে থেকেই জানতে পারবে।

তবু আমাদেরও তো কৃতজ্ঞতা বলে একটা বস্তু আছে—

কৃতজ্ঞতা!

নয়? ভেবে দেখ মামা যদি আমাদের এভাবে আশ্রয় না দিতেন?

আশ্রয় আবার কি? আমরা কিছু ভেসে যাচ্ছিলাম না! বরং এখানে এসে থাকার জন্য
মিথ্যা থানিকটা লজ্জার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে গেলাম।

লজ্জা!

নয়? ভেবে দেখ, কাকার ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে? সবাই একদিন জানবে।

তা জানে জানুক। তাহলেও আমাদের দিক থেকে আমরা কেন অকৃতজ্ঞ হব।

তোমার যুক্তি আমি মেনে নিতে পারছি না সুবিনয়। আমি আর এখানে থাকছি না।

তুমি চলে যাবে সুবীরদা?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কেন?

এখানে থাকার আর কোন অধিকার নেই বলে।

সুবিনয় আর কোন কথা বলে না।

॥ পনের ॥

কিরীটী আর অরূপ দোতলায় উঠে গগনবিহারীর শয়নঘরটার তালা খুলে প্রবেশ করল।
ঘরটাতে সেই দিন থেকেই তালা দেওয়া ছিল। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী
দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের আলোটা জুলছে।

অরূপ দেখতে পায়নি আলোটা। বুঝতে পারেনি কারণ ঘরে জ্বানক্ষয় জানলায় পর্দা
টাঙ্গনো থাকলেও পিছনের কাচের সার্পি দিয়ে যে আলো পদ্ধতিতে করে ঘরের মধ্যে
প্রবেশ করছিল সেটা পর্যাপ্ত।

কি ব্যাপার মিঃ রায়?

ঘরের আলোটা জুলছে—

তাই তো!

সেদিন এনকোয়ারীর শেষে যখন ঘরে তাঙ্গা-বজ্জ করে যাও, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে
যাওনি অরূপ?

গিয়েছিলাম তো। আমি নিজে নিভিয়ে দিয়েছি ঘরের আলো।
কিরীটী তৌকু দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে মৃদু কঠে বললে, গত দুদিনের মধ্যে

ঘরে কেউ এসেছিল—

আপনার তাতো মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ প্রথমে এসেছিল সে তাড়াতড়িতে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

কে? কে আসতে পারে?

কিরীটী অরূপের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ঐ শয়নঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার
জন্য মধ্যবর্তী দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ। দরজার কপাটে হাত দিয়ে
ঠেলন কিরীটী। কিন্তু খুলতে পারল না।

ভিতরের দিককার ছিটকিনিটা আটকানো।

কিরীটী ঘরে দাঁড়িয়ে ডাকল, অরূপ!

বলুন?

সেদিন যাবার সময় এই দরজার ছিটকিনিটা কি তুলে দিয়ে গিয়েছিলে?

ঠিক মনে পড়ছে না। অরূপ বলে।

সম্ভবত দাওনি। মনে হচ্ছে এটা খোলাই। দেখা যাচ্ছে দরজাটার দুর্দিক থেকেই
আটকাবার ব্যবস্থা আছে। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে ওপাশ থেকে দরজাটা খুলে দাও তো।
অরূপ চলে গেল। একটু পরেই ছিটকিনি নামাবার শব্দ হল অন্য ঘর থেকে এবং
দরজাটা খুলে গেল।

পাশের ঘরটাই গগনবিহারীর বসবার ঘর।

বসবার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল।

এখন বুবতে পারছ অরূপ, কাল বা পরশু কোন একসময় রাত্রে কেউ গগনবাবুর
শোবার ঘরে ঢুকেছিল!

মৃদু গলায় কতকটা যেন আত্মগতভাবেই কথাগুলো বললে কিরীটী।

রাত্রে এসেছিল?

হ্যাঁ, এ ঘরের আলোটাই তার সাক্ষী।

কথাটা বলতে বলতে কিরীটী আবার মধ্যবর্তী দরজাপথে শয়নঘরে এসে ঢুকল।

অরূপও ওর পিছনে পিছনে আসে।

অরূপ!

বলুন?

ঐ আলমারির চাবিটা কোথায়?

সেদিন তো কোন চাবি পাইনি।

গগনবিহারীর আলমারি ওয়ার্ড্রোব ও দরজার চাবি নিশ্চয়ই ছিল।

থাকাই তো উচিত।

তবে পাওনি কেন?

চাবির ব্যাপার সকলকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কেউ বলতে পারল না।

সুবীর ও সুবিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তারা কি বলেন?

সুবীরবাবু বলেছিলেন, গগনবিহারী নাকি তাঁর চাবির রিংটা সর্বদা নিজের কাছেই
রাখতেন। হি শুয়াজ ডেরি পার্টকুলার আবাস্ট হিজ কীজ।

তবে চাবির রিংটা কি হল? তারপর একটু থেমে দ্রুলে, চাবির রিংটা যে পাওয়া যায়নি তা তো তুমি আমাকে বলনি অরূপ?

তদন্তের রিপোর্টে অবিশ্য নোট করা আছে ডাইরীতে— তবে আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

এখন তাহলে মনে হচ্ছে চাবিটা যে সরিয়েছিল সে-ই কাল বা পরশু কোন এক সময় রাত্রেও ঘরে এসেছিল। ভাল কথা, আর একটা খবর শুনেছ?

কি? গত পরশু রাত থেকে শমিতা দেবী নিরুদ্ধিষ্ঠ!

সে কি, কে বলল?

ঠাঁর দাদা যোগজীবনবাবু।

কিরীটী অতঃপর সেরাত্রের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে গেল।

মিঃ রায়!

বল?

আচ্ছা ঐ শমিতা দেবীই কি—সেরাত্রে—

গগনবিহারীকে হত্যা করেছে কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক সেরাত্রে কোন এক সময় শমিতা দেবী এই ঘরে এসেছিল।

কিন্তু তিনি তো ভোইমেটলি—

অঙ্গীকার করেছেন। ঠিকই। তাহলেও যে প্রমাণ সে রেখে গিয়েছিল ঘরে এবং যে প্রমাণ সে তার দেহে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল—সেই দুটোর যোগফল যে দুয়ে দুয়ে চার সেটা তো আর অঙ্গীকার করতে পারবে না! কিন্তু কথা হচ্ছে, কখন এসেছিল সে? কত রাত্রে? এবং তখন আর কেউ এ ঘরে ছিল কিনা? শোন অরূপ, শমিতা দেবীকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে—যেমন করেই হোক।

যদি কলকাতা ছেড়ে তিনি চলে গিয়ে থাকেন?

না, তা যায়নি। আর যাবেও না আমার ধারণা। অস্তুত গগনবিহারীর মৃত্যুর ব্যাপারটার উপর একটা সমাপ্তির যবনিকা না নেমে আসছে যতক্ষণ।

গগনবাবুর বন্ধু মানে ঐ যোগজীবনবাবু—ওর দাদা কি বলছেন?

তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। কে—কে ওখানে? কথাটা বলতে বলতে অত্যন্ত ক্ষিপ্তার সঙ্গে দুই ঘরের মধ্যবর্তী আধভেজানো দরজাটার দিকে ছুটে যায়, দড়াম ঘরে ঠেলে দরজাটার কপাট দুটো খুলে ফেলে কিরীটী। চকিতে একটা রঙিন বন্ধু যেন ফেলে হল পাশের ঘরের বাইরে যাবার দরজাপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরীটী ছুটে যায় সেই দরজাটার দিকে এবং চেঁচিয়ে ওঠে, কল্পিণীঁ।

কল্পিণী দাঢ়াল না। সে তার ঘরে চুকে গেল। কল্পিণীর অপ্রিয়মাণ শাড়ির অঞ্চলপ্রাঙ্গটা অরাপেরও নজরে পড়ল। কিরীটী এগিয়ে গেল কল্পিণীর ঘরের দিকে— কারণ বসবার ঘরের পরের ঘরটাই কল্পিণী ও বামদণ্ডের ঘর।

কল্পিণী তাড়াতাড়িতে দরজাটা বন্ধ করতে পারেনি। কিরীটী খোলা দরজাপথে কল্পিণীর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অরূপও। দুজনেই দেখতে পেল শয়ার উপর কল্পিণী শুয়ে, চোখে-মুখে আঁচল চাপা। তার বুকের কাছটা ঘন ঘন আন্দোলিত

হচ্ছে।

কিরীটী নিঃশব্দে মুহূর্তকাল শায়িত রুক্ষিণীর দিকে তাকিয়ে শাস্ত গলায় ডাকল,
রুক্ষিণী!

রুক্ষিণী সাজা দেয় না।

রুক্ষিণী উঠে বস। হিন্দীতেই কিরীটী বলে, আমি জানি তুমি জেগে—উঠে বস।

শির মে শুষ্ঠ দরদ বাবুজী। কোঁকাতে কোঁকাতে রুক্ষিণী বলে। ওঠে না—চোখও মেলে
না।

ওঠে—ওঠে বলছি!

কিরীটীর তীক্ষ্ণ কঠের নির্দেশে রুক্ষিণী আর শুয়ে থাকে না। উঠে বসে খাটের উপর।
ঐ ঘরটাও বেশ সাজানো-গোছানো।

একপাশে একটা কাঠের আলমারি, দেওয়ালে একটা প্রমাণ-আরশি। বড় সাইজের
একটা থাট। একটা আলনা। তার উপরে শাড়ি ও জামা ভাঁজ করা। গোটা-দুই প্যান্ট ও
শার্টও আছে। একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক।

কেয়া বাত বাবুজী! কোঁকাতে কোঁকাতে রুক্ষিণী আবার বলে।

পাশের ঘরে গিয়েছিলে কেন?

হায় রাম! আমি তো শুয়েছিলাম শির দরদ করছিল বলে। আমি তো যাইনি।

মিথ্যে কথা বলে কোন লাভ নেই। বল, কেন গিয়েছিলি?

হায় রাম! সচ বলছি বাবুজী—

যাসনি তুই?

গঙ্গামাটকি কসম বাবুজী—

চাবিটা কোথায়?

চাবি?

হ্যাঁ। তোর সাহেবের আলমারির চাবি। কোথায় আছে বের করে দে।

সে হামি কি জানি?

তোর কাছেই আছে। বের কর। নাহলে দারোগা সাহেব এখনি তোকে থানায় ধরে
নিয়ে যাবে।

রুক্ষিণী চুপ করে থাকে।

অরূপ যাও, নিচে যে সেপাই পাহারায় আছে তাকে আন। ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে
হাজতঘরে বন্দী করে রাখ।

রুক্ষিণী তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে, কেন বাবুজী—হামার কি কসর হলো?

তুই তোর সাহেবের আলমারির চাবি চুরি করেছিস।

না।

আবার ঝুট বলছিস?

নেহি—ঝুট নেহি—

ওর ঘরটা সার্চ কর তো অরূপ!

পাওয়া গেল না। রুক্ষিণীর ঘরের সবকিছু তমতম করে খুজেও কোন চাবি পাওয়া
গেল না। কিন্তু চাবি না পাওয়া গেলেও, রুক্ষিণীর ট্রাঙ্কের মধ্যে বেশ ডারি ওজনের
একজোড়া সোনার বাসা, কিছু দামী প্রসাধন দ্রব্য, গোটা-দুই দামী শাড়ি ও একটা ছোট

ଠିନେର କୌଟୋର ମଧ୍ୟେ ପାଓଯା ଗେଲ ଏକଶୋ ଓ ଦଶ ଟାକାର ନୋଟ ମିଳିଯେ ପ୍ରାୟ ଦେଡ଼ ହାଜାରେର ମତ ଟାକା ।

ଏ ଟାକା କାର ? କିରୀଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

ହାୟ ରାମ ! କାର ଆମାର—ଆମାର !

ତୁଇ ତୋ ମାଇନ୍ଦେ ପେତିମ ନା—ଅତ ଟାକା ତୁଇ କୋଥାଯ ପେଲି ?

ଆମି—ଆମି—କେମନ ଥତମତ ଖାୟ ରକ୍ଷଣୀ ।

ବଲ କୋଥାଯ ପେଲି ? ତୋର ସାହେବ ତୋକେ ଦିଯୋଛିଲ—ତାଇ ନା ?

ନୀ ରାମଦେଇ ଆମାର ମରଦ—

ଆମାର ବୁଟ ବଲଛିସ ! ସାହେବେର ସଙ୍ଗେ ତୋର ଗୋପନ ଆଶନାଇ ଛିଲ—ସାହେବ ତୋକେ ଦିଯେଛେ ।

ରକ୍ଷଣୀ ଚୁପ ।

ଶୋଇ, ଏଥନ୍ତି ସବ କଥା ଖୁଲେ ବଲ—ନା ହଲେ ଏଥୁନି ତୋକେ ଥାନାଯ ପାଠୀବ ।

ଗନ୍ଦାମାର୍ଦ୍ଦିକ କମମ—ଆମି କିଛୁ ଜାନି ନା ବାବୁଜୀ । ତୋର ଗୋଡ଼ ଲାଗି—

ରାମଦେଇ—ତୋର ମରଦ କୋଥାଯ ?

କେମନ କରେ ଜାନବ ?

ତୁଇ ଜାନିମ ସେ କୋଥାଯ ?

ନା, ଜାନି ନା ।

ରାମଦେଇର କୋନ ଫଟୋ ଆଛେ ?

ଆଛେ । ଛିଲ ତୋ ଏ ଟ୍ରାଫେର ମଧ୍ୟେ ।

କୋଥାଯ ? ତୋର ବାକ୍ଷେର ମଧ୍ୟେ ତୋ ପାଓଯା ଦେଲ ନା ?

ତବେ ଆମି ଜାନି ନା ।

ଠିକ ଆଛେ । ଅରାପ ଓକେ ନିଯେ ଗିଯେ ହାଜତେ ରାଖ । ଆର ଥବରେର କାଗଜେ ରାମଦେଇ ଓ ଶମିତାର ନାମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦାଓ ତାଦେର ବର୍ଣନ ଦିଯେ ।

ରକ୍ଷଣୀ ଚେଂଚାମେଟି କାରାକାଟି ଶୁରୁ କରେ ଦେୟ, ତାକେ ସବନ ଗ୍ରେଣ୍ଟାର କରେ ନିଯେ ଯାଓଯା ହଛେ । ସୁବୀର ଆର ସୁବିନ୍ୟ ଏମେ ସିର୍ଡିର ନିଚେ ଦାଁଡାୟ ।

ସୁବୀର ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ଓକେ ଆୟରେସ୍ଟ କରଲେନ ନାକି ଦାରୋଗାବାବୁ ?

ହଁ । ଅରାପ ଜବାବ ଦେୟ ।

ଆପନାକେ ଆଗେଇ ବଲେଛିଲାମ, ଓ ମାଗିଇ ଯତ ନଷ୍ଟେର ଗୋଡ଼ । ସୁବୀର ବଲେ ।

ସୁବିନ୍ୟ କିନ୍ତୁ କୋନ କଥା ବଲେ ନା ।

ମେ ଏକପାଶେ ଚୁପଚାପ ଦାଁଡିଯେ ଥାକେ ।

॥ ଘୋଲୋ ॥

ଏ ଘଟନାର ଚାରଦିନ ପରେ ।

ଅରାପ ଥାନାଯ ତାର ଅଫିସ-ଘରେ ବସେଛିଲ, ବେଳା ତଥାନ ମରକାଳ ଦଶଟା ହବେ ।

ହାତେ ଧରା ଏକଟା ଭାଁଜକରା ସଂବାଦପତ୍ର । ଶମିତା ଏମେ ଅଫିସ-ଘରେ ଢକଳ ।

ଆପନିହି ତୋ ଏ ଥାନାର ଓ.ପି. ମିଃ ମୁଖ୍ୟାର୍ଜୀ ?

ହଁ ମିସ ସାନ୍ୟାଳ, ଆସୁନ ।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আমি নিরুদ্ধিষ্ট বলে, কি ব্যাপার? এসবের অর্থ কি? বসুন মিস সান্যাল।

না! আমি বস্তুতে আস্বানি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার উদ্দেশ্যটা জানতে এসেছি। বলুন কি ব্যাপার?

কিরীটী মুখ্য আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন, কারণ তাঁরই নির্দেশে ডি.সি. বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন!

বিশেষ আমি তাহলে তাঁর কাছেই যাচ্ছি।

যেতে হবে না, আমি তাঁকে ফোনে ডাকছি। বসুন আপনি।

না। আমি সেখানেই যাচ্ছি।

বসুন, বসুন—ব্যস্ত হবেন না মিস সান্যাল। মনে হচ্ছে বিজ্ঞাপনটা কাগজে দেওয়ায় আপনি একটু ক্ষুক হয়েছেন!

তা যদি হয়েই থাকি, খুব অন্যায় হয়েছে কি? কোথায় কে খুন হয়েছে সেই ব্যাপারের সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে কাগজে কাগজে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দিলে সেটার অর্থ যে কি দাঁড়ায় নিশ্চয়ই সেটা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না?

নিশ্চয়ই না।

হঠাৎ কিরীটির কঠিন শুনে যুগপৎ দুজনেই দরজার দিকে ফিরে তাকাল।

মিঃ রায়! আপনি এসে গেছেন ভালই হল। আমি আপনাকে আসবার জন্য ফোন করার কথা ভাবছিলাম। অরূপ বলে।

হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে অমলেন্দুবাবুর ফোনে জানতে পারলাম শমিতা দেবী তাঁর কাছেই আছেন, তাই এসেছিলাম অরূপ তোমাকে নিয়ে তাঁর ওখানে যাব বলে, তা দেখছি উনি নিজেই এসে গেছেন। কিন্তু মিস সান্যাল, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন। কিরীটী বলল।

না। বসবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি কেন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সেটা জানতে পারলেই আপাতত খুশি হব। একটু যেন কঠিন কঠেই কথাগুলো বলে শমিতা।

আপনি তাহলে বিজ্ঞাপনটা দেখেই এসেছেন? কিরীটী শুধায় শমিতাকে।

হ্যাঁ। নচেৎ আপনি কি মনে করেন সোস্যাল ভিজিট দিতে এসেছি থানায়?

নিশ্চয়ই না। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা তো দিন তিনেক হল বের হয়েছে। আপনি তাহলে আরও আগে আসেননি কেন জানতে পারি কি?

সে প্রশ্নের জবাব আমি দিতে প্রস্তুত নই।

বেশ, দেবেন না। কিন্তু প্রশ্নটা স্বাভাবিক বলেই করেছিলাম।

বাজে কথা রেখে এখন বলুন কেন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন? আপনি কি মনে করেন আমিই সে রাত্রে গগনবিহারীকে হত্যা করেছি?

যদি সেটা ভাবিই তাহলে কি খুব অন্যায় হবে মিস সান্যাল? শাস্তি গলায় কিরীটী উচ্চারণ কর্বো।

কিরীটীর স্পষ্টেক্ষিটা হঠাৎ যেন শমিতাকে স্তুক করে দেয়। শমিতা কয়েক সেকেন্ড কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আই সী! তা হঠাৎ আমাকে সন্দেহ করলেন কেন জানতে পারি কি?

প্রথমত আপনি পুলিসের কাছে যে জবানবন্দি দিয়েছেন সেদিন এবং আমাকেও যা বলেছেন সেটা অকপট সত্তা নয়।

মানে!

মানে আপনি খুব ভালভাবেই সেটা জানেন এবং বিত্তীয়ত আপনার হঠাৎ নির্কল্পণ
হয়ে যাওয়া—

নির্কল্পণ হয়ে গিয়েছিল এ ধারণা আপনার হল কেন?

ব্যাপারটা সাদা চোখে বিচার করতে গেলে তাই কি মনে হয় না? ভয় পেয়ে আপনি
হঠাৎ গা-দাক দিয়েছিলেন?

গা-দাক দিয়েই যদি থাকি, নিশ্চয়ই তাহলে আজ নিজে এখানে আসতাম না!
যাক সে-কথা। কয়েকটা প্রশ্নের আমার জবাব দেবেন কি?
কি প্রশ্ন?

এক নম্বর, সেরাতে মানে দুঃঢিনার রাত্রে, আপনি রাত পৌনে দশটা নাগাদ মরালী
সংঘ থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

কোথায়ও আমি বের হইনি ঐ সময়, বের হয়েছিলাম রাত সাড়ে বারোটায়।

না। পৌনে দশটায় বের হয়ে আবার রাত বারোটা নাগাদ আপনি ক্লাবে ফিরে যান;
এবং সে প্রমাণও আমাদের হাতে আছে।

প্রমাণ?

হঁ। আপনি ব্যারিস্টার সতেজন ঘোষালের গাড়ি চেয়ে নিয়ে, বিশেষ কাজ আছে
একটু—বলে রাত পৌনে দশটা নাগাদ ক্লাব থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ক্যান ইউ
ডিনাই ইট?

শমিতা যেন হঠাৎ কেমন স্তুক হয়ে যায়। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিরীটির মুখের
দিকে।

বলুন? কোথায় গিয়েছিলেন সে রাত্রে?

বাড়িতে গিয়েছিলাম একটা জরুরী কাগজ আনতে ক্লাবের—

আবার সত্য গোপন করছেন! আপনি যে কোথায় গিয়েছিলেন আমি জানি।

কোথায়? কেমন যেন থতমত খেয়ে কথাটা উচ্চারণ করল শমিতা।

গগনবিহারীর ওথানে।

ইট্স্ এ ড্যাম লাই!

না—ইট্স্ এ ফ্যাক্ট! এবং সুবিনয়বাবু আপনাকে দেখেছেন। বলুন কেন গিয়েছিলেন?

আমি যাইনি।

গিয়েছিলেন। নাউ টেল মি হোয়াই?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

জানি। কিন্তু কেন? সাতদিন পরে হঠাৎ কেন গিয়েছিলেন তাঁর কাছে?

গগনবাবু আমাকে ক্লাবে ফোন করেছিলেন বিশেষ কারণে একবার দেখা করার জন্য।

দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?

না!

কেন?

আমি ঘরে চুকে দেখি—

কি?

হি ওয়াজ ডেড। সারা মেরোতে রক্ত।

আমারও অনুমান তাই। কিন্তু সত্যি কথাটা যদি সেদিন বলতেন তবে হয়ত কটা দিন
আমাদের অঙ্গকারে হাতড়ে বেড়াতে হত না। হত্যাকারীকে আগেই স্পষ্ট আউট করা
সম্ভবপর হত।

আপনারা বিশ্বাস করবেন না তাই বলতে সাহস পাইনি।

হঁ। আচ্ছা এবাবে বলুন, গগনবাবু যে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে আপনাকে দিতে
মনস্থ করেছিলেন তা আপনি জানতেন, তাই না?

জানতাম। কারণ ঐ লম্পটটা আমাকে এ সম্পত্তির লোড দেখিয়ে—

বিয়ে করতে চেয়েছিলেন বোধ হয়?
না।

তবে?

হি ওয়ানটেড টু এনজয মি। আর সেটা বুবাতে পেরেই—
ঝগড়া করে বের হয়ে এসেছিলেন সাতদিন আগে!

হ্যাঁ।

আর সুবিনয়বাবু?

সুবিনয়!

হ্যাঁ। তাঁর আপনার প্রতি দুর্বলতা ছিল, না?

হি ইজ অ্যান ইমবেসাইল ফুল, একটা নিরেট গর্দভ। দুটো হেসে কথা বলতাম বলে
তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার প্রেমে আমি মজে গিয়েছি।

আর সত্যেন ঘোষাল?

হি ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন।

তাঁর প্রতি আপনার কোন দুর্বলতা ছিল না?

কোনদিনও না। আর কিছু আপনার জানবার আছে?

আছে।

আর কি জানতে চান বলুন?

সেকথা জিজ্ঞাসা করবার আগে আপনাকে নিয়ে একবার গগনবাবুর বাড়িতে আমরা
যেতে চাই।

গগনবিহারীর ওখানে! বাট হোয়াই? কেন?

সবার সামনে একটা ঘোকাবিলা হওয়া আমাদের সকলেরই প্রয়োজন, তাই—
ঘোকাবিলা! কিসের?

সেখানে গেলেই সব জানতে পারবেন। আপনি আছে?

না। চলুন।

এখন নয়।

তবে কখন?

আজ রাত ঠিক দশটায়।

রাত দশটায়?

হ্যাঁ। আসতে পারবেন না?

পারব। কিন্তু—

বলুন?

আপনি কি এখনও আমার কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না?

না পারলে নিশ্চয়ই এখন আপনাকে ছেড়ে দিতাম না আমরা। আর আপনাকে আটকাব না, এখন আপনি যেতে পারেন।

শমিতা বের হয়ে যাচ্ছিল, কিরীটি পশ্চাত থেকে আবার ডাকল, একটা কথা শনিতা দেবী—

তুমোঁ

জামজোন্দুবাবুকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

কেন? তাকে দিয়ে কি হবে?

আপনারা দুজনেই জানেন আপনারা পরম্পর কেউ আপনাদের এখনও ভুলতে পারেন নি। ভুল-বোঝাবুঝি যদি একটা অতীতে হয়েই থাকে সেই ভুলটারই জের টেনে চলতে হবে বাকী জীবনটা তারই বা কি মানে আছে!

শমিতা আর কোন জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে বের হয়ে যায়।

শমিতা ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাবার পর কিরীটি বললে, সত্ত্ব অরূপ, যোগজীবনবাবুর কাছে যেন আমি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ করছিলাম ঘটনাচক্রে ব্যাপারটার সঙ্গে আকস্মিক ভাবে জড়িয়ে যাওয়ায়।

আপনি কি জানতেন যে শমিতা দেবী হত্যাকারী নয়?

জানতাম।

জানতেন?

জানতাম বৈকি। নচেৎ প্রথম দিনই তোমাকে বলতাম ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য।

কিন্তু জানলেন কি করে যে উনি সে-রাত্রে গগনবিহারীর ঘরে গিয়েছিলেন?

মনে পড়ে তোমার; মৃতের হাতে এক টুকরো কাচের চুরি পেয়েছিলাম?

মনে আছে বৈকি।

সেই ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরো ও শমিতা দেবীর ডান হাতের কঙ্গীতে প্লাস্টার দিয়ে ঢাকা গোপন ক্ষতিছাটাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল সেরাত্রে শমিতা দেবী গগনবিহারীর ঘরে গিয়েছিল।

কাচের চুড়িটা যে ওর হাতেই ছিল তার প্রমাণ কি?

যোগজীবনবাবুই বলেছিল, দুর্ঘটনার দিন দুই আগে শমিতার এক বাক্সী কাশী থেকে কিছু কাচের চুড়ি এনে ওকে দেয়। সেগুলো তার হাতেই ছিল। অবিশ্য প্রশ্ন করে সংবাদটা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে যোগজীবনবাবুর কাছ থেকে।

কিন্তু তাই যদি হয় তো—শমিতা দেবী যা বলে গেলেন তা কেমন করে সত্ত্বের? উনি তো ঘরে চুকে তাঁকে মৃত দেখেছিলেন!

না—দেখেনি।

তবে?

গগনবিহারী তখনও বেঁচেই ছিলেন। এবং আমার অনুমান যদি তিথে না হয় তো—কি?

তার উপস্থিতিতেই গগনবিহারী নিহত হন।

তবে নিশ্চয়ই শমিতাদেবী হত্যাকারীকে দেখেছিলেন সে-রাত্রে?

সম্ভবত দেখেনি।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ রায়।
সব অঙ্ককার দূর হয়ে যাবে আজ রাত দশটায়। যে ঘরে হত্যা হয়েছিল সেই ঘরেই
হত্যাকারীকে অস্থির প্রারণা আজ রাত্রে আমরা খুঁজে পাব। যা হোক, তুমি কিন্তু প্রস্তুত
হয়ে যেও অরূপ।

যাৰ—কিন্তু—

আৰং কিন্তু নয়—ৱাত দশটায় আজ। চলি এখন।
কিৱিটা উঠে পড়ল।

॥ সতের ॥

ৱাত দশটায়।

সেই গগনবিহারীর গৃহে। তাঁৰ শয়নকক্ষে—যে কক্ষে কয়েক রাত্ৰি আগে আততায়ীৰ
ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত যোগজীবনবাবু, অমলেন্দুবাবু, শমিতাদেবী, সুবীর, সুবিনয়,
বাহাদুর, কিৱিটা, অরূপ ও ডাঃ অধিকারী—কিৱিটিৰ পরিচিত একজন ডাঙ্গাৰ।

কিৱিটা সম্বোধন কৰে বলে, আপনারা সকলেই হ্যাত একটু অবাক হয়েছেন কেন
এভাবে সকলকে আপনাদের আমরা এ সময় এই ঘরে আসতে বলেছিলাম কথাটা ভেবে।
আসতে বলেছিলাম এই কারণেই যে—কিৱিটি একটু থেমে আবার বলে, আমরা মানে
অরূপবাবু, গগনবিহারীৰ হত্যাকারী কে জানতে পেৰেছেন। হি ওয়ান্টস টু আনমাক হিম
বিফোর অল অফ ইউ!

সকলেই পৰম্পৰ পৰম্পৰের মুখের দিকে তাকায়।

একটা ভয়—একটা সন্দেহ যেন সকলেই দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সব কথা বলবাৰ আগে শমিতা দেবী, আপনাকে আমি অনুৱোধ কৰছি, সেৱাত্রে
গগনবাবুৰ টেলিফোন পেয়ে এ-ঘৰে পা দেৰাৰ পৰ কী আপনি দেখেছিলেন—কী হয়েছিল
বলুন?

আমি তো সকালেই বলেছি।

আপনি বলেছেন গগনবাবুকে আপনি মৃত দেখেন। কিন্তু তা তো নয়। হি ওয়াজ স্টীল
লিভিং—তখনও তিনি বেঁচেই ছিলেন এবং সে-সময় তিনি ফুললি ড্রাঙ্কড। বদ্ধ মাতাল।
কি, তাই নয়?

শমিতা বোৰা। পাথৰ।

বলুন? আমাৰ কথা কি মিথ্যে?

না, তিনি বেঁচেই ছিলেন।

এবং আপনার উপস্থিতিতেই হি ওয়াজ স্ট্যাবড।

হ্যাঁ। কিন্তু আমি—আমি হঠাৎ ঘৰ অঙ্ককার হয়ে যাওয়ায় বুঝতে পারিনি কে তাকে
ছোৱা মেৰেছিল।

সব বলুন।

ঘৰে চুক্তেই গগনবাবু বলেন ঝাকে বিয়ে কৰাৰ জন্য—বিয়ে কৰলে সব সম্পত্তি
তিনি আমাৰ নামে লিখে দেবেন।

শমিতাৰ বিবৃতি।

শমিতা বাড়ের মতই এব্বে ঘরে চুকেছিল, ফোন করেছিলেন কেন?
শামি, এস। গগনবিহারী দু হাত বাড়িয়ে দেন শমিতার দিকে।
ডেন্ট টাচ মি।

ডেন্ট বি ড্রাইল মাই ডালিং। আই লাভ ইউ। আই ওয়ান্ট ইউ—বলে টলতে টলতে
গিয়ে গগনবিহারী দু হাতে জাপটে ধরেন শমিতাকে বুকের উপরে।

দুজনে একস্থি ধন্তাধন্তি শুরু হয়ে যায়। তারপরই হঠাৎ গগনবিহারী একটা আর্ত
চিৎকার করে ওঠেন। ঠিক ছি সময় ঘরের আলোটা দপ করে নিতে যায়।

গগনবিহারীর আলিঙ্গন শিথিল হয়ে যায়। তিনি মাটিতে পড়ে যান। কয়েকটা মুহূর্ত
তাস্তপের স্তুর হয়ে অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা। তারপর একসময় আলোটা জুলতেই
তার নজরে পড়ে—রক্তের স্নেতের মধ্যে গগনবিহারী পড়ে। ঘরময় কাঁচের চূড়ি।
শমিতার ডান হাতের কঞ্জিতেও কেটে গিয়েছে, শমিতা ভয়ে তাড়াতাড়ি ভাঙা চূড়গুলো
মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে যখন পালাতে যাবে সিঁড়িতে রামদেওর সঙ্গে তার
দেখা হয়ে যায়।

শমিতা থামল।

তারপর? কিরীটী শুধায়।

আমি প্রথমে বাড়ি যাই। সেখান থেকে আবার ক্লাবে ফিরে যাই। এর বেশি কিছু আর
আমি জানি না। বিশ্বাস করুন—

অরূপ!

বলুন।

রামদেওকে নিয়ে এস এ ঘরে।

অরূপ বের হয়ে গেল।

রামদেও! অর্ধেস্ফুট কঠে সুবীর বলে।

হ্যাঁ। সুবীরবাবু, দুর্ভাগ্য খুনীর, রামদেও ধরা পড়েছে পরশু রাত্রে মোকামা জংশনে।
বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলে, উঁহ সুবিনয়বাবু,
দরজার দিকে এগুবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। দি ক্যাট ইজ অলরেডি আউট অফ
দি ব্যাগ! তাছাড়া এ বাড়ির চারদিকে পুলিস!

অরূপ এসে ঘরে চুক্ল রামদেওকে সঙ্গে নিয়ে। মাত্র কটা দিনেই লোকটার চেহারা
যেন শুকিয়ে গিয়েছে। একমুখ দাড়ি, রক্ষ চুল, মলিন বেশ, চোখের কোলে কালি। বিষম
ক্লাস্ট।

অরূপ, তুমি সঙ্গে করে যে লোহবলয় এনেছ—সে দৃঢ়ি আমাদের সুবিনয়বাবুর হাতে
আপাতত পরিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত কর।

কিরীটীর কথায় অরূপ যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

সুবিনয় বলে ওঠে, এসবের মানে কি কিরীটীবাবু? আপনার কি স্বার্গ? আমিই মামাকে
হত্যা করেছি?

ধারণা নয় সুবিনয়বাবু—ইট্‌স এ ড্রয়েল ফ্যাট্ট! কই অরূপ—

অরূপ এগিয়ে সুবিনয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল্লি।

সুবীর বলে ওঠে ঐ সময় এতক্ষণ পরে, সুবিনয় তুমি! তুমিই তাহলে কাকাকে খুন
করেছ?

এ মিথ্যে—মিথ্যে সুবীরদী। চেঁচিয়ে ওঠে সুবিনয়, ইট ইজ প্রিপ্রোস্টারাস! কিরীটী এবাবে রামদেওর দিকে তাকাল, রামদেও!

রামদেও কেমন যেন ফ্লাইফ্লায়াল করে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।
ডাঃ অধিকারী?

বলুন।

সঙ্গে আপনার সিরিঞ্জ ও পেথিডিন অ্যামপুল একটা এনেছেন তো—যা আনতে
বলেছিলাম।

হ্যাঁ।

ৰামদেওকে একটা পেথিডিন ইনজেকশন দিন।

সবাই নির্বাক।

ডাঃ অধিকারী কিরীটীর নির্দেশে রামদেওকে একটা পেথিডিন ইনজেকশন দিয়ে
লেন।

মিনিট কয়েক পরেই রামদেওর চেহারার পরিবর্তন হয়।

চোখের মণি দুটো চকচক করতে থাকে।

রামদেও? কিরীটী আবার ডাকে।

জী!

বল সে রাত্রে তুমি কেন পালিয়েছিলে? আমি বলছি তুমি তোমার সাহেবকে খুন
রনি—তুমি নির্দোষ।

আমি খুন করিনি।

বললাম তো, আমি তা জানি।

আমিও সে রাত্রে বার বার বাবুজীকে (সুবিনয়কে দেখিয়ে) বলেছিলাম, আমি কিছু
জানি না, আমি খুন করিনি—কিন্তু উনি বললেন; উনি দেখেছেন আমাকে খুন করতে
সাহেবকে। পুলিসকে উনি বলে দেবেন। সেই ভয়েই আমি পালাই।

॥ আঠারো ॥

কিরীটী বলছিল।

রঞ্জিণীর ঘোবন তিনজনকে আকর্ষণ করেছিল। প্রৌঢ় গগনবিহারী আর যুবক সুবিনয়
ও সুবীর। তবে সুবীর ভীতু প্রকৃতির। কিন্তু রঞ্জিণী গভীর জলের মাছ। সে কারও কথা
কারও কাছে না বলে দুজনকেই নিয়ে খেলিয়েছে। রামদেও মিলিটারি ফেরতা রগচূটা
স্লাক—ব্যাপারটা কোনক্রমে জানতে পারলে ছোরা বসিয়ে দেবে বুকে। তাই সুবিনয়
ক্লোশলে রামদেওকে পেথিডিনে অ্যাডিস্ট করে দ্রুমশ তাকে হাতের মঠোর মধ্যে নিয়ে
আসে। সুবীর ভীতু প্রকৃতির আগেই বলেছি—সে বেশিদূর অগ্রসর হবার সাহস
পায়নি—কাজেই সুবিনয়ের আরও সুবিধা হয়ে যায়।

তারপর? অরূপ জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু গোপন প্রেমের যা শেষ পরিণতি—শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। গগনবিহারী
ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিলেন। এবং সে জানাটা আদৌ তার পক্ষে আনন্দের
হয়নি। আর কেউ না—তাঁরই আগ্রিত এবং তাঁরই জায়ে তার লালসার ভোগে তাগ
বসাচ্ছে জানতে পেরে নিশ্চয়ই ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। ফলে তিনি সুবিনয়কে ডেকে
বাঢ়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

কবে? অরূপ প্রশ্ন করে।

কিরীটী বললে, যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটে সেইদিন সকালে।

জানলেন কি করে?

ঠাকুর প্রিয়লালের ছাত্র। ঐদিন সকালে অফিস যাবার আগে খেতে বসে সুবিনয় বলেছিল প্রিয়লালকে পরের দিনই সকালে সে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তারপর?

কিন্তু সুবিনয় মুখে যাই বলুক কুক্ষিগীর উগ্র রূপ ও যৌবন যার স্বাদ সে পেয়েছিল সেটা ভুলে যাওয়া বা সে লোভ দমন করা সুবিনয়ের পক্ষে তখন আর সম্ভবপ্র ছিল না। তাছাড়া জগতে বিশেষ একশ্রেণীর নারী আছে যারা পুরুষকে একেবারে কুক্ষিগত করে ফেলে তাদের যৌন আবেগ দিয়ে, একবার কোন পুরুষ তার বাহ্যিকনে ধরা দিলে। সুবিনয়েরও হয়েছিল তাই—ঐ কুক্ষিগীও হচ্ছে সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক। তাই শেষ পর্যন্ত কুক্ষিগীকে হারাবার ভয়ে সুবিনয় ডেসপারেট হয়ে ওঠে।

ওরা মন্ত্রমুক্তের মত শুনছিল।

অরূপ বলে, আশ্চর্য! মানুষটাকে দেখে একবারও মনে হয় না ঐ প্রকৃতির—

ওরা হচ্ছে বর্ণচোরা আম। তাই তো প্রথমটায় আমার ধোঁকা লেগেছিল। কিন্তু তিনটে ব্যাপার আমার মনকে সন্দিন্ধ করে তোলে। এক নম্বর, জ্যাকিকে ওষুধ দিয়ে নিস্তেজ করে ফেলা। আর দু নম্বর, সে-রাত্রে সুবিনয়ের গৃহে উপস্থিতি। এবং শেষ তিন নম্বর, যেভাবে গগনবিহারীকে আমূল ছোরা বিধিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সেটা কোন শক্তিশালী লোক ছাড়া সম্ভব ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার অ্যানালিসিস শুরু করি। প্রথমত কার কার পক্ষে গগনবিহারীকে হত্যা করা সম্ভব ছিল ভাবতে গিয়ে এবং সমস্ত ব্যাপারটা ও গগনবিহারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছিল চারজনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল—কুক্ষিগী, শমিতা, রামদেও ও সুবিনয়। কুক্ষিগীকে বাদ দিয়েছিলাম হিসাব থেকে এই কারণে যে তার কাছে গগনবিহারী ছিল স্বর্গভিত্তি প্রসবকারী হংস। কাজেই সে গগনবিহারীকে হত্যা করতে পারে না। শুধু তাই নয়, ঐভাবে আমূল ছোরা বিধিয়ে তার মত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে হত্যা করাও সম্ভব ছিল না। তারপর শমিতা। গগনবিহারীর হাতের মুঠোয় ভাঙা চূড়ি ও শমিতার হাতের ক্ষত যদিও উভয়ের মধ্যে একটা স্ট্রাগলের সম্ভাবনা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল কিন্তু সেও নারী। একই কারণে কুক্ষিগীর মত তাকেও আমি হিসাব থেকে বাদ দিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর রামদেও। গগনবিহারীকে এত বোকা ভাবতে পারি না যে তিনি রামদেওর চোখের উপরেই তার বৌকে সঙ্গোগ করবেন। তাছাড়া সে গগনবিহারীকে হত্যা করলে তার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকেও বাদ দিত না। তাকেও ঐ একই সঙ্গে শেষ করে দিত। তাহলে বাকি থাকে সুবিনয়। সন্দেহটা সুবিনয়ের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার চেহারা, তার উপস্থিতি সে রাত্রে ও সে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ—সের মিলিয়ে আমার মনকে সজাগ করে তোলে। তারপর জ্যাকিকে ওষুধ দিয়ে নিস্তেজ করা—রামদেও ধরা পড়বার পর সেও অ্যাডিষ্টেড জানতে পেরে আমার কোন সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। অবিশ্য তার আগেই শমিতা দেবীর কিছুটা সত্য প্রিষ্ঠিও সেদিন ধানায় আমার সন্দেহকে ওর ওপরে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। যাক, এবাবে আসল ঘটনায় আসি।

কিন্তু একটু থেমে আমাৰ শুৰু কৱল, সুবিনয় সম্বত রঞ্জিণীৰ মুখেই গগনবিহারী ও শমিতাৰ সব ব্যাপারটা ও ঝগড়াৰ ব্যাপারটা জানতে পেৱেছিল আৱ দেইটাই সে শেষ মুহূৰ্তে কাজে লাগিয়।

কি ভাবে! আৰুপ শুধায়।

সুবিনয় চেন্নান কৱেছিল শমিতাকে ক্লাবে। গগনবিহারী নয়। আমাৰ ধাৰণা—কাৰণ সে কোম্পান্য উপৱে দোষটা চাপাৰাব জন্য তাকে অকুহলে টেনে নিয়ে আসে। শমিতা আমুতেই তাৰপৰ যা যা ঘটেছিল সেও শমিতাৰ মুখেই তোমোৱা শুনেছ। যখন দুজনে মুচ্ছপাট চলেছে তখন পশ্চাত দিক থেকে সুবিনয় গগনবিহারীকে ছোৱা মেৰেই ঘৰ ছেড়ে যাবাৰ আগে ঘৰেৱ আলোটা নিভিয়ে দেয়। কাজেই শমিতা সুবিনয়কে দেখতে পায়নি। সব ব্যাপারটা রঞ্জিণী জানতে পেৱেছিল অবিশ্যি, কিন্তু সেও ভয়ে মুখ খোলেনি। গগনবিহারীৰ কোট ও জুতোটা আগে থাকতেই সৱিয়ে রেখেছিল সুবিনয়। একটা গায়ে ও একটা পায়ে দিয়ে হত্যা কৱেছিল যাতে পুলিসেৱ কুকুৰ ও জ্যাকিকেও ধোঁকা দিতে পাৱে। সৰ্বশেষে পেথিডিনে অ্যাডিস্টেড, সম্পূৰ্ণ তাৰ হাতেৱ কজীতে, রামদেওকে ভয় দেখিয়ে সৱিয়ে দেয়। সম্পূৰ্ণ আটাঘাট বেঁধেই—প্ল্যান কৱে সব কিছু কৱেছিল সুবিনয়, কিন্তু এত কৱেও সে নিজেকে বাঁচাতে পাৱল না, সে নিজেৰ ভুলেৱ ফাঁদেই নিজে আটকে পড়ল।

হ্যাঁ। এমনিই হয়। সবাৰ চোখেৱ আড়ালে একজন যিনি সৰ্বক্ষণ চোখ মেলে বসে আছেন তাকে ফাঁকি দেওয়া শেষ পৰ্যন্ত যায় না। সুবিনয়ও পাৱল না। ভুলেৱ কথা বলছিলাম না! প্ৰথম ভুল সে কৱেছিল জ্যাকিকে ঘুমেৱ ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াৰ চেষ্টা কৱে। যদিও তা পুৱোপুৱিৰ সম্ভবপৰ হয়নি। দ্বিতীয় ভুল রামদেওকে পেথিডিনে অ্যাডিস্টেড কৱেছে সেটা কোনক্ষমে প্ৰকাশ হয়ে পড়ে।

রামদেওকে খুন কৱে ফেললেই তো একেবাৱে ল্যাঠা চুকে যেত! অৱপ বলে।

তা যেত—কিৰীটি বলে, কিন্তু তখন আৱ সেটা হয়ত সম্ভবপৰ ছিল না। অবিশ্যি সে যদি আগে রামদেওকে শেষ কৱত, তবে চট কৱে হয়ত রামদেওৰ প্ৰবলেম তাৰ সামনে এসে দাঁড়াত না। কিন্তু সেৱকম পৰিকল্পনা হয়ত ওৱ মাথাৰ আসেনি। রামদেও পুৱোপুৱি তাৰ হাতেৱ মৃঠোৱ মধ্যে ছিল বলে রামদেওৰ ব্যাপারটা পৱে কোন এক-সময় মেটাবে মনে কৱে রামদেওকে তখনও হয়ত শেষ কৱেনি। এবং তৃতীয় ও মাৰাঞ্চক ভুল যেটা কৱেছিল সুবিনয় সেটা হচ্ছে গগনবিহারীৰ জামা ও জুতো চুৱি কৱে হত্যাৰ সময় সেটা ব্যবহাৰ কৱে। ঐ দুটো বস্তুই আমাকে হিৱনিষ্ঠিত কৱেছিল হত্যাকাৰী ঐ বাড়িৱই কেউ, যাৱ পক্ষে ঐ দুটি বস্তু হাতানো সম্ভবপৰ ছিল। সৰ্বশেষে ঐ দুটি বস্তুৰ ব্যবহাৰ থেকেও আমাৰ যে কথাটি মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে হত্যাকাৰী রামদেও নয়—হয় সুবিনয় যা হয় সুবীৱ—দু'জনেৱ একজন।

তাহলে যত নষ্টেৱ মূল রঞ্জিণীই দেখতে পাইছি! অৱুপ বলে।

হ্যাঁ। রঞ্জিণী নয়, বল বনমরালী। গগনবিহারীৰ সাধেৱ বনমৰালীটা শেষ পৰ্যন্ত তাঁৰ মৃত্যুৱ কাৰণ হল।

কিৰীটি থামল।

পৱেৱ দিন প্ৰত্যৰ্যে লেকে দেখা হল যোগজীৱন শৰুৰ সঙ্গে কিৰীটিৰ। এই কদিন ভদ্ৰলোক লজ্জায় বেড়াতেও আসেননি লেকে সকালে বোধ হয়।

রায় সাহেব!

যোগজীবনের ডাকে কিরীটি ফিরে তাকায়।

শমিতা দেবীর খবর কি সান্যাল মশাই?

সে অমলেন্দুর ওখানেই আছে।

মিঠে গিয়েছে তাহলে?
তাই তো মনে হচ্ছে।

যাক। পাশ থেকে যোগেশবাবু বলে উঠলেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ!

ফণীবাবু বললেন, আজকালকার গোলাপান কি যে ভাবে আর কি যে করে—

কিরীটি শেষ করে কথাটা, বোঝাই যায় না!

সকলে হেসে ওঠে।

সুভদ্রা হরণ

Digitized by srujanika@gmail.com

॥ এক ॥

এক এক সময় দেহে ও মনে কিরীটির এমন একটা নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিত যখন সে হয়ত দিনের পর দিন তার বস্তুর ঘরটা থেকে বেরতই না। কেউ এলে দেখা পর্যন্ত করত না। দেহ ও মনের ঐ নিষ্ক্রিয় ভাবটা কোন কোন সময় একনাগড়ে এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত চলত। ও যেন এই সময়টায় শামুকের মতই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখত।

বছর তিনেক আগেকার কথা—কিরীটির সেই সময় ঠিক ঐ অবস্থা ছিলছিল।

সময় তখন গ্রীষ্মকাল।

এক শহরে প্যাচপ্যাচে বিশ্রী গরম—তার উপরে সারা শহর জুড়ে চলেছে সে সময় প্রচল্ড এক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবাধ খুনোখুনি। একে অন্যকে হত্যা করাটা যেন এক শ্রেণীর রাজনৈতিক আশ্রয়পুষ্ট বেপরোয়া কিশোর যুবকদের নিয়ন্ত্রিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

কাউকে রিভলবারের গুলি চালিয়ে, কাউকে পাইপগান দিয়ে, কাউকে রাইফেলের গুলিতে, কাউকে ছোরা মেরে বা বোমার ঘায়ে কাউকে—যে যেমন পারছিল যেন নিষ্ঠুর হত্যায়ে মেতে উঠেছিল।

খবরের কাগজের পাতা খুললেই নিয় এ ধরনের দুঁচারটে মর্মস্তুদ হত্যাসংবাদ চোখে পড়বেই।

জনজীবনের সে যেন এক বীভৎস চিত্র। কেবল কি তাই! জনজীবন যেন সর্বদা আতঙ্কিত—সন্ত্রস্ত। মৃত্যু যেন সর্বত্র সর্বক্ষণ ওৎ পেতে আছে।

সকালে হয়ত বেরুল—রাত ফুরিয়ে গেল, আর ফিরলাই না।

কাউকে হয়ত চলন্ত বাস থেকে নামিয়ে—দিনের আলোয় চারিদিকে মানুষজন—নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে গেল সকলের চোখের সামনে। রক্তাঙ্গ মৃতদেহটা তার রাস্তায়ই পড়ে রইল।

বাড়ির কেউ বের হলে না ফিরে আসা পর্যন্ত দুশিঙ্গার শেষ নেই। সন্ধ্যার পরই যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। সহজ জীবনযাত্রাটাই যেন কেমন থমকে গিয়েছে।

কিরীটির গড়িয়াহাট অঞ্চলটা কিছু শাস্ত। দ্বিপ্রহরে ঘরের মধ্যে বসে কিরীটি ও কৃষণের মধ্যে সেই কথাই হচ্ছিল।

ভৃত্য জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

এই জংলী, চা কর! কিরীটি বললে।

চায়ের জল চাপিয়েছি। জংলী বললে, বাইরে একজন বাবু এসেছেন—

বলে দে দেখা হবে না।

কিরীটি কথাটা বলতে জংলী বললে, বলেছিলাম, কিন্তু বাবু জেনেছেন না। বলেছেন তীষণ জরুরী দরকার তাঁর—

বলেছিস বুঝি আমি আছি বাড়িতে? কিরীটি খিচিয়ে গুঁটে।

হ্যাঁ।

ভেংচে ওঠে কিরীটি, হ্যাঁ। তোকে না বলে দিয়েছি কেউ এলে বলবি বাবু বাড়িতে নেই!

কৃষ্ণ বলে, দেখই না কে। মিশ্যেই খুব বিপদ, নচেৎ এই প্রচন্ড রোদে এই গরমে কেউ তোমার কাছে আসে! যা জংলী, বাবুকে এই ঘরেই পাঠিয়ে দে।

জংলী চলে গেল। তার ওপরে প্রাপ্তে চপল হাসি। মনে হল মনিব-গৃহিণীর হকুম পেয়ে সে যেন খুশিই হয়েছে।

খুশি হবার জংলীর কারণ আছে। কিরীটীর যথন ঐ ধরনের নিষ্ঠিয়তা চলতে থাকে জংলীর ব্যাপ্তির আদৌ ভাল লাগে না। কেবল একা একা ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে বাবুর কারণ সঙ্গে দেখা না; কথা পর্যন্ত না—এমন কি মাঙজীর সঙ্গেও কদাচিং এক আঢ়াটা কথার বেশী নয়।

কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণ চলে যাবার পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। সতর্ক জুতোর শব্দ। দরজা ঠেলে আগস্তক ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী চোখ তুলে তাকাল আগস্তকের দিকে।

লম্বা ঢাঙা দড়ির মত পাকানো চেহারা। পরনে দামী শাস্তিপুরী ফাইন ধূতি ও গায়ে পাতলা আদিদির পাঞ্জাবি। সারা গা থেকে ভুরভুর করে একটা কড়া দিশী সেন্টের গন্ধ বেরিচ্ছে। গা যেন কেমন গুলিয়ে ওঠে। হাতে একটা মোষের শিংয়ের লাঠি।

নমস্কার আমার নাম হরিদাস সামস্ত।

কিরীটী নিরাসক কঠে বললে, বসুন।

হরিদাস সামস্ত বসতে বসতে বললেন, আপনাকে এ সময় বিরক্ত করবার জন্য আমি সত্যিই খুবই লজ্জিত, দুঃখিত রায় মশায়। কিন্তু নেহাত প্রাণের দায়ে—

কিরীটী দেখছিল আগস্তকের চেহারা ও মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বেই হবে বলে মনে হয়। রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে স্পষ্ট বোৰা যায়। কিন্তু কেশ বেশ সহজে ছাঁটা। মাঝখানে টেরি। কিঞ্চিৎ কুঁঁপিত কেশ। দাড়ি-গৌণ নির্খুতভাবে কামানো। লম্বাটে ধরনের মুখ। চওড়া কপাল। কপালের রেখা স্পষ্ট। কপালের রেখায়, চোখের কোণে, ভাঙা গালে যেন একটা অমিতাচারের চিহ্ন সৃষ্টি। নাকটা সামান্য যেন ভোঁতা; ভাঙা গাল। ধারালো চিবুক। চোখে সোনার দামী ফ্রেমের চশমা।

বড় বিপদে পড়েছি রায় মশাই। দেখুন, আপনি হয়ত সব শুনে বলবেন পুলিসের কাছে গেলাম না কেন। গেলাম না কারণ তাদের দ্বারহ একবার হলে গোপনীয়তা বলে আর কিছু থাকে না। তাছাড়া অন্যপক্ষ যদি জানতে পারে যে পুলিসের সাহায্য আমি নিছি তাহলে হয়ত সঙ্গে প্রাণেই শেষ করে দেবে আমাকে। তাই বুঝলেন কিরীটী—

কথাগুলো বলতে বলতে হরিদাস সামস্ত পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিলেন। দেখা গেল দু'হাতের আঙুলে গোটা চারেক আংটি। তার মাঝে বোধ হয় একটা রক্তমুখী নীলা মনে হল কিরীটীর।

কিরীটী চেয়ে চেয়ে দেখছিল হরিদাস সামস্তকে।

মুখটা যেন চেনা-চেনা, কবে কোথায় দেখেছে—আপসা বাপসা মনে হচ্ছে।

মাপ করবেন হরিদাসবাবু, আপনাকে যেন আগে কেমনও দেখিছি—

দেখেছেন বইকি রায় মশাই।

দেখেছি?

হ্যাঁ। এককালে স্টেজে অভিনয় করতাম তো।

রঙমহল মঞ্চে—

হ্যাঁ। ছিলাম অনেক দিন।

উল্কা নাটকে আপনি অভিনয় করেছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। রাজীব ঘোষের ভূমিকায়। মনে আছে আপনার সে অভিনয়?

হ্যাঁ। মনে আছে বেঁকি। তা মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কেন, মঞ্চ ছেড়ে দিলেন কেন?

আমাদের যুগ যে চলে গিয়েছে।

যুগ চলে গিয়েছে কি রকম?

তাছাড়া কি? আমরা তো এখন ডেড-ফসিল। তবে ওই অ্যাক্টিংয়ের নেশা জানেন তো কি ভয়ানক! তাই থিয়েটারের মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে যোগ দিলাম যাত্রার দলে।

যাত্রার দলে?

হ্যাঁ। যাত্রা, তারপর একদিন পার্টনারশিপে আধাআধি হিস্যায় নবকেতন যাত্রা পার্টি গড়ে তুললাম।

কতদিন হল যাত্রার দলে অভিনয় করছেন?

তা ধরুন বছর সাত-আট তো হলই প্রায়। প্রথমটায় বছর দুয়েক এ-দলে ও-দলে গাওনা গেয়ে বেড়িয়েছি। তারপর দেখলাম এ লাইনে বাঁচতে হলে নিজের দল গড়া ছাড়া উপায় নেই। তাই—

নিজের দল খুললেন?

ঠিক আমি একা নই। আমি আর রাধারমণ পাল মশাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বছর দুই বাদে শেয়ার বেচে দিয়ে পাল মশাইয়ের দলেই বর্তমানে চাকরি করছি।

জংলী ঐ সময় দু'কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

থিয়েটারে অভিনয় ব্যাপারে কিরীটির বরাবর একটা নেশা আছে। নতুন নাটক কখনও কোনও মঞ্চে সে বড় একটা বাদ দেয় না। হরিদাস সামন্তর অভিনয় সে রঙমঞ্চে বার দুই দেখেছে। সেও বছর সাত-আট আগে। কিন্তু সে চেহারা নেই হরিদাস সামন্তর। সে চেহারা যেন শুকিয়ে গিয়েছে। তাহলেও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল সেই কারণেই।

নিন সামন্ত মশাই, চা খান।

চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে হরিদাস সামন্ত বললেন, আমার অভিনয় আপনি তো দেখেছেন রায় মশাই?

দেখেছি।

প্রথম যুগের অভিনয় হয়ত আমার দেখেননি।

দেখেছি। আপনার সিরাজদৌলায় সিরাজের পার্ট।

আর কিছু?

রঞ্জনীপে সোনার হরিণ।

দেখেছেন?

হ্যাঁ।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন হরিদাস সামন্তর বুক কাপিয়ে বের হয়ে এল।

Digitized by srujanika@gmail.com

বললেন, হ্যাঁ—সেসময় তিরো থেকে ক্যারেষ্টার রোল পর্যন্ত করতাম—

আবার যেন একটা চাপা দীর্ঘশাস বের হয়ে এল সামন্তর।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আশচর্য! এখনও আপনার সে কথা মনে আছে? আপনি গুণী ব্যক্তি, তাই অনেকগুলের কথা ভাজও স্মরণ রেখেছেন। কেউ মনে রাখে না রায় মশাই—নটনটাইদের কেউ মনে রাখে না। গিরিশচন্দ্র ঠিকই বলে গিয়েছেন—দেহপট সনে নট সকলই হারায়। কথাগুলো বলতে বলতে হরিদাস সামন্তর চোখের কোণ দুটো সজল হয়ে গেছে।

কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন তা তো কই এখনও বললেন না সামন্ত মশাই।

হ্যাঁ—বলব। আর সেই জন্যই তো এসেছি। রায় মশাই, আপনার রহস্য উদ্ঘাটনের অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতার, শক্তির কথা আমি জানি। আর তাতেই সর্বাঙ্গে আপনার কথাই মনে হয়েছে। আমার সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, তা থেকে মুক্ত যদি কেউ করতে পারে আমাকে একমাত্র আপনিই হয়ত পারবেন।

সামন্ত মশাই, জানি না আপনার কি ধরনের বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তবে আমার যদি সাধ্যাতীত না হয়, যথসাধ্য আপনার আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবার চেষ্টা করব।

কিরীটির বিরক্তির ভাবটা ততক্ষণে অনেকখানি কেটে গিয়েছে। বলতে কি সে যেন একটু কৌতুহলই বোধ করে সামন্ত মশাইয়ের কথায়।

পারবেন রায় মশাই, কেউ যদি পারে তো একমাত্র আপনিই পারবেন। আপনাকে সব কথা খুলে না বললে গোড়া থেকে আপনি বুঝতে পারবেন না। তাই গোড়া থেকেই বলছি।

॥ দুই ॥

হরিদাস সামন্ত অতঃপর বলতে শুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

থিয়েটারে নতুন নতুন সব ছেলেছেকরা অভিনেতাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাস সামন্তদের মত ব্যক্তি অভিনেতাদের চাহিদা করতে শুরু করেছিল।

তার অবিশ্যি আর একটা কারণও ছিল। নতুন অভিনেতারা সব নতুন চঙে অভিনয় করে যা আগের দিনের অভিনেতাদের সঙ্গে আদৌ মেলে না।

পাবলিকও চায় নতুন ধরনের অভিনয় আজকাল।

অবিশ্যি হরিদাস সামন্তের ডিমান্ড করে যাওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। অতিরিক্ত মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারে শরীরটা যেন কেমন তাঁর ভেঙে শুকিয়ে গিয়েছিল। বয়সের আদাজে বেশ বুড়েই মনে হত তাঁকে।

বয়সের জন্যই তাঁকে হিরোর রোল থেকে আগেই সরে আসতে হয়েছিল। শেষে ক্যারেষ্টার রোল থেকেও ক্রমশঃ তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল।

এবং শেষ পর্যন্ত একদিন যখন হরিদাস বুঝতে পারলেন মধ্যের প্রয়োজন তাঁর জন্ম ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে—এবং হয়ত শীঘ্রই একদিন নোটিশ পেতে হবে—হরিদাস সামন্ত নিজেই স্টেজ থেকে সরে গেলেন।

একটা সুযোগও তখন এসে গিয়েছিল।

নিউ অপেরা যাত্রাপার্টি থেকে তাঁর ডাক এল। মাইনেটাও মোটা রকমের। হরিদাস সামন্ত সঙ্গে সঙ্গে আগত লক্ষ্মীকে সাদরে বরণ করে নিলেন।

ঐ সময়টায় যাত্রার দলগুলো আবার নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করছিল। মধ্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাবা দলে মোটা মাইনে দিয়ে টানতে শুরু করেছিল। অনেকে সেজন্য যাত্রার দলে নামও সেখাতে শুরু করেছিল। সেখানেই অভিনেত্রী সুভদ্রার সঙ্গে পরিচয়।

অভিনেত্রী বললে ভুল হবে, কারণ সুভদ্রা তখন মাত্র মাস আগেক ঐ যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে। নয়া রিত্রুট। রেফিউজী কলোনীর মেয়ে—ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুন। সুভদ্রার বৰ্ষস তখন কৃতি-একুশের বেশী নয়। পাতলা দেহারা, গায়ের বৰ্ণ শ্যাম—কিন্তু চোখ মুখের ও দেহের গড়নটি ভাবি চমৎকার। যৌবন যেন সারা দেহে উপচে পড়ছে। ওকে দেখে ও ভাবত্তিপি দেখে বানু অভিনেতা হরিদাস সামন্ত বুকাতে পেরেছিলেন— মেয়েটির মধ্যে পার্টস আছে। ঠিকমত তালিম দিয়ে খেটেখুটে তৈরী করতে পারলে মেয়েটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দলের প্রোপ্রাইটার রাধারমণ পাল মশাইকে কথাটা বললেন হরিদাস সামন্ত।

পাল মশাই বললেন, বেশ তো, দেখুন না চেষ্টা করে সামন্ত মশাই।

তাহলে ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তৈরী করে দেব।

বেশ, করুন।

একটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন হরিদাস সামন্ত এবং তাঁর অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুভদ্রার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার অভিনয়ের দ্যুতি ঝিলমিল করে উঠল।

অভিনয়ের তালিম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার যে তলে তলে ঘট্টে ঘাঁচিল সেটা আর কেউ দলের না বুকালেও রাধারমণ পাল মশাই সেটা বুকাতে পারছিলেন। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। কারণ যাত্রার দলে ঐ ধরণের ব্যাপার ঘটেই থাকে। এক-একজন অভিনেতার সঙ্গে এক-একজন অভিনেত্রী কেমন যেন জোট বেঁধে যায়। ক্রমশঃ হরিদাস তাঁর বাড়িঘরের সঙ্গে সম্পর্কই প্রায় তুলে দিলেন।

বাড়িতে স্ত্রী চিরকপ্পা।

দুটি ছেলে। বড়টি তেইশ-চবিশ বৎসরের, একটি ফ্যাট্টরিতে মেকানিক—সুশান্ত। কৃতি-একুশ বৎসরের ছোটটি প্রশান্ত পাড়ায় মন্তানী করে বেড়ায়।

প্রৌঢ় বয়সে কোন পুরুষের চোখে যদি কোন নারী পড়ে, তখন তার সাধারণ লাজ-লজ্জার বালাইটাও বোধ হয় থাকে না। প্রৌঢ় হরিদাসেরও সুভদ্রার প্রতি নেশাটা যেন তাঁকে একেবারে বেপরোয়া করে ভুলেছিল। যাত্রার দলে তিনি বেশ ভাল মাইনেই প্রেতেন এবং প্রোপ্রাইটার পাল মশাইয়েরও বোধ হয় হরিদাসের প্রতি একটা দুর্লভতা ছিল। সেই কারণেই হরিদাস সুভদ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন।

হরিদাস নেবৃতলায় একটা বাসা ভাড়া নিলেন, সুভদ্রা তাঁর পাশে সেখানেই থাকতে লাগল।

ক্রমশ দলের মধ্যে সমন্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

কেউ কেউ আড়ালে মুখ টিপে হেসেছিল প্রৌঢ় হরিদাস ও যুবতী সুভদ্রার ব্যাপার-স্যাপার দেখে। বছর দুয়োক হরিদাসের বেশ আনন্দেই কেটে গেল। তারপরই হরিদাস সামন্তের ডাগ্যাকাশে যেন ধূমকেতুর উদয় হল।

তরঁণ অভিনেতা, বছর ছাবিশ হবে বয়েস, শ্যামলকুমার এসে দলে যোগ দিল। শ্যামলকুমার দেখতে শুনত্তেও যেমন চমৎকার তেমনি কষ্টস্বরটিও ভরাট মাধুর্পূর্ণ। অভিনয়েও পটু। পাল মশাই শ্যামলকুমারকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন লুফে নিলেন।

কিছুদিন পরে সুতুন বই খোলা হল। শ্যামলকুমার নায়ক—সুভদ্রা নায়িকা। পালা দারুণ জমে গেল।

শ্যামলকুমারের আসার কিছু আগে থাকতেই হরিদাস আর নায়কের রোল করতেন না। ক্যারেক্টর রোলগুলো করতেন। দলের অন্য একটি ছেলে নায়কের রোল করত।

শ্যামলকুমারের কিন্তু দলে এসেই সুভদ্রার প্রতি নজর পড়েছিল। সুভদ্রার মৌবন আকৃষ্ট করেছিল—এবং দেখা গেল সুভদ্রাও পিছিয়ে নেই। যোগাযোগটা স্বাভাবিকই।

হরিদাস সামন্ত তখনও কিছু বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেননি যে, সুভদ্রার মনটা ধীরে ধীরে শ্যামলকুমারের দিকে ঝুঁকছে। বুঝতে যখন পারলেন তখন নাটক অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী সুধাময়ীর অসুখটা হঠাতে বাড়াবাড়ি হওয়ায় হরিদাস সামন্ত কটা দিন নেবুতলার বাসায় যেতে পারেননি। তারপর স্ত্রী মারা গেল। শ্রাদ্ধ—শাষ্টি চুকবার পর এক রাতে আটটা নাগাদ হরিদাস নেবুতলার বাসায় গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

ভিতর থেকে একটু পরে সুভদ্রার সাড়া এল, কে?

আমি হরিদাস—দরজা খোল।

আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। তুমি বাড়ি যাও, কাল এস।

তা দরজাটা খুলছ না কেন? দরজাটা খোল।

বলছি তো শরীরটা খারাপ। জবাব এল সুভদ্রার ভিতর থেকে।

হরিদাসের মনে কেমন সন্দেহ জাগে। ইদানীং কিছুদিন ধরে সুভদ্রার ব্যবহারটাও যেন কেমন ঠেকছিল। তাই তিনি বললেন, দরজা খোল সুভদ্রা—

দরজা অতঃপর খুলে গেল। কিন্তু খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা নয়—শ্যামলকুমার। কয়েকটা মুহূর্ত হরিদাসের বাঞ্নিষ্পত্তি হয় না। তিনি যেন বোৰা। পাথর।

শ্যামলকুমার পাশ কাটিয়ে বেরবার উপক্রম করতেই সামন্ত বললেন, দাঁড়াও, শ্যামল—

শ্যামলকুমার দাঁড়াল।

তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছিলে?

কেন বলুন তো?

শ্যামলকুমারের গলার স্বরটা যেন ধৃক করে হরিদাসের কানে ঝাঙ্গে।

এটা আমার বাসাবাড়ি, জান?

জানি বইকি। আর কিছু আপনার বলবার আছে?

তোমার এতদূর স্পর্ধা।

সামন্ত মশাই ভুলে যাবেন না, আমি আপনার মাইনে করা ভৃত্য নই। কথাটা বলেই আর শ্যামলকুমার দাঁড়াল না, একপ্রকার যেন হরিদাসকে ধাক্কা দিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে ছিল সুভদ্রা। শ্যামলকুমারের ঠিক পিছনেই।

হরিদাস সামন্ত এবাব ডাকলেন, সুভদ্রা—
কি?

সুভদ্রা অঙ্ককার ওকে এগিয়ে এল হরিদাসের সামনে।
এসবের মাঝে কি?

মাঝে আত্মার কি? দেখতেই তো পাচ্ছ। সুভদ্রার স্পষ্ট জবাব, বলায় কোন দিধা বা
সংকেচ নেই। লজ্জা বা কোন অনুভাবের লেশমাত্রও নেই যেন।
তাহলে যা কানাঘুষায় শুনছিলাম তা মিথ্যে নয়?

মাঝারাত্রে চেঁচিয়ো না।

কি বললি হারামজাদী, চেঁচাব না? একশবাব চেঁচাব—হাজারবাব চেঁচাব। আমারই
ভাড়াবাড়িতে বসে আমারই খাবি, আমারই পরবি—

কিন্তু হরিদাস সামন্তকে কথটা শেষ করতে দিল না সুভদ্রা, বললে, আমি তোমার
বিয়ে-করা সাতপাকের ইষ্টিরী নই হরিদাসবাবু। অত চোখ রাঙ্গারাঙ্গি কিসের?

কি হল হরিদাসের—দপ্ত করে যেন মাথার মধ্যে আগুন জুলে উঠল। বাঘের মতই
সুভদ্রার উপর ঝাপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি সুভদ্রাকে কিল চড় ঘৃষি লাধি চালাতে
লাগলেন হরিদাস।

সুভদ্রা মাটিতে পড়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল।

হরিদাস সামন্ত ঐ পর্যন্ত বলে থামলেন।

তারপর? কিরীটি জিজ্ঞাসা করলে।

পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলে তারপর। বললেন হরিদাস সামন্ত।

তাহলে বলুন ব্যাপারটা মিটে গেল?

মিটল আর কোথায় রায় মশাই! আমিও ভেবেছিলাম বুঝি প্রথমটায় মিটে গেল। কিন্তু
তারপর দিন পনেরো না যেতেই বুঝলাম—

কি বুঝলেন?

সুভদ্রা বাইরে শাস্তি ও চুপ করে থাকলেও গোপনে ওদের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়নি।
আবার একদিন ধরা পড়েও গেল—আবার ধোলাই দিলাম।

আবার মারধোর করলেন?

করব না? কি বলছেন আপনি রায় মশাই—এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! কিন্তু যেন
সমন্ত ব্যাপারটা অন্যদিকে বইতে শুরু করল।

কি রকম?

বুঝলাম ওরা দু'জনে তলে তলে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য বন্ধ পরিকর। কিন্তু মুখে
অন্য রকম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে হরিদাস সামন্ত বললেন, একটা কথা আপনাকে বলা
হয়নি—শ্যামলকুমার যে নাটক সিখতে জানে জানতাম না। হঠাৎ একদিন ঐ ঘটনার দিন

পনেরো পরে পাল মশাই আমিকে ডেকে বললেন—সামন্ত মশাই, একটা চমৎকার পালা হাতে এসেছে।

তাই নাকি? জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ। নতুন লেখচুটি আর কে জানেন?

কে?

আমাদের দলের একজনের লেখা।

কিরীটী কে? আবার আমাদের দলের নাটক লিখল?

বলুন তো কে? অনুমান করুন তো?

না মশাই, পারলাম না।

পারলেন না তো! শ্যামলকুমার।

বলেন কি!

হ্যাঁ। ছেলেটার মধ্যে সত্যিই একটা পার্টস আছে। পালাটা সত্যি চমৎকার হয়েছে। এক কামুক-প্রোটের পার্টস দারুণ। ঠিক করেছি সেই প্রোটের রোলটাই আপনি করবেন। নায়িকা হবে সুভদ্রা আর নায়ক শ্যামলকুমার। কাল থেকেই রিহার্শেল শুরু করছি। গল্পটি মেটামুটি হচ্ছে প্রোটের কাছেই থাকত সুভদ্রা। পরে সেখানে এল গল্পের নায়ক জ্যোতির্ময় বলে ছোকরাটি—তারপর আসল ও সত্যিকারের নাটকের শুরু। একেবারে জমজমাট। আপনি শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা যদি তিনটে রোল নেন তো দেখতে হবে না—একেবারে বাজিমাত।

তারপর? কিরীটী শুধাল।

আমি কি তখন জানি নাটকের বিষয়বস্তু কি এবং কতখানি। বললাম, বেশ তো, নাটকটা যদি ভাল হয়—

ভাল কি বলছেন মশাই, একেবারে সত্যিকারের একখানি নাটক। এখন বলুন কাল থেকে রিহার্শেল শুরু করবেন তো? সামনের রথ্যাত্মার দিন থেকেই মহলা শুরু করা যাক। কি বলেন?

বেশ তো।

হরিদাস সামন্ত বলতে লাগলেন, নাটকের মহলা শুরু হল। নাটকের নাম কি জানেন রায় মশাই?

কি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

সুভদ্রা হৰণ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সামাজিক পালার ঐ ধরনের নাম কখনও শুনেছেন? তার চাউতেও বড় কি জানেন রায় মশাই?

কি?

নাটকের বিষয়বস্তু অবিকল আমার ও সুভদ্রার মধ্যে যেমন শ্যামলকুমারের আবির্ভাব ঠিক তেমনি। তবে অত্যন্ত কৃৎসিত ভাবে।

কি রকম?

রাখালকে করা হয়েছে নাটকে সুভদ্রার পালিত বাপ—যে বাপ শেষ পর্যন্ত মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল। ভাবতে পারেন কি জগন্য মনোবৃত্তি! পাল মশাইকে আমি বলেছিলাম

ঐ ধরনের বিশ্বী ব্যাপার পাঞ্জায় আদো থাকা উচিত নয়। কিন্তু পাল মশাই হেসেই উড়িয়ে দিলেন আমার কথাটা। বললেন—আধুনিকতা আছে ব্যাপারটার মধ্যে।

নাটকের শেষ কি? নাটকের শেষ দৃশ্য রাখাল বিষপান করবে—ঘৃণায়, অপমানে। কাল বাদে পরঙ্গ সেই পালার প্রথম অভিনয় রজনী—চন্দননগরে।

তা এই ব্যাপারে আপনার দিক থেকে বিপদের বা আশঙ্কার কি আছে?

ব্যায় মশাই, আমি বুঝতে পারছি—

কি?

ওরা আমাকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই হত্যা করার মতলব করছে।

হত্যা করবে? বলেন কি? কিরীটী বললে।

হ্যাঁ। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, ঐ যে নাটকের মধ্যে বিষপ্রয়োগের ব্যাপারটা আছে—আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ঠিক ঐ থেকেই সত্যসত্যই আমাকে ওরা হত্যা করার—

না, না—তা কখনও সম্ভব?

সম্ভব। ওদের পক্ষে সবই এখন সম্ভব। ওরা মরীয়া হয়ে উঠেছে।

তা এতই যদি আপনার ভয়, দল ছেড়ে দিন না।

ছাড়তে চাইলেও ছাড়া পাব না, কারণ বেশ কিছু টাকা ধারি পাল মশাইয়ের কাছে আমি। অথচ পুলিসকে একথা বললে তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে। তাই আপনার শরণাপন হয়েছি রায় মশাই। আমাকে আপনি বাঁচান।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, সুভদ্রার মনোভাব এখন আপনার প্রতি কেমন? সে এখনও আপনার সঙ্গেই আছে তো?

তা আছে। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকালেই বোৰা যায়, তলে তলে ও ছুরি শানাচ্ছে।

সামন্ত মশাই, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলব?

কি বলুন?

সুভদ্রাকে আপনি ছেড়ে দিন না—

সুভদ্রাকে ছাড়াও যা মৃত্যুবরণ করাও তা। তা যদি পারতাম তবে আর আপনার শরণাপন হব কেন?

কথাগুলো বলতে বলতে সামন্ত পকেট থেকে দশ টাকার দশখানা নোট বের করে এগিয়ে ধরলেন।—গরীব অভিনেতা আমি রায়মশাই, আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক দেবার সাধ্য বা ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই। আপাতত এটা—

টাকা থাক সামন্ত মশাই। কারণ আমি নিজেই এখনও বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি। আচ্ছা পরঙ্গ তো চন্দননগরে আপনাদের অভিনয়?

হ্যাঁ—প্রথম গাওনা।

আমি যাব। আপনাদের ধীনরমের আশেপাশেই থাকব। তবে—

তবে?

আমাকে হয়ত চিমে ফেলবে শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা। তাই ভাবছি—

বলুন?

এক প্রৌঢ়ৰ ছানাবেশে—আপনার বক্ষৰ পরিচয়ে যাব।

বেশ। খুব ভাল প্রস্তাৱ।

তাহলে সেই কথাটো বুঠে। আমাৰ নাম বলবেন ধূঞ্জাটি রায়। এককালে অভিনয় কৰতাম। আপনাৰ পুৰুষত্ব বন্ধু।

ঠিক আছে তাই হবে।

অতঃপৰ হৱিদাস সামষ্ট বিদায় নিলেন।

॥ তিন ॥

হৱিদাস সামষ্ট বিদায় নেবাৰ পৱই কৃষণ এসে ঘৰে চুকল।

কেন এসেছিলেন গো ভদ্রলোক?

লোকটা কে জান কৃষণ?

ন।

এককালে মঞ্চেৰ নামকৰা অভিনেতা ছিল, এখন যাত্রাৰ দলে অভিনয় কৰে। বয়েস হয়েছে। বোধ কৰি তিপ্পান-চুয়ান হবে?

তা কি চান উনি তোমাৰ কাছে?

কিৱীটী সংক্ষেপে হৱিদাস-বৃত্তান্ত কৃষণকে শোনাল।

কৃষণ সব শুনে বললে, বুড়োৰ এখনও এত রস!

বুড়ো বয়সেই তো রসাধিক্য হয়, বুঝতে পাৰছ না আমাকে দিয়ে?

তা কিছু কিছু বুঝতে পাৰছি বৈকি।

অতএব হে নারী, সতৰ্ক হইও।

বয়ে গেছে আমাৰ।

বটে! এত সাহস!

যাও না, একবাৰ দেখ না চেষ্টা কৰে।

পাছিছ না যে।

ওহো, কি দুঃখ রে!

দুজনেই হেসে ওঠে।

কিৱীটী হৱিদাস সামষ্টৰ সঙ্গে কথা বলতে বলতেই স্থিৱ কৰেছিল—যাত্রাৰ দলেৰ মানুষগুলো যারা হৱিদাস সামষ্টৰ জীবনে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী—বিশেষ কৰে শ্যামলকুমাৰ ও সুভদ্রা—তাদেৰ সে দেখবে। ওদেৰ অফিসে গিয়েও পৱিচয় হতে পাৰে। কিন্তু একজন উটকো লোক দেখলে—বিশেষ কৰে কোনক্রমে যদি তাৰা পৱিচয় জানতে পাৰে তাৰা হয়ত কিছুটা সচেতন হয়ে যেতে পাৰে। তাই সে মনে মনে স্থিৱ কৰে যাত্রাৰ আসৰ গিয়ে যাত্রাৰ দেখা হবে, লোকগুলোকে দেখাও হবে। চাই কি পৱিচয়ও হতে পাৰে।

এবং তাতে কৰে হয়ত তাদেৰ মনেৰ খবৰাখবৰও কিছু আঁচ কৰাৰও যেতে পাৰে। সেই ভেবেই চন্দননগৱে যেদিন পালাগান সেদিন সেখানে সে যাত্রাৰ জন্য প্ৰস্তুত হয়।

চন্দননগৱ শহৱে এক বনেদী ধনীগুহৰে বিৱাট নাটমঞ্চে যান্তাৱ আসৰ বসেছে।

আৱ সে যুগ নেই—এখন কৃষ্ণিৰ অন্যতম ধাৰক ও বাহুক যাত্রাপালা। আজকাল চিকিৎস কেটে যাত্রা-গান হয়। শ্বেতাও হয় প্ৰচুৱ। তোছাড়া মৰক্কেতন যাত্রা পার্টিৰ নাম খুব ছাড়িয়েছিল এ সময়। বিশেষ কাৱে তাদেৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী শ্যামলকুমাৰ ও সুভদ্রাৰ জুটিৰ জন্য।

পালা শুরু হবে রাত অট্টায়।

কিরীটী সন্ধ্যার মুখোমুখিই গিয়ে চল্দননগর স্টেশনে নামল ট্রেন থেকে।

গ্রীষ্মাকাল। কিন্তু শহরের প্রাচপেচে গরম এদিকটায় নেই যেন।

কিরীটীর চেহারা ও শেশভূষা দেখে তাকে কারও চিনবার উপায় ছিল না। মাথার মাঝখানে টেরি। অনেকটা সেকেলে কলকাতা শহরের বনেদী লোকেদের মত বেশভূষা।

পরনে শাস্তিপুরের মিহি ধূতি, গায়ে গিলে-করা আদির পাঞ্জাবি, ঢোকে চশমা—পূর্ণষ্ঠ একজোড়া পৌত্র মোম দেওয়া। গলায় একটা পাকানো চাদর—গিঁট দেওয়া। পায়ে চকচকে পাম্পসু। হাতে বাহারে ছড়ি।

প্রককালে ঐ ধরনের বাবুদের কলকাতা শহরে প্রায়ই দেখা যেত।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা সাইকেল-রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই কিরীটী জানতে পারল যাত্রার আসর কোথায় বসেছে।

রিকশাওয়ালা শুধায়, যাত্রা দেখবেন বাবু?

কিরীটী হেসে বলে, আমার এক বস্তু ঐ দলে অভিনয় করে। শ্রীরামপুরে থাকি। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তার সঙ্গেও দেখা হবে প্রায়ই দেখা যেত।

উঠুন বাবু, পৌছে দিছি। এক টাকা ভাড়া লাগবে।

তাই পাবে। চল।

উঠুন।

কিরীটী উঠে বসল সাইকেল-রিকশায়। রিকশাওয়ালা একটা হিন্দী ফিল্মের গান গুন শুন করে গাইতে গাইতে রিকশা চালাতে লাগল।

মিনিট পনেরো লাগল যাত্রার আসরে পৌছতে।

মন্ত্র বড় সেকেলে পুরাতন জমিদার-বাড়ি।

বিরাট নাটমঞ্চ। চারিদিক ঘিরে সেখানে আসরের ব্যবস্থা হয়েছে।

গেটের সামনে সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে কিরীটী রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরের দিকে এগুল।

অল্পবয়সী যাত্রা দলের একটি ছোকরা গেটের সামনে বসেছিল। শ্রোতাদের আসা তখনও ভাল করে শুরু হয়নি।

কিরীটী সেই ছেলেটিকেই শুধাল, হরিদাস সামন্ত মশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

এখন তো তিনি গ্রীনরুমে আছেন।

তা জানি, তাকে যদি একটা খবর দেন—বলবেন তাঁর অনেক কালের বস্তু ধূঢ়ুচৰায় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

আসুন আমার সঙ্গে। তারপর আবার কি ভেবে ছেলেটি অন্য একটি উত্তপ্তি দেকে বললে, ওরে সুবল, এই বাবুটিকে সামন্ত মশাইয়ের কাছে নিয়ে আস।

সুবল একবার কিরীটীর আপাদমন্ত্রক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আসলে, চলুন।

বিরাট নাটমঞ্চে কতকগুলো পাশাপাশি টিনের পার্টিশন তুলে ছেট ছেট ঘরের মত করে সাজাঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারই একটার সামনে এসে সুবল বললে, যান চেতৱে, সামন্তদা এই ঘরেই আছেন।

কিরীটী ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ভিতরে পা ফেলেই ধরকে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে একটি পাঁচিশ-ছাবিশ বৎসরের যুবতী।

উভয়েই পিছন ফিরেছিল বল কিরীটীকে ওরা দেখতে পায়নি।

মেয়েটির সারা দেহে ঘোবন টলমল করছে। মেয়েটি বিশেষ লস্তা নয়—বরং একটু বেঁটেরই দিকে। কিন্তু ছিপছিপে গড়নের জন্য বেমানান দেখায় না। পরনে একটা মুশিদিবাদ সিঙ্কের শান্তি। একমাথা চুল, এলো খোঁপা করে। খোঁপাটা পিঠের উপর যেন ঝুলছে।

মেয়েটি দাঢ়িয়ে—সামন্ত মশাইও দাঢ়িয়ে। তাঁর পরনে একটা লুঙ্গি ও আদির
পাঞ্জাবি।

বেঁদের কথাবার্তা কিরীটীর কানে আসে।

কেন, ডাকছ কেন? মেয়েটি বলল।

সুভদ্রা, আজ পালা শেষ হলে আমরা বের হয়ে পড়ব। হরিদাস সামন্ত বললেন।
না, আমি কাল ভোররাত্রে ট্রেনে বর্ধমান যাব। সুভদ্রা বললে।

বর্ধমান! বর্ধমান কেন?

সবই তোমাকে বলতে হবে নাকি? সুভদ্রার কঠে যেন বিদ্রোহের সূর।

তা বলতে হবে না! সঙ্গে বোধ হয় শ্যামলকুমার চলেছে?

চলেছে কি না চলেছে যাওয়ার সময়ই দেখতে পাবে।

সুভদ্রা, তুমি ভাব, আমি কিছুই বুঝি না।

কি বুঝেছ শুনি?

সেদিনকার পিটুনির কথা নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি?

শোন, তোমাকেও আমি স্পষ্ট করে আজ বলে দিচ্ছি, তোমার নেবুতলার বাসায় আর
আমি যাব না।

উঃ! তলে তলে তাহলে বাসাও ঠিক হয়ে গিয়েছে?

সুভদ্রা কোন জবাব দিল না, যাবার জন্যই বোধ করি ঘুরে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই
কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কে আপনি?

হরিদাস সামন্তরও দৃষ্টি ইতিমধ্যে পড়েছিল কিরীটীর উপরে।

কি হে সামন্ত, চিনতে পার!

কে?

ধূঁজটি—আমি ধূঁজটি রায় হে!

ধূঁজটি?

চিনতে পারছ না? সেই যে—

হরিদাস সামন্ত প্রথমটায় সত্যিই কিরীটীকে চিনতে পারেনি। কিরীটীর চোখ টিপে
ইশারা করায় দুদিন আগেকার সব কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। বলে গত্তেন—ও হাঁ হাঁ,
ধূঁজটি! কোথা থেকে হে?

শুনলাম তুমি পালা-গান গাইতে এসেছ—তাই ভাবলাম অমৈককাল দেখাসাক্ষাৎ নেই,
দেখা করে যাই।

হাঁ হাঁ, এবার চিনেছি। উঃ, কতদিন পরে দেখা! তা বেশ—বেশ করেছ।

আজ তোমাদের পালা তো সুভদ্রা হৱণ!

কথাটা বলে আড়চোখে একটা কিরীটি সুভদ্রার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ।

উনিও বুঝি তোমাদের মনে অভিনয় করেন?

হ্যাঁ। ওই-ই তোমায়িকা সাজে। ওর নাম সুভদ্রা মন্ডল।

নমস্কার, কিরীটি হাত তুলে নমস্কার করে।

সুভদ্রাও প্রতিনমস্কার জানায়।

কিরীটি বললে, পালার নামটির সঙ্গে আপনার নামটিও তো বেশ মিল করাই। পালাটা
কে কিংবিতে হে সামন্ত? পৌরাণিক?

না, সামাজিক—জবাব দিল সুভদ্রা।

সামাজিক?

হ্যাঁ। দেখবেন না পালাটা! ভাল লাগবে পালাটা আপনার। কথাগুলো বলতে বলতে
বার দুই সুভদ্রা আড়চোখে হরিদাস সামন্তের দিকে তাকাল।

কিরীটির মনে হল সুভদ্রার ওষ্ঠের প্রাণে যেন একটা বাঁকা হাসির চকিত বিদ্যুৎ থেলে
গোল।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই দেখব, এসেছি যখন! কিরীটি বললে।

সুভদ্রা, ওকে এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও।

তা ওহে সামন্ত, শুনেছি তোমাদের শ্যামলকুমার নাকি অঙ্গুত অভিনয় করে। তার
সঙ্গে একটিবার আলাপ হয় না?

জবাব দিল সুভদ্রা, কেন হবে না? শ্যামলই তো এ নাটকের নাট্যকার। আমি এক্ষুনি
শ্যামলকে ডেকে আনছি।

খুশিতে যেন ডগমগ হয়ে সুভদ্রা লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুভদ্রার পদশব্দ মিলিয়ে গেল বাইরে।

॥ চার ॥

কিরীটি হরিদাস সামন্তের দিকে ফিরে তাকাল।

এই আপনার সুভদ্রা, সামন্ত মশাই?

হ্যাঁ। কি মতলব করেছে ওরা জানেন? আজই ওরা ভোররাত্রের গাড়িতে বর্ধমান
যাবে।

শুনলাম তো।

শুনেছেন?

হ্যাঁ। ঘরে ঢেকার মুখে আপনাদের শেষের কথাগুলো কানে এল।

কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, তা হতে দিচ্ছি না। সামন্ত বললেন।

সামন্ত মশাই, ও কালনাগিনী। মিথ্যে শুধু ছোবল থাবেন। যাক সেকথা। আপনাদের
পালা শুরু হচ্ছে কখন?

রাত ঠিক আটটা। এখন সাড়ে ছুটা। আর দেড় ঘণ্টা বাঁচে।

আমাকে আসবে বসবার একটা জায়গা করে দেবেন।

নিশ্চয়ই।

ভাল কথা, আপনাদের এই নাটকে কোন অক্ষে যেন রাখালকে বিষ দেবার কথা!

বিষ কেউ দিছে না। পালায় আছে বিষ, আমিই নিজে খেচ্ছায় পান করব সুভদ্রা তার
প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাচ্ছে জানতে পেরে।

ওঃ, তাহলে জেনেগুরুই বিষপান? বিষপ্রয়োগ নয়? কিরীটি বললে।

হ্যাঁ, জেনেগুরুই বিষপান।

তবে—

কি তবে?

দৃশ্টি কি রকম বলুন তো?

আমি একটা ফ্লাস হাতে আসরে যাব, তাতে বিষ রয়েছে।

তারপর?

আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করব বিষটা, তারপর ফ্লাসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উলতে
উলতে বের হয়ে আসব আসর থাকে।

তাহলে আসরের মধ্যে পতন ও মৃত্যু নয়?

না। নেপথ্যে।

তাহলে আর আপনার এত ভয় কেন?

মানে?

ফ্লাস তো আপনিই নিয়ে যাবেন নিজে হাতে আসরে?

না।

তবে?

সুভদ্রাকে ডেকে বলব ফ্লাসটা নিয়ে আসতে। সে এনে দেবে ফ্লাস আসরে।

তাই নাকি! এ যে দেখছি—

কিরীটির কথা শেষ হল না।

সুভদ্রা ও শ্যামলকুমার এসে সাজঘরে ঢুকল।

সুভদ্রার হাতে এক কাপ চা। কিরীটি দেখল, শ্যামলকুমারের বয়স আটাশ-উন্ডিশের
বেশী হবে না।

ভারি সুত্তী চেহারাটি। যেমন নায়কোচিত দেহের গঠন, তেমনি পূর্ণবোচিত স্বাস্থ্য ও
যৌবন যেন কানায় কানায় উপচে পড়ছে।

কালো রং হলোও দেখতে সুন্দর। যাকে বলে সত্যিকারের সুপুরুষ। অভিনেতার মতই
চেহারা বটে।

সুভদ্রা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে কিরীটির দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে
বললে, এই নিন চা। এই আমাদের শ্যামলকুমার, নাটকও এরই লেখা।

আপনিই নাটকুর?

আজ্ঞে।

এই বুঝি আপনার প্রথম নাটক? কিরীটি শুধায়।

হ্যাঁ। বিনীতভাবে জবাব দিল শ্যামল। শুনলাম আপনি সামন্তব্যুর বক্ষু। আজ
আমাদের নাটকটা দেখে যান না।

এসেছি যখন দেখে যাব বৈকি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটি আবার বললে, কিন্তু নাটকের অমন একটা
অসুস্থ পৌরাণিক প্যাটার্নের নাম রাখলেন কেন শ্যামলবাবু?

শ্যামলকুমার মন্দ হেসে বললে— নাটকটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আগে দেখুন, তারপর আপনার সঙ্গে অঙ্গোচনা করব। আচ্ছা তাহলে আমরা চলি। প্রথম দৃশ্যেই আমার আর সুভদ্রার প্রাণী আছে। এস সুভা—

শ্যামলকুমার সুভদ্রাকে ডেকে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরিটী গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিল আড়চোখে, শ্যামলকুমার আর সুভদ্রার দিকে জুলন্ত অপিঙ্গলৰ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন হরিদাস সামন্ত।

মনে হচ্ছিল যেন এখনি ওদের উপর বাঁপিয়ে পড়বেন এবং পারলে ওদের দুজনের হাঁটি ছিড়ে ফেলেন।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই হরিদাস সামন্ত যেন ফেটে পড়লেন, দেখলেন—দেখলেন তো স্বচক্ষে রায় মশাই! এরপরও বলবেন, ওরা মনে মনে আমাকে হত্যা করবার সঙ্গল আঁটছে না? উঃ কি সাজ্জাতিক, কি ভয়ানক শয়তানী!

অধীর হবেন না সামন্ত মশাই।

অধীর হব না, কি বলছেন রায় মশাই? আমি তো একটা মানুষ, না কি?

ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাহলেও একটা কথা কি জানেন? ওরা মনে মনে যদি কোন মতলব এঁটেই থাকে কৌশলে ওদের পথ থেকে আপনাকে সরাবার, রাগারাগি করে চেঁচামোচি করলে বা এমন করে অবৈর্য হলে ওদের তাতে করে সুবিধাই হবে।

পারছি না, এত অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না রায় মশাই। তাছাড়া আপনাকে তো এখনও একটা কথা বলিছিনি।

কি কথা?

আজ আবার ঐ রাক্ষেলটার সঙ্গে দুপুরে আমার একচেট হয়ে গিয়েছে।

কার কথা বলছেন? কিরিটী শুধাল।

কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন না? ঐ শ্যামলকুমার!

কি হল তার সঙ্গে আবার?

জানেন, ও আমাকে আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছে আজ।

আলটিমেটাম?

হ্যাঁ। দুপুরের ট্রেনে আসতে আসতে শ্যামলকুমার আমাকে বলেছে—

কি বলেছে?

ওদের পথ থেকে যদি আমি না সরে দাঁড়াই তো ওরাই আমাকে সরাবার ব্যবস্থা করবে।

তাই নাকি!

কথাটা কয়েকদিন আগেও শ্যামলকুমার আমাকে একবার বলেছিল।

ওরাই—মানে কি? আপনার কি মনে হয়, ঐ মড়য়ন্ত্রের মধ্যে সুভদ্রাও আছে? নিশ্চয়ই আছে।

কিরিটী ক্ষণকাল যেন কি ভাবল। তারপর বলে, ঠিক আছে।

বাহিরে ঐ সময় পালা শুরু হবার প্রথম বেল পড়ল।

ঐ যাঃ, প্রথম বেল পড়ল—প্রথম দৃশ্যের শেষের দিকে আমার অ্যাপিয়ারেন্স আছে। হরিদাস সামন্ত বলে উঠলেন।

আপনি প্রস্তুত হয়ে দিন।

আপনি ?

আসরে আমার বসবার একটা জায়গা করে দিন সামনের রোতে, যাতে করে ওদের দুজনকে আরও ভাল করে দেখে নাটকটা ভাল করে শুনতে পারি।

ঠিক আছে। চলুন আপনাকে আমি বসিয়ে দিয়ে আসি। তারপর মেক্সাপে বসব, চলুন।

চলুন।

সামন্ত মশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী ওঁর গ্রীনরুম থেকে বেরুল।

গম্ভীর করেছিল যেন আসর।

দর্শনার্থীতে একেবারে যেন ঠাসাঠাসি আসর তখন।

তিল-ধারণেরও স্থান নেই। হরিদাস সামন্ত পাল মশাইকে বলে প্রথম সারিতেই আসরের একেবারে সামনাসামনি একটা চেয়ারে কিরীটীকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে পালা শুরু হল।

কিরীটী তন্ময় হয়ে পালা শুনছিল।

নাটকটি বেশ লাগে কিরীটির। চমৎকার নিখেছে ছেলেটি। কে বলবে একটি তরুণের এই প্রথম প্রয়াস !

যেমন ঘটনার বাঁধুনী তেমনি নাটকীয় সংঘাত, আর তেমনি নাটকের সংলাপ।

আরও আশ্চর্য লাগছিল কিরীটির, হরিদাস সামন্তের কাছে কয়েকদিন আগে শোনা তাঁর জীবনকাহিনীই যেন নাটকের কাহিনীর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে।

এক বৃদ্ধের এক তরুণীর প্রতি আকর্ষণ,—যে আকর্ষণের টানে সে তার নিজের সংসারকে ভাসিয়ে দিল, অথচ ঐ বৃদ্ধ ঐ তরুণীর সম্পর্কে পালিত পিতার মতই। এমন সময় নাটকে শুরু হল ওদের সংসারে এক তরুণকে নিয়ে সংঘাত।

মেয়েটি সহজেই তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল স্বভাবতই, আর তাইতেই সংঘাত।

এক ত্রিকোণ সংঘাত।

শেষ পর্যন্ত পিতার নিজের বিকৃত বাসনার জন্য মেয়েটির প্রতি জেগে ওঠে এক গভীর অনুশোচনা, যার ফলে সে হ্রিয়ে করল সে নিজেই স্বেচ্ছায় ওদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে।

সে বিষপান করবে।

বিষ সংগ্রহ করে নিয়ে এল বৃদ্ধ এবং সেই বিষ সে এনে জলের পাত্রের মধ্যে মেলে দিল এবং মনস্ত করল মেয়েটির হাতের থেকে বিষ-মেশানো জল পান করবে, যাতে করে সেই জল পান করলেই মৃত্যু হয়।

ক্রমশঃ নাটকের সেই দৃশ্য এল।

সুভদ্রা (নাটকের নায়িকা) কোথায় বের হয়েছিল, অনেক রাতে ফিরে এসে দেখে সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে একাকী চুপ করে বসে আছে।

সুভদ্রা বললে, পাশের ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গুড়েছিলাম, খেয়েছি?

আজ আর কিছু খাব না সুভদ্রা।

থাবে না ?

না শুধু এক প্লাস জল। টেবিলের ওপর আছে, এনে দাও তো জলের গ্রাসটা।

শুধু জল থাবে?

হ্যাঁ।

সুভদ্রা চলে গেল এবং একটু পরে এক প্লাস জল নিয়ে এল, এই নাও জল।
যাও, তুমি শুধু পেটো গে।

সুভদ্রা চলে গেল।

নিজের হাতে বিষমিক্রিত সেই জল পানের পূর্বে বৃন্দর সংলাপঃ সুভদ্রা, তুমি সুখী
হও। আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। একটা চিঠি রেখে যাব, আমার মৃত্যুর
জন্য কেউ দায়ী নয়।

এই জলে বিষ মিশিয়ে রেখেছি তুমি জান না, তোমার হাত দিয়েই এই বিষ আমি পান
করছি। আর তাই তো তোমরা মনে মনে চেয়েছিলে—তাই হোক, তাই হোক।

সংলাপগুলো উচ্চারণ করতে করতে টলতে টলতে হরিদাস সামন্ত জলটুকু পান করে
প্লাসটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আসর থেকে প্রস্থান করলেন।

শেষ দৃশ্য।

রাখাল-বেশী হরিদাসের প্রস্থানের পরই সুভদ্রা আর নায়কের প্রবেশ।

কিরীটী যেন নাটকের কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

সুভদ্রা!

বল জ্যোতির্ময়!

আর এই খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারছি না।

কি করতে চাও?

এ যেন সত্যি আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমারও।

আমি ঠিক করেছি—

কি ঠিক করেছ?

আজ রাত্রেই আমরা পালাব।

আমি প্রস্তুত।

ইচ্ছে ছিল না আদৌ আমার এভাবে তোমাকে অপহরণ করে চোরের মত রাতের
অন্ধকারে সরে পড়বার, কিন্তু—

কিন্তু কি?

সামনে দিয়ে গেলে ঐ বৃন্দ মনে নিদারণ আঘাত পাবে। সুখের ঘর বাঁধতে চলেছি,
কারও মনে কোন দুঃখ দেব না। ভাল করে শেষবারের মত ভেবে দেখ, তোমার মনে কোন
চিন্তা বা সংকোচ নেই তো?

এতটুকুও না। ওর কৃৎসিত দৃষ্টি আমাকে যেন লোভীর মত সর্বক্ষণ শেহন করছে।
অথচ ও আমার পালিত বাপ। মুক্তি চাই আমি—মুক্তি চাই।

চল।

দুজনে হাত ধরাধরি করে আসর থেকে বের হয়ে যাবার উপক্রম করবে, আর ঠিক
বেরবার আগেই বাড়ির ভৃত্য এসে বলবে, দিদিমণি, শিশী চলুন, বাবু কত্তাবাবু বোধ হয়
মারা গেছেন।

কিন্তু ভৃত্য আর আসে না।

ভৃত্যও আর আসে না, ওরাও নাটকের সংলাপগুলো বলতে পারে না।

ওরা ঘন ঘন ভৃত্য আসার প্রবেশপথের দিকে তাকাতে থাকে।

নিজেদের মধ্যেই অস্ফুট কঢ়ে বলাবলি করে ওরা। কিরীটী সামনে বসেই শুনতে পায়।

কি ব্যাপার, চাকর আসছে না কেন?

দু'মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট কেটে গেল। অর্থে ভৃত্য আসছে না আসবে।

সুভদ্রা আর শ্যামলকুমার পরম্পরের মুখের দিকে তাকায়।

দু'জনেরই চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

দর্শকরা প্রথমটায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু প্রায় যখন আট দশ মিনিট এই অবস্থায় কেটে যাবার উপক্রম হল তখন তাদের মধ্যেও একটা ফিসফিসানি, চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

লে বাবা, এরা দুটি সঙ্গের মত দাঁড়িয়ে রইল কেন? কে একজন বললে।

আর একজন টিপ্পনী কাটল, কি বাবা, ভাগব বলে এখনও দাঁড়িয়ে কেন? কেটে পড় না বাপু, দুটিতে তো বেশ জোট মানিয়েছে!

ওরাও বোধ হয়—সুভদ্রা আর শ্যামলকুমার কেমন অস্থির বোধ করতে থাকে। বৃক্ষের ভৃত্যের আবির্ভাবের পর যে সংলাপ তাও বলতে পারছে না, এদিকে ভৃত্যেও দেখা নেই।

অবশেষে বুদ্ধি খাটিয়ে শ্যামলকুমার বললে, চল সুভদ্রা, আর দেরি করা উচিত নয়। হ্যাঁ, চল।

ওদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সারা প্যান্ডেল যেন এক অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল।

কিরীটী নাটকের শেষটাকু জানত। হরিদাসের মুখেই শুনেছিল।

কিরীটীও ঠিক বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা ঠিক কি হাটল!

ভৃত্যের আসবে আবির্ভাব হল না কেন?

হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়ায় তাড়াতাড়ি কিরীটী উঠে পড়ল এবং দ্রুতপদে সাজঘরের দিকে পা বাঢ়াল।

দর্শকরাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না।

তারা তখন হাসি থামিয়ে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, এটা কি হল? এ কেমন পালা রে বাবা?

॥ পাঁচ ॥

হরিদাস সামন্তর সাজঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল কিরীটী।

সেখানে তখন যাত্রাদলের আট-দশজন জমায়েত হয়েছে, পাল মশাইও উপস্থিত। শ্যামলকুমার ও সুভদ্রাও পৌছে গিয়েছে সে ঘরে।

একটা চাপা গুঞ্জন ঘরের মধ্যে যেন বোবা একটা আতঙ্কের গৃহ ধূরথম করছে। ভিড় ঠেলে সামনের দিকে দু'পা এগুতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল কিরীটির।

সামন্ত মশাই চেয়ারের উপর বসে আছেন। পরনে তাঁর আভিনয়েরই সাজপোশাক। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে ঘাড়টা ভেঙে যেম।

দুটো হাত অসহায় ভাবে চেয়ারের দু'পাশে ঝুলছে। পায়ের সামনে একটা কাঁচের গ্লাস।

কি ব্যাপার? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

বুঝতে পারছি না রায় মশাই, অধিকারী রাধারমণ পাল বললেন, ঘরে চুকে দেখি ঐ দৃশ্য। ডেকেও সাড়া না পেয়ে আপনার বন্ধুর—

কিরীটী এগিয়ে পেল। ঝুলে-পড়া হরিদাস সামন্তর মুখটা তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা আবার ঝুলে পড়ল বুকের উপরে।

মুখটা নীজচে। ঠোঁট দুটিও নীজচে। কশের কাছে সামান্য রঞ্জাঙ্গ ফেন।

তাতটা তুলে নাড়ি পরীক্ষা করল কিরীটী। তারপর রাধারমণ পালের দিকে তাকিয়ে মৃদুক্ষেত্রে বললে, উনি বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই? সে কি?

একটা চাপা আর্তনাদের মতই যেন রাধারমণ পালের কঠ হতে কথাগুলো উচ্চারিত হল।

হ্যাঁ, মারা গেছেন। কিরীটী আবার কথাটা উচ্চারণ করল।

মারা গেছেন?

কিরীটী ঐ সময় মাটি থেকে ফ্লাস্টা তুলে একবার নাকের কাছে নিয়ে শুরু।

তারপর সেটা পাশের একটা তুলের উপরে নামিয়ে রেখে বললে, মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

বিষ!

কথাটা কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে যেন উচ্চারিত হল শ্যামলকুমারের মুখ থেকে।

কিরীটী শ্যামলকুমারের মুখের দিকে তাকাল। শ্যামলকুমারের সমন্ত মুখে যেন একটা বিরত ভয়ের কালো ছায়া।

আমার তাই মনে হচ্ছে, কিরীটী বললে, পুলিসে এখনি একটা খবর দেওয়া দরকার।

পুলিস! পুলিস কি করবে? রাধারমণ একটা ঢোক গিলে কথাটা বললেন।

স্বাভাবিক মৃত্যু নয় যখন তখন পুলিসে একটা সংবাদ দিতে হবে বৈকি।

ঘরের মধ্যে যাত্রাদলের সবাই তখন ভিড় করেছে, সবার কানেই বোধ করি সংবাদটা পৌছে গিয়েছিল।

জনা ঘোল-সতেরো মেয়ে-পুরুষ যাত্রার দলে।

ইতিমধ্যে বোধ করি বাড়ির কর্তা রমণীমোহন কুণ্ডুর কানেও সংবাদটা পৌছে গিয়েছিল। ভদ্রলোক হস্তদণ্ড হয়ে এসে ঘরে চুকলেন।

কি হয়েছে পাল মশাই? ব্যাপার কি?

রমণীমোহনের বয়স খুব বেশী নয়—পঞ্চাশ-একাহার মধ্যেই। বেশ স্বাস্থ্যবান দেহ। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে বোঝা যায় ভদ্রলোক রীতিমত শোখিন। পরনে কাঁচির কোচানো ধূতি, চওড়া কালোপাড়, সাদা গিলে-করা আদির পাঞ্জাবি, পায়ে বিলাসী গরী চটি।

আপনি? কিরীটী প্রশ্ন করে রমণীমোহনের দিকে তাকিয়ে।

আমি এ বাড়ির মালিক—রমণীমোহন কুণ্ডু।

ওঃ, ইনি সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু। রাধারমণ বললেন।

গুলোয় সামন্ত মশাইয়ের নাকি কি হয়েছে?

রাধারমণ পাল চুপ করে ছিলেন। কিরীটীই প্রশ্নটার জবাব দিল, মারা গেছেন। মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটেছে।

সর্বনাশ ! পয়জনিং ?

হ্যাঁ।

এখন উপায় ?

থানায় একটা সংবাদ পেঠাতে হবে।

হ্যাঁ, এখনি প্রায়চিকিৎসা হস্তদণ্ড হয়ে বের হয়ে গেলেন রমণীমোহন কৃষ্ণ।

কিরীটী আবার পাল মশাইয়ের দিকে তাকাল। ভদ্রলোকের মুখটা যেন এর মধ্যেই কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে পুরু ঢেঁটটা জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

পাল মশাই !

আঁজে ?

আপনাদের দলের সর্বশেষ আজ রাত্রে কার সঙ্গে সামন্ত মশাইয়ের দেখা হয়েছিল, সেকথা জানতে পারলে হত !

পাল মশাই একটা ঢেঁক গিলে বললেন, আমার সঙ্গে—মানে পালা শুরু হবার পর থেকে আমি এখানে আসিছিনি।

তাহলে আপনার সঙ্গে পালা শুরু হবার পর আর সামন্ত মশাইয়ের দেখা হয়নি ?
না।

হ্যাঁ। আপনারা ? কিরীটী পর্যায়ক্রমে সকলের দিকে তাকাল।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্যায়ক্রমে একে একে সকলের মুখের উপরই ঘুরে এলো।

চিরাপর্িতের মত যেন সব দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কথা নেই।

কেউ আপনাদের মধ্যে আজ পালা শুরু হবার পর এখানে আসেননি ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

রোগা মত এক ব্যক্তি এগিয়ে এল। বয়স বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে বলে মনে হয়।

কিরীটী পুনরায় তাকে প্রশ্ন করে, আপনি এসেছিলেন ?

না। তবে তৃতীয় অক্ষ শুরু হবার পর একবার আমি এখানে শ্যামলকুমারকে আসতে দেখেছি। আর তৃতীয় অক্ষের মাঝামাঝি—সামন্ত মশাই তখন আসরে, সুভদ্রা দেবীকে এই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিলাম।

কিরীটী বক্তার মুখের দিকে তাকাল।

রোগা পাকানো চেহারা। চোখের কোল বসা। ভাঙা গল। নাকটা খাঁড়ার মত উচু। মাথায় একমাথা ঢেউ-খেলানো বাবরি চুল। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন। পরনে তরুণের অভিনয়ের পোশাক।

কিরীটীর মনে পড়ল, লোকটি ভাল অভিনেতা। বর্তমান নাটকে ভিলেবের পার্ট করছিল। পালায় নায়িকার অন্যতম প্রেমিক। হতাশায় সে প্রতিহিংসাপ্রায়ণ হয়ে উঠেছিল।

কি নাম আপনার ?

আঁজে সুজিতকুমার মিত্র।

এই দলে আপনি কতদিন আছেন ?

কতদিন—মানে, ধরন গে বছর ছয়েক তো হবেই। আগে তো আমিই এ দলে হিরোর রোল করতাম। রোগে রোগে চেহারাটা ক্ষেঙে যাওয়ায় পাল মশাই আর আমাকে হিরোর পার্ট দেন না, ভিলেবের পার্ট করি।

হাঁ। তা আপনি দেখেছেন শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা দেবীকে এই ঘরে আসতে?

আজ্জে বললাম তো ক্ষমতা, শ্যামলকুমারকে আমি ঢুকতে দেখেছি, কিন্তু বের হয়ে যেতে দেখিনি। আর সুভদ্রা দেবীকে বেরোতে দেখেছি কিন্তু ঢুকতে দেখিনি।

শ্যামলকুমার ভিত্তির মধ্যে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিরীটি শ্যামলকুমারের মুখের দিকে তাকাল।

শ্যামলকুমার তৃতীয় অক্ষের গোড়ায়—কিরীটি প্রশ্ন করল, আপনি এসেছিলেন এ

ঘরে? হ্যাঁ। সামন্ত মশাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন—একটা চিরকুট দিয়ে।
চিরকুট!

হ্যাঁ, এই যে দেখুন না—এখনও আছে আমার কাছে।

বলতে বলতে পকেটে হাত চালিয়ে ছোট একটুকরো কাগজ বের করল শ্যামলকুমার।
দেখি—কিরীটি চিরকুটটা হাতে নিল।

ছোট একটুকরো প্রোগ্রাম-ছেঁড়া কাগজ—তাতে পেনসিলে লেখা,—শ্যামল, একবার
আমার ঘরে এস।

নীচে কোন নামসই নেই।

এতে তো দেখছি কারুর নামসই নেই। তা এটা যে সমস্তরই পাঠানো, বুবলেন কি
করে?

আজ্জে দলের চাকর ভোলা আমাকে চিরকুটটা দেয়।

ভোলা? কোথায় সে?

ভোলা ভিত্তের মধ্যে সবার আড়ালে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এল।

কালো বেঁটে নাদুস-নদুস চেহারা। পরনে একটা ধূতি ও গায়ে গেঞ্জি। বয়স বছর
ত্রিশেক হবে। চোখের দৃষ্টিতে বেশ যেন একটা সতর্কতা।

তোমার নাম ভোলা? কিরীটি শুধাল।

আজ্জে।

বাবুকে তুমি ঐ চিরকুটটা দিয়েছিলে?

আজ্জে।

সামন্ত মশাই তোমাকে দিতে দিয়েছিলেন?

আজ্জে নিজের হাতে দেননি—

তবে! চিরকুটটা তুমি কোথায় পেলে?

রাধারাণী দিদিমণি চিরকুটটা আমায় দিয়েছিলেন।

তিনি কে?

এবার একটি বছর ত্রিশ বয়সের রমণী এগিয়ে এল।

আমার নাম রাধারাণী।

আপনি দিয়েছিলেন ওকে চিরকুটটা? কিরীটি প্রশ্ন করল,

হ্যাঁ।

আপনাকে সামন্ত মশাই দিয়েছিলেন?

না। বিতীয় অক্ষের শেষের দিকে আমি যখন আসর থেকে সাজঘরের দিকে যাচ্ছি,

কে যেন আমাকে চিরকুট্টা দিয়ে বললে, এটা ভোলাকে দিয়ে বলবেন—শ্যামলবাবুকে দিয়ে যেন বলে সামন্ত মশাই তাঁকে এ ঘরে ডেকেছেন।

কে সে?

প্যাসেজে ভাল আলো ছিল না আর আমারও তাড়াতাড়ি ছিল, ভাল করে চেয়ে দেখিনি, নজরও দিইনি।

তার গলাশ চেনেননি?

ন্য ঠিক তাড়াতাড়িতে—

তু তারপর?

ভোলা আমাদের সাজঘরের বাইরেই ছিল—তাকে চিরকুট্টা দিয়ে বলি শ্যামলবাবুকে দিয়ে আসতে, সামন্ত মশাই দিয়েছেন। শ্যামলবাবুর সাজঘরটা আমাদের পাশের ঘরেই।

ঐ সময় হঠাৎ দণ্ডয়মান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্য থেকে মধ্যবয়সী কালো গাঁটাগোঢ়া এক ভদ্রলোক, যিনি সুভদ্রা হরণ পালায় সুভদ্রার মামার পার্ট করেছিলেন—তিনি এগিয়ে এসে বেশ যেন একটু রুক্ষ কর্কশ গলাতেই বললেন, কিন্তু মশাই, আপনার পরিচয় জানতে পারি কি? আপনি কে? পুলিসের মত আমাদের এই জেরা করছেন কেন? আপনি কে? আপনি তো বাইরের লোক। পুলিসকে আসতে দিন, তাদের কাজ তারাই করবে।

রাধারমণ পাল তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, দোলগোবিন্দবাবু, উনি সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু।

বন্ধু তো হয়েছে কি?

ঠিক সেই সময় স্থানীয় থানার অফিসার-ইন-চার্জ মনীশ চক্ৰবৰ্তী হস্তদণ্ড হয়ে এসে ঘরে চুকলেন। তাঁর পিছনে পিছনে রমণীমোহন কুণ্ড।

মনীশ চক্ৰবৰ্তীর বয়স চাঞ্চিলের কিছু উৰ্ধে বলেই মনে হয়। রীতিমত পালোয়ানের মত চেহারা। পাকানো একজোড়া গোঁফ। খুঁতনিতে নূর দাঢ়ি। পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম।

কোথায়—কোথায় ডেড় বড়ি?

ঐ যে—বললে কিরীটি।

মনীশ চক্ৰবৰ্তী এগিয়ে গিয়ে ডেড় বড়ির সামনে দাঁড়ালেন। নানা ভঙ্গিতে দেখলেন দুর থেকে, সামনে থেকে, কখনও ঝুঁকে পড়ে, কখনও সামান্য একটু হেলে দাঁড়িয়ে।

কখন মারা গিয়েছে? I mean কখন ব্যাপারটা আপনারা জানতে পেরেছেন?

কথাগুলো বলে পর্যায়ক্রমে মনীশ চক্ৰবৰ্তী ঘরের মধ্যে উপস্থিত দণ্ডয়মান সকলের দিকেই তাকালেন।

সবাই চুপ, কারও মুখে কোন কথা নেই।

কি হল? সবাই আপনারা ডেফ অ্যান্ড ডাষ্ট স্কুলের ছাত্র হয়ে গেলেন মাকি? শুনতে পাচ্ছেন না কথাটা আমার, না জবাৰ দিতে পারছেন না?

তবু কারও মুখে কোন শব্দ নেই। পূৰ্ববৎ সবাই যেন বোৰ—সবাই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে।

ঐভাবে ধৰ্মক দিয়ে কি ওদের কারও মুখে কোন কথা বৈৰ কৰতে পাৰবেন অফিসার? এক এক কৰে আলাদা আলাদা কৰে জিজ্ঞাসা কৰুন। কিরীটি মৃদু গলায় বললে, দেখছেন ত্তে ঘটনার আকস্মিকতায় ওঁৱা সব ঘাৰড়ে গিয়েছেন।

কিরীটীর দিকে তাকালেন মণীশ চক্রবর্তী। বার কয়েক যেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে
কিরীটীকে জরীপ করলেন। তারপর বললেন, আপনি?

বাধারমন পাল বললেন, সামন্ত মশাইয়ের উনি বস্তু।

বস্তু?

আজ্ঞে।

তা উনিষ্ঠ কি যাত্রাদলের! কিরীটীর বেশভূষা লক্ষ্য করেই মণীশ চক্রবর্তী কথাটা
বললেন।

মচ—উনি এসেছিলেন ওর বস্তুর সঙ্গে দেখা করতে। তারপর পালা শুনছিলেন।

অফিসার, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল। এই সময় কিরীটী বললে।

কি কথা?

আগে সকলকে ঘর থেকে একটু বেরতে বলুন, তারপর বলছি।

মণীশ চক্রবর্তী ভুঁকুঁচকে যেন কি ভাবলেন মুহূর্তকাল, তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে
বললেন, আপনারা একটু বাইরে যান।

সকলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ঘরে থেকে বের হয়ে গেল সবাই। ঘর খালি হয়ে গেল।

কি বলছিলেন বলুন?

কিছু বলবার আগে বলতে চাই, আজকের ব্যাপারটার একটা উপক্রমণিকা আছে মিঃ
চক্রবর্তী।

উপক্রমণিকা! সে আবার কি?

কিরীটী তখন তাঁর কাছে হরিদাস সামন্তর যাওয়া থেকে আজকের সমন্ত ঘটনা
সংক্ষেপে বলে গেল, তারপর বললে, মানুষগুলোকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য ও বোঝবার
জন্যই আমি আজ এখানে এসেছিলাম। একবারও ভাবতে পারিনি সত্যিই এমন একটা
দুর্ঘটনা ঘটবে।

কিন্তু এখনও আপনার আসল পরিচয়টা তো পেলাম না?

কিরীটী মৃদু গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করল।

মণীশ চক্রবর্তী যেন আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীকে জরীপ করলেন।

তারপর বললেন, ও, আপনিই সেই বেসরকারী গোয়েন্দা—কিরীটী রায়! হ্যাঁ, নামটা
আপনার শুনেছি দু-একবার।

আজ্ঞে তবে গোয়েন্দা ঠিক নয়—

তবে?

রহস্যের সন্ধান করে আমি বিশেষ আনন্দ পাই। বলতে পারেন ওটা আমার একটা
নেশা।

নেশাটা দেখছি বড় জবরি নেশা। তা আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন?

মনীশ চক্রবর্তীর কথা বলার ভঙ্গি ও কথাগুলোর মধ্যে স্পষ্টতই যেমন একটা তাছিল্যের
ভাব প্রকাশ পায়।

কিরীটী সেটা বুঝতে পেরেই মৃদু হেসে বলে, অমি আবার কি বলব মিঃ চক্রবর্তী?

আপনিই যখন এসে পড়েছেন—আপনার কি আর কিছু জানতে বা বুঝতে বাকি থাকবে?

কিরীটীর তোবামোদে মণীশ চক্রবর্তী একটু যেমন প্রসম হলেন।

নেহাত লোকটা অর্ধাচিন নয় বোধ হয়, মনে হয় তাঁর।

তবু আপনি তো প্রথম থেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন, তা সত্যিই কি আপনার ব্যাপারটা একটা মার্ডার বলেই মনে হয়? সত্যিই লোকটাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কিরীটীবাবু?

এত তাড়াতাড়িকি কিছু বলা যায়? আপনিই বলুন না মিঃ চক্ৰবৰ্তী, আপনার তো এই লাইনে প্রচৰ অভিজ্ঞতা আছে!

তা ঠিক তবে জবানবন্দি না নিয়ে কিছু বলতে পারছি না; তবে এটা ঠিক—ওঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করাই হয়েছে। আর ঐ শ্যামলকুমার আর—

তারপরই একটু থেমে বললেন, কি নাম যেন মেয়েটির বললেন?

সুভদ্রা।

হ্যাঁ, সুভদ্রা—ওৱা দুজনেই এর মধ্যে আছে। বুবালেন মিঃ রায়, আপনার সব কথা শোনবার পর মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্তৰীয়ক-ঘটিত দৰ্যা। আর সেই দৰ্যা থেকেই হত্যা।

অসম্ভব নয় কিছু।

॥ ছয় ॥

তাহলে এবার ওদের সকলের জবানবন্দি নেওয়া যাক, কি বলেন মিঃ রায়? কথাটা বলে মণীশ চক্ৰবৰ্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন।

নিন না। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তো—

কি, বলুন?

এই ঘরে আমি—

থাকবেন জবানবন্দি নেওয়ার সময়?

হ্যাঁ।

থাকুন, থাকুন। আপন্তির কি আছে এতে?

ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে কত কিছুর শিখবার আছে। কেমন করে আপনারা জবানবন্দি নেন, তার process—

শিখতে চান? বেশ, বেশ। কিউরিয়েসিটি থাকা ভাল—ওতে জ্ঞানবৰ্দ্ধি পায়।

কিরীটীর বোধ হয় লোকটার পাকামি সহ্য হচ্ছিল না, তাই বললে, হ্যাঁ, আপনাদের বৰ্তমান আই.জি. মিঃ মল্লিক তাই বলেন।

মিঃ মল্লিক! তাঁকে আপনি চেনেন নাকি? সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ডয়মিনিং শৰ্কা প্রকাশ পায় মণীশ চক্ৰবৰ্তীর কষ্টস্বরে।

সুকান্ত মল্লিক আমার বিশেষ বন্ধু।

আ—আপনার বন্ধু আমাদের বড়সাহেব, তা এ কথাটা এজেণ্টবলেননি কেন?

আপনার কাছে কি সেকথা বলতে পারি?

পারবেন না কেন? হাজারবার পারেন। তা আপনি দাঙড়িয়ে কেন—বসুন। মণীশ চক্ৰবৰ্তীর কষ্টস্বর ও চেহারা যেন সম্পূর্ণ পাটে যায় মুছতেই, ভদ্ৰলোক যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

কুণ্ঠ মশাই, ও কুণ্ঠ মশাই! টেচিয়ে ওঠেন মণীশ চক্ৰবৰ্তী।

গৃহকর্তা রমণীমোহন কুঞ্চি হস্তদণ্ড হয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, কিছু দলিলছিলেন
সাবার ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওঁর বসবাৰ জন্য একটা চেয়ার এনে দিন।
এখুনি এনে দিচ্ছি আৱার।

হ্যাঁ, তাৰপৰ পাল মশাইকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিন।

রমণীমোহন কুঞ্চি যেমন হস্তদণ্ড হয়ে এসেছিলেন, তেমনি আবার হস্তদণ্ড হয়ে বেৱ
হয়ে দৈনন্দিন ঘৰ থেকে।

আমি চক্ৰবৰ্তী ?

বলুন।

আমি যদি আপনাৰ জবানবন্দি নেওয়াৰ ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা প্ৰশ্ন কৰি?

একশোবাৰ কৰবেন। হাজাৰবাৰ কৰবেন।

কিৱাটী মনে মনে হাসল, চাকৱিৱ কি মহিমা ! আই.জি.সুকান্ত মল্লিকেৱ সঙ্গে আলাপ
আছে শুনেই মণীশ চক্ৰবৰ্তী একেবাৱে যেন বিনয়াবন্ত, বশংবদ।

আৱও মিনিট দশেক পৱে।

প্ৰথম জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছিল দলেৱ অধিকাৰী রাধারমণ পালেন। মণীশ চক্ৰবৰ্তী
প্ৰশান্তি কৰিবাৰ পৱ কিৱাটী মুখ খুলল।

পাল মশাই, শুনেছি হৱিদাস সামন্ত একদিন আপনাৰ পার্টনাৰ ছিলেন, তাই না ?
হ্যাঁ।

তা পার্টনাৰশিপ ছেড়ে দিলেন কেন ?

আপনি তো তাৰ বন্ধুজন ছিলেন, জানেন না তাৰ চিৰিত্ৰেৰ কথা ?

দীঘদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না—

ওৱ দৃঢ়ি বিশেষ ব্যাধি ছিল।

ব্যাধি ?

হ্যাঁ। একটি মদ্যপান, আৱ—

আৱ ?

স্ত্ৰীলোক সম্পর্কে ওৱ একটা বিকী দুৰ্বলতা, তাই তো—

কি ?

একেৱ নম্বৰেৱ যাকে বলে লম্পট। ঐ দৃঢ়ি রোগই ওৱ সৰ্বনাশ কৰেছিল। অচেৎ
অভিনয়-প্ৰতিভা যেমন ছিল লোকটাৰ তেমনি অন্য দিক দিয়ে সংও ছিল। কিন্তু এ যে
মদ্যপান ও স্ত্ৰীলোক-ব্যাধি, সৰ্বগুণ হৱে নিয়েছিল। নইলে মনে কৰুন কিমা, সুভদ্রা
মেয়েটা তো ওৱ মেয়েৱ বয়সী, না কি—

বাধা দিল কিৱাটী, থাক ওকথা। আচ্ছা সবাৱ আগে আপনাই তাৰিখে সামন্ত মশাইকে
মৃত আবিষ্কাৰ কৰেন ?

আজ্ঞে।

এ থৰে কি কৰতে এসেছিলেন, উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

না।

তবে ?

কিছু টাকা চেয়েছিলেন, সেই টাকা দিতে এসেই তো—

আপনি ঘরে ঢুকে দেখলেন, ঐভাবে বসে আছেন?

হ্যাঁ, প্রথমটা তো বুঝতেই পারিনি, তারপর—

পাল মশাই?

আজ্জে?

নাটকের মৃত্যুদৃশ্যে ছিল ভৃত্য গিয়ে আসরে খবর দেবে কর্তব্যাবুর মৃত্যু হয়েছে, তাই
না?

হ্যাঁ

ভৃত্য কে সেজেছিল?

ভৃত্য যে সাজত সে অনুপস্থিত আজ। তাই দোলগোবিন্দবাবুকে বলেছিলাম। দ্বিতীয়
অঙ্কের পর তার তো পার্ট ছিল না, তাই বলেছিলাম সেই যেন ভৃত্যের মেকআপ নিয়ে
আসরে গিয়ে কথাগুলো বলে আসে।

পাল মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, কিন্তু তিনি তো যাননি।

যাননি! সে কি! দোলগোবিন্দবাবু যাননি?

না। ফলে যা হবার তাই হয়েছিল। নাটকটি শেষ হতে পারেনি। কিরীটী অতঃপর
দৃশ্যের শেষ ব্যাপারটা খুলে বললে।

দাঁড়ান তো, দোলগোবিন্দবাবুকে ডাকি।

ব্যস্ত হবেন না পাল মশাই, পরেও কথাটা জিজ্ঞাসা করলে চলবে।

কেন গেল না—

এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো?

কি প্রশ্ন?

মণীশ চক্রবর্তী খিচিয়ে ওঠেন, যা জানতে চান উনি তার জবাব দিন।

আজ্জে?

পাল মশাই? কিরীটী ডাকল, এই ব্যাপারে আপনার দলের কাউকে কি সন্দেহ হয়?

সন্দেহ? সন্দেহ কাকে করব? না না, আমার দলের মধ্যে কেউ এমন কাজ করতে
পারেই না। তাছাড়া সামন্ত মশাইকে দলের সকলেই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত, ভক্তি করত।

মণীশ চক্রবর্তী ঐ সময় প্রশ্ন করলেন, শ্যামলকুমার?

শ্যামলকুমার!

হ্যাঁ, তার সঙ্গে তো শুনলাম সুভদ্রা বলে আপনার দলের মেয়েটিকে নিয়ে সামন্তের
সঙ্গে রীতিমত একটা রেষারেষি চলছিল ইদানীং।

না না, রেষারেষি আবার কি! সামন্ত মশাইয়ের অবিশ্যি মনে তাই হয়েছিল। কিন্তু
আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, সুভদ্রা সেরকম মেয়ে নয়, ওটা সামন্ত মশাইয়ের মনের
ভুল। তাছাড়া শ্যামল ছেসেটি যেমন ভদ্র তেমনি ধীরস্থির, এসব শুন্ধারাপির মধ্যে সে
ধাকতেই পারে না।

ঠিক আছে। মণীশ চক্রবর্তী বললেন।

কিন্তু পাল মশাই, আমাদের ধারণা, কিরীটী বললে, আপনাদের দলেরই কেউ সামন্ত
মশাইকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে।

এ আপনি কি বলছেন? না না, হয়তো—

কি ?

সামন্ত মশাই আঘাত্যা করেছেন !

আঘাত্যা !

কেন, পারেন না ?

তা পারেন—তবে শোধ হয় তা করেননি। ঠিক আছে, আপনি দয়া করে শ্যামলকুমারকে এখন একবার পাঠিয়ে দিন।

রাধারমণ পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। একটু পরে শ্যামলকুমার এসে ঘরে ঢুকল।

মগিন চক্রবর্তীই প্রথমে তাকে নানাবিধ প্রশ্ন শুরু করলেন, একটার পর একটা। অবশ্যে কিরিটীর দিকে তাকিয়ে একসময় বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করবেন নাকি কিছু? জিজ্ঞাসা করবার আর কিছু আছে?

কিরিটী তাকাল শ্যামলকুমারের দিকে।

শ্যামলকুমার যেন কেমন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

হাতের আঙুলগুলো নিয়ে কেবলই নাড়াচাড়া করছে।

শ্যামলবাবু!

আজে ?

সুজিতবাবু বলছিলেন তখন—

কি—কি বলছিলেন সুজিতবাবু ?

আজকের তৃতীয় অক্ষের শুরু হবার পর একবার আপনি এই ঘরে এসেছিলেন।

হ্যাঁ, এসেছিলাম। সামন্তদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সে কথা তো তখনি আপনাকে বললাম।

হ্যাঁ বলেছেন, তা কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা বলেননি।

সামন্তদার মনে ইদানীং একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল—

জানি। আপনার ইদানীং সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার জন্য। তিনি আদপেই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছিলেন না, তাই না ?

হ্যাঁ।

আপনি—আপনি কি করে জানলেন? শ্যামলকুমার প্রশ্ন করে।

জানি। তারপর একটু থেমে—এবার বলুন শ্যামলবাবু, সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে সত্যিই কি আপনার—

হ্যাঁ, আমি তাকে ভালোবাসি।

আর সুভদ্রা দেবী ?

সেও আমাকে ভালবাসে।

ই। তা কি কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে।

ঘরে এসে ঢুকতেই আজ উনি আমাকে বললেন, শেষবারের মত তোমাকে বলছি শ্যামল, আমাদের ডিতর থেকে তুমি সরে দাঁড়াও, নচেৎ এমন শিখা তোমাকে পেতে হবে যে জীবন দিয়ে তোমাকে তা শোধ করতে হবে।

আপনি কি জবাব দিলেন ?

আমি বলেছিলাম, এই জন্যই যদি ডেকেছেন জানলে আসতাম না—যা বলবার আপনি সুভদ্রাকে বলবেন। সে যদি আমাকে না চায় তো আমি নিশ্চয়ই সরে দাঁড়াব।

আর কোন কথা হয়নি?

না।

তারপর আর এ যে আপনি আসেননি?

না।

আচ্ছা, এ বাপারে আপনার দলের কাউকে সন্দেহ হয়?

না।

আবারও সঙ্গে দলের মধ্যে হরিদাসবাবুর কোন মনোমালিন্য বা বাগড়াবাঁটি কথনও হয়েছে বলে জানেন?

সুজিতের সঙ্গে তো ওঁর খিটিমিটি লেগেই ছিল।

তাই নাকি? কেন?

তা জানি না, তবে—

তবে?

এককালে শুনেছি ওর অবস্থা নাকি খুব ভাল ছিল, রেস খেলে ও মদাপান করে সব খুইয়েছে সুজিতবাবু! তাছাড়া—

তাছাড়া?

শুনেছি সুভদ্রাকে ওই দলে এনেছিল। একসময় সুভদ্রার সঙ্গে ওর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সামন্তদা আসার পর থেকেই সামন্তদার সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল সুভদ্রা।

আচ্ছা, সুভদ্রাকে আপনার কি রকম মনে হয়?

খুব ভাল মেয়ে।

আজ পালা শেষ হবার পর রাত্রে সুভদ্রা বলছিল বর্ধমান যাবে। আপনি জানেন সেকথা?

হ্যাঁ, আমাকে ও বলেছিল।

আপনারও সঙ্গে যাবার কথা ছিল কি?

আৰু।

কেন যাবে বলেছিল সুভদ্রা বর্ধমানে, জানেন কি?

তার এক মাসী বর্ধমানে নাকি থাকে, তার অসুখ, তাকেই বলেছিল দেখতে যাবে বর্ধমানে।

আপনাকে সঙ্গে যেতে বলেনি?

বলেছিল, কিন্তু আমি বলেছিলাম যাব না।

ঠিক আছে, আপনি যান, সুজিতবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন।

শ্যামলকুমার চলে গেল।

মণীশ চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন, ছেলেটাকে কি রকম মনে হল কিরীটীবাবু?

আপনার কি মনে হল?

গভীর জলের মাছ। তা বাছাধন জানেন না যে আমারও এ লাইনে দীঘদিনের অভিজ্ঞতা। তাছাড়া ও সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। এ আপনাকে আমি বলে রাখছি, এ—এ হচ্ছে—

মণীশ চক্রবর্তীর কথা শেষ হল না। সুজিতকুমার এসে ঘরে ঢুকল।

সুজিতকে প্রথমে মণীশ চক্রবর্তী প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

কিরীটী তখন ঘরের চাবিদিকে আবার তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঘরটা ভাল করে দেখা হয়নি। হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ল, দরজার গোড়ায় একটা সিগারেটের পোড়া টুকরো। কিরীটী শিষ্টে নীচু হয়ে সিগারেটের টুকরোটা তুলে নিতে গিয়ে নজরে পড়ল যে চেয়ারের উপরে ইরিদাস সামন্তর মৃতদেহটা উপবিষ্ট, তার নীচে কি একটা পড়ে আছে, চকচক করছে।

মণীশ চৰজ্ঞবৰ্তী তখন সুজিতকে নিয়ে ব্যস্ত, সেদিকে নজর দেবার মত অবকাশ ও মন কোনটাই ছিল না। সে তাকালও না কিরীটীর দিকে।

কিরীটী নীচু হয়ে চকচকে বস্তুটি তুলে নিয়ে দেখল একটা শৌখিন গালার চুড়ির ডগ্রাম্প, আয়না কাঁচের চুম্বিক বসানো। সেই আয়না কাঁচের উপরেই আলো পড়ে ঝিলিক দিচ্ছিল।

সিগারেটের শেষাংশটাও পরীক্ষা করল।

চারমিনার সিগারেট—এবং সেই সিগারেটটা যে খাচ্ছিল সে নিশ্চয়ই পান খেয়েছিল, কারণ শেষাংশে পানের ছোপ শুকিয়ে আছে।

দুটো বস্তুই কিরীটী পকেটে রেখে দিল সত্ত্বে।

মিঃ রায়—

মণীশ চৰজ্ঞবৰ্তীর ডাকে কিরীটী ওর দিকে তাকাল।

ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন নাকি?

দু-একটা প্রশ্ন করব। সুজিতবাবু, আপনি বলেছিলেন তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার পর আপনি একবার শ্যামলকুমারকে এ ঘরে আসতে দেখেছিলেন!

হ্যাঁ।

তখন রাত কটা হবে বলে আপনার মনে হয়?

কত আর হবে, রাত সোয়া দশটা কি সাড়ে দশটা।

শ্যামলবাবু এ ঘরে কতক্ষণ ছিলেন জানেন?

তা মিনিট পনের-কুড়ি হাত পারে।

বুঝলেন কি করে? আপনি বুঝি ততক্ষণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন?

তা কেন! আমি—আমি চলে গিয়েছিলাম।

তাহলে জানলেন কি করে শ্যামলবাবু এ ঘরে মিনিট পনের-কুড়ি ছিলেন?

মানে মিনিট পনের-কুড়ি বাদে এদিকে আসছিলাম, তখন তাকে বেরতে দেখেছিলাম এই ঘর থকে।

হ্যাঁ। তাদের পরস্পরের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল বলতে পারেন?

তা কেমন করে বলব! আমি তো আর ঘরে যাইনি।

তা ঠিক। তবে অনুমান তো করতে পারেন?

অনুমান!

হ্যাঁ, অনুমান।

না।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—

কি?

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও তো তাদের দু-একটা কথা আপনার কানে আসতে পারে?

না মশাই, তাছাড়া কেপ্পাও আড়ি পাতা আমার অভ্যাস নেই।

হঠাৎ কিরীটি বলে, আপনি খুব পান খান সুজিতবাবু মনে হচ্ছে?

সুজিত একমুখ পান নিয়ে চিবোছিল। দোকানিস্কন্দ লালচে এবড়োথেবড়ো দু'পাটি দাঁত বার করে সুজিত বললে, হ্যাঁ, সর্বক্ষণ পান-দোক্তা না হলে আমার চলে না।

আর কোন কিছুর প্রতি আসতি নেই আপনার সুজিতবাবু?

আসুন্তো অনেক কিছুর উপরেই ছিল, কিন্তু একে একে সবই ছেড়েছি।
তাই মাকি!

হ্যাঁ, বড় বদ অভ্যাস। আর বদ অভ্যাসের উপর একবার আসতি জমলে তা সে যেননই হোক না কেন ছাড়তে বড় কষ্ট হয়।

তা তো হবারই কথা। তা ড্রিফ্ট-ট্রিফ্ট করেন না?

একসময় করতাম, এখন পেলে করি, না পেলে করি না, বুবলেন না—মানে ঐ আর কি, পরের পয়সায়—বলতে বলতে সুজিত পানের রসে রাঙানো লালচে দাঁতগুলো বের করে হাসল।

কিরীটির যেন সে হাসি দেখে গা বিনামিন করে।

আর সিগারেট? ধূমপান?

পানের সঙ্গে ওটা ঠিক ভাসে না, বুবলেন না!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তবে মিথ্যে বলব না, খাই। মানে ধূমপানে অভ্যন্ত আমি।

কি ব্র্যান্ড থান?

যা পাই।

আপনার পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আছে?

হ্যাঁ। সুজিত পকেটে হাত চালিয়ে একটা দোহড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করল।
অর্ধেক খালি বাক্সটার।

কিরীটি সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে ফিরিয়ে দিল।

সুজিতবাবু, আচ্ছা হরিদাস সামন্ত পান খেতেন?

সুজিত লালচে দাঁতগুলো বের করে বললে, হ্যাঁ। তবে পাতা পান নয়, বোতল পান
করতেন, মাত্রাধিক্যেই।

আর সিগারেট?

হ্যাঁ, তাও খেতেন।

কি ব্র্যান্ড খেতেন বলতে পারেন?

চারমিনার।

আচ্ছা সুজিতবাবু?

আজ্ঞে!

শ্যামলকুমার লোকটি কেমন!

ছুঁচো।

কি রকম?

ছুঁচো যেমন সর্বদা ছৌকছৌক করে, তারও অভ্যাসটি তেমনি।

কি রকম? কিসের জন্য ছৌকছৌক করতেন?

boimdoi.net

বুঝলেন না?

না।

স্ত্রীলোক—বুঝলেন, স্ত্রীলোক!

ইঁ। তা এ দলে কেমনি মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল নাকি?

কেন—হরিদাস সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু আপনি, শোনেননি তার কাছে কিছু?

না।

তাৰ স্ত্রীলোকটিৰ উপরেই যে নজর ছিল শ্যামলকুমারের!

তাৰ নাকি? একটু থেমে কিৱাটী আবার প্ৰশ্ন কৰে, আছা সুজিতবাবু, হরিদাস সামন্তৰ
মেয়ে শ্যামলকুমারের কি রকম সন্তোষ ছিল বলুন তো?

সাপে-নেউলেৰ সম্পর্ক যেমন তেমনি ধৰনেৰ সন্তোষ ছিল বলতে পাৱেন।

কেন বলুন তো?

ঐ যে একটু আগেই বললাম—বুঝলেন না!

মানে?

মানে সামন্ত মশাইয়ের মেয়েমানুষ ছিল সুভদ্রা, শ্যামলকুমার এসে সেই
মেয়েমানুষটিকে হাতিয়ে নিয়েছিল। তাৰ ফলে যা হবাৰ তাই হয়েছিল।

ইঁ। আছা আৱ একটা কথা—

কি, বলুন?

আগে তো, মানে শ্যামলকুমার আসাৰ আগে এ দলে বোধ হয় হিৱোৱাৰ পার্ট আপনিই
কৰতেন, তাই না?

কৰতাম, আৱ এখনও কৰতে পাৱি। শুধু তো মাকাল ফলেৰ মত চেহাৱাই হলে হয়
না মশাই, অভিনয়-বস্তু হচ্ছে একটা আৰ্ট, বুঝলেন, গড়গড় কৰে তোতাপাখীৰ মত
খানিকটা শেখানো বুলি আওড়ে গেলেই সেটা অভিনয়—acting হয় না। শ্যামল
অভিনয়েৰ কি বোৰে? কিন্তু পাল মশাইয়েৰ কি সে খেয়াল আছে?

আপনাৰ অভিনয় কিন্তু আজ আমাৰ সত্ত্ব চমৎকাৰ লেগেছে।

লেগেছে তো? লাগতেই হবে। আপনাদেৱ মত অভিনয়াৰসিক বলেই বুঝেছেন?

আছা, হরিদাস সামন্ত কেমন অভিনয় কৰতেন?

এককালে ভাল অভিনয়ই কৰত। কিন্তু ঐ যে মহা দৃষ্টি ব্যাধি—মদ আৱ স্ত্রীলোক,
ওতেই ওৱা সৰ্বনাশ হল।

আপনি বলতে চান তাহলে মেয়েমানুষেৰ জন্যই ওৱা প্ৰাণটা গেল?

নিৰ্ধাত।

মেয়েমানুষটি তাহলে আপনাৰ মনে হয়—

আজ্ঞে হঁা, আমাদেৱ সুভদ্রা দেবী। সাক্ষাৎ কালনাগীনী, বুঝলেন—যিমকেন্দু।

॥ সাত ॥

বিষকন্যা কেন বলছেন?

যে কন্যাৰ সংস্পৰ্শই বিষ, সে-ই তো প্ৰাণঘাতিনী বিষকন্যা।

তা বটে। তাৰপৰ একটু থেমে কিৱাটী বললে, সুজিতবাবু, এবাৰ সত্ত্ব কৰে বলুন
তো, আজ অভিনয় শুন দুবাৰ পৰ একবাৰও কি এ ঘৰে আপনি আসেননি!

না।

ঠিক বলছেন?

নিশ্চয়ই।

মনে করে আবুর ভাল করে ভেবে বলুন?

ভাবাভাবির বা মনে করবার কি আছে? আসিনি।

কিন্তু আমি যদি বলি—

না।

আজ অভিনয় শুরুর পরে এ ঘরে আপনি এসেছিলেন!

না।

সুজিতবাবু, আমার হাতে প্রমাণ আছে যে আপনি এ ঘরে এসেছিলেন।

প্রমাণ? এ কি বলছেন মশাই?

কিরীটির মনে হল গলাটা যেন কেমন বসে গেছে হঠাৎ সুজিতকুমারের।

গলার স্বরটা যেন ঠিক স্পষ্ট নয়।

কিরীটি বুরাতে পারে তার নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

অঙ্গীকার করে কোন লাভ নেই। বলুন, কেন এসেছিলেন?

আমি আসিনি।

আপনার জামার পকেটে ওটা কি উঁচু হয়ে আছে? দেখি বের করুন তো?

ওটা একটা হাফ পাইন্ট বোতল।

বোতলটা বের করুন।

সুজিত পকেট থেকে একটা কালো চ্যাপ্টা মত হাফ পাইন্ট বিলিতি মদের বোতল
বের করল।

কি আছে ওতে?

হইসকি।

দেশী না বিলিতি?

দেশী।

বোতলটা তো দেখছি অর্ধেকের বেশী খালি। এটা কি পরম্পরাগতি নাকি?

মানে?

কেউ কি দিয়েছে?

হ্যাঁ।

কে দিল?

পাল মশাই। তারপরই একটু থেমে বলল, অভিনয়ের রাত্রে বিশেষ করে অভিনয়ের
সময় মধ্যে মধ্যে না পান করলে আমি অভিনয় করতে পারি না। তাই পালমশাই

অভিনয়ের রাত্রে একটা পাইন্ট বোতল আমাকে দিয়ে থাকেন।

কিরীটী ক্ষণকাল অতঃপর সুজিতকুমারের দিকে চেয়ে ঝুঁকে।

আমি এবারে যেতে পারি?

হ্যাঁ। কিন্তু বোতলটা আমার চাই দিন।

বোতলটা।

হ্যাঁ, দিম।

নিন।

সুজিত বোতলটা কিরীটির হাতে তুলে দিল। কিরীটি বোতলটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখল, তারপর শেষ সামনের টেবিলের উপর রেখে দিল।

আচ্ছা, এবাবে আপনি যেতে পারেন।

সুজিতকুমার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মণীশ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি সত্যই আজ রাত্রে একবার এ ঘরে এসেছিল বলে আপনার মনে হয় মিঃ রায়?

মনে হয় নয়, এসেছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার কেমন যেন খট্কা লাগছে।

কি বলুন তো?

কিছু না। সুভদ্রা দেবীকে এবাবে ডাকান তো!

এখুনি ডাকছি।

মণীশ চক্রবর্তী ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে সুভদ্রাকে ঐ ঘরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বললেন।

একটু পরে সুভদ্রা এল। কেঁদে কেঁদে তার দু'চোখের পাতা ফুলে উঠেছে।

চোখের পাতায় তখনও জল বোঝা যায়।

সুভদ্রা ইতিমধ্যেই তার অভিনয়ের সাজপোশাক ছেড়ে ফেলেছে।

পরণে সাধারণ একটি লাল রংয়ের চওড়াপাড় তাঁতের শাঢ়ি।

কিরীটি লক্ষ্য করল মুখের প্রসাধনও তুলে ফেলেছে সুভদ্রা ইতিমধ্যেই।

মণীশ চক্রবর্তী প্রথমে তার প্রচলিত ভঙ্গীতে প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনিই সুভদ্রা দেবী?

জলে ভরা চোখ দুটি তুলে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সুভদ্রা সম্মতি জানাল।

অনেক দিন এ দলে আছেন?

হ্যাঁ।

সুজিতবাবু বলছিলেন আপনাকে তৃতীয় অক্ষের মাঝামাঝি সময়ে একবার নাকি এ ঘরে আসতে দেখেছিলেন।

সুজিতবাবু ঠিকই দেখেছিলেন। এসেছিলাম।

কেন?

সামন্ত মশাই আমাকে ডেকেছিলেন।

কিরীটি নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুভদ্রার সারা দেহ।

মণীশ চক্রবর্তী আবার প্রশ্ন করেন, কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

বলেছিলাম বর্ধমানে যাৰ, তাই বারণ করলেন যেন না যাই।

বর্ধমানে কেন যেতে চেয়েছিলেন?

মাসীৰ খুব অসুখ।

তারপর কতক্ষণ ছিলেন?

মিনিট দশক।

ঐ সময় কিরীটির দিকে তাকিয়ে মণীশ চক্রবর্তী বললেন, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ওকে?

কিরীটী সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বললে, সুভদ্রা দেবী, শুনলাম সুজিতবাবুই আপনাকে
একদিন এই যাত্রাদলে এনেছিলেন?

হ্যাঁ।

সুজিতবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

আমি এই যাত্রার দলে আসার আগে মধ্যে যামেচার ফ্লাবে প্লে করতাম।
সুজিতবাবু একবার আমার প্লে দেখে আলাপ করেন। তারপর আমি যাত্রার দলে যোগ
দিতে চাই কিন্তু জিঞ্জাসা করলে আমি বলি, হ্যাঁ। তখন উনি নিয়ে আসেন আমাকে। সেই
থেকেই আমাদের পরিচয়।

তার আগে পরিচয় ছিল না? ওঁকে জানতেনও না?
না।

আপনার মা-বাবা ভাই বৈন নেই?

না। ছেটবেলায় মা-বাবা মারা যায়, তারপর মাসীর কাছেই আমি মানুষ।

বর্ধমান থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতেন?

তা কেন!

তবে?

আমি পনের বছর বয়সেই কলকাতায় চলে আসি আমার স্বামীর সঙ্গে।

আপনার বিয়ে হয়েছিল?

হয়েছিল।

স্বামী এখন কোথায়?

কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

কতদিন আগে?

বছর দশক আগে, বুবাতেই পারছেন। তারপর লেখাপড়া শিখিনি, বাঁচতে তো হবে,
কাজেই এখনে-ওখনে অভিনয় শুরু করলাম।

ইদানীং হরিদাস সামন্তর সঙ্গেই বোধ হয় ঘর করছিলেন?

সুভদ্রা মাথা নীচু করল।

সুভদ্রা দেবী!

বলুন?

আপনি যখন তৃতীয় অক্ষের মাঝামাঝি সময় এ ঘরে আসেন, সামন্ত মশাই তখন কি
করছিলেন মনে আছে আপনার?

চুপচাপ বসেছিলেন।

তিনি মদ্যপান করছিলেন, না?

ঠিক মনে নেই। বোধ হয় করছিলেন।

তাহলে ঘরে বোতল একটা নিশ্চয়ই থাকত, বোধ হয় তিনি মদ্যপান করছিলেন না!
মনে করে বলুন তো?

কি বললেন?

বলছি তিনি তখন মদ্যপান করছিলেন না বোধ হয়।

তা হবে। আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি।

কেমন প্রাপ্ত ঘরে ছিল?

গ্লাস!

হ্যাঁ, এই কাঁচের গ্লাসটা কিরীটী অন্দরে টুলের উপর রক্ষিত শূন্য কাঁচের গ্লাসটা দেখাল।

দেখিনি।

হ্যাঁ। আচ্ছা, ইদনোঁ আপনার সঙ্গে তাঁর মন-কথাকথি চলছিল, তাঁই না?

অতঙ্গ সন্দেহ বাতিক ছিল লোকটির—

স্বাভাবিক। নিম্নকষ্টে কিরীটী কথাটা উচ্চারণ করল।

কিছু বললেন?

না। আচ্ছা, কে আপনাদের মধ্যে সামন্ত মশাইকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বিষ!

হ্যাঁ, তীব্র কোন বিষপ্রয়োগেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে।

না না, ওঁর হাতের ব্যামো ছিল, গ্লাড-প্রেসারও ছিল।

তা হয়তো ছিল, তবে তাঁর মৃত্যু বিষের ক্রিয়াতেই হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

কিন্তু কে তাঁকে বিষ দেবে? কেউ তো তাঁর শক্তি এখানে ছিল না?

কার মনে কি আছে আপনি জানবেন কি করে? তারপরই হঠাতে কিরীটী বললে, আপনার ডান হাতের কবজির কাছে রক্তের দাগ কিসের দেখি। দেখি হাতটা আপনার?

রক্তের দাগ—কই! না তো, ও কিছু না। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সন্ধ্যার সময় সাজঘরের ঢিনের পাটিশনের একটা পেরেকে হাতটা কেটে গিয়েছিল কবজির কাছে।

অভিনয়ের সময় দেখেছিলাম, আপনার দু'হাতে কাঁচের আয়নার চুমকি বসানো দুটি চুড়ি। চুড়ি দুটো বুঝি খুলে রেখেছেন?

হ্যাঁ। সাজঘরে বাস্তুর মধ্যে।

নিয়ে আসতে পারেন চুড়ি দুটো?

সুভদ্রা কেমন যেন এবার একটু থতমত খেয়ে যায়। চুপ করে থাকে। কেমন যেন একটু মনে হয় ইতস্তত ভাব একটা।

কই, যান? নিয়ে আসুন চুড়ি দুটো?

সুভদ্রা বেরছিল, কিন্তু কিরীটী তাকে আবার কি ভেবে বাধা দিল, না, আপনি না। মণীশ চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ চক্রবর্তী। বাইরে কাউকে বলুন তো, সুভদ্রা দেবীর সাজঘর থেকে চুড়ি দুটো নিয়ে আসতে।

মণীশ চক্রবর্তী বের হয়ে গেলেন।

ঘরে এবারে একা সুভদ্রা।

সুভদ্রা যেন বেশ একটু বিরতই বোধ করে, অথচ মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও কিরীটীর বুঝতে কিন্তু অস্বিধা হয় না।

কিরীটী সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

সুভদ্রা দেবী।

অ্যা! আমার কিছু বলছিলেন?

সুভদ্রা দেবী, আমার নামটা বোধ হয় আপনি জানেন না—

সামন্ত মশাই যে বঙছিলেন, ধূঢ়িটি রায় আপনার নাম!

নামটা আপনার মনে আছে দেখছি। কিন্তু ওটা তো আমার আসল নাম নয়।
তবে?

ওটা আমার ভূন্য এক্ষেত্র নাম, বিশেষ করে নামের আড়ালে যখন আমি আমাকে
কিছুটা গোপন করতে চাই। বলতে পারেন ছদ্মনাম।

ছদ্মনাম
হ্যাঁ

সুভদ্রা তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—কিরীটী রায় নামটা কখনও শুনেছেন?

কিরীটী রায়! আপনি কি তবে সেই বিখ্যাত রহস্যানুসন্ধানী—একটা ঢেক গিলে
কেমন যেন শুকনো গলায় থেমে থেমে কথাগুলো টেনে টেনে উচ্চারণ করল সুভদ্রা।
হ্যাঁ, আমিই সেই।

তবে আপনি—

না। সামন্ত ঘশাইয়ের বন্ধু আমি কোনদিনও ছিলাম না—তাঁর সঙ্গে পরিচয় মাত্র
আমার কয়েকদিন আগে। এবং আরও বোধ হয় আপনার একটা কথা জানা দরকার,
তিনি মৃত্যু-আশঙ্কা করছিলাম বলেই আমার শরণাপন হয়েছিলেন।

মৃত্যু আশঙ্কা!

হ্যাঁ, তাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁকে হত্যা করা হবে।

কে—কে তাঁকে হত্যা করবে?

হত্যা যে কেউ তাঁকে করেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছেন, এ সামনে তাঁর বিষ-জর্জরিত
মৃতদেহ—আর এও আমি জানি—

কি—কি জানেন?

আপনারা যাঁরা আজ রাত্রে এখানে উপস্থিত হয়েছেন অভিনয়ের ব্যাপারে—সেই
আপনাদের মধ্যেই কেউ একজন তাঁকে হত্যা করেছেন।

কিরীটী শাস্তি ধীর গলায় কথাগুলো বলে গেল।

কে—কে তাঁকে হত্যা করেছে?

আপনিই অনুমান করুন না, কে তাঁকে হত্যা করতে পারে!

এ সময় মণীশ চক্রবর্তী পুনরায় এসে ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একটি গালার চূড়ি।

একটিই পেয়েছেন—জোড়ার অন্যটা পাননি তো? কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

না, একটিই পেলাম।

জানতাম পাবেন না। সুভদ্রা দেবী, জোড়ার অন্য চূড়িটা কোথায় গেল? সুভদ্রার দিকে
ফিরে তাকিয়ে কিরীটী তার কথাটা প্রশ্নের ভিতর দিয়ে শেষ করল।

জা—জানি না, ওখানেই তো খুলে রেখেছিলাম।

না, রাখেননি।

রাখিনি—কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি—অন্যটা ভেঙে গিয়েছে।

ভেঙে গিয়েছে।

হ্যাঁ, তৃতীয় অক্ষ শুরু হবার পরই কোন এক সময় ডেঙে গিয়েছিল। কারণ তৃতীয়
অক্ষের মাঝামাঝি সময়—আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে, হাতে আপনার চূড়ি ছিল। তা
কি করে ভাঙ্গে?

সুভদ্রা চুপ। একেবারে শ্বেত বোবা, বিমৃঢ়।

জবাব দিন—এই ঘরেন মধ্যেই, না? কিন্তু ভাঙল কি করে?

হ্যাঁ, এই ঘর থেকে বেফৰার সময় দরজায় ধাক্কা লেগে চূড়িটা ভেঙে যায়।

আপনি মিথ্যে কথাবলছেন, যেমন একটু আগে বলেছিলেন, পেরেকে হাত কেটেছেন!

কিন্তু—

বলুন সত্ত্ব কথাটা?

মিথ্যে আমি বলিনি।

বলেছেন। এবার বলুন তো—আপনি সন্তানসন্তবা, তাই—

হ্যাঁ। মাথাটা আবার নীচু করল সুভদ্রা।

কার সন্তান আপনার গর্ভে?

সামন্ত মশাইয়ের।

তিনি জানতেন কথাটা?

জানতেন।

আশ্চর্য! অশ্বুট স্বরে কথাটা কিরীটি উচ্চারণ করল।

কি বললেন?

কিছু না। আপনি যেতে পারেন। পাল মশাইকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিন।

সুভদ্রা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত শেষ হয়ে আসছিল। গ্রীষ্মের স্বল্পায়ু রাত্রি। খোলা জানলাপথে একটা ঠাণ্ডা ঝিরঝির হাওয়া আসছিল।

রাধারমণ পাল এসে ঘরে চুকলেন।

ইতিমধ্যেই কিরীটির পরামর্শে মণীশ চক্ৰবৰ্তী একটা চাদরে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়েছিলেন চেয়ার থেকে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যেন পাল মশাইয়ের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমায় ডেকেছেন?

পাল মশাই!

কিরীটির ডাকে রাধারমণ পাল ওর মুখের দিকে তাকালেন।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বলুন?

সুজিতবাবুকে আজ আপনি একটা পাইন্ট বোতল দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

অভিনয়ের রাত্রে আপনি প্রত্যেক বারই দিতেন?

আঞ্জে।

পাল মশাই, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। কিরীটি বললেন।

কি বলুন?

আপাতত যতদিন না সামন্ত মশাইয়ের মৃত্যুরহস্যের একটা মীমাংসায় পুলিশ পৌছাব। ততদিন আপনার দলের কয়েকজন কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। ভালুক কথা, সোলগোবিন্দবাবু আছেন তো, তাকে একবার সন্দি ডেকে দেন, কয়েকটা প্রশ্ন তাঁকে করতে চাই।

না মশাই, তার কোন সন্ধানই পাচ্ছি না।

সন্ধান পাচ্ছেন না? কিরীটি

না।

আপনি জানেন মাত্তিনি কেথায় গিয়েছেন?

না। হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়ার কারণও তো কিছু বুঝতে পারছি না।

কিরীটি এঙ্গু যেন কি ভাবল, তারপর বললে, তিনি তো আনেক দিন আপনার দলে আছেন।

তা ধরুন প্রায় বছর সাতেক তো হবেই। তবে মনে হচ্ছে—
কি?

ক্ষেত্র লিকারের সন্ধানে বোধ হয় গিয়েছে। সারাটা দিনই উসখুস করছিল। কিন্তু আমি যেতে দিইনি। নেশা করলে ওর ছাঁশ থাকে না। পার্ট করতে পারবে না। নচেৎ সে পালাবার লোক নয়। নেশা একটু বেশি করে বটে—লোকটা সাদাসিধে, ঘোরপঁঢ়াচ তেমন কিছু নেই। আপনার দলের সকলেরই বোতল-প্রতি রয়েছে। কিরীটি বললে।
আজ্ঞে।

আর কে কে মদ্যপান করে থাকেন এ দলে?

সবাই করে অজ্ঞবিস্তর।

শ্যামলকুমার?

বলতে পারি না।

আপনি?

না, জীবনে আজ পর্যন্ত মদ স্পর্শ করিনি।

হাঁ। তাহলে ঐ কথাই রইল, ওরা যেন কলকাতার বাইরে না যায়।

কিন্তু আপনি দলের কাদের কথা বলছিলেন যারা পুলিসের বিনা অনুমতিতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।

শ্যামলকুমার, সুজিতকুমার, সুভদ্রা দেবী আর আপনি ও দোলগোবিন্দবাবু।

রাধারমণ পাল যেন কেমন ফ্যালফ্যাল করে বোবা অসহায় দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর কিছুক্ষণ বাদে শুকনো গলায় প্রশ্ন করেন তিনটা দিয়ে ঠোঁট চেঁটে, কেন, আমাদের কি আপনি সন্দেহ করেন?

আপনাদের সকলের উপরই যে পুলিসের সন্দেহ পড়েছে তা নয়—

তবে?

বুবত্তেই পারছেন আপনারা যাঁরা যাঁরা মৃত হরিদাস সামন্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এ হত্যারহস্যের মীমাংসায় একটা পৌছতে হলে আপনাদের প্রত্যেকেরই শান্তির নাম করলাম আমাদের প্রয়োজন।

কিন্তু—ইতস্তত করলেন রাধারমণ পাল।

বলুন, থামলেন কেন?

সত্যিই কি আপনারা মনে করেন হরিদাস সামন্তকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে?

পুলিসের ধারণা আপাতত তাই, তবে ময়নাতদন্তে যদি আন্য কিছু প্রকাশ পায়।

কিন্তু আমরা আমাদের এককালের একজন সহকর্মীকে হত্যা করতে যাবই বা কেন?

সেটা জানতে পারলে তো সব কিছুর মীমাংসা হয়েই যেত পাল মশাই। যাক, যা

বললাম, সেই মত সকলকে বলে দিন। আর পরশু বা তরশু বিকেলের দিকে আপনাদের চিৎপুরের অফিসে যাব, ওহের সকলকে উপস্থিত থাকতে বলবেন।

আর উপস্থিত থাকা দল বোধ হয় আমার ভেঙেই গেল রায় মশাই!

রাধারমণ পালৈর গুলার স্বরটা যেন বুজে আসে।

না না, দল ভাঙবে কেন?

কি রাজেন্দ্র এর পরও দল আর থাকবে—তাছাড়া যা আপনারা বলেছেন তা যদি সত্যিই হয়—উঃ, আমি আর ভাবতে পারছি না রায় মশাই, এ কি সর্বনাশ হল! এখন দেখতে পাইছি সামন্ত মশাইয়ের কথাটা শুনলেই বোধ হয় ভাল হত, বার বার করে আগ্রাকে বলেছিলেন সামন্ত মশাই, এ নাটক করবেন না, অন্য নাটক দেখুন। কিন্তু কি যে মাথায় তখন ভূত চাপল! সামন্ত মশাই নিজে তো গেলেনই, আমাকেও ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন অগাধ জলে।

কুণ্ঠ ভবন থেকে সকলের বিদায় নিতে পরের দিন বেলা দশটা হয়ে গেল।

কিরীটি আগেই চলে গিয়েছিল।

মণিশ চক্রবর্তীও লাস মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য চালান করে দিয়ে একসময় বিদায় নিলেন। রাধারমণ পাল সকলকে নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন দশটায়। বেলা এগারোটায় একটা কলকাতাগামী ট্রেন আছে সেটাই ধরবেন।

গৃহে পৌছতে কৃষ্ণ বললে, একেবারে রাত কাবার করে এলে, ব্যাপার কি? যাত্রা শুনছিলে নাকি? খুব ভাল যাত্রা হয়েছে বুঝি?

যাত্রা আর শেষ হল কোথায়? একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে দিতে দিতে কিরীটি বললে, শেষ হওয়ার আগেই যবনিকাপাত।

কি রকম?

সামন্ত মশাই—সেদিনের সে ভদ্রলোককে মনে আছে? প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন! শেষ পর্যন্ত তাঁর আশঙ্কাটাই সত্য হল।

মানে!

কিরীটি তখন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বিবৃত করে গেল।

সব শুনে কৃষ্ণ বিশ্ময়ের সঙ্গে বলল, বল কি! শেষ পর্যন্ত তাহলে সত্য-সত্যিই—হঁয়, বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু।

কে বিষ দিল?

সব তো তোমাকে বললাম—কে দিতে পারে বলে মনে হয়?

তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ?

একেবারে যে পারিনি তা নয়, তবে—

তবে? কৃষ্ণ সকৌতুক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

হত্ত্যার একটা মোটিভ থাকাও দরকার। কিন্তু বর্তমানে তাঁরের কাছে যে মোটিভটা পাইছি সেটা তেমন যেন খুব একটা জোরালো মনে হচ্ছে না।

আমার কি মনে হচ্ছে জান?

কি?

তোমার ঐ সুভদ্রা মা কি যেন নাম বলেছিলে মেয়েটির—

তুমি কি সুভদ্রাকেই—কিরীটীর কথাটা শেষ হল না।
কৃষ্ণ স্বামীর মুখের পিছে তাকিয়ে বললে, কোন মেয়েছেলে যখন ভালবাসা নিয়ে
খেলায় মাতে তখন তার জাছে নীতি বলে কিছুই থাকে না, আর—

আর কি?

মেয়েদের স্বার্থে ঘী লাগলে তখন তারা একজন পুরুষের চাইতে অনেক নীচে নামতে
পারে।

নাহি হয়ে তুমি একজন নারীর এত বড় অপযশ গাইছ কৃষ্ণ?

অপযশ গাইব কেন, সত্য যা তাই বলছি। তাছাড়া কোন পুরুষমানুষ কি কোন নারীর
সন্তুষ্কারের মূল্যায়ন করতে পারে নাকি?

পারে না বুঝি?

না।

কেন?

কেন কি, সেইটেই তো পুরুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা।

কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার যুক্তিটা কি? ঐ স্বার্থে ঘা লেগেছে বলেই কি?

আমার কথাই বা তুমি মেনে নেবে কেন?

আর একটু প্রাঞ্জল যদি হতে দেবী—

আমার মনে হয় সুভদ্রার অনেকখানি অভিনয় আছে—

সে যে একজন পাকা অভিনেত্রী সেটা অবিশ্য আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু—একটা
কথা ভুলো না:

কি?

তোমায় বলেছি একটু আগে সুভদ্রা অন্তঃসংস্থা।

কৃষ্ণ ঘন্দু হাসল। বলল, বস, চা নিয়ে আসি।

কৃষ্ণ সোফা ছেড়ে উঠে লঘু পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটীর চিন্তাধারাটাকে কিন্তু কৃষ্ণ যেন অন্য এক খাতে বইয়ে দিয়ে গেল। তবে কি
সে ভুল পথে চলেছে!

স্ত্রীলোকের মন বিচিত্র পথে আনাগোনা করে মিথ্যা নয়, এমনিতেই মেয়েদের সহজাত
একটা অভিনয়-প্রযুক্তি থাকে—তার উপরে সুভদ্রা তো রীতিমত অনুশীলনের দ্বারা এত
বছর ধরে সেই অভিনয়-প্রতিভাকেই তার ঝালিয়ে তুলেছিল।

সামান্য ইস্পাত আজ ঘষায় ঘষায় ধারালো হয়ে উঠেছে।

একটু পরে কৃষ্ণ দু-কাপ কফি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

একটা কাপ কিরীটীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্যটা নিজে নিয়ে মুখোমুখি কসল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কিরীটী বললে, কৃষ্ণ, আজ একবার বধমান যাব।

হঠাতে বধমান?

একটু ঘুরে আসি।

সুভদ্রার মাসীর খৌজ নিতে?

হ্যাঁ। বোনাবিটির পরিচয় পেলাম, মাসীটির সঙ্গে যদি পরিচয় করা যায়—
কখন যাবে?

দুপুরে।

রাত ন'টা নাগাদ বধমান থেকে ফিরে দেড়তলার ঘরে প্রবেশের মুখে দরজার গোড়ায়
নজর পড়ল একজোড়া ভূমিকাজুতোর।

মনে হচ্ছে মণিশ চক্রবর্তীর আগমন হয়েছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে চুকতেই দেখল তার অনুমান মিথ্যা নয়, বাইরে মণিশ চক্রবর্তীর
জুতোই সেইখানে।

মণিশ চক্রবর্তী একটা চেয়ারে বসেছিলেন, সামনে একটা থালি চায়ের কাপ।

মণিশবাৰু যে! কতক্ষণ?

জো প্রায় ঘটা দেড়েক হবে। মপ্পিক সাহেবকে আপনি ফোন করেছিলেন বুঝি? হ্যাঁ।

তাঁকে বলেছেন কেসটার কথা?

কথায় কথায় বলেছিলাম।

আমি কি আপনাকে কোন অসম্মান করেছি বা কোনৱেক অসহযোগিতা করেছি
আপনার সঙ্গে?

না, না। সে কি কথা?

মপ্পিক সাহেব মনে হলৈ যেন একটু ক্ষুঁষ হয়েছেন।

না না, ফোন করে দেব'খন। বৰং আমি আপনার দক্ষতার প্রশংসাই করছিলাম তাঁর
কাছে। যাক, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা পেয়েছেন?

হ্যাঁ, সন্ধ্যায় পেয়েছি। এই যে দেখুন। আপনার অনুমানই ঠিক—*a case of poisoning, stomach contents*-এর মধ্যে লিকারের সঙ্গে মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষ ছিল।
কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক ল্যাবরেটোরীতে স্ট্যাম্প
কনটেন্স—

খুব ভাল করেছেন। কাঁচের প্লাস আর বোতলটাও পাঠিয়েছেন তো?

হ্যাঁ। তারপর একটু খেমে বললেন, আমার এখন কি মনে হচ্ছে জনেন কিরীটীবাৰু?
কি বলুন তো?

ঐ দোলগোবিন্দ না কি যেন নাম—যে সে রাত্রে হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছে, এ তারই
কীর্তি। নিশ্চয় তারই কীর্তি।

হতে পারে। তা হঠাৎ তারই উপরে সন্দেহটা পড়ছে কেন বিশেষ করে?

নচেৎ ব্যাটা হঠাৎ গা-ঢাকা দিলে কেন? কিন্তু যাবে কোথায়? আমি লোক
লাগিয়েছি—ঠিক ধৰবই ব্যাটাকে।

ব্যাপারটা ক্ষেফ ডয় বা নাৰ্ভসনেসও তো হতে পারে মিঃ চক্রবর্তী।

না, না কিরীটীবাৰু—আপনি যাই বলুন, এতকাল খুনে ডাকাতদের নিয়ে কারবার
করছি—ও এশাই সাপের ইঁচি বেদেয় চেনে। আৱও একটি লোককে আমিৰ সন্দেহ হয়,
ব্যাটা একটি বাস্তু ঘৃণ্ণ—

কাৰ কথা বলছেন?

কাৰ আবাৰ—ঐ রাধারমণ গাল, দলেৱ অধিকাৰী, কেনেন ভিজে বেড়ালটিৰ মত
হাবড়াব দেখাচ্ছিল।

তপ্তিলোক প্ৰচণ্ড ঘাৰড়ে গিয়েছিল বুঝতে পাৱেননি।

টো ক্ষেফ অস্তিনয়। বুঝতে পাৱেনন না, ও দৃষ্টাকেই আমি ভাৰছি আৱেস্ট কৰব!

অ্যারেস্ট করে থানায় এনে ছাপ, দিলেই দেখবেন স্বীকার করতে পথ পাবে না। হঁ, বলে কত দেখলাম! মশিক সাহেবকে আমি বলে দিয়েছি দুটো দিন অপেক্ষা করুন স্যার, ও রহস্যের মীমাংসা আমি করে এনেছি প্রায়।

হঁ, তাহলে শামিজজুমারের উপর থেকে সন্দেহটা আপনার গেছে? হঠাৎ কিরীটি বলল।

যায়নি একেবারে, তবে—

তবে—

অতটা আর নেই, তবু তার উপরে আমার চোখ আছে বৈকি।

কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ ধরনের হত্যার একটা মোটিভ—উদ্দেশ্য থাকে, আপনার মনে হয় এ ক্ষেত্রে মোটিভটা কি?

মোটিভ? বুঝতে পারলেন না—কথাটা বলে একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে মণীশ চক্রবর্তী কিরীটির দিকে তাকালেন।

না, ঠিক বোধ হয় এখনও বুঝিনি।

ওদের দুজনেরই strong motive আছে।

যথা?

আজ সকালে দোলগোবিন্দ ছোট ভাইকে থানায় ডেকে আনিয়েছিলাম।

তাই নাকি?

হঁ। সে কি বললে জানেন? দোলগোবিন্দ লোকটা নাকি যেমন মাতাল তেমনি একের নম্বরের জুয়াড়ি।

মাতাল, জুয়াড়ি?

হঁ।

Rare combination বলতেই হবে। তবে পাল মশাইও যেন অমনিই কিছু বলছিলেন।

জানেন শনিবার শনিবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে সে যেত, আর সেই ব্যাপারেই হরিদাস সামন্তর কাছে তাকে হাত পাততে হত।

হরিদাস সামন্ত টাকা দিত?

দিত। হঁয়, খেপে খেপে অনেক টাকা তাকে দিয়েছিল ধার সামন্ত, যার একটা পয়সাও নাকি শোধ করেনি আজ পর্যন্ত দোলগোবিন্দ।

টাকা ধার দিত? টাকা ফেরত পাবে না জেনেও টাকা ধার দিত? আশচর্য!

তাই তো শুনলাম। পাল মশাইকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনিও তাই বললেন। এখন বুঝতে পারছেন, সেই টাকা যাতে কোনদিন দোলগোবিন্দকে শোধ করতে না হয় তাই কৌশলেই হয়তো সে হরিদাস সামন্তকে—and that was the motive—

সরিয়ে দিয়েছে বলতে চান?

ব্যাপারটা কি খুব অসম্ভব!

হঁ, আর রাধারমণ পাল—তার কি স্বার্থ?

আমার কি মনে হয় জানেন?

কি?

লোকটার ঐ সুভদ্রা মেয়েটার উপরে লোড ছিল।

লোড ?

কেন, থাকতে পারে না ! অমন ডবগা ছুঁড়ি, চেহারাখানা ভাবুন তো একবার।

মনে হচ্ছে আপনারও মনে যেন দোলা লাগিয়েছে সুভদ্রা ! মন্দ হেসে কিরীটী সকৌতুকে বললে ।

যাঃ কি যে বলেন !

আজ্ঞা এতে লজ্জার কি আছে মিঃ চক্ৰবৰ্তী ! ভাল জিনিস সকলেৱ মনকেই আকৰ্ষণ কৰে।

সগীশ চক্ৰবৰ্তী সলজ্জ হাসি হাসেন।

॥ আট॥

পৱেৱ দিন ।

সন্ধ্যা উত্তীৰ্ণ হবাৱ পৱেই কিরীটী চিংপুৱে রাধাৱমণ পালেৱ যাত্রা-পার্টিৰ অফিসে গিয়ে হাজিৱ হল। গ্ৰীষ্মেৱ রাত আটটা—সন্ধ্যাও বলা চলে সবে ।

ঐ অঞ্চলটা যেমন ঘিৰি, তেমনি নোংৱা, তেমনি মানুষেৱ ভিড়। ট্ৰাম-বাস-ট্যাক্সি-ৱিকশা ও ঠেলাগাড়িতে যেন গিগিজ কৱেছে ।

গাড়ি থেকে নেমে কিরীটী হীৱা সিংকে বলে, আশেপাশে কোথাও পাৰ্ক কৱে রাখ ।

এ অঞ্চলটা শহৱেৱ বোধ হয় সবচাইতে বেশী পুৱনো। সেকেলে ধৱনেৱ সব দোতলা তিনতলা বাড়ি, গা-ঘেঁষাঘেঁষি কৱে দাঢ়িয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে সৱু গলি। গলিৱ মোড়ে চা ও পান-সিগাৰেটেৱ দোকান। রাস্তাটা যেমন সংকীৰ্ণ তেমনি নোংৱা ।

নবকেতন যাত্রা-পার্টিৰ অফিস খুঁজে পেতে বেশ একটু সময়ই লাগল। তিনতলা একটা বাড়ি, তাৱ মধ্যে অনেক ঘৰ। দোতলায় নবকেতন যাত্রা পার্টিৰ অফিস। নীচেৱ তলাটা অনুকৰাব। ভাঙা সৱু সিড়ি, অনুকৰাব। বারোয়াৱী সিড়িতে আলোৱ বলতে গেলে কোন ব্যবহাৰই নেই ।

পকেট থেকে সৱু পেনসিল-টুচ্টা বেৱ কৱে তাৱই সাহায্যে কোনমতে কিরীটী দোতলায় উঠে গেল ।

আৱও দুটি যাত্রা-পার্টিৰ অফিস দোতলায় ।

হৈ-চে কৱে গান-বাজনা আৱ অভিনয়েৱ মহলা চলেছে ।

সৱু ৱেলিং-ঘেৱা বারান্দা—বারান্দাটা দক্ষিণ-উত্তৱ ঘূৱে পশ্চিম-উত্তৱে চলে গিয়েছে ।

দক্ষিণেৱ শেষ দুটো ঘৰেই নবকেতন যাত্রা-পার্টিৰ অফিস ।

একটা ছোকৱা একগাদা মাটিৰ ভাঁড় ও একটি চায়েৱ কেতলি নিয়ে বাস্তুদা দিয়ে আসছিল, তাকেই কিরীটী শুধাল, নবকেতন যাত্রা-পার্টিৰ অফিস কোন্টা ?

ঐ যে স্যাৱ, এগিয়ে যাব না ।

ছোকৱাটি কিরীটীকে কথাটা বলে নিজেৱ কাজে চলে গেল ।

কিরীটী এগিয়ে গেল ।

দৱজা খোলাই ছিল। ঘৰেৱ মধ্যে আলো জলছিল ।

দৱজাৱ পাশে দেওয়ালে টিনেৱ সাইনবোৰ্ড লাগানো—নবকেতন যাত্রা-পার্টি ।

তিতৰে প্ৰবেশ কৱল কিরীটী ।

ঘরের মধ্যে দুটি লোক ছিল।

চিনতে তাদের কষ্ট হয় কিরীটীর, একজন অধিকারী রাধারমণ পাল মশাই, আর একটি স্ত্রীলোক।

চন্দননগরে সেই বাত্রে এ অভিনেত্রীকেও কিরীটী দেখেছিল। নাম কৃষ্ণভামিনী।

বয়স পঁয়াত্তি ছাত্রিশ হবে, মোটাসোটা গড়ন।

দু'জনে মুঝেমুঝি দুটি তত্ত্বপোশের উপর বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে যেন কি আলাচলা করছিল, কিরীটীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

কিরীটীর আজ ছদ্মবেশ ছিল না।

তাই বোধ হয় প্রথমটায় কিরীটীকে চিনতে পারেন না পাল মশাই। তু কুণ্ঠিত করে তাকালেন, কি চাই?

পাল মশাই, নমস্কার।

নমস্কার। কোথা থেকে আসছেন?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চিনতে পারছেন না বোধ হয়?

না।

আমি ধূঁজটি রায়।

আপনি—বিস্ময়ে পাল মশাইয়ের গলাটা যেন বাকরোধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, সেটা ছিল আমার ছদ্মবেশ!

ছদ্মবেশ!

হ্যাঁ, সামন্ত মশাইয়ের আমন্ত্রণেই এ ছদ্মবেশে সেদিন চন্দননগরে আমায় যেতে হয়েছিল।

বুঝলাম না ঠিক।

আমার আসল নামটা হয়তো শুনে থাকবেন—কিরীটী রায়।

রহস্যানুসন্ধানী কিরীটী রায়।

হ্যাঁ।

তা আপনি—

বললাম তো, সামন্ত মশাইয়ের কেমন ধারণা হয়েছিল তাঁর জীবন বিপর, তাই তিনি আমার শরণাপন হয়েছিলেন।

তথাপি রাধারমণ পালের নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল। কৃষ্ণভামিনী চেয়ে ছিল কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী আবার বললে, সেদিন বলেছিলাম আসব এখানে—

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বসুন, বসুন।

ঘরটি মাঝারি সাইজের, একধারে একটা তত্ত্বপোশ পাতা সুতরাঙ্গি বিছানো, গোটাকয়েক তাকিয়া, মাঝখানে একটি টানাওয়ালা নীচু ডেঙ্ক।

অন্য পাশে একটি ফাট্টের আলমারি। খানকয়েক চেয়ারও চুল।

দেওয়ালে দু-তিনটে ক্যালেগার, একটি ফ্রপ ফটো।

ঘরের মধ্যে বেশ একটি উজ্জ্বল শক্তির ধাতি জুলছিল।

রাধারমণ পাল তত্ত্বপোশ থেকে মেঝে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিমধ্যে। বললেন, বসুন রায় মশাই।

আপনার দলের আর সবাইকে দেখছি না?

সবাই আছে পাশের ঘরে। রাধারমণ পাল বললেন, ভামিনী, শঙ্করকে ডেকে চায়ের কথা বল।

ব্যস্ত হবেন না পাল মশাই। চায়ের এখন প্রয়োজন নেই। কিরীটী বললে।

দল বোধ হয়ে উঠেই যাবে রায় মশাই। রাধারমণ বললেন এরপর।

কেন?

আর কেন—শ্যামল চলে যাচ্ছে নোটিস দিয়েছে, সামন্ত মশাই নেই, বুঝতেই পারছেন শ্যামলও চলে গেল—

সুভদ্রাও কি নোটিস দিয়েছে নাকি? কিরীটী শুধাল।

না, দেয়নি এখনও তবে শ্যামল না থাকলে সুভদ্রাও যে থাকবে না সে তো জানা কথাই।

তা বটে! আর সুজিতবাবু?

না, ও বোধ হয় যাবে না। হরিদাস চলে গেল, শ্যামল আর সুভদ্রা চলে গেলে কাকে নিয়ে আর পালা গাওয়াব?

ভাল কথা, দোলগোবিন্দবাবুর কোন সংবাদ পেলেন?

সে ফিরে এসেছে।

এসেছে! তা সেদিন রাত্রে হঠাত গাঢ়াকা দিয়েছিলেন কেন?

ভয়ে।

কিরীটী মৃদু হাসল।

সেই আলোচনাই করছিলাম ভামিনীর সঙ্গে বসে। একদিন আমি, হরিদাস আর কৃষ্ণভামিনী তিনজনে মিলে দল গড়েছিলাম। আমার আর হরিদাসের আধাআধি বখরা। শেষ পর্যন্ত হরিদাস বখরা বেচে দিল আমাকে।

হরিদাসবাবুর মুখে সে কথা শুনেছি।

শুনেছেন!

হ্যাঁ।

কি যে হল, হঠাত বখরা বেচে দিল।

সবাইকে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে বলেছিলাম—

সবাই এসেছে—সবাই পাশের ঘরে আছে, কার কার সঙ্গে আপনি কথা বলতে চান বলুন, আমি ডাকছি—না, সবাইকে ডাকব?

সবাইকে ডাকার একসঙ্গে প্রয়োজন নেই, সকলকে আমার প্রয়োজনও নেই। আচ্ছা সেরাত্রে হরিদাসবাবুর সাজঘরের পাশের দুটি সাজঘরে কারা কারা ছিল বলতে পারেন?

হরিদাসের সাজঘরের ডান দিকের সাজঘরে ছিল সুজিত আর কৃষ্ণন।

কৃষ্ণন?

হ্যাঁ, কৃষ্ণন চাটুজ্য। এই যে লম্বা ঢাঙা মত, নায়কের বন্ধুর রোল করেছিল নাটকে!

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আর বাঁদিককার ঘরে?

সুভদ্রা আর এই কৃষ্ণভামিনীর সাজঘর ছিল। আর বাকি সব একটা বড় সাজঘরে ছিল। মধ্যবর্তী দরজা ছিল একটা দু'ঘরের মধ্যে।

কিরীটী কি যেন চিন্তা করে।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট আন্যায়ী হরিদাস সামন্তর মৃত্যু হয়েছিল রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে, অর্থাৎ তৃতীয় অক্ষের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে। পালা শুরু হয়েছিল ঠিক স্বাত সাড়ে সাতটায়।

পাল মশাই—

আজ্জে?

স্বাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত—আপনি কোথায় ছিলেন এই এক ঘণ্টায় সময়?

ঠিক মনে পড়ছে না।

তৃতীয় অঙ্ক শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টা কোথায় ছিলেন মনে করে দেখুন!

আমি প্রথম দিকে আসরেই ছিলাম, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল হরিদাস একশো টাকা চেয়েছিল, সেই টাকাটা দেবার জন্য নিজের ঘরে ঢেলে আসি।

সেই সময় সে ঘরে আর কে ছিল?

আমি আর দোলগোবিন্দবাবু।

দোলগোবিন্দবাবু তার সাজঘরে না থেকে আপনার ঘরে ছিলেন কেন?

তার পার্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই তার সাজঘরে না থেকে আমার ঘরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল বোধ হয়।

ভাল কথা, পাল মশাই—

বলুন?

দোলগোবিন্দবাবুর রেস খেলা অভ্যাস আছে, তাই না?

হ্যাঁ, এই ঘোড়া রোগেই তো ওর সব খেয়েছে। হরিদাসের ছিল মদ আর মেয়েমানুষ, আর দোলগোবিন্দের মদ আর ঘোড়া। নচেৎ দুজনেরই অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভা ছিল।

দুজনের মধ্যে খুব সন্তোষ—মানে সম্প্রীতি ছিল বুঝি?

তা তো ছিল বলেই মনে হয়।

দোলগোবিন্দবাবুকে হরিদাসবাবু প্রায়ই টাকা ধার দিতেন, তাই না?

দিত, কিন্তু শুনলেন কোথায়?

শুনেছি। এবং সে টাকা তিনি শোধ করতেন না।

রেস খেলে সব ওড়াত, টাকা শোধ করবে কোথা থেকে?

টাকা কখনও দোলগোবিন্দবাবু শোধ করতেন না, অথচ হরিদাসবাবু তাকে ফেরে দিয়েই যেতেন।

কি জানি মশাই, তাই তো দিত।

আচ্ছা পাল মশাই, সুজিতবাবুর সঙ্গে দোলগোবিন্দবাবুর সম্প্রীতি কৈমে ছিল?

দুজনের বলতে পারেন সাপে-নেউলের সম্পর্ক, ঘাগড়াঝাটি লেকেই থাকত।

আর একটা কথা—বলতে বলতে কিরীটী পকেট থেকে কাগজের একটা ভাঁজ-করা টুকরো বের করল, আপনি তো হরিদাস সামন্তর অনেক দিনের পরিচিত, দেখুন তো এই সেঁথাটা—তাঁরই হাতের সেখা কিনা?

সেখি। রাধারঞ্জ পাল ভাঁজ-করা কাগজটা হাতে নিলেন, চোখে চশমা দিয়ে বেশ ভাল করে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, এটা কোথায় গেলেন?

মনে নেই। সে-রাত্রে শ্যামলবাবু দিয়েছিলেন—এই সেই চিরকুট যেটা রাধা দেবী
শ্যামলের হাতে দেবার জন্য ঢাকের ভোলাকে দিয়েছিল।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। চিরকুটে লেখা—শ্যামল, একবার দেখা করবে সময় পেলেই,
জরুরী দরকার।

কি মনে হয় পাল মশাই, লেখাটা সামন্ত মশাইয়েরই তো?

সেই ব্রহ্মকুট তো হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে।

ঠিক বলতে পারছেন না? আচ্ছা, হরিদাসবাবুর কোন হাতের লেখা আপনার কাছে
আছে?

সে রকম কিছু নেই।

কোন চিঠি বা—

দাঁড়ান, মনে পড়েছে, সুভদ্রা হরণ নাটকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যে হরিদাসের হাতে
correction ও suggestion লেখা আছে, যা সে রিহার্সেলের সময় লিখেছিল!

দেখতে পারি একবার নাটকের পাণ্ডুলিপিটা?

নিশ্চয়ই। ভাবিনী, আলমারি থেকে পাণ্ডুলিপিটা বার করে দাও তো। এই নাও চাবি।
পাল মশাই পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করে দিলেন।

কৃষ্ণভাবিনী নিঃশব্দে উঠে গিয়ে চাবি দিয়ে আলমারি খুলে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা
বের করে এনে দিল।

কিরীটী উল্টে-পাল্টে কিছুক্ষণ কয়েকটা পাতা দেখল, তারপর বললে, পাল মশাই!
বলুন?

পাণ্ডুলিপিটা আমি নিয়ে যাব।

নিয়ে যান ও অভিশপ্ত পাণ্ডুলিপি, ও এবরে থাকলে হয়ত আরও অমঙ্গল হবে।
কৃষ্ণভাবিনী দেবী!

কিরীটির ডাকে মহিলাটি ওর মুখের দিকে তাকাল।

এক কাপ চা খাওয়ান।

কৃষ্ণভাবিনী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পাল মশাই!

আজ্ঞে?

আমার দুটো ঠিকানা চাই।

ঠিকানা!

হ্যাঁ। সুভদ্রা ও হরিদাসবাবু কোথায় থাকতেন সেই বাড়ির ঠিকানা, আর সুজিতবাবুর
বাসার ঠিকানা।

সুভদ্রা আর হরিদাস পাল স্টীটে থাকত—তিন/দুই, আর সুজিত কালীঘাটে থাকে,
মহিম হাস্পাত স্ট্রীটে।

খাতা দেখে অতঃপর সঠিক ঠিকানা দুটো বলে দিলেন রাধারমণ, কিরীটী টুকে নিল
নেটিবুকে।

আর একটা কথা—

বলুন?

সুজিতবাবুই তো একদিন সুভদ্রাকে আপনার দলে এনেছিলেন।

হ্যাঁ।

এবার দোলগোবিন্দবাবকে একবার ডাকুন।

আর কাউকে?

না

রাধারঘণ পুরুষের থেকে বের হয়ে গেলেন এবং একটু পরে দোলগোবিন্দকে নিয়ে
এসে চুক্তি কৰলেন।

॥ নয় ॥

রোজ্বা পঁ্যাকাটির মত চেহারা। তোবড়ানো গাল, কোটরগত চক্ষু দীর্ঘ অত্যাচারের সাফ্ট
দেয়। দুই চোখে ভীত-সন্ত্রস্ত চাউনি।

আপনারই নাম দোলগোবিন্দ? কিরীটীর প্রশ্ন।

আজ্জে, সিকদার।

আপনার সেরাত্রে লাস্ট সিনে চাকরের পার্টে প্রঞ্জি দেওয়ার কথা ছিল না?
আজ্জে।

তবে যাননি কেন?

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন!

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন!

হ্যাঁ, মানে ভীষণ ঘূম পাচ্ছিল।

ঘুমোতে ঘুমোতেই বুঝি কোথাও চলে গিয়েছিলেন?

আজ্জে!

তবে সে রাত্রে অত খুঁজেও আপনাকে পাওয়া গেল না কেন?

আজ্জে, পুকুরের পাড়ে—

পুকুরের পাড়ে!

তবে সে রাত্রে অত খুঁজেও আপনাকে পাওয়া গেল না কেন?

আজ্জে, পুকুরের পাড়ে—

পুকুরের পাড়ে!

হ্যাঁ, বড় গরম, তাই পুকুরের ধারে সিঁড়ির উপরে গিয়ে বসেছিলাম একটু। কখন
ঘুমিয়ে পড়েছি।

তারপর ঘূম ভাঙল কখন?

পরের দিন সকালে?

তারপর কি করলেন?

তখন শুনলাম হরিদাসদা খুন হয়েছেন—সেই শুনে ভয়ে পালিয়ে চিয়েছিলাম।
কার কাছে শুনলেন?

রাধার কাছে।

গাল মশাই, রাধা দেবীকে ডাক্ব তো!

রাধারঘণ কিরীটীর নির্দেশ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন আবার! ঠিক ঐ সময়
কৃষ্ণভায়িনী এক কাপ চা হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

চা—

রাখুন ওখানে।

কৃষ্ণভায়িনী চায়ের কাপটা পাশের একটা টুলের উপরে নামিয়ে রাখল।

রাধারাণী এসে ঘরে ঢুকল রাধারমণ পালের সঙ্গে।

রাধারাণী দেবী আপনার নাম?

আজ্জে!

আপনি দোলগোবিন্দবাবুকে পরের দিন সকালবেলা দিঘির পাড়ে দেখেছিলেন?
কে বলতে?

বৈনু উনি বলছেন?

ও মাগো, কোথা যাব গো—হ্যাঁরে হাড়হাবাতে অলঞ্চেয়ে অনামুখো, তোর সঙ্গে
আমার দেখা হল পরের দিন সকালে কখন রে?

রাধা, মানে তুই—

দোলগোবিন্দর মুখের কথাটা শেষ হতে পারল না।

রাধা চোখ পাকিয়ে চিংকার করে উঠল, বদমায়েসী করবার আর জায়গা পাওনি
হতচাড়া ড্যাকরা! খেঁরে বিষ বেড়ে দেব তোমার!

সে কি রাধা, তুমি আমায় বললে না—দেখুন স্যার, ও মিথ্যে বলছে, নচেৎ আমি
জানব কি করে যে হরিদাসদা খুন হয়েছে?

রাধারাণী প্রায় তখনি ঝাঁপিয়ে পড়লিল দোলগোবিন্দর উপর, কিরীটী বাধা দিল,
থামুন থামুন কি করছেন আপনারা, যান রাধারাণী দেবী, আপনি এ ঘর থেকে চলে যান।

দোলগোবিন্দবাবু! কিরীটী ডাকল।

কেঁদে ফেললে দোলগোবিন্দ, বিশ্঵াস করুন স্যার, আমি কিছু জানি না, কিছু দেখিনি
সে-রাতে। ওসব খুনোখুনির মধ্যে আমি ছিলাম না।

আপনি সে-রাতে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কোথায় ছিলেন
দোলগোবিন্দবাবু, অর্থাৎ তৃতীয় অকের মাঝামাঝি সময়?

ঠিক মনে পড়ছে না। কাঁদতে বললে দোলগোবিন্দ।

মনে পড়ছে না?

আজ্জে না।

ঐ সময় হরিদাসবাবুর ঘরে গেছেন একবারও?

না তো!

কাউকে সে-ঘরে যেতে দেখেছেন?

কাকে দেখব!

কাউকে দেখেছেন কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি। মনে করে দেখুন না, কিংবা মনে করে
দেখুন তো, কেউ আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিল কিনা শ্যামলবাবুকে দিতে!

চিঠি?

হ্যাঁ, একটুকরো কাগজ?

কাগজ—শ্যামলকুমারকে দিতে!

হ্যাঁ, দিয়েছিল কেউ আপনাকে—তাই না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। আমাকে নয়, ভোলাকে—কে যেন একটা কি ভোলাৰ হাতে
দিয়ে বললে সেটা শ্যামলকুমারকে দিতে, হরিদাসদা দিয়েছেন।

কে সে ?

অঙ্ককারে ঠিক বুঝতে পারিনি, তাছাড়া আসরে তখন আমার যাবার কথা, আমার পার্ট ছিল।

মেয়েছেলে, না কোন পুরুষ ?

মনে হচ্ছে মেয়েছেলে।

কে বলে মনে হয় সে আপনাদের দলের ?

চিনতে পারিনি—ঠিক বুঝতে পারিনি।

রাধারমণবাবু ?

আজ্জে !

আপনার দলের ক'জন স্ত্রীলোক আছেন ?

চারজন। কৃষ্ণভামিনী, সুভদ্রা, রাধারাণী আর ফুল্লরা।

ফুল্লরা কে ?

যে সে-রাত্রে নায়কের ছেট বোন সেজেছিল।

তাকে একবার ডাকবেন এ ঘরে ?

রাধারমণ তখনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দোলগোবিন্দবাবু !

আজ্জে !

আপনার দেশ কোথায় ?

বর্ধমানে।

টাউনে ?

না, মেমারীতে—সুভদ্রার মাসী যেখানে থাকে।

সুভদ্রার মাসীকে আপনি চেনেন ?

চিনব না কেন—একই পাড়ায় তো।

তাহলে সুভদ্রাকেও আপনি চেনেন ?

ও যখন মেমারীতে ছিল তখন চিনতাম, তাছাড়া বাড়িতে তো আমি খুব একটা যাই

না।

বাড়িতে আপনার কে কে আছে ?

কেউ নেই, এক বিধবা পিসি।

বিয়ে-থা করেননি ?

করেছি। স্ত্রী এখানেই আমার সঙ্গে বেলেঘাটায় থাকে।

শেষ কবে সুভদ্রাকে আপনি মেমারীতে দেখেন ?

তা বছর দশকে আগে হবে। ও বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে।

পালিয়ে ?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম তাই।

কার সঙ্গে ? ওখানকারই কারও সঙ্গে কি ?

তা জানি না, স্ত্রীর মুখে পরে আমি কথাটা শুনেছিলাম।

সুভদ্রাকে তারপর কবে আবার দেখলেন ?

এখানেই—বছর তিনেক আগে এ দলে এসে।

এ দলে কতদিন আপনি আছোন?

তিনি বছর।

তার আগে?

অন্য দলে অভিনয় করতাম।

সে সকল ছেড়ে দিলেন কেন?

মিথ্যে বলব না হজুর, আপনি পুলিসের লোক, চুরির দায়ে আমার চাকরি যায়।
চাকরি?

হ্যাঁ, সব মিথ্যে—কিন্তু প্রমাণ করতে পারলাম না।

রাধারমণ এই সময় ফুল্লরাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

ফুল্লরার বয়স বছর কুড়ি হবে। বেশ ফরসা গায়ের রং, দোহারা চেহারা। মুখটা গোল,
চক্ষু দৃষ্টি চক্ষণ।

এরই নাম ফুল্লরা, রায় মশাই। রাধারমণ বললেন।

তোমার নাম ফুল্লরা?

আজ্জে। গলাটি মিহি ও মিষ্টি সুরেলা।

কিরীটির মনে পড়ল মেয়েটি পালায় সে-রাত্রে চমৎকার গান গেয়েছিল।

তুমি সে-রাত্রে শ্যামলবাবুর হাতে একটা চিঠি দিয়েছিলে?

কে বললে?

দিয়েছিলে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।

না তো!

দোলগোবিন্দবাবু, দেখুন তো—সে রাত্রে ও-ই কি শ্যামলবাবুর হাতে চিঠিটা
দিয়েছিল?

দোলগোবিন্দ তাকাল ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরাও তাকিয়ে থাকে ভুক্তিত করে
দোলগোবিন্দের দিকে। কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর দোলগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, আজ্জে না।

ফুল্লরার ভ্যুগল সরল হয়ে আসে।

ঠিক আছে, তোমরা যেতে পার।

দোলগোবিন্দ আর ফুল্লরা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আর কাউকে ডাকব রায় মশাই? রাধারমণ শুধালেন।

না, থাক।

সবাই আছে ও ঘরে।

থাক, প্রয়োজন নেই।

চা-টা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল রায় মশাই। আর এক কাপ চা আনি।

না না, এবারে আমি যাব। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

কিরীটি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দিন দুই পরে।

ঠিকথেরে কিরীটি ও কৃষ্ণের মধ্যে কথা হচ্ছিল। গতকাল সকালে আবার কিরীটি
বর্ধমানে মেমারীতে গিয়েছিল, ফিরেছে রাত্রে।

কৃষ্ণ সেই সম্পত্তি কথা বলছিল, কাল হঠাৎ আবার বর্ধমানে গিয়েছিলে কেন
বললে না তো।

আগেরবাবু সুভদ্রার মাসীর খোঁজ পাইনি, তাই আবার গিয়েছিলাম যদি তার দেখা
পাই।

দেখা হল?

হ্যাঁ

কেন, বাড়িতে ছিল না বুঝি?

বছরখনেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

সে কি! তবে যে সুভদ্রা তোমাকে বলেছিল!

এখন দেখছি তোমার কথাই ঠিক কৃষ্ণ।

তোমাকে সেদিনই আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম না, সুভদ্রাকেই আমার সন্দেহ হয়।

সন্দেহ যে আমারও হয় না তা নয়, তবে—

তবে আবার কি?

তার গর্ভের সন্তানই সব যেন কেমন এলোমেলো করে দিচ্ছে।

ঐ মেয়েটি একটি সাংঘাতিক চরিত্রের এ তুমি জেনে রেখো।

সেটা যে বুঝিনি তা নয় কৃষ্ণ, কিন্তু তার গর্ভের সন্তানই যে আমার সব হিসাব
গোলমাল করে দিচ্ছে।

ওদের মত মেয়ের আবার সন্তানধারণ!

তুমি যে দেখছি, না বিহয়েই কানাইয়ের মা হয়ে বসলে!

ঠাট্টা করছ?

পাগল! যাও গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে, এক কাপ চা আন তো।

॥ দশ ॥

রাত তখন বোধ করি ন টা হবে।

সারাটা দিন প্রচণ্ড গরম গিয়েছে, যেমন রৌদ্রের তাপ তেমনি গরম হাওয়া, গা যেন
ঝলসে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ হল সবে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

খুজে খুজে কিরীটী শ্যামবাজারে পাল স্ট্রাটে রাধারমণ পালের দেওয়া ঠিকানামত
একটা সরু গলির মুখে এসে দাঁড়াল।

পাল স্ট্রাট থেকেই সরু গলিটা একটা গলির মত যেন বের হয়ে গিয়েছে। মুশকেশ
গলিটার দোতলা-তিনতলা বাড়ির ভিতরকারের অংশ।

গলি-পথে আলোর তেমন ভাল ব্যবস্থা নেই।

পকেট থেকে টর্চটা বের করে আলো ফেলে নস্বরটা দেখে চতুর্থ বাড়ির দরজার কলিং
বেলটা কিরীটী টিপস, বার দুই টেপবার পর ভিতর থেকে সাড়ে পাত্তয়া গেল।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ, অঙ্ককার।

নারী-কঢ়ে প্রশ্ন ভেসে এস অঙ্ককারেই, এত তাড়াতাড়ি ঝলে, তোমার তো আসবার
কথা—

সুভদ্রার কথা শেষ হল না।

কিরীটী সাড়া দিয়ে বললো সুভদ্রা দেবী, আমি কিরীটী রায়।

মহূর্তের যেন একটা স্মৃতা, তারপরই চাপা সতর্ক কিছুটা শক্তি কঠে উচ্চারিত হল,
কিরীটীবাবু!

হাঁ, ভিতরে চলুন, আপনার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা আছে।
দরকারী কথা! কিন্তু আমি যে এখনি একবার বেরুব কিরীটীবাবু!

বেরুব সময় নেব না, দু-চার মিনিট। চলুন না।

আসুন।

সরু একটা অন্ধকার প্যাসেজ, কিরীটী টর্চ হাতে সুভদ্রার পিছনে পিছনে এগুতে
এগুতে বললে, প্যাসেজে বুঝি আলো নেই?

ছিল। ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

প্যাসেজের পরে একটা ছোট বারান্দা মত, তার একটার মধ্যে টিনের একটা শেড।

একটা ঘরের দরজা খোলা, আলো আসছিল খোলা দরজাপথে। পাশাপাশি দুটো ঘর।
যে ঘরে আলো জুলছিল কিরীটীকে নিয়ে সুভদ্রা সেই ঘরেই এসে ঢুকল। ঘরটা বড় নয়,
ছোটই আকারে। কিন্তু ছিমছাম করে সাজানো।

একপাশে একটি খাটো পরিপাটি করে শয্যা বিছানো, পাশাপাশি দু'জোড়া মাথার
বালিশ, বালিশের ওয়াডে ঝালর বসানো লেসের। মধ্যখানে একটা পাশবালিশ।

মাথার কাছে একটা নীচু টেবিলের ওপর একটা টেবিল ফ্যান। ফ্যানটা ঘূর্ণ্যমান,
তার পাশে একটা কাঁচের প্লেটে কিছু বেলফুল, একটি ধূপদানীতে ধূপকাঠি প্রজুলিত।
চন্দনধূপের মিষ্টি গন্ধ বেলফুলের সুগন্ধের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে ঘরের বাতাস যেন স্নিগ্ধ
রেখেছে।

অন্যদিকে আয়না বসানো একটি কাঠের আলমারি। একটি মিটসেফ, সেফের উপরে
গোটা দুই ইন্ডিয়ান রামের বোতল, একটা কাঁচের জাগ জলভর্তি, গোটা দুই প্লাস। খান-
দুই চেয়ারও ছিল ঘরে।

বসুন কিরীটীবাবু!

কিরীটীর দৃষ্টি তখন সুভদ্রার উপর ন্যস্ত।

চমৎকার করে খোঁপা বেঁধেছে সুভদ্রা, খোঁপায় একটি বেলফুলের মালা জড়নো।
পরনে নীল রংয়ের লাল চওড়াপাড় দামী তাঁতের শাড়ি। হাতে দু'গাছি সোনার বালা।
কপালে কুমকুমের টিপ।

এই বাড়িতেই আপনি হরিদাস সামন্তর সঙ্গে থাকতেন? কিরীটী শুধাল।

হ্যাঁ। এবাবে ছেড়ে দিতে হবে।

ছেড়ে দেবেন কেন? শ্যামলবাবু বুঝি অন্য বাসা ঠিক করেছেন?

এখনও পায়নি, খুঁজছে বাসা।

হ্যাঁ। তা আপনার মাসীর কোন সংবাদ পেলেন?

মাসী!

বলেছিলেন না সেদিন মাসী খুব অসুস্থ, তাকে দেখতে যাবেন।

যাওয়া আর হল কই! হঠাৎ যে ঝঞ্চাটে পড়া গেল।

তা ঠিক। তা যাবেন না?

মেঝি, চিঠি দিয়েছি।

সুভদ্রা দেবী—

বলুন!

মাসীর কাছ থেকে আপনি কতদিন হল চলে এসেছেন?

তা বছর সাত-আট হবে।

মধ্যে মধ্যে যেতেন মাসীর কাছে, তাই না?

হ্যাঁ, আমি ছাড়া তো আর ওর কেউ নেই।

শেষ করে গেছেন?

মাস দুই আগেও তো গিয়েছি।

কেমন ছিলেন তখন তিনি।

বিশেষ ভাল যাচ্ছে না মাসীর শরীরটা।

আপনার বিবাহ হয়েছিল বলেছিলেন সেদিন, আপনার স্বামীর নামটা কি—কোথায় যেন দেশ-বাড়ি?

হগলী জেলায়। নাম ছিল শ্যামাকান্ত।

শ্যামাকান্ত কি?

শ্যামাকান্ত ঘোষ।

বিয়ে বোধ হয় আপনার মাসীই দিয়েছিল?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কে দেবে!

বিয়ে কোথায় হয়েছিল, মেমারীতে?

হঠাতে যেন চমকে তাকাল সুভদ্রা কিরীটীর মুখের দিকে। তারপর একটা ঢঁক গিলে বললে, হ্যাঁ।

বিয়ে হয়েছিল আপনাদের কি মতে? হিন্দু-মতে না রেজেন্ট্র করে?

হিন্দু-মতে।

আপনি কিন্তু সত্যি বললেন না, কারণ আমি যতদুর দেখছি আপনি পালিয়ে এসেছিলেন মাসীর কাছ থেকে, তারপর হ্যাত বিয়ে করেছিলেন কাউকে।

কে বললে আপনাকে আমি পালিয়ে এসেছিলাম?

যদি বলি আপনার মাসী, এবং—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, কলিং বেল ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল।

কে এল! আপনি একটু বসুন, দেখে আসি।

যান।

সুভদ্রা তড়িৎপদে ঘৰ থেকে বের হয়ে গেল। এবং কিরীটী শিকারী বিড়ালের মত সুভদ্রাকে অনুসরণ করে।

অঙ্ককার প্যাসেজ।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল, ফিস্ফিস করে দুটো কঠু মাঝে শিগগিরি যাও এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করার শব্দ।

কিরীটী চকিতে ঘরে এসে প্রবেশ করে।

একটু পরে সুভদ্রা এসে ঘরে ঢুকল।

কে এসেছিল?

কেউ না। ভুল নম্বৰ, অস্কুলৰে অন্য বাড়িতে বেল টিপেছিলেন ভদ্রলোক।

আচ্ছা সুভদ্রা দেবী, আজ তাহলে আমি চলি।

কিরীটী আৰ দাঁড়াল মা, ঘৰ থেকে বেৰ হয়ে গেল।

নিজেই সদৰ দৱজা খুলে গলিৰ মধ্যে পড়ে, বড়ৰাস্তায় এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে
এদিকে-ওদিক অক্কাতে তাকাতে পাশেই অঞ্চলৰ একটা ঝুল-বারান্দা দেখে তাৰ নীচে
গিয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে রাস্তার এদিক-ওদিক নজৰ রাখতে লাগল।

প্ৰায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাদে দেখা গেল সুভদ্রা গলি থেকে বেৰ হয়ে এল।

 কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দূৰ থেকে সুভদ্রাকে অনুসৰণ কৰে।

সুভদ্রা এদিক-ওদিক সতৰ্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ট্ৰাম রাস্তার সামনে যে ‘নিউ
স্টার’ ৱেস্টুৱেন্ট তাৰ সামনে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকাল, তাৰপৰ চঢ় কৰে
একসময় ৱেস্টুৱেন্টৰ মধ্যে চুকে গেল সুভদ্রা।

কিরীটী চেয়ে থাকে।

ৱাস্তার অপৰ দিককাৰ ফুটপাতে একটা খোলা জায়গায় মোটৱ রিপেয়ারিংয়ের
কাৰখানা। লোকজন কাৰখানায় কাজ কৰছে, গোটা দুই গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তাৰই
একটাৰ আড়ালে কিরীটী নিজেকে গোপন কৰে উল্টো দিকেৰ ফুটপাতে ৱেস্টুৱেন্টৰ
দিকে চেয়ে থাকে।

ৱেস্টুৱেন্টেৰ খোলা দৱজাপথে এবং ভিতৱ্বেৰ উজ্জুল আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট
চোখে পড়ে কিরীটীৰ।

ভিতৱ্বে খৰিদৰেৰ বিশেষ একটা ভিড় দেখা যায় না। জনা তিন-চার খন্দেৰ বসে
আছে।

কিরীটী দেখতে পায় সুভদ্রা গিয়ে একটা কোণেৰ টেবিলে চেয়াৰ টেনে বসল।

ৱেস্টুৱেন্টেৰ ছোকৱাটা সামনে এসে দাঁড়াল, কি যেন তাকে বলল সুভদ্রা।

সুভদ্রা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে।

সুভদ্রার দৃষ্টি কিষ্টি রাস্তায়, ঘন ঘন তাকাচ্ছ সে রাস্তার দিকে।

পনেৰ মিনিট কুড়ি মিনিট প্ৰায় কাটতে চলেছে, সুভদ্রা কখন থেকে এক কাপ চা নিয়ে
বসে আছে সেই কোণেৰ টেবিলেৰ চেয়াৰটায়। হঠাৎ কিরীটীৰ দৃষ্টি সজাগ হয়ে উঠল।

একজন এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ৱেস্টুৱেন্টেৰ মধ্যে গিয়ে চুকল। এবং অঞ্চল্কণ
পৱেই সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে বেৰ হয়ে এল।

সুভদ্রার সঙ্গে লোকটিকে চিনতে, অন্য ফুটপাতে দাঁড়িয়েও, ৱেস্টুৱেন্টেৰ উজ্জুল
আলোয় কিরীটীৰ এতুকু অসুবিধা হয় না।

চোখেৰ তাৰা দুটো তাৰ উজ্জুল হয়ে ওঠে। একটা আৱামেৰ নিঃশ্বাস নেয় কিরীটী
এতক্ষণে যেন, তাহলে অনুমান তাৰ মিথ্যা নয়।

কিরীটীৰ প্ৰয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

হীৱা সিংকে বাগবাজারেৰ মোড়ে পেট্ৰোল পাম্পটাৰ সামনে গাড়ি পাৰ্ক কৰে রাখতে
বলে এসেছিল, এগিয়ে গেল কিরীটী সেইদিকে।

গাড়িতে উঠে বসে কিরীটী বললে, চল হীৱা সিং, কোঠি।

ৱাত প্ৰায় পৌমে এগাৱাটায় কিরীটী তাৰ গৃহে এসে পৌছল।

কোথায় গিয়েছিলে? কৃষ্ণ শুধায়, এত রাত হল যে?

সোফার উপরে আরাম করে বসতে বসতে কিরীটী বললে, দাঁড়াও, অনেকক্ষণ ধূমপান করিনি। বলতে বলতে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করল।

কফি খাবে ?

মন্দ কি !

বথোঁ কফি আনি ।

ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা মেশিন চলার দরজন ঘরটা ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক ।

॥ এগারো ॥

মিনিট দশক পরে কফির শূন্য কাপটা নামিয়ে রাখতেই কৃষ্ণ আবার প্রশ্ন করল,
কোথায় গিয়েছিলে ?

বল তো কোথায় ?

মনে হয় সুভদ্রা-নিকেতনে !

বাঃ, চমৎকার কৃষ্ণ ! তোমার দেখছি তৃতীয় নয়নটি রীতিমত খুলে গিয়েছে !

বাঃ, এত বড় একজন রহস্যভূতীর সঙ্গে এতকাল বাস করছি ! কথায় বলে সাধুসঙ্গে
স্বর্গবাস !

আর অসৎ সঙ্গে—বলতে বলতে কিরীটী হেসে ওঠে ।

সত্যি বল না গো ?

কি বলব ?

আমার অনুমানটা কি মিথ্যে ?

না, একেবারে মিথ্যে নয় । তবে—

তবে ?

আর দুটো দিন অপেক্ষ কর দেবী, আশা করছি তারপরই হরিদাস সামন্ত
হত্যারহস্যের উপর যবনিকাপাত হয়ে যাবে । এখনও সামান্য বাকি, দুটি বা একটি দৃশ্য ।

বিশ্বাস করি না । তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কে হত্যাকারী !

সত্যের অপলাপ করা কর্তব্য নয়, তা বুঝতে পেরেছি বোধ হয় ।

বোধ হয় না, বুঝতে তুমি পেরেছ ঠিকই ।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসে ।

উঃ, তোমার পেট থেকে কথা বের করা না—ঠিক আছে, বলো না । তবে আমি
বুঝতে পেরেছি হত্যাকারী কে ?

বুঝতে যদি পেরে থাক তবে আবার প্রশ্নবাণ নিঙ্কেপ কেন, দেবী ?

মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম, আমার অনুমান ঠিক কিনা ।

ঠিক আছে, তাহলে এস আমরা দুজনেই হত্যাকারীর নাম দুটো আলাদা আলাদা
কাগজে লিখে আমার ড্রয়ারে রেখে দিই চাবি বন্ধ করে, তাৰপৰ চাবিটা—

ঐ সময় জংলী এসে ঘরে ঢোকে শূন্য কফির কাপ দুটো নিয়ে যেতে ।

কিরীটী জংলীর দিকে তাকিয়ে বললে, ড্রয়ারের চাপিটা থাকবে শ্রীমান জংলীর
হেপোজতে । পরণ রাত ঠিক এগারোটা দশ মিনিটে চাবি নিয়ে কাগজ খুলে মিলিয়ে দেখা
যাবে কার অনুমান সত্য । কেমন, রাজী ?

বাজী।

জংলী হাঁ করে ওদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ পরে বলে, কি হল মাইজী! কৃষণ ততক্ষণে উঠে ভৈরবের উপর থেকে দুটো কাগজ আর কলম এনে বললে, নাও, তুমি সেথো আমিও লিখছি।

তথাস্ত দেবী।

জংলী অবশ্যও বোকার মত ওদের দিকে তাকিয়ে।

তুম্ভুমের জেখা হলে, দুখানা কাগজ ভাঁজ করে চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে সে দুটো ড্রয়ারের ঘর্ঘনে ফেলে চাবি বন্ধ করে, ড্রয়ারের চাবিটা জংলীর হাতে দিয়ে কৃষণ বললে, এই চাবিটা রাখ্য তোর কাছে জংলী।

কেন মাইজী?

যা বলছি—রাখ্য। আমি চাইলেও দিবি না, বাবু চাইলেও দিবি না, বুবলি? ঘূর্ঘ দিলেও নয়।

জংলী বুঝতে পারে কোন একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। সে শিটিমিটি হাসতে হাসতে চাবিটা পকেটে রাখতে রাখতে বললে, ঠিক হ্যায় কিসিকো এ কুঞ্জী নেই দুংগা।

পরের দিন সকালে চা-পানের পর কিরীটী যেন কার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে ফোনে।

কৃষণ পাশেই সোফায় বসে একটা স্কার্ফ বুনছিল, কিরীটীর ফোন শেষ হলে বললে, সুরতর খবর কি বল তো?

কিরীটী একটা সোফায় বসে সামনের সুদৃশ্য একটি কাশীরী কৌটো থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে বললে, মাসখানেক প্রায় দেখা নেই, তাই না!

হাঁ ও যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

বিয়ে না করলে পুরুষমানুষ এমনিই হয়ে যায়।

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। কিরীটী উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

মাল্লিকের ফোন।

মণীশ কি করেছে শুনেছে!

কি? ...তাই নাকি! ভালই তো। কিরীটী হাসতে জাগল।

কিছুক্ষণ পরে ফোন রেখে ফিরে এসে আবার বসল কৃষণের মুখোমুখি। হাঁ, কি যেন বলছিলে? বিয়ে না করলে কি হয়ে যায়, কৃষণ—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, ঐ সময় দরজা ঠেলে সুরত ঘরে চুকল, মুখে শিত ছাপি। আরে তুই—তোর পায়ের শব্দ পাইনি তো! কিরীটী বললে।

তাহলে দেখছি মণীশ চক্রবর্তী ঠিকই বলেছে—সুরত হাসতে হাসতে মুখোমুখি বসে বললে।

মণীশ চক্রবর্তী?

হাঁ, চন্দননগর থানার ওসি।

তুই চিনিস নাকি ওকে?

আমরা যখন বাঁকুড়া কলেজে পড়তাম তখন ও বাঁকুড়া স্কুলে পড়ত, দূর্ধর্ষ ফুটবল প্রেম্যার ছিল।

গোলকীপার বুঝি। কিরীটি যিতহাসে বলল।

ঠিক বলেছিস। কিন্তু বুঝলি কি করে? বলতে বলতে হেসে ওঠে সুব্রত।

হাসলি যে?

সুব্রত বললে, মেই দৃশ্যটা মনে পড়ল তোর কথায়।

কোন দৃশ্যটা?

কম্পেজের মাঠে খেলা হচ্ছিল, ও ছিল গোলকীপার। বরাবরই ওর চেহারাটা ছিল কুমড়েপ্পত্তাসের মত, সেই চেহারা আর সাতটা গোল খেয়েছিল, তাইতেই মনে আছে ওকেন তারপর বহুকাল পর চন্দননগরে একটা সাহিত্য-সভায় ওর সঙ্গে পরিচয় হল। এখন আবার একজন কবি।

ফুটবল থেকে কবিতা—অসাধারণ উত্তরণ! এ যে আরও দুর্ধর্ষ ব্যাপার!

তাই—তবে মাঝখানটা বাদ দিলি কেন? দারোগা। গত শোল বছর। ভদ্রলোকের এক কথা এক কাজ। ঐ দারোগাগিরিতেই আটকে আছে, এক ধাপও অগ্রসর হয়নি। ভদ্রলোক দেখলাম তোর উপরে ভীষণ খাপ্পা।

কেন? আমি আবার কি করলাম?

কি একটা যাত্রাদলের লোকের খুনের ব্যাপারে নাকি তুই তার উপরওয়ালার সাহায্যে নাক গলিয়ে ব্যাপারটাকে প্রায় ভঙ্গুল করে দিতে বসেছিস?

কেন, সে তো একমাত্র শুনলাম—

কি শুনলি?

ফোনে মন্ত্রিক বললে, রাধারমণ পালকে নাকি সে অ্যারেস্ট করেছে, তার মতে সেই নাকি খুনী।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। সুব্রত কঠে আগহের সুর।

আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে আসি, তুই কৃষ্ণর কাছে সব শোন্।

কিরীটি উঠে গেল ঘর থেকে।

আধঘন্টা পরে স্নান সেরে একেবারে বেরুবার পোশাকে সজ্জিত হয়ে কিরীটি ঘরে এল।

কি রে, শুনলি?

শুনলাম, আর এও বুঝলাম মণীশ চক্রবর্তী আর একটা গোল খেয়ে বসে আছে।

বুঝলি কি করে? কৃষ্ণর সঙ্গে মত বিনিময় হল বুঝি? বলতে বলতে আড়তে কিরীটি স্তুর দিকে তাকাল।

না, তোর গৃহিণী তো কুলু কুল না কিছুতেই। সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, তাহলে তুই একটু বোস, আমি একটু ঘুরে আসি।

কতদূর যাবি? সুব্রত শুধায়।

বেশি দূর না—কাছাকাছি।

ঐ সময় ঘরের টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

কিরীটি এগিয়ে গিয়ে রিপিডারটা তুলে নেয়, কিরীটি বলে—

আমি মণীশ চক্রবর্তী কথা বলছি।

কি খবর বলুন? আঁ! কেমিক্যাল আনালিসিসের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে—বোক্সে কিছু পাওয়া যায়নি? প্লাসে এবং স্টেমাক কনটেন্টে বিষ পাওয়া গিয়েছে?

কি বিষ?... অ্যাট্রোপিন সালফেট? ঠিক আছে। হঁা, ভাল কথা—সন্ধ্যার দিকে একবার ফোন করবেন। কিরীটী হেলের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

সুব্রত শুধাল, কি? অ্যাট্রোপিন সালফেট বিষ পাওয়া গিয়েছে?

হঁা, অ্যাট্রোপিনের লিখাল ডোজটা বোধ হয়—এক থেকে দুই গ্রেন—কৃষ্ণ, এই আলমারি থেকে ডাঃ ঘোষের ফারমাকোপিয়াটা বের কর তো, এই যে লাল মলাটের বইটা—একেবারে ডান দিকে শেষে, দ্বিতীয় থাকে—

কৃষ্ণ আলমারি থেকে বইটা বের করে এনে কিরীটীর হাতে দিল। কিছুক্ষণ ধরে পাতা উচ্চে উচ্চে এক জায়গায় এসে তার দৃষ্টি নিবন্ধ হল। পড়তে লাগল।

একটু পরে বইটা বন্ধ করে কৃষ্ণের হাতে দিতে দিতে বললে, আশচর্য! লোকটা ঐ বিশেষ বিষটা যে এত দ্রুত এত অল্প ডোজে কার্যকরী, তা জানল কি করে?

কিরীটী পুনরায় বসে সোফার উপর, একটা সিগারেট ধরায়।

কৃষ্ণ, তোমাকে বলেছিলাম না দুদিন পরে মীমাংসা হবে?

হঁা।

তার আর দরকার হবে না বোধ হয়, মিসিং লিঙ্কটা পেয়ে গিয়েছে।

সত্য!

বোস् সুব্রত তুই, যাস নে। ঘন্টা দেড়েক-দুয়েকের মধ্যে ঘুরে আসছি।

বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল, চললাম।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ বার ॥

কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলে দিয়ে সুভদ্রা যেন একটু অবাকই হয়, কিরীটীবাবু আপনি!

হঁা, একটা কথা গত সন্ধ্যায় জিজ্ঞাসা করা হয়নি। চলুন না ভিতরে।

আসুন। অনাসঙ্গ গলায় সুভদ্রা কিরীটীকে যেন আহুন জানালে।

গত রাত্রের সেই ঘর। শয়্যাটা এলোমেলো হয়ে আছে এখনও। তখনও গুছিয়ে পাট করা হয়নি শয়্যাটা।

কিরীটী একবার আড়চোখে শয়্যাটা দেখে নিলে। শুনলাম শ্যামলবাবু যাত্রাদলের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন? কিরীটী কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

তাই নাকি! শুনিন তো—কে বললে?

শুনলাম। তাহলে আপনিও বোধ হয় এই দল থেকে চলে যাবেন?

না। তা কেন যাব?

যাবেন না! শ্যামলবাবু চলে যাবেন, অথচ আপনি—

তার যদি না পোষায় তো সে চলে যাবে, আমি চাকরি ছাড়তে যাব কেন?

শ্যামলবাবু যদি আপন্তি করেন?

করবে না—আর করলেই বা।

তা আপনাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?

বিয়ে?

হঁা, শ্যামলবাবুর আর আপনার?

হস্তদণ্ড হয়ে এই সময় রাধারমণ পাল এসে থারে চুক্স, সুভদ্রা, শুনেছ?

রাধারমণ পাল কিরীটীকে অক্ষয় করেনি প্রথমটায়, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে হঠাতে নজরে পড়ে গেল কিরীটীকে।

একটু থেমেও যেন থত্তমত থেয়ে বললে, কিরীটীবাবু, আপনি ?

কি হয়েছে পাল মশাই ? কিরীটী শাস্ত গলায় প্রশ্ন করল।

সুজিতকে প্রতরাত্রে সে যখন বাড়ি ফিরছে, তার গলির মধ্যে কারা যেন পিছন থেকে ছোঁয়া মেরেছে।

মে কি ! একটা ভয়ার্ত স্বর যেন বের হয়ে এল সুভদ্রার কষ্ট থেকে।

কুতে কখন ? কিরীটী আবার শাস্ত গলায় প্রশ্ন করল, মানে রাত ক'টা হবে ?

ও তো বলছে রাত প্রায় বারোটা সোয়া-বারোটা হবে।

সুজিতবাবু এখন কোথায় ?

বাসুর হাসপাতালে—কেবল একটু আগে হাসপাতাল থেকে আমাকে অফিসে ফোন করেছিল।

কে ?

সুজিত।

আঘাতটা খুব বেশি হয়েছে ? কিরীটী পুনরায় শাস্ত গলায় প্রশ্ন করে।

না, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে। বাঁ দিককার ঠিক কাঁধের নীচে নাকি হাতের উপর দিয়ে গিয়েছে।

এখন তিনি কোথায় ?

তার বাসা কালীঘাটে। আমি তো সেখান থেকেই আসছি।

প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই তো পাল মশাই ? সুভদ্রা এতক্ষণে প্রশ্ন করে।

নাঃ, খুব বেঁচে গিয়েছে এয়াত্রা। নেহাত বোধ হয় পরমায় ছিল। কিন্তু আমি ভাবছি সুভদ্রা, কে এভাবে আমাদের সর্বনাশ করছে! সেদিন সামন্ত মশাই গেলেন, কাল আবার সুজিতের প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা—

পাল মশাই !

হঠাতে কিরীটির ডাকে রাধারমণ পাল ওর দিকে ফিরে তাকাল।

বলতে পারেন, হরিদাস সামন্তের কি চোখের অসুখ ছিল ?

না তো ! কেন ?

না—আচ্ছা, আপনাদের দলের আর কেউ কি ইতিমধ্যে চোখের ব্যাপারে ভুগছিলেন ?

কেন, আমিই তো কিছুদিন থেকে কষ্ট পাচ্ছি—চোখের ডাঙ্গার দেখছেন আমার সেবা চন্দননগরে যেদিন পালা গাইতে যাই তার পরের দিনই বিকেলে ওষুধ লাগিয়ে চোখের ডাঙ্গারের কাছে আমার যাবার কথা ছিল।

গিয়েছিলেন ?

না—দেখছেন তো কি ঝঞ্জাটের মধ্যে ক'টা দিন যাচ্ছে।

তা ঠিক। তা ডাঙ্গারটি কে ?

ডাঃ চ্যাটার্জি, ধর্মতলার আই-স্পেশালিস্ট।

যে ওষুধটা লাগাবার কথা ছিল সে ওষুধটা তৈরী করানো হয়েছিল ?

হ্যা, এখনও আমার অফিস-ঘরেই বোধ হয় রয়েছে।

ফিরে গিয়ে অফিস-ঘরে ওষুধটা আছে কিনা আমাকে একবার জানাবেন—বাড়িতে আমায় ফোন করে আর ঘন্টা তিমেক বাদে।

বেশ।

ভুলবেন না যেন। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

কিরীটী আর দাঁড়াল নাম। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী গৃহে ফিরে এল। সুব্রত তখন কৃষ্ণের সঙ্গে গল্প করছিল।

সোফায় বসতে বসতে কিরীটী বললে, মিলে গেছে—দুয়ে দুয়ে চার।

হত্তাকারী তাহলে—

হ্যাঁ সুব্রতের প্রশ্নের উত্তরে কিরীটী বললে, নিজের হাতেই নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিয়েছে আমার হতে।

সুব্রত ও কৃষ্ণ দুজনেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না, কারণ ওরা তো জানেই—নিজে থেকে মুখ না খুললে ও-মুখ খোলানো যাবে না।

বিকেলের দিকে তিনটে নাগাদ রাধারমণ পালের ফোন এল কিরীটীর কাছে।

সংক্ষিপ্ত দু-চারটে কথা হল। তারপর কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

সুব্রত কিরীটীর বাড়িতে ছিল। যায়নি—কৃষ্ণ যেতে তাকে দেয়নি।

কৃষ্ণ, আর একপ্রস্থ চা হলে মন্দ হত না—সুব্রত বললে।

সুব্রতের কথায় কৃষ্ণ উঠে গেল ঘর থেকে।

সুব্রত বললে, চা থেয়ে এবার যাব।

বোস্ না, ব্যস্ত কি!

কিরীটী তাকে থাকবার অনুরোধটা জানাল বটে, কিন্তু সুব্রতের মনে হয় কিরীটী যেন একটু অন্যমনস্ক—কেমন যেন ভিতরে ভিতরে একটা অস্ত্রিতা।

সুব্রত জানে কোন রহস্যের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছালে কিরীটী অমনি ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অস্ত্রি হয়ে ওঠে।

কথা বলে কম এবং সংক্ষিপ্ত। বোঝা যায় ও যেন কথা বলতে চায় না।

কিরীটীর দিকে তাকাল সুব্রত। কিরীটী সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে। মুখে ভুলস্ত সিগার। ধূমপান করছে কি করবে বোঝবার উপায় নেই।

গ্রীষ্মের শেষ প্রহরের প্লান আলো বাইরে। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে।

ওর বসবার ভদ্রিতে নিষ্ঠুরতার মধ্যে যেন একটা প্রতীক্ষার ইঙ্গিত।

কিরীটী কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছে? কিংবা কোন সংবাদের জন্য কান পেতে আছে যেন!

কৃষ্ণ জংলীর হাতে ট্রেতে চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটী যেন একটু দ্রুত চক্ষুল পদবিক্ষেপেই এগিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। কিরীটী রায়—কে, সুশান্তবাবু? বলুন, তারপর—কৃষ্ণনগরে যায়েছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, মারা গেছে অনেক দিন আগে? হ্যাঁ! ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

কিরীটীর কঠস্বরে চোখে-মুখে যেন একটা চাপা উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে ধ্রা পড়ে।

রিসিভারটা নামিয়েই আমৰায় তুলে নিয়ে ডায়েল করে কিরীটী, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কিরীটী
রায়—হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা করে রাখবেন, ঠিক রাত এগারোটায় যেমন বলেছি মিট্ করবেন,
হ্যাঁ, যেখানে বলেছি স্থানেই।

আবার হেমু আমিয়ে ডায়েল করল কিরীটী কাকে যেন, আমি কিরীটী রায় কথা
বলছি—যে দ্বিতীয় ছেলেকে নজর রাখতে বলেছিলেন, তারা যেন এক মুহূর্তের জন্যও নজর
না দিবিয়ে নেয়। হ্যাঁ, ইনস্ট্রাকশন দিন—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাড়িতে ফোন করবে,
আপনাকেও সংবাদটা দেবে।

 কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পুনরায় এসে সোফায় গা ঢেলে দিল।

কিরীটীর চোখে-মুখে দুপুর থেকে যে দুশ্চিন্তাটা প্রকট হয়ে উঠেছিল সেটা যেন আর
অবশিষ্ট নেই।

মনে হচ্ছে শেষ দাবার চালাটি যেন দিলি! সুব্রত বললে।

সুত্রণলো সবই হাতের মধ্যে এসে গিয়েছে, একটা জ্যাগায় শুধু একটা ছোট্ট গিট্,
সেটা খুলতে পারলেই—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, আবার ফোন বেজে উঠল।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা হাতে তুলে নিল, কিরীটী রায়। কে, পাল মশাই?
তবে কি আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন চন্দননগরে? নেননি—আপনার অফিস-
ঘরেই ছিল? আমিও সেই রকমই অনুমান করেছিলাম। খুজে পাবেন না তাও জানতাম,
কাল সকালে আসবেন।

কিরীটী রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল, তারপর কৃষ্ণার দিকে ফিরে বললে, কৃষ্ণ,
আমি পাশের ল্যাবরেটোরী ঘরে আছি। যে কোন সময় একটা ফোন আসতে পারে, এলে
আমাকে ডেকো। সুব্রত, যাস না—হয়তো বেরলে হতে পারে রাত্রে।

কিরীটী আর কোন কথা বললে না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ তের ॥

ফোন এল রাত দশটার কিছু পরে।

কিরীটীকে ডাকতে হল না। সে সজাগ ছিল। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে রিসিভারটা তুলে
নিল।

অন্য পক্ষ কি কথা বললে বোঝা গেল না ফোনের অপর প্রান্ত থেকে, কেবল কিরীটী
একটিমাত্র জবাব শোনা গেল, ঠিক আছে, মশিক সাহেবকে ফোন করে দিন।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, খাবার হয়েছে কৃষ্ণ?
হ্যাঁ। দেব?

হ্যাঁ, আমাদের খাবার দিতে বল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আধগাংটার মধ্যেই দুজনে বেরল।

হীরা সিং?

জী সাব!

শ্যামবাজার চল।

শ্যামবাজারে সুভদ্রার গৃহে পৌছতে আধ ঘন্টার বেশি লাগে না।

কিরীটী আর সুব্রত গলির মধ্যে চুকে দরজার কলিং বেলটা টিপল কিরীটী।

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল।

সুভদ্রাই দরজা খুলে দিয়েছিল, কিরীটিবাবু এত রাত্রে, কি ব্যাপার?

চলুন ভিতরে, আপনাকে একটা সংবাদ দিতে এসেছি।

সুভদ্রা কিন্তু দরজা ছাড়ে না, কেমন যেন একটা ইতস্ততঃ ভাব।

আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন কিরীটিবাবু।

জানি আপনি কি ব্যাপারে ব্যস্ত। কিন্তু আমার প্রয়োজনটা অনেক বেশি।

আপনি ক্ষমতা আসবেন—বলতে বলতে সুভদ্রা কিরীটির মুখের উপরই যেন দরজাটা বন্ধ করবার উপক্রম করে।

কিরীটি কিন্তু হাত দিয়ে দরজার পাণ্ডা দুটো ঠেলে শাস্ত গলায় বললে, কোন লাভ হবে না সুভদ্রা দেবী। আপনার যত কাজই থাক এখন, এবং আপনি যত ব্যস্তই থাকুন, আমাকে ঘরে যেতে দিতেই হবে, আমার কথাও আপনাকে শুনতেই হবে।

কিন্তু আপনি কি জোর-জবরদস্তি করবেন নাকি?

সে রকম করবার কোন ইচ্ছা, বিশ্বাস করুন, সত্যই আমার নেই, তবে আপনি যদি আমাকে বাধ্য করেন—

এটা আমার বাড়ি কিরীটিবাবু!

সুভদ্রার গলার স্বর তীক্ষ্ণ এবং কঠিন।

অবশ্যই, এবং সেটা না জানার তো কোন হেতু নেই। চলুন ভিতরে।

না।

সুভদ্রা দেবী, পুলিস আশপাশেই আছে, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না আশা করি, তাদের সাহায্য আমি নিই!

পুলিস!

হ্যাঁ, চলুন ভিতরে।

সহসা সুভদ্রার কঠস্বরের যেন পরিবর্তন ঘটল।

সে বললে, আপনি পুলিস নিয়ে এসেছেন? কিন্তু কেন, কি করেছি আমি?

ভিতরে চলুন সব বলছি।

সুভদ্রা মুহূর্তকাল স্তুত হয়ে যেন কি ভাবল। তারপর বললে, বেশ। আসুন।

বসবার ঘরেই বসাতে যাচ্ছিল সুভদ্রা কিরীটিকে, কিন্তু কিরীটি বললে, না, আপনার শেষবার ঘরে চলুন।

শোবার ঘরে?

হ্যাঁ, চলুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল, সুভদ্রার শয়ার উপরে বসে আছে সুজিতকুমার, ঢুকে ও হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

নমকার সুজিতবাবু, চিনতে পারছেন?

হ্যাঁ, কিরীটিবাবু। সুজিত বললে।

ভাসই হল সুজিতবাবু, আপনাকে কয়েকটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করার ছিল, দেখা হয়ে গেল এখানেই, আপনার কালীঘাটের বাড়িতে আর ছুটতে হল না।

হ্যাঁ, আজ দুপুরে গিয়ে সুভদ্রা এখানে আমার নিয়ে এসেছে।

ভাসই করেছেন উনি, ওখানে তো সেবা করার মত কেউ আপনার ছিল না। কিরীটি

বললে।

বসুন না কিরীটিবাবু, দাঁড়িয়ে কেন? সুজিত বললে।

আপনি তো বসতে বিছুলেন, সুভদ্রা দেবী তো ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না বাড়িতে।
সে কি! কেন সুভদ্রা সুজিত প্রশ্নটা করে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

আপনার এ ক্ষমতায়ে এখানে উপস্থিতিটা হয়তো বাইরের লোক কেউ জানুক সুভদ্রা
দেবীর ইচ্ছা ছিল না, তাই না কি সুভদ্রা দেবী?

কথটা বলে আড়চোখে তাকাল কিরীটী সুভদ্রার দিকে।
সুভদ্রা চুপ। কোন কথা বলে না।

কিরীটী আবার বললে, যাক, একপক্ষে ভালই হল, দুজনের সঙ্গে একই জায়গায় দেখা
হুয়ে গেল। তারপর, কেমন আছেন? হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল?

হ্যাঁ। বললে ডাক্তাররা আঘাতটা অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। ভাগ্যে নেহাত অপাধাতে
মৃত্যু ছিল না বলেই—হাসতে হাসতে বললে সুজিত।

হ্যাঁ, ভাগ্য নিশ্চয়ই বলতে হবে। তা কে পিছন থেকে আপনাকে আঘাত করল
জানতেই পারলেন না? দেখতেও পেলেন না লোকটাকে সুজিতবাবু?

অন্ধকারে ছোরাটা মেরেই ছায়ার মত অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেল কিরীটীবাবু!
তাছাড়া রক্তে তখন আমার সারা জামা ভিজে গিয়েছে, প্রায় ফের্ণেট হবার যোগাড়। এই
অবস্থায় আততায়ীকে দেখবার মত অবস্থা কি থাকতে পারে!

তা সত্যি।

তা উনি—সুব্রতকে দেখিয়ে সুজিত বললে, ওঁকে তো চিনতে পারছি না!

উনি আমার এক ছোটবেলার বন্ধু, কৃষ্ণনগরে চাষাপাড়ায় ওঁর বাড়ি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, আপনারও কৃষ্ণনগরে ঐ পাড়াতেই বাড়ি সুজিতবাবু, তাই না? ভাল কথা,
রঞ্জিত বিশ্বাসকে আপনি চেনেন?

রঞ্জিত বিশ্বাস! কে বলুন তো?

চিনতে পারছেন না, অথচ তিনি বলছিলেন, একসঙ্গে এক বছর আপনারা আর্ট স্কুলে
পড়েছিলেন! কিরীটী বললে।

ও! হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা তাকে আপনি চেনেন নাকি?

চিনতাম না, তবে—

তবে?

সেদিন চেনা-পরিচয় হল, তাঁর কাছেই শুনছিলাম—

কি শুনেছেন?

আপনি ছোটবেলা থেকেই ভাল অভিনয় করতে পারতেন, শেষ পর্যন্ত তাই খোঁস হয়
আঁকার লাইন ছেড়ে অভিনয়ের লাইনটাই বেছে নিলেন।

হ্যাঁ, ও হল কমাশিয়াল অর্টিস্ট আর আমি হলাম অভিনেতা। তা রঞ্জিত বিশ্বাস এখন
কোথায়? অনেক দিন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

এবারে হয়তো হবে।

কলকাতায় থাকলে হবে বৈকি। কিন্তু আপনি একটু আগে যেন বলছিলেন আমাকে
আপনার কি জিজ্ঞাসা করবার আছে?

হ্যাঁ, দুটো কথা।

কি বলুন তো?

দুর্ঘটনার রাত্রে—অর্থাৎ যে রাত্রে হরিদাস সামন্তকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়—মন্দের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে—

বলেন কি! সত্ত্ব নাকি ব্যাপারটা?

॥ চৌদ্দ ॥

হ্যাঁ সুজিতবাবু ব্যাপারটা নিষ্ঠুর সত্য এবং সেটা কি বিষ জানেন—শাস্ত গলায় কথাটা বলে কিরীটী পর্যায়ক্রমে সুজিত ও সুভদ্রার দিকে তাকাল।

কি বিষ? সুজিত প্রশ্ন করে।

কিরীটী পূর্ববৎ শাস্ত গলায় বললে, অ্যাট্রোপিন সালফেট, যার থেকে দু গ্রেনেই অবধারিত মৃত্যু একজন মানুষের।

বলেন কি!

তাই এবং সে বিষ তাঁকে তাঁর মন্দের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কে—কে তাকে মন্দের সঙ্গে বিষ দিতে পারে? ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয় তো!

Suicide!

না। শাস্ত গলায় কঠিন ‘না’ শব্দটা যেন উচ্চারিত হল কিরীটীর কষ্ট হতে, ব্যাপারটা আদৌ আত্মহত্যা নয়।

নয় কি করে জানলেন?

জেনেছি, এবং সে প্রমাণও আমার কাছে আছে। কথাটা বলে পুনরায় কিরীটী সুভদ্রার দিকে তাকাল।

সুভদ্রা যেন পাথর।

সে যেন কেমন অসহায় বোৰা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর দিকে।

সুভদ্রা দেবী, আপনি সন্তুষ্টভৎ: জানেন ব্যাপারটা, আপনিই বলুন না—হরিদাসবাবুকে মন্দের সঙ্গে বিষ কে দিতে পারে বা কার পক্ষে সন্তুষ্ট ছিল সে-রাত্রে?

আমি—আমি কি করে জানব?

কিন্তু আমার মনে হয় সুভদ্রা দেবী, ব্যাপারটা আপনি জানলেও জানতে পারেন।

আমি?

হ্যাঁ—বলুন সুভদ্রা দেবী, কে সে-রাত্রে সামন্ত মশাইয়ের মন্দের সঙ্গে বিষ দিতে পারে? কিরীটীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ।

সুভদ্রা, সত্যি তুমি জান? প্রশ্ন করল এবার সুজিত।

না, না—

বলুন সুভদ্রা দেবী, বলুন—কারণ, রাত সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে অর্থাৎ তৃতীয় অক্ষের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে সে-রাত্রে আপনি হরিদাসবাবুর ঘরে বিভায়বার গিয়েছিলেন।

প্রমাণ—

হ্যাঁ, এই ভাঙা—বলতে বলতে পকেট থেকে সে-রাত্রে সাজঘরে কুড়িয়ে পাওয়া কাচের আয়না-বসানো চূড়ির টুকরোটা বের করে বললে, চূড়ির টুকরোটাই সে প্রমাণ দেবে, দেখুন তো, চিনতে পারছেন কি না, এই ভাঙা টুকরোটা যে চূড়ির সেটা সে-রাত্রে অভিনয়ের সময় আপনার হাতে ছিল—

সুভদ্রা বোবা।

এখন বলুন সুভদ্রা দেবী, দ্বিতীয়বার কেন আপনি আবার সে-ধরে গিয়েছিলেন?

আ—আমি স্বামী। বিশ্বাস করুন—

গিয়েছিলেন শাস্ত কঠিন গলা কিরীটীর। বিষ মেশানো মদের বোতলটা সরিয়ে আনবার জন্য, তাই না?

আমি কিছু জানি না।

জানেন। বলুন সে বোতলটা কোথায়?

আমি জানি না—কিছু জানি না—বলতে বলতে সুভদ্রা সুজিতের দিকে তাকাল।

স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেন কি? আমার দিকে তাকিয়ে বলুন। কিরীটী আবার বললে।

কি বলছেন? উনি আমার স্বামী হতে যাবেন কেন? সুভদ্রা বলে ওঠে।

নন বুঝি! কিরীটীর কঠে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গের স্বর, কি সুজিতবাবু, উনি আপনার স্ত্রী নন? অবিশ্য এখনও জানি না বিবাহটা দশ বছর আগে আপনার কোন্ মতে হয়েছিল। হিন্দুমতে পূর্ণত ডেকে, না রেজিস্ট্রি করে, না শৈবমতে, না কেবল কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর ছুইয়ে—

কোন মতেই আমাদের বিবাহ হয়নি। কি সব পাগলের মত যা-তা বলছেন। সুজিত বলে ওঠে।

আমি পাগল, তাই না! এবাবে বলুন সুভদ্রা দেবী, আপনার গলার হীরের লকেটা কোথায় গেল? কিরীটী বললে।

লকেট! কিসের লকেট?

আপনার গলায় যে সুর হারটা আছে তার সঙ্গে একটা লকেট ছিল, লকেটটা কোথায়? সেই লকেটটা যে হরিদাসবাবুর হাতে গিয়ে পড়েছিল সেটা জানতে পেরেই বোধ হয় মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, যেহেতু বুবেছিলেন আসল সত্যটা তাঁর কাছে ফাঁস হয়ে গেছে, তাই না? এতদিনের অভিনয়টা আপনাদের ধরা পড়ে গেছে তাই ভেবে মরীয়া হয়ে, না সুভদ্রা দেবী—উঁহ, কোমরে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি কোমরে দোকার কৌটোর মধ্যে দোকার সঙ্গে কি মেশানো আছে।

সুভদ্রা হাতটা কোমর থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হল।

সুবৃত, সুভদ্রা দেবীর কোমরে গোঁজা দোকার কৌটো গোঁজা আছে, ওটা নিয়ে নে।

সুবৃত এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রার কোমরে গোঁজা দোকার ছেট্ট কৌটো ছিনিয়ে নিল।

আমি জানি সুভদ্রা দেবী, অবশ্যই অনুমানে নির্ভর করে, সুজিতবাবু আজ যদি আপনার গর্ভের সন্তানকে স্বীকৃতি না দিতেন তাহলে আপনি শেষ পথটাই নিতেন।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করে সুজিত হেসে উঠে বললে, চমৎকার একটা নাটক বচন করেছেন তো কিরীটীবাবু!

সত্যই নাটকটা চমৎকার সুজিতবাবু, আপনার ভিলেনের রোপাটও অপূর্ব হয়েছে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত। তবে জানেন তো, সব নাটকেই ভিলেনের শেষ পরিণতি হয় জেল, নয় ফাঁসি।

কিরীটীর কথা শেষ হল না, অকস্মাত যেন বাধের মত ঝাপিয়ে পড়ল একটা ধারাল ছোরা কোমর থেকে টেনে নিয়ে সুজিত কিরীটীর উপরে।

কিন্তু কিরীটী অস্তর্ক ছিল না, চকিতে সে সরে দাঢ়ায়।

সুজিত হমড়ি থেয়ে দেঙ্গালের উপর গিয়ে পড়ে গেল।

সুরত সেই সুযোগটা হে঳ায় হারায় না, লাফিয়ে পড়ে সুজিতের উপর। সুজিতের সাধ্য ছিল না সুরতের শারীরিক বলের কাছে দাঁড়ায়। তাই সহজেই সুরত তাকে চিৎ করে ফেলে মাটিতে।

কিরীটী তার পাকেটে যে বাঁশীটা ছিল তাতে সজোরে ঝুঁ দিল।

মল্লিক সামনে তাঁর দলবল নিয়ে প্রস্তুতই ছিলেন কিরীটীর পূর্ব নির্দেশ মত বাড়ির সামনে, সকলে ছুটে এল ঘরে।

প্রবের দিন সকালে দুই প্রস্তু চা হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় প্রহ্লের সঙ্গে কিরীটী, সুরত, মল্লিক সাহেব, মণীশ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ—কিরীটীর বাড়ির বসবার ঘরে হরিদাস সামন্তের মৃত্যুর ব্যাপারেই আলোচনা চলছিল।

আলোচনা ঠিক নয়।

একজন বক্তা। সে কিরীটী। এবং অন্য সকলে শ্রোতা।

কিরীটী বলছিল : ব্যাপারটা সত্যিই একটা রীতিমত নাটক। এবং নাটকের শুরু নবকেতন যাত্রা পার্টিতে সুভদ্রার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং শেষ সুজিতের হাতে হাতকড়া পড়ার সঙ্গে।

সুভদ্রা তার মাঝীর আশ্রয় থেকে পালিয়ে যখন যায় তখনই সুজিতের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়। সুজিত সুভদ্রাকে ঠিকমত আইনানুগভাবে কোনদিন বিবাহ করেছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু সুভদ্রার বোধ হয় তা সত্ত্বেও সুজিতের উপর একটা দুর্বলতা ছিল, আর সে দুর্বলতাটুকুর পরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল শয়তান সুজিত।

সুজিতের চরিত্রে নানা দোষ ছিল, তার মধ্যে রেসের মাঠ ও জুয়া—অভিনয় সে ভালই করত, কিন্তু ঐ মারাত্মক নেশার দাস হওয়ায় তার সে প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটাও খারাপ হয়ে যায় চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলার জন্য। সে ক্রমশঃ পারফেক্ট ভিলেনে রূপান্তরিত হয়।

এদিকে সুভদ্রাও তাকে ছাড়বে না, সুজিতের পক্ষেও তার ভার বয়ে চলা সম্ভব নয়। তখন সুজিতই এক উপায় বের করল। সুভদ্রার অভিনয়ের নেশা ছিল, সে তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল পাল মশাইয়ের কাছে। বেশ চলছিল এবং চলতও হয়তো দুজনের, কিন্তু মাঝখানে প্রৌঢ় হরিদাস সামন্ত পড়ে সব গোলমাল করে দিল।

হরিদাস সামন্তের লোভ পড়ল সুভদ্রার যৌবনের প্রতি। সে আকৃষ্ট হল এবং শয়তান সুজিত তখন দেখল ব্যাপারটায় তার লাভ বই ক্ষতি নয়। সে আর এক কৌশলে সুভদ্রাকে হরিদাস সামন্তের হাতে তুলে দিয়ে হরিদাসকে শোষণ শুরু করল।

হরিদাস টাকা যোগাতে লাগল, সুভদ্রার বোধ হয় ব্যাপারটা আগাগোড়াই পছন্দ হয়নি, সে অনন্যোপায় হয়ে শয়তান সুজিতের শাসনান্তি হরিদাসের রাঙ্গাত্তা হয়ে রইল।

কয়েক বছর বেশ ত্রিভাবেই হয়তো চলছিল, তারপরই ব্যাপারটা হরিদাসের কাছে ফাঁস হয়ে গেল।

কিন্তু কেমন করে ফাঁস হল, সেটাও অবিশ্যি আমার অনুমতি, হরিদাস সামন্ত হঠাতে কোন এক সময় সুভদ্রার গলার হারের লকেটটা বোধ হয় প্রস্তু। সেই লকেটের মধ্যে ছিল সুভদ্রা ও সুজিতের যুগল ফটো। হরিদাস ব্যাপার বুঝতে পেরে (আমার অনুমান অবশ্য) সুভদ্রাকে তিরক্ষা করে এবং টাকা দেওয়া বন্ধ করে। কারণ সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল সুভদ্রার হাত দিয়েই সুজিত তাকে শোষণ করে চলেছে।

সুজিত ব্যাপারটা জন্মতে পারল। এবং সে তখন হরিদাসকে নিশ্চয়ই শাসায়, প্রাণভয়ে ভৌত হরিদাস তখন আমার কাছে ছুটে আসে। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে বলতে সহস পায় না।

তবে সব কথাগুলো বললেও স্পষ্ট করে আভাসে যেটুকু বলে তাতে আমার বুবাতে কষ্ট হয় না, তাই বিপদ যাত্রাদলের মধ্যেই।

সন্দেহটা আমার আরও ঘনীভূত হয় সুভদ্রা হরণ নাটকের বিষয়বস্তু শুনে। তবে একটা কথা এখানে অঙ্গীকার করব না, শ্যামলকেই প্রথমে নাটকের বিষয়বস্তু শোনার পর সন্দেহ করি, তাই আমি নাটকটা দেখতে যাই।

সুব্রত প্রশ্ন করে, কিন্তু সুজিতকে তুই সন্দেহ করলি কখন?

সুজিতকে ঠিক প্রথমটায় সন্দেহ করিনি—কিরীটী বলতে থাকে, এইমাত্র তো বললাম আমার প্রথম সন্দেহ পড়ে শ্যামল ও সুভদ্রার উপরে। তাদের উপরেই আমি নজর রেখেছিলাম। কিন্তু বিষ ও চুড়ির টুকরো আমার মনের চিঞ্চাধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে।

হরিদাস সামন্তকে মন্দের সঙ্গে বিষ দেওয়া হয়েছিল, শ্যামল মদ্যপান করে না, কিন্তু সুজিত মদ্যপানে অভ্যন্তর ছিল—তাতেই মনে হয় আর যে-ই বিষ দিক না কেন মন্দের সঙ্গে মিশিয়ে, শ্যামল নয়, শ্যামল যদি বিষ না মিশিয়ে থাকে মন্দে তবে আর কে মেশাতে পারে—আর কে ঐ ব্যাপারে, অর্থাৎ হরিদাসকে পৃথিবী থেকে সরানোর ব্যাপারে interested থাকতে পারে!

প্রথমেই তারপর মনে হয়েছিল সুভদ্রার কথা। কিন্তু যে মুহূর্তে বুবাতে পারলাম সুভদ্রা অস্তঃসন্তা, তখুনি বুলাম সুভদ্রা তাকে বিষ দেয়নি, তার গর্ভের সন্তানের জন্মদাতাকে সে বিষ দেবে না।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, হরিদাস সুজিতকে টাকা দেওয়া বন্ধ করায় হয়ত সুজিত তাকে চাপ দিছিল, অর্থাৎ নিজের জালে জড়িয়ে সুভদ্রারও আর টাকা দেবার জন্য হরিদাসকে অনুরোধ করবার উপায় ছিল না। এমন সময় হয়ত একটা কথা তার মনে হয়েছিল, হরিদাসকে যদি বোঝাতে পারে গর্ভের সন্তান হরিদাসেরই তখন হয়ত হরিদাস আবার সুজিতকে টাকা দিতে পারে, সুভদ্রার প্রতি সন্দেহটা যেতে পারে, তাই আমার মনে হয়েছিল সুভদ্রা হরিদাসকে বিষ দেয়নি।

কাজেই সুভদ্রা যদি বিষ না দিয়ে থাকে তবে আর কে হতে পারে! শ্যামলও নয়—তাছাড়া শ্যামল তো সুভদ্রার মন পেয়েছিলই—সে কেন তবে হরিদাসকে ছেড়া করতে যাবে? তাহলে আর কে—হঠাতে তখন মনে পড়ল সুজিতের কথা! সুজিতই সুভদ্রাকে যাত্রার দলে এনেছিল। Then why not সুজিত?

ঐ পথেই তখন চিঞ্চা শুরু করলাম। মনে আরও সন্দেহ জাগল সুজিত সম্পর্কে, কারণ সে-ই বলেছিল সে-রাত্রের জ্বানবন্দীতে, সে নাকি সুভদ্রা ও শ্যামলকে হরিদাসের সাজাঘরে সে-রাত্রে টুকরতে দেখেছিল। মনে হল তবে কি ওদের উপরে সন্দেহ জাগানোর জন্যই সুজিত ওদের নাম করেছিল!

মনের মধ্যে কথাটা দানা বাঁধতে শুরু করল। তারপর ঐ চিরকুটটা—যেটা রাধারাণী তোলাকে দিয়েছিল শ্যামলকে দিতে।

নাটকের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় হরিদাসের হাতের নোটস ছিল, সে লেখার সঙ্গে

চিরকুটের লেখা যখন মিছন না, তখন বুবাতে বাকি রইল না চিরকুটটা জাল এবং শ্যামলকে ফাঁসানোর সেটা আর একটা ষড়যন্ত্র।

কার লেখা তবে চিরকুট! কে লিখতে পারে! শ্যামল নয়—তবে আর কে? আমার মনে হল, Why not সুজিত?

সুজিতের উপর সন্দেহটা আরও বেশী ঘনীভূত হওয়ায় তার সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলাম। কখনগরে খোঁজ নিতেই বের হয়ে গেল সে এককালে এক বছর আর্ট স্কুলে পড়েছিল। বুবলাম তখন সে-ই ঐ চিঠি লিখেছে হরিদাসের হাতের লেখা নকল করে। কিন্তু কেন? What was his motive?

নজর রাখলাম সুভদ্রা ও সুজিতের উপর। দেখা গেল সুজিত যাতায়াত করে সুভদ্রার ঘরে। তার ঘরের শয্যাও সেই সাক্ষ্যই দিয়েছিল।

সুজিত তখন আর একটা চাল চালল, একটা self-inflicted injury করে দেখাতে চাইল তাকে কেউ হত্যার চেষ্টা করেছে। হাসপাতালে attending ফিজিসিয়ানের রিপোর্ট থেকেই ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়ে গেল, কেউ তাকে ছুরি মারেনি, তাহলে ঐ ধরনের injury হতে পারে না।

যে কুয়াশাটা সুজিতকে ঘিরে ছিল সেটা এবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এদিকে ওদের দুজনের উপর থেকে নজর কিন্তু আমি সরাইনি।

সুভদ্রা অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুবাতে পেরেছিল তাকে আমি সন্দেহ করেছি, সেটা অবিশ্য তাকে আমি কিছুটা কথায়বার্তায় বুঝিয়েও দিয়েছিলাম এবং অনুমান করেছিলাম ঐ কারণেই যে সে এবারে নিশ্চয়ই ছুটে যাবে সুজিতের কাছে।

অনুমান যে আমার মিথ্যা নয়, প্রমাণিত হয়ে গেল। সে ছুটে গেল। যে মুহূর্তে সংবাদ পেলাম, আমরাও সুজিতের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। অবশ্য সুজিত দুটো মারাঞ্চক ভুল করেছিল।

সুব্রত শুধায়, কি?

কঢ়িগর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কিরীটী বললে, প্রথমতঃ সে অর্থাৎ সুজিত তার জবানবন্দিতে শ্যামলকুমার ও সুভদ্রার উপরে সকলের সন্দেহটা ফেলবার জন্য তাদের সে হরিদাস সামন্তর ঘরে চুকতে দেখেছিল কথাটা আমার কাছে বলে।

ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দিকে, অর্থাৎ শুরুতে হরিদাস সামন্তর কিছুক্ষণ appearance ছিল—বোধ হয় মিনিট কুড়ি, তারপরই সে চলে আসে এবং সে সময় সুজিতের নাটকে কোন appearance ছিল না।

হিসাবমত সেটা রাত সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা। এবং আমার অনুমান সেটা কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যেই কোন এক সময় সুজিত সবার অলঙ্কো হরিদাসের সাজঘরে চুকে—যেহেতু everything was pre-arranged-পূর্ব-পরিকল্পিত সে প্রস্তুতই ছিল। হরিদাসের মদের বোতলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে আসে।

সুব্রত শুধায়, সে বিষটা তাহলে—

কিরীটী বললে, ঐ সাজঘরের মধ্যেই ছিল, রাধারমণের চোখের অসুখের জন্য ডাক্তার যে eye drop দিয়েছিল তার মধ্যেই আ্যট্রোপিন সালফেট মারাঞ্চক বিষ ছিল।

বিষের শিশির সবটাই সুজিত হয়তো মদের বোতলে ঢেলে শিশির মধ্যে তার বোতল

থেকে মদ ঢেলে রাখে, ~~যেটা~~ পরে chemical analysis-এও প্রমাণিত হয়েছে। আর সেই কারণেই সুজিতের বোতাল কোন আ্যাট্রোপিন বিষ পাওয়া যায়নি analysis-এ।

কিন্তু কথা হচ্ছে ভুলটা কি? এবং কোথায়? সুভদ্রা নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে আসরেই চিল—তাই তার পক্ষে বিষ মেশানো সম্ভবপর ছিল না, অথচ সুজিত সেটা হিসাবের ঘট্টে গণ্য করেনি। সে শ্যামলকুমারের সঙ্গে সুভদ্রার নাম করে একই টিলে দুই পার্শ্ব মাঝবার ফন্দিতে সুভদ্রার নামটা করেছিল! এবং সে হয়তো জানত না, হরিদাস সুভদ্রাকে টাকা দেবার জন্য তৃতীয় অঙ্কে সে যখন free থাকবে তখন তাকে একবার তার সাজঘরে যেতে বলেছিল।

সুজিত যদি ঐ মাঝবার ভুলটা না করত, অর্থাৎ শ্যামলকুমারের সঙ্গে সুভদ্রারও নামটা আমাকে না জানাত তাহলে হয়তো তার গিল্টি কনসাসটা অত সহজে আমার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠত না। সন্দেহের তার প্রতি শুরু আমার সেখান থেকেই।

মণীশ চক্রবর্তী বললেন, তবে সুজিতই হরিদাস সামন্তকে বিষ দিয়েছিল?

হ্যাঁ। কিরীটী বললে, সুজিত মিছই। তবে সুভদ্রা বোধ হয় সুজিতকে হরিদাস সামন্তর সাজঘর থেকে বেরবার সময় দেখে ফেলেছিল। যে কারণে তার মনে তার প্রতি সন্দেহ জাগে।

কৃষ্ণ বললে, তবে সুভদ্রা সে কথা তোমাকে জানায়নি কেন তার জবানবন্দিতে?

কিরীটী বললে, ভুল তো তোমার সেইখানেই হয়েছে কৃষ্ণ।

ভুল! কৃষ্ণ স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে সুজিতকে সুভদ্রা প্রথমদিকে ভালবাসলেও, সুজিত যখন অর্থের লোভে অন্যাসেই তাকে হরিদাস সামন্তর মত এক প্রৌঢ় কামুকের হাতে তুলে দিল সে ভালবাসার আর অবশিষ্ট মাত্রও ছিল না—থাকতে পারে না, নারীর মন সে ব্যাপারে বড় কঠিন। অথচ সুজিতের কবল থেকে মুক্তিরও তখন আর তার কেন উপায় ছিল না।

আশ্চর্য! একবারও আমার সে কথা মনে হয়নি।

কিরীটী বললে, জানি, আর সেই ভুলেই তোমার কাগজে হয়তো লিখে রেখেছ হত্যাকারী সুভদ্রা, তাই না?

হ্যাঁ।

কিরীটী হাসল।

কিরীটী আবার বলতে শুরু করল, যাক যা বলছিলাম, সুজিত যে মৃহূর্তে ~~বৃক্ষতে~~ পেরেছিল সুভদ্রার মন শ্যামলকুমারের দিকে ঝুঁকেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেছে, সুভদ্রার গর্ভে হরিদাসের সন্তান থাকা সত্ত্বেও, তখনই সে ~~স্থির~~ করে তার plan of action—একই সঙ্গে শ্যামল ও সুভদ্রাকে সরাতে হবে, কারণ সে তো বুঝেছিলই—সুভদ্রা হরিদাসের কাছে না থাকলে তাকে দোহন আর চলবে না। শ্যামলকুমারকে দোহন করা সম্ভবপর হবে না।

মন্ত্রিক সাহেবের শুধালেন, তারপর? বলুন, থামলেন কেন মিঃ রায়?

কিরীটী আবার বলতে লাগল, শ্যামল ও সুভদ্রা ~~দুজনকেই~~ একসঙ্গে কেমন করে ফাঁসানো যায় ভাবতে ভাবতেই হয়তো সুজিত এই পথটি বেছে নিয়েছিল and plan was successful—কেউ ধরতে পারত না তাকে অত সহজে, যদি না সে আগ বাড়িয়ে ওদের দুজনের নাম করে বসত আমার কাছে।

আচ্ছা, একটা কথা—কৃষ্ণ! বলে, সুভদ্রা কি কোনদিনই সুজিতকে ভালবাসেনি? বাসেনি—তা তো বলোন! তবে রমণীর মন তো—আর তার বদলের কারণও তো আগে কিছুটা বলেছি। এবং শেষে শ্যামলকুমারের আবির্ভাব রঙমঞ্চে, যার প্রতি মন যে কোন নারীর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সন্তুষ্ট ছিল।

আচ্ছা, তামার কি ধারণা—কৃষ্ণ আবার প্রশ্ন করে, শ্যামল জানতে পেরেছিল সুভদ্রা মা হ্যাত চালছে?

সন্তুষ্টবত জানতে পেরেছিল—বা হয়তো সুভদ্রা ধরা পড়ে গিয়েছিল। তবে সেটা তো ক্ষেত্রের মিলনের ব্যাপারে আজকালকার দিনে কলকাতা শহরে অসংখ্য ব্যবহৃত থাকায় এমন কোন অস্তরায় হত না। তখন ঐ ধরনের কাঁটা অনায়াসেই তারা পরে দূর করে নিতে পারত।

থাক সে কথা। এবাবে সুজিতের দ্বিতীয় ভুলের কথায় আসা যাক—what was his second mistake!

কিরীটি বলতে লাগল, সুজিত নিশ্চয়ই হরিদাসের সাজঘর থেকে বের হয়ে আসবাব সময় সুভদ্রাকে লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু সুভদ্রা যখন হরিদাসের ঘরে গিয়ে ঢেকে, হরিদাসের তখন already মৃত্যু হয়েছে—সে কথাটা সুজিত জানত, কারণ হরিদাস অভিনয় করার সময় ঘন ঘন মন্দ্যপান করত। আর সে-রাত্রে সুভদ্রার বর্ধমানে চলে যাবার কথা শুনে আরও নিশ্চয়ই মনটা তার বিক্ষিপ্ত ছিল, তাই হরিদাস আসব থেকে এসেই মন্দ্যপান করবে যেমন সে জানত, তেমনি এও সে জানত, সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হবে।

কাজেই সুভদ্রা যখন টাকার জন্য হরিদাসের সাজঘরে ঢুকেছিল—তাকে follow করে সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে নিঃসন্দেহে—সুজিতের ঐ সময় সাজঘরে ঢেকাটাই দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল।

দুজনে সাজঘরে মুখেমুখি হল। যা ছিল অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে—সুভদ্রার মনে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঐ জন্যই পরে। তবে এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার বোধ হয় ঘটেছিল। সুজিতকে বোধ হয় সুভদ্রা কিছু বলে, ফলে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হয় যে সময় সুভদ্রার হাতের চুড়ি একটা ভেঙে যায়। আর ঐ চুড়িরই ভগ্নাংশ প্রমাণ দেয় ঘরের মধ্যে মৃত্যুর ঠিক আগে বা পরে কোন এক সময় সুভদ্রা হরিদাসের ঘরে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করেছিল।

যা হোক, সুজিতের প্রতি আমার সন্দেহটা ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠল, আমি তার উপরে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করলাম। তার প্রতিটি movement-এর উপরে দৃষ্টি রাখা হল। জন্ম গেল সুজিতই সে রাত্রে গিয়েছিল সুভদ্রার গৃহে হরিদাসের মৃত্যুর পর, শ্যামলকুমার মৃত্যু।

আর সুজিত যে যায় সেখানে, তার প্রমাণ সুভদ্রার ঘরে গিয়ে আমি স্থচক্ষে যাচাই করে এসেছি।

এদিকে শ্যামল দলে notice দিল সে দল ছেড়ে দেবে। বুরলাম বা অনুমান করলাম, শ্যামলকুমার ও সুভদ্রা ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবার ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে এও মনে হল এ সুজিত নিশ্চয়ই তা হতে দেবে না।

হয়তো সুভদ্রাও সেটা বুঝতে পেরেছিল, আর তাইতেই সে বুঝতে পেরেছিল সুজিতের সঙ্গে তার একটা শেষ বোঝাপড়া করা দরকার। আর সেই বোঝাপড়ার জন্য তার তৃণে মোক্ষম তীরও রয়েছে—হরিদাসের সাজঘরে তার সে-রাত্রে যাবার ব্যাপারটা।

জানতাম সুভদ্রাকে সুজিতের ওখানে যেতেই হবে, বিশেষ করে সুজিত যখন নিজেকে নিজেজ্ঞান্ত করে বোঝাবার চেষ্টা করল সকলকে, তার life-এর উপরেও attempt নেওয়া হয়েছে।

আমরা constant watch রাখলাম, সুভদ্রা গেল গত বাত্রে সুজিতের বাসায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জানতে পারলাম। সব ব্যবহৃত আগে থেকেই করা ছিল, আমরাও বের হয়ে পড়লাম। বোঝাপড়া ওদের মধ্যে কতদূর হয়েছিল জানি না, তবে দুজনেই অকস্মাত আমাদের আবির্ভাবে থতমত খেয়ে গেল, ওদের মুখের চেহারা, ওদের হাবভাব স্পষ্ট জানিয়ে দিল দোষী কে?

খুনী কে আর একবার অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝলাম আবারও—আমার অনুমান মিথ্যা নয়।

তবে হ্যাঁ, এও বলব, সুজিত মিত্র একজন অতীব দক্ষ অভিনেতাই কেবল নয়, নার্ডও তেমনি শক্ত তার এবং আমরা সেখানে ঐ সময়ে গিয়ে উপস্থিত না হলে সুজিতের কোমরে লুকানো ছোরার আঘাতেই সুভদ্রাকেও হয়তো সে-বাত্রে প্রাণ দিতে হত শেষ পর্যন্ত।

এই হচ্ছে মোটামুটি কাহিনী।

কিরীটী থামল।

হাত বাড়িয়ে চুরোটের বাক্স থেকে একটা চুরোট ও লাইটারটা হাতে তুলে নিল।

সুব্রত বললে, কৃষ্ণ, চা।

কৃষ্ণ উঠে গেল।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ওরা—সুভদ্রা ও শ্যামল হির করেছিল চলে যাবে এবং নাটকের শেষ দৃশ্যেও ছিল সুভদ্রাকে হরণ করে নায়ক পালাবে, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠবে না—সুভদ্রাকে আর হরণ করা হবে না নায়কের, যেমন শ্যামলকুমারেরও আর সুভদ্রাকে নিয়ে চলে যাওয়া হল না। ক্লিপক নাটক শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর সত্ত্বে পরিণত হল।

বিদ্যুৎ-বহি

irboi.nect

irboi.nect

॥ এক ॥

পাইপটা নিতে গিয়েছিল।

কিরীটী নতুন করে আবার পাইপে অগ্নিসংযোগ করে, পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া উদ্বারণ করে বলে, কথাটা কারোরই অজানা থাকবার কথা নয়। কারণ ঐ দিন সকা঳েই হংরাজী বাংলা সব কাগজে ঘোষণা করা হয়েছিল কলকাতা শহরের কোন কেন্দ্র এলাকায় সেদিন রাত্রে নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে অর্থাৎ নিষ্পত্তীপ হবে।

তালুকদার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তার মানে, তুমি কি বলতে চাও কিরীটী ?

এইটুকুই তোমাকে বলতে চাই তালুকদার যে, হত্যাকারী পূর্ববিজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্পত্তীপের ঐ গোল্ডেন অপারচুনিটিকুর অত্যন্ত সুচারু ভাবে সত্যিকারের বুদ্ধিমানের মত সম্ভবহার করেছে।

তা না হয় মানলাম বুদ্ধিমানের মত নিষ্পত্তীপের পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়টুকু সম্ভবহার করেছে—কিন্তু হত্যাকারী এটা তো জানত না যে, ঠিক সেই সেইদিনই ব্রজদুলাল সাহা সঙ্ক্ষার ভাই কাউটে মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসবেন। তাঁর ফিরে আসাটা তো জানতে পেরেছি আমরা—অফিসের জরুরী ট্রাঙ্ককল পেয়ে অকশ্মাত।

সম্ভবতঃ তা নয়।

তা নয়, মানে ?

মানে আমার ধারণা—

কি ?

ব্রজদুলাল সাহার মাদ্রাজ থেকে অকশ্মাত প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারেও হত্যাকারীর হাত ছিল।

তুমি কি বলতে চাও কিরীটী ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তালুকদার কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।
কিরীটী কিন্তু একান্তই নির্বিকার।

সোফার উপরে শরীরটাকে একটা নিশ্চিত আলস্যের ভঙ্গীতে এলিয়ে দিয়ে তার সম্মুখে উপবিষ্ট তালুকদারের সঙ্গে কথা বলছিল।

পাইপে এবারে আর একটা টান দিয়ে বলে, বলছিলাম এই যে, ঐ দিকটায় একটু নজর দিলে ক্ষতিই বা কি ?

কোন দিকটায় ?

বলছিলাম, কিরীটী বলে, সেদিন ব্রজদুলাল সাহার মাদ্রাজ থেকে অকশ্মাত প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে হত্যাকারীর হাত ছিল—সেটাকে আমাদের বজায়ে প্রবলেমের অ্যাকসন হিসাবে ধরে নিসে ক্ষতিটাই বা কি ?

ক্ষতি নয় কিন্তু—

তুমি তো জান তালুকদার, কিরীটী আবার বলে, মন আমার কখনও হঠাত কিছু ধরে নেয় না।

তা জানি। তবে—

তবের কথা থাক। আমি সেই রকম ইঙ্গিতই যেন একটা ঐ ব্যাপারে পাচ্ছি বলেই
বলছিলাম—

বস্তুতঃ উ ভয়ের ঘণ্ট্যে কয়েকদিন আগেকার একটা রহস্যপূর্ণ হত্যার ব্যাপার নিয়ে
আলোচনা চলাইল কিরীটীরই বাসায় তার দোতলার বসবার ঘরে বসে, সন্ধ্যার দিকে।
হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল দিন-সাতকে আগে বালীগঞ্জ অঞ্চলে গর্চা লেনে।

বিষ্ণুক ব্রজদুলাল সাহা যাকে বলে সত্যিকারের ধনীই ছিলেন।

বালীগঞ্জ অঞ্চলে তিনটি কয়লার খনি ছাড়াও কোলকাতায় তাঁর একটি লোহার
কারবার ছিল। বিরাট ফলাও কারবার, সাহা স্টীল কোম্পানী। সাহা স্টীল কোম্পানীর
অফিস ডালহৌসি ক্ষোয়ারে। বিরাট একটা সাততলা বাড়ির দোতলার সবটা নিয়ে সাহা
স্টীল কোম্পানীর অফিস।

ব্রজদুলাল সাহার বয়স বাহান্ন থেকে তিমানৰ মধ্যে ছিল। সুন্দর স্বাস্থ্যবান লোক,
শরীরে কোনৰকম রোগ ইত্যাদি ছিল না।

ধনী ব্যবসায়ী হিসাবে গত কয়েক বছর ধরে ব্রজদুলাল সাহা কলকাতা শহরে
সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে বালীগঞ্জ অঞ্চলে বিরাট প্রাসাদত্ত্বে এক বাড়ি
ফাঁদবার পর। বছর দুই হল গর্চা লেনে বিরাট বাড়ি করেছিলেন। শুধু বাড়িই নয়, মনের
মত করে প্রচুর অর্থব্যয়ে গৃহটি সাজিয়েও ছিলেন।

ঐশ্বর্যকে করায়ত্ত করতে কিন্তু ব্রজদুলালকে অনেকগুলো বৎসর জীবনের খেসারত
দিতে হয়েছিল। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছেন ব্রজদুলাল সাহা
একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এবং সাফল্যের দুয়ারে সবে যখন পা দিতে চলেছেন স্ত্রী মায়া
দেবী চোখ বুজলেন। বয়স তখন কতই বা ব্রজদুলালের! মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। সমস্ত দেহে
তখনও অটুট স্বাস্থ্য।

সে যাই হোক, ব্রজদুলাল কিন্তু আর দ্বিতীয় সংসার করেননি। অবিশ্য করবার মত
তাঁর ফুরসৎ বা মনের তাগিদও ছিল না।

কোন সন্তুষ্ণাদি ছিল না ব্রজদুলালের। গর্চা লেনে বিরাট বাড়ি করবার পর বলতে
গেলে সেখানে তিনি এবং লোকজনের মধ্যে চারজন ভূত্য, দুজন ঠাকুর, দুজন দারোয়ান,
ড্রাইভার ও একজন অল্পবয়েসী সেক্রেটারী ছিল—ভারতীয় খৃষ্টান, বছর চবিশের তুরুণী,
রেবেকা।

রেবেকাকে থাকবার জন্য তিনতলায় দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্রজদুলাল।

॥ দুই ॥

সাহার গৃহে রেবেকা কেবল সেক্রেটারীই নয়, বাড়ির কেয়ারটেক্সের হিসাবেও ছিল। আর
ছিল একজন, সাধন মিত্র।

সাধন ছিল সাহার অফিসে তাঁর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। একই গ্রামে ছিল সাধনের
বাড়ি।

গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা শহরে ভাগ্যাভ্রেষ্টে এসেছিল সাধন।
এবং কোথাও অনেক চেষ্টা করে, কোন সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে একদিন
ব্রজদুলাসের শরণাপন্ন হয়।

কি জানি কেন যে ব্রজদুলাল কোন আত্মীয়স্বজনকে তো নয়ই, এমন কি গ্রামের পরিচিত বা অন্যান্য ভাবে পরিচিত কাউকেই কখনও সাহায্য করতেন না। বলতেন, আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত জন কাউকেই আমি কোন সাহায্য করতে চাই না—

কারণ হয়ত তাৰ একটা ছিল কিন্তু সেটা কেউ জানত না, অথচ ব্রজদুলালের ভাইপো ভাইবি ছিল তাদেৱ কখনও নিজেৰ গৃহে প্ৰবেশ তো দূৰেৱ কথা, তাদেৱ কখনও কোন খোঁজখৰু নন্তৰে নাই না। সেই ব্রজদুলাল সাহায্য সাধনকে শুধু পড়াৰ ব্যবস্থাই যে কৱে দিলেন তা ময় নিজেৰ গৃহে স্থানও দিলেন। এবং সেই থেকে সাধন ব্রজদুলালেৰ গৃহেই থেকে যাব।

সেও আজ থেকে বছৰ বাবো-তেৱো আগেকগাৰ কথা।

ব্রজদুলালেৰ ব্যবসাও তখন আজকেৱ মত বিৱাট ফলাও হয়ে ওঠেনি। অবস্থাও এমনি শৰ্শসালো হয়ে ওঠেনি। ছোটখাটো একটা লোহার কাৰবাৰ মাত্ৰ এবং থাকেন তিনি তখন গড়িয়াৰ দিকে ছোট বাসা-বাড়ি নিয়ে।

কিছুদিন আগে স্ত্ৰীৱ ঘৃত্য হয়েছে। একটিমাত্ৰ ভৃত্য নিয়ে তাঁৰ সংসাৱ।

তাৰপৱেই লাগলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একদিন এবং মাৰ বছৰ চাৰেকেৱ মধ্যে কোথা দিয়ে কোনু পথে যে চঞ্চলা লঞ্চী তাঁৰ সোনাৰ বাঁপিটি হাতে নিয়ে ব্রজদুলালেৰ গৃহে অচঞ্চলা হয়ে বসলেন—ফলে দেখতে দেখতে চাৰ বছৰেৱ মধ্যেই দেখা গেল ব্রজদুলাল তিনটি খনিৰ মালিক ও সাহা আ্যাও স্টীল কোম্পানীৰ ম্যানেজিং ডাইরেক্টোৱা! কথায় বলে পুৱষ্য ভাগ্যম। সেটাৰ প্ৰকৃষ্ট প্ৰমাণ যেন ঐ ব্রজদুলাল সাহা।

সাধনেৰও আপনাৰ বলতে ত্ৰিসংসাৱে কেউ ছিল না। ছোটবেলায় একই দিনে কলেৱায় মা-বাপ হারিয়ে আশ্ৰয় নিয়েছিল সে গাঁয়ে দূৰসম্পর্কৰ্য় এক দিদিৰ বাড়িতে।

গ্রামেৰ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকটা পাস কাৰবাৰ পৰ দিদিৰ আশ্ৰয়ে আৱ ভাৱ-বোৱা না হয়ে থেকে একদিন সামান্য একটি সুটকেসে খান দুই জামা-কাপড় নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হল। পাইস হোটেলে থেয়ে এখান-ওখানে অনেক ঘুৱে ঘুৱে বেড়ায়। কিন্তু কোন সুৱাহাই হয় না। অবশেষে একদিন ব্রজদুলালেৰ অফিসে গিয়ে সাহসে ভৱ কৱে দেখা কৱল। গ্রামেৰ কৃতী পুৱষ্য ব্রজদুলাল যদি একটা হিলে কৱে দেন এই আশ্বায়। ব্রজদুলাল ছেলেটিৰ চেহাৱায় ও তাৰ সঙ্গে কথা বলে মুক্ষ হলেন। স্থান দিলেন নিজেৰ গৃহে। ব্রজদুলালেৰ আশ্ৰয়ে মাথা গুঁজতে পেৱে সে যেন বেঁচে গিয়েছিল। যেমন সুন্দৰ স্বাস্থ্যবান চেহাৱা তেমনি তৌক্ষ বুদ্ধি। ব্রজদুলালেৰ কাছে সাধন একটা চাকৰিই চেয়েছিল কিন্তু ব্রজদুলাল বললেন, চাকৰি দেখা যাবে পৱে, এখন পড়াশুনা কৱ।

পড়ব, কিন্তু.....

কিন্তু দিয়ে দৱকাৱ নেই—কালই কলেজে ভৱ্তি হয়ে যাও।

সাধন কলেজে ভৱ্তি হয়ে গেল। কুমে সে কৃতিত্বেৱ সঙ্গে অধিমৌভিতে এম. এ. পাস কাৰবাৰ পৰ ব্রজদুলাল তাঁৰ নিজেৰ অফিসেই সাধনকে চুকিয়ে দিলেন।

সত্যিই ঐ সুন্দৰ, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমুগ্ধ অথচ বিনয়ী শ্ৰে ছেলেটিকে পুত্ৰাধিক ভালবেসেছিলেন ব্রজদুলাল। এবং অনেকেৱই ধাৰণা ইয়েছিল—নিজেৰ ভাইপো-ভাইবিৰেৰ বঞ্চিত কৱে হয়ত ব্রজদুলাল তাঁৰ সব কিছুই একদিন ঐ সাধনকেই দিয়ে যাবেন।

‘ইদানীং এমন হয়েছিল সাধন না হলে ব্রজদুলালের কোন কাজই হত না।

সকল ব্যাপারের শীর্ষামূলতা ছিল ঐ সাধন মিত্র।

সাধন একতলায় থাকত অফিস-ঘরের পাশের ঘরটিতেই—অর্থাৎ ব্রজদুলালের গর্তা লেনের বাড়িতেই।

॥ তিন ॥

পলিসের রিপোর্ট থেকেই জানা যায় :

ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই দিন-পনের আগে ব্রজদুলালকে মাদ্রাজে যেতে হয়েছিল এবং কথা ছিল দিন-কুড়ি আগে সেখানে তিনি থাকবেন।

কিন্তু সাতদিনের মাথায় অফিস থেকে সকালবেলা আটটা নাগাদ অকস্মাত একটা জরুরী ট্রাঙ্ক কল পেয়ে ব্রজদুলালকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয় ঠিক নিহত হবার রাত্রে—সন্ধ্যায় ভাইকাউন্টে।

সন্ধ্যা রাত সোয়া সাতটা নাগাদ গৃহে এসে পৌঁছান এয়ারপোর্ট থেকে ব্রজদুলাল তাঁর নিজেরই গাড়িতে গর্তা লেনের বাড়িতে।

রাত আটটা থেকে নটা তাঁর শোবার ঘরে সাধনের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হয়। তার পরই সাধনকে তিনি একটি জরুরী ব্যাপারে সেই রাত্রেই গাড়ি নিয়ে পাটনায় মাসখানেক পূর্বে সাহা আঞ্চ স্টীল কোম্পানীর নতুন খালি অফিস খোলা হয়েছিল, সেই অফিসে যেতে বলেন।

সাধন নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে রাত সাড়ে নটা নাগাদ চলে যায় পাটনায়।

যতদূর জানা গিয়েছে দুর্ঘটনার রাত্রে ব্রজদুলালের বাড়িতে তিনি এবং ভূতের দলই ছিল। কারণ দুপুরের দিকে বের হয়ে গিয়ে রাত সাড়ে আটটার শোতে রেবেকা মেট্রোতে সিনেমা দেখতে যায়।

তাছাড়া সে জানত না যে ঐ রাত্রেই ফিরে আসবেন ব্রজদুলাল।

রাত দশটায় ডিনার শেষ করে ব্রজদুলাল শুতে যান।

রাত পৌনে এগারোটায় কুড়ি মিনিটের জন্য ঐ অঞ্চল নিষ্পদ্ধীপ হয়।

সোয়া বারোটায় রেবেকা সিনেমা থেকে ফিরে এসে তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় দোতলায় ব্রজদুলালের ঘরে আলো জুলতে দেখে। তার কৌতুহল হয় এবং গিয়ে দেখে ঘরের দরজা হা-হা করছে খোলা। খোলা দরজা-পথে উকি দিতেই ব্রজদুলালের ঘরের মধ্যের দৃশ্যটা তার চোখে পড়ে।

স্লিপিং গাউন ও পায়জামা পরিহিত ব্রজদুলাল সাহা একটা সোফার উপরে উপবিষ্ট, কিন্তু দেহের উর্ধ্বাংশ ও মাথাটা সোফার হাতলের উপর থেকে অসহায়ভাবে মিটের দিকে ঝুলছে। একটা হাত খোলা অবস্থায় মাটিতে ঢেকে রয়েছে।

ঐভাবে ব্রজদুলাল সাহার চেয়ারে বসে থাকার সমস্ত ভঙ্গিটি এমন যে—রেবেকা যেন সেদিকে দৃষ্টি পড়ামাত্রই ভয়ানক চমকে ওঠে।

কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে খোলা দরজা-পথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। কাছে গিয়ে পাড়াতেই ঝুঁকে-থাকা ব্রজদুলালের মুখটা সে দেখতে পায়।

চোখ দুটো যেন কেটের থেকে বের হয়ে আসছে। সমস্ত মুখে তখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে যেন অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন। দুইাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবজ্জ্বল।

সামনের একটা গোলাকার শ্রেতপাথের টেবিলের উপরে জুলছে সুদৃশ্য একটি টেবিল ল্যাম্প। তার পাশে একটি অর্ধসমাপ্ত ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের বোতল, একটি দামী কাচের শূন্য প্লাস উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে সোডা সাইফন ও চাবির একটা রিং।

একটা অর্ধস্ফুট চিংকার রেবেকার কষ্ট থেকে বের হয়ে আসে।

প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় কি করবে সে বুঝতে পারে না।

প্রথমের মতই যেন কয়েকটা মুহূর্ত সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে রেবেকা। একবার ভাবে স্কটলকে চিংকার করে ডাকে।

কিন্তু সাহস হয় না। ব্রজদুলাল সাহা যে মৃত সে কথাটা বুঝতে রেবেকার কেন যেন দেরি হয়নি। তবু সম্ভিঃ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই—সোজা ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

ভাবে, কি করা কর্তব্য—কি সে করবে!

অবশ্যে কি মনে হওয়ায় পাশের ঘরে গিয়ে সাহার পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ চক্রবর্তীকে ফোন করে দেয় অবিলম্বে একবার আসার জন্য।

ফার্ম রোডেই ডাঃ চক্রবর্তী থাকেন। ব্রজদুলালের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়। ফোন পেয়ে আধ ঘন্টার মধ্যেই চলে আসেন তিনি।

রেবেকা বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল, ডাঃ চক্রবর্তীর গাড়ির সাড়া পেয়ে নিজে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

ডাঃ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার, কেমন আছেন মিঃ সাহা?

চলুন, দেখবেন।

উপরে গিয়ে ব্রজদুলালকে পরীক্ষা করেই বুঝতে পারেন ডাঃ চক্রবর্তী তিনি মৃত।

এতটুকুও আর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিকটবর্তী থানায় ফোন করে দেন।

আরও আধগন্টা পরে থানা-অফিসার সুখময় মল্লিক এসে হাজির হন।

ডাঃ চক্রবর্তীর মৃতদেহ দেখেই মনে হয়েছিল, কোন তীব্র বিবের ক্রিয়ায় ব্রজদুলালের মৃত্যু ঘটেছে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে পুলিসকে খবর দিয়েছিলেন।

পুলিস অফিসার সুখময় মল্লিক ও ডাঃ চক্রবর্তীর প্রথমটায় ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা আঘাত্য। মনের সঙ্গে কোন তীব্র বিষপান করে তিনি বুঝি আঘাত্য করেছেন এবং সেইভাবে তদন্ত শুরু করেছিলেন সুখময় মল্লিক।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ওলট-পালট হয়ে গেল আকস্মিক ভাবে অকুশ্বানে কিরীটীর আবির্ভাবে পরের দিন সকালে।

॥ চার ॥

সুখময় মল্লিক যখন নীচের পারলারে বসে সকলের জবানবন্দি নিচ্ছেন—কিরীটী সেখানে গিয়ে উপস্থিত।

মল্লিকের সঙ্গে কিরীটীর পূর্বপরিচয় ছিল। কিরীটীকে আসতে দেখে ঐ সময় মল্লিক একটু যেন বিশ্বায়ের সঙ্গেই শুধায়, কি ব্যাপার মিঃ রায়, আপমি?

কিরীটী বলে, কাল রাত দশটা নাগাদ মিঃ সাহা আমকে ফোন করেছিলেন আজ সকালে আটটা নাগাদ একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

কেন বলুন তো? মল্লিক যেন একটু বিশ্বায়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করেন।

কি একটা জরুরী ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্য চান বলেছিলেন।

কি জরুরী ব্যাপার কিছু বলেন নি আপনাকে?

না, তা অবিশ্বিত কিছু ফোনে বলেন নি। কিন্তু আপনি এখানে—কি ব্যাপার বলুন তো
সুখময়বাবু?

কিরীটীর জ্ঞাতার্থে সুখময় মন্ত্রিক তখন গতরাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা বিবৃত করেন।

সব শুনে কিরীটী তো একেবারে বোৰা। বলে, সে কি! তিনি মৃত?

হ্যাঁ খুব সম্ভবতঃ সুইসাইড বলে মনে হচ্ছে।

সুইসাইড!

হ্যাঁ, সেই রকম মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, তা মৃতদেহ কোথায়?

ওপরে তাঁর শোবার ঘরে।

মৃতদেহেটা আমি একবার দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই। চলুন না।

আর কালবিলম্ব না করে কিরীটী সুখময় মন্ত্রিকের সঙ্গে দ্বিতলে যায় এবং যে ঘরের
মধ্যে তখনও সোফার উপরে মৃতদেহটা ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

মৃতদেহের ভঙ্গীটাই যেন প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিরীটী।

মৃতদেহের ভঙ্গী দেখলে মনে হয় যেন মৃত্যুর কারণটাই যাই হোক না কেন, ত্রি ভাবে
চেয়ারের উপরে বসে বসে তাঁর মৃত্যু হয়নি।

মৃত্যুর পরে কেউ ব্রজদুলালকে ঐভাবে সোফাটার উপরে বসিয়ে দিয়েছে যেন।

মৃতের দু'চোখে আতঙ্ক নয়, যেন এখনও বিশ্বায়ের আকশ্মিকতা স্পষ্ট হয়ে আছে।

কিরীটীর দিকে তাকিয়ে মন্ত্রিক প্রশ্ন করে, কি মনে হচ্ছে আপনার মিঃ রায়?

আমার কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না মিঃ মন্ত্রিক। মৃদুকর্ণে কিরীটী বলে।

মনে হচ্ছে না?

না।

তবে?

কি জানি কেন মনে হচ্ছে, দেহের ভঙ্গী যেন ঠিক আঘাতহ্যান নয়। তাছাড়া কোন তীব্র
বিবের ক্রিয়াতেই যদি আকশ্মিক মৃত্যু ঘটে থাকে, মৃত্যু মুহূর্তের বিক্ষেপ ও কুক্ষনের
কোন চিহ্নই তো মৃতের দেহে দেখা যাচ্ছে না।

কথা বলে পুনরায় কিরীটী প্রথম দৃষ্টি নিয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকে আরও
কিছুক্ষণ।

দেখতে দেখতেই তার নজরে পড়ে মৃতের ঝুলন্ত ডান হাতের তজনীর দিকে তজনীর
মাথায় কালো একটা দাগ।

এগিয়ে গিয়ে মৃতের মুখটাও একবার তুলে দেখল। ঘাড়টা শুক্র হয়ে রয়েছে।

বুঝতে পারে কিরীটী, মৃতদেহে রাইগার মার্টিস সেট ইন করেছে ইতিপূর্বেই।

তারপর তজনীর মাথার ছোট কালো দাগটিও বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে সোজা
হয়ে উঠে দাঢ়ান।

মিঃ মন্ত্রিক কিরীটীকে সন্তুষ্য করতে থাকেন নিঃশব্দে।

এবাবে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে শাগল কিরীটী।

বেশ বড় সাইজের ঘর-চারিদিকে বড় বড় জানলা। দক্ষিণে একটিমাত্র জানলার কবাট ব্যতীত সব বন্ধ। এবং সব জানলাতেই পর্দা ঢানা। কিন্তু আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের চিহ্ন—যা কিছু ঘরের মধ্যে আছে সবকিছুর মধ্যেই যেন বিরাজ করছে। একধারে কোণাকুনি একটি সিঙ্গল বেড়।

মুখ্য ধরে ত্রিপয়ের উপর ঈষৎ নীলাভ রংয়ের ফোন।

অন্যদিকে একদিকে একটি গড়রেজের স্টীলের প্রমাণ সাইজের আলমারি, তার পাশেই দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা একটি লোহার সেফ।

আর এক পাশে একটি কাঁচের ছেট আলমারি। তার মধ্যে কিছু ফরেন লিকারের বোতল ও কাঁচের প্লাস ইত্যাদি সাজানো। এবং ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় সুদৃশ্য মাঝারি সাইজের একটি সোফা সেট।

আর কোন আসবাবপত্র নেই ঘরের মধ্যে। মেঝেতে দামী পুরু কাশ্মীরী কাপেটি বিস্তৃত। ঘরের মধ্যে দুটি দরজা।

একটি দরজা খোলাই ছিল। অন্য দরজাটি পাশের ঘরে যোগাযোগ রেখেছে। সেটা এ-ঘর থেকে বন্ধ। দুটি দরজায়ই ইয়েল লক লাগানো।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুমও আছে। বাথরুমের দরজাটা ভেজানোই ছিল। বাথরুমের ভিতরে গিয়েও একবার ঘুরে এল কিরীটি।

ফিরে এসে ঘরে ঢুকে আবার যেখানে সোফার উপরে মৃতদেহ ছিল সেখানে এসে দাঁড়াল।

সামনে ত্রিপয়ের উপরে টেবিল-ল্যাম্পটা তখনও জুলছিল।

নতুন ঝকঝকে একটা টেবিল-ল্যাম্প। প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে লাগানো ল্যাম্পটা। ল্যাম্পের সঙ্গে যে সুইচ সেটা টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল কিরীটি।

তারপরই হঠাৎ সুখময় মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললে কিরীটি, সব চাইতে পুরনো চাকর এ-বাড়িতে কে মিঃ মল্লিক?

জীবন।

তাকে একবার ডাকতে পারেন এ-ঘরে?

এখুনি ডাকছি। সুখময় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভৃত্য জীবনকে সঙ্গে নিয়ে সুখময় ঘরে এসে ঢুকলেন।

লোকটার বয়স হয়েছে। চামড়ার কুঞ্চন ও চুলে পাক ধরেছে। বেঠে-ঘাটো নামস-নুদুস চেহারা, ভারী একজোড়া গৌঁফ। পরনে একটা ফর্সা ধূতি ও গায়ে অনুকূপ ফুটুয়া। কিরীটি লোকটার মুখের দিকে তাকাল।

বড় ড্যাবডেবে চোখ। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ভীজি।

এর নামই জীবন, মিঃ রায়। সুখময় পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তুমি বাবুর কাছে কত দিন আছ জীবন? কিরীটি প্রশ্ন করে।

আজ্জে তা প্রায় বছর চোদ তো হবেই।

তোমার চাইতে তাহলে বোধ হয় পুরনো আর কেউ এ বাড়িতে নেই।

না।

বাবুর কাজকর্ম কে বেশি দেখাশোনা করত ?

আজ্জে বরাবর আমিই করতাম।

তুমিই ?

আজ্জে। এবং ঘরে আমি ছাড়া আর কোন চাকরবাকরকে তো তিনি ঢুকতেই দিতেন না।

তা আচ্ছা জীবন, দেখ তো এই ঘরের মধ্যে ভাল করে চেয়ে, কোন কিছু খোয়া গিয়েছে বা নতুন কিছু তোমার নজরে পড়েছে কিনা।

কিরীটীর নির্দেশে জীবন অনেকক্ষণ ধরে ঘরের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ মৃতের সামনে ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে বলে, আজ্জে ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা—

কি ?

ওটা তো ছিল না মনে হচ্ছে।

ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা ছিল না ?

আজ্জে না।

ভাল করে দেখে বল।

জীবন আরও এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা দেখে বলে, না বাবু, এটা ছিল না। তবে অনেকটা এই রকমই দেখতে টেবিল-ল্যাম্প ছিল এখানে। এটা নতুন বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া সেটার ঢাকনাটা ছিল নীল রংয়ের রেশমী কাপড় ঝালর-দেওয়া। আর এটা তো দেখছি সবুজ-প্লাস্টিকের। না, এ সে ল্যাম্প নয়।

ঠিক বলছ ?

আজ্জে।

এটা এর আগে দেখেছে ?

না।

আচ্ছা জীবন, তোমার বাবু কি প্রত্যহ মদ খেতেন ?

হ্যাঁ। শোবার আগে এখানে বসে প্রত্যহ খেতেন। এবং খেতে খেতেই রাত্রে সংবাদপত্র পড়তেন।

কিন্তু কোন কাগজ তো দেখছি না। কাল রাত্রে কি কাগজ পড়েননি ?

কাল রাত্রে তো আমি কাগজ দিয়েছিলাম। তিনি নিজে চেয়ে নিয়েছিলেন কাগজটা। কি কাগজ পড়তেন তিনি ?

আজ্জে স্টেটস্ম্যান কাগজ।

কাল রাত্রে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

আজ্জে।

কখন কাল রাত্রে তুমি তোমার বাবুকে শেষ জীবিত দেখ ?

রাত সাড়ে নটায় সাধনবাবু ঘর থেকে চলে যাবার পরই বাবু আমাকে আবার নীচে থেকে ঢাকেন।

কলিং বেল আছে নাকি এ ঘরে ?

আছে। দুটো কলিং বেল, এই যে দেখুন না—সোফার গায়ে একটা, আর একটা থাটের সঙ্গে।

হ'ল। তারপর?

আমি ঘরে এলে বাৰ আমাকে সোড়া বোতল ও প্লাস সব দিতে বললেন। আমি সব দেবার পৰ তিনি ঘৰেৱৰ দৰজা বন্ধ কৰে দেন।

ঘৰেৱ দৰজা বন্ধ কৰে দিয়েছিলেন কাল রাত্ৰে? হ্যাঁ।

ঘৰেৱ দৰজা বন্ধ কৰেই কি তিনি রোজ শুভেন? হ্যাঁ। দৰজা বন্ধ কৰেই বৰাবৰ শুভেন।

আচ্ছা, এই যে বন্ধ দৰজাটা দেখা যাচ্ছে—পাশেৱ ঘৰেৱই তো? হ্যাঁ।

পাশেৱ ঘৰটায় কেউ থাকে?

আজে না। ওটা বাবুৰ প্ৰাইভেট চেম্বাৰ। তবে বাড়িতে যথন কাজ কৰতেন ঐ ঘৰে বসেই কৰতেন।

ঐ দৰজার তালাৰ চাবিটা কোথায়?

চাৰি কোথায় তা জানি না। তবে দৰজাটা এ ঘৰ থেকে খোলা ও বন্ধ কৰা দুই গেলেও ও-ঘৰ থেকে চাৰি ছাড়া খোলা যায় না।

কিৱিটী অতঃপৰ দৰজার চাৰিৰ 'নব' ঘূৰিয়ে দৰজা খুলে পাশেৱ ঘৰে গিয়ে ঢুকল।

ঘৰটি মাৰাবি আকাৰেৱ। দু'দিকেৱ দেওয়ালে স্টীলেৱ আলমারি ও কিছু স্টীলেৱ র্যাক। ব্যাকে ফাইল-পত্ৰ সব সাজানো। মাৰাখনে একটি অৰ্ধচন্দ্ৰাকৃতি সুন্দৰ দামী সেক্রেটাৰিয়েট টেবিল। একটি দামী গদী-মোড়া রিভলভিং চেয়াৰ ছাড়াও গোটাচাৰেক চেয়াৰ অন্যদিকে টেবিলে রয়েছে, টেবিলৰ উপৰে একটি টেবিল-ল্যাম্প ও ফোন।

ঘৰটি এয়াৰ-কণ্ঠিশন কৰা। ঘৰেৱ জানলা দৰজা সব বন্ধ এবং ভাৰী লাল রঙেৱ দামী পৰ্দা খোলানো জানলায় দৰজায়। মেঘেতে দামী কাপেটি বিস্তৃত! এ ঘৰেও দুটি দৰজা। ঐ মধ্যবতী দৰজাটা ছাড়াও অন্য একটি দৰজা।

সেই দৰজাটিও বন্ধ ছিল এবং কিৱিটী পৱিত্ৰ কৰে দেখল—ঐ দৰজাতেও ইয়েল লক্ সিস্টেম।

॥ ছয় ॥

অফিস-ক্লুবটা পৱিত্ৰ পৰ কিৱিটী সুখময়কে নিয়ে আবাৰ নীচে এল যে ঘৰে বসে সুখময় সকলেৱ জৰানবন্দি নিছিলেন।

সুখময় প্ৰশ্নটা কৱেন, তাহলে অন্যৱকম কিছু বলেই তো আপনাৰ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, মিঃ রায়?

কিৱিটী পাইপটায় পাউচ থেকে তামাক ভৱতে ভৱতে মৃদু কঢ়ে বলে, আই অ্যাম সৱি সুখময়বাৰু, আমাৰ কিষ্ট সেৱকমই বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা—

কি মনে হচ্ছে?

ইট ইজ নট এ কেস অফ সুইসাইড। মনে হচ্ছে ডেফিনিট কেস অফ হোমিসাইড।

হোমিসাইড? মানে হত্যা?

হ্যাঁ।

কিষ্ট—কেন?

দেখুন মিঃ মল্লিক, আপনার নজর পড়েছে কিনা জানি না—তবে আমার কিন্তু তিনটে ব্যাপার অত্যন্ত 'কুইয়ার' লাগছে।

'কুইয়ার' লাগছে কি?

প্রথমতঃ ধরন লোকটার যে পরিচয় এখন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে পেয়েছি—নিশ্চয়ই বলতে পারি আমরা লোকটা সেলফ-মেড-ম্যান এবং জীবনে যাকে বলে স্বত্ত্বাস্বরের সাকসেসফুল ম্যান, তাই। সেক্ষেত্রে এ ধরনের একজন লোক হঠাৎ দেন সুইসাইড করতে যাবেন?

তা অবিশ্যি—

দ্বিতীয়তঃ ধরন, ঐ ধরনের লোকদের শক্ত থাকাটা এমন কিছু বিচিত্র যেমন নয়, তেমনি লোকটা যে একেবারে সাধু-চরিত্রের ছিলেন তাও মনে করবার কিছু নেই এবং সেক্ষেত্রে সেদিক থেকে গোপন আঘাত আসাটাও খুব একটা অস্বাভাবিক কি?

বুবালাম না আমি ঠিক!

বুঝলেন না?

না।

লোকটা বিপত্তীক ছিল, অর্থ ছিল এবং কিছু কিছু দোষও যে ছিল তাও জেনেছি আমরা। আর—

আর?

সুন্দরী তরঙ্গী সেক্রেটারীও ছিল এবং তার থাকবার ব্যবস্থাও এই বাড়িতেই। ওয়েল—

তবে কি আপনি মিঃ রায়—

কিছুই আমি বলছি না সুখময়বাবু—ব্যাপারগুলো শুধু চিন্তা করতে বলছি। এবং সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রব্যাবিলিটি কোথায় বেশি? হত্যার না আঘাতহ্যার? তারপর কাম টু আওয়ার থার্ড পয়েন্ট—যে লোকটা ঘট্টাখানেকের মধ্যে সুইসাইড করবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তার পক্ষে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার ডিসকাশন করে তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্টকে অমন কুল রেনে পাটনা পাঠানো কি খুব স্বাভাবিক?

সুখময়বাবু চুপ করে থাকেন।

কিরীটী ইতিমধ্যে হস্তধৃত পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করেছিল। পাইপটায় গোটা দুই টান দিয়ে বলে, আরও কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনার কাছে বিচিত্র লেগেছে।
কি বলুন তো?

প্রথমতঃ উপরের ঘরের ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা। আগেরটা কোথায় গেল এবং নতুনটাই বা কে আনল এবং কেন আনা হল?

ল্যাম্পটা!

হ্যাঁ। দ্বিতীয়তঃ ঘরের যে দরজাটা নিজ হাতে ব্রজদুলাল বক করে দিয়েছিলেন, সেটা কে খুলল?

কেমন যেন বোকার মতই ফ্যালফ্যাল করে সুখময় মল্লিক কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কি বলবেন জবাবে বুঝাতে পারেন না। বলে কি লোকটা!

প্রথম দিককার তিনটি যে পয়েন্ট বললেন তার অবিশ্যি কিছু অর্থ হয়। কিন্তু শেষে যে কথাগুলো বললেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই যেন বুজির গোচর হয় না মল্লিকের।

নতুন টেবিল-ল্যাম্পট কোথা থেকে এল? ঐদিনের স্টেটসম্যান কাগজটা কোথায় গেল?

যে দরজাটা ব্রজদুলাল নিজে হাতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন সে দরজাটা কে খুললে? কিরীটি মোখ করি মল্লিকের মনের ভাবটা অনুধাবন করতে পারে।

অতঃপর মনু হেসে বলে, বসুন, সুখময়বাবু—আপনার জবানবন্দি নেওয়া নিশ্চয়ই শেষ করতে পারেননি এখনো?

না। সবে শুরু করেছিলাম।

তাহলে শেষ করুন।

আপনি যা বললেন তাই যদি হয় তো মিঃ রায় তাহলে এখন তো দেখছি সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে। সুখময় বসতে বসতে বলেন কিরীটির মুখের দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ, ব্রজদুলাল সাহাকে কেউ গতরাত্রে হত্যা করেছে যখন আমরা বুঝতেই পারছি, জবানবন্দির ব্যাপারেও দৃষ্টিটা আপনার সেই দিকেই দিতে হবে।

মনু শাস্তি কঠে কিরীটী কথাগুলো বলে।

॥ সাত ॥

জবানবন্দি নেওয়া শুরু করলেন অতঃপর সুখময় মল্লিক।

বাড়ির লোকজনেরা তখনও ঘরের বাইরে বারান্দাতেই সবাই দাঁড়িয়েছিল পুলিস প্রহরায়।

ভৃত্য জীবন, রামখেলন, হরি ও নারাণ। রাঁধুনী বামুন ব্রিজনন্দন। দারোয়ান মিশির ও ধনবাহাদুর। ড্রাইভার, কেরামংটল্লা—অফিসের ড্রাইভার সেও থাকত ব্রজদুলালের গৃহে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে।

বাড়ির নীচের তলায় একেবারে পশ্চিম দিকে ভৃত্য ঠাকুর ও ড্রাইভারদের থাকবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা। তারা সব ঐখানেই থাকে।

জীবন ব্রজদুলালের খাস ভৃত্য। সে একমাত্র ব্রজদুলালের কাজকর্ম ছাড়া অন্য কিছুই করত না।

নতুন লোক বলতে ওদের মধ্যে কেউই নয়।

চার-পাঁচ বছর ধরে সকলেই এই বাড়িতে কাজ করছে।

ভৃত্যদের মধ্যে জীবন আর নারাণ ব্যতীত অন্য কেউ তো বড় একটা উপরেই নেওন না। কাজেই ভৃত্যদের কারও কাছ থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদই পাওয়া গেল না।

সবাই রাত সাড়ে নটায় ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল একমাত্র ভৃত্য জীবন সাদে।

সে শুতে যায় রাত দশটা নাগাদ।

কিরীটী জীবনকেই একবার জিজ্ঞাস করে, রেবেকা রাতে কখন ফিরেছে, সে জানে কিনা?

জীবন বলে, জানি না।

দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে কোলাপসিবল গেট দেখলাম জীবন, ওটা রাতে বন্ধ থাকে। না খোলা থাকে।

আমি শোবার আগে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ রোজ বন্ধ করে দিই। জীবন জবাব দেয়।

কাল রাত্রে বন্ধ করেছিল?

হঁ। রাত দশটায়।

রেবেকা তাহলে ভিনতলায় গেল কি করে?

আজ্জে উনিষ্টো প্রায়ই রাত করে ফেরেন—ওঁর কাছে ঐ গেটের একটা ডুপ্পিকেট চাবি আছে।

দ্বিতীয়বারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, রাত পৌনে বারোটা নাগাদ গতরাত্রে রেবেকাকে সে গেট খুলে দিয়েছে।

কিরীটী শুধোয়, আচ্ছা মিশির, কাল রাত্রে সাধনবাবুর বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া ও রেবেকার রাত্রে ফেরা ছাড়া আর কেউ রাত সাড়ে নটার পরও এ বাড়ি থেকে বের হয়েছে বা এসেছে কিনা মনে পড়ে?

জী, না।

বাবু যে ক'দিন বাড়িতে ছিল না তার মধ্যে অপরিচিত কেউ এ বাড়িতে এসেছে? হঁ।

কে?

একজন বুড়ো সাহেব।

একজন বুড়ো সাহেব?

জী।

সে কেন এসেছিল?

সে বলেছিল সে মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে নাকি মেমসাহেবের আঢ়ায়।

দেখা করেছিল বুড়ো সাহেব রেবেকার সঙ্গে।

তা জানি না, তবে ভিতরে গিয়েছিল।

কিরীটী তখন জীবনকে ডেকে সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করে। সাহেব সম্পর্কে সে কিছু জানে কিনা।

জীবন বলে, হঁ, সেই বুড়ো সাহেব মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিল। মেমসাহেব সে-সময় বাবুর চেম্বারে কি সব লেখাপড়া করছিল। সাহেবের কথা বলতে তিনি সাহেবকে ঐ ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলেন। আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সাহেব কতক্ষণ ছিল?

তা প্রায় ঘন্টাখানেক তো হবেই। জীবন বলে।

আর একটা কথা জীবন, সাধনবাবু কাল সে-সময় কি বাড়িতেই ছিলেন? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

আজ্জে না।

সাধনবাবু তাহলে কাল সারাদিন বাড়িতে ছিলেন না তুমি বলছ জীবন?

আজ্জে।

সবার শেষে রেবেকাকে ঘরে ঢাকা হল।

বছর চবিশ বয়স হবে রেবেকার।

নিঃসন্দেহে রেবেকাকে সুন্দরী বলা চলে। গায়ের রঙ চকচকে না হলেও বেশ ফর্সা।

রোগা দোহারা দীর্ঘজীব বলা চলে। মুখখানি লম্বাটে ধরনের হলেও চোখ নাক ও ভূঁদুটি
সতীই মূল্য। গতরাত্রের প্রশ়াশনের প্লেপটা তখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।

পরিধানে দামী একটা তাঁতের কালো সরুগাড় শাড়ি। হাতে চারগাছি করে সরু
সোনার চুড়ি।

তারতীয় ঝীঁজত না জানা থাকলে এবং হঠাতে দেখলে অবস্থাপন্থ বাঙালী গৃহস্থদের
মেয়ে বলেই মূল্য হবে বুঝি রেবেকাকে।

আপনারই নাম মিস রেবেকা মণ্ডল? থানার ও সি মিঃ মাল্লিক প্রশ্ন শুরু করেন।

হ্যাঁ।

এখানে আপনি ব্রজদুলালবাবুর সেক্রেটারী হয়ে ছিলেন?

হ্যাঁ।

কতদিন এখানে আছেন?

এক বছর পাঁচ মাস।

এক্সকিউজ মি, কত করে মাইনে পান আপনি?

হঠাতে ঐ সময় কিরীটাই প্রশ্নটা করে রেবেকা মণ্ডলকে।

কিরীটির প্রশ্নে রেবেকা ওর মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্য তাকাল, তারপর মৃদু কঠে
বললে, পাঁচশো টাকা।

পাঁচশো টাকা! কিরীটি কথাটা পুনরাবৃত্তি করে।

হ্যাঁ।

কিরীটি টাকার অক্টো শুনে কয়েক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে বলে, তার মানে মাইনের ঐ পাঁচশো টাকা একরকম আপনার
অল ফাউণ্ডেশন ছিল। কারণ থাকা-খাওয়া যখন আপনার এইখানেই ছিল।

তা বলতে পারেন।

হ্যাঁ! Decent pay! কতকটা যেন আঞ্চলিক ভাবেই কথাটা নিম্নকঠে উচ্চারণ করে
কিরীটি আবার। ও সি-র দিকে তাকিয়ে বলে, Yes carry on—

আবার প্রশ্ন শুরু হয়।

মিস মণ্ডল, আপনার আপনজন কে আছে?

আপনার বলতে আমার সংসারে এক মামা। তিনি আসানসোলে স্টেশনমাস্টার।

আর কোন আচ্ছায়স্বজন—

না।

আচ্ছা, বাড়ি কোথায় আপনার?

মুর্শিদাবাদ।

সেইখানেই কি বরাবর থাকতেন?

ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম।

কিন্তু আপনি তো বলেন আপনার বলতে এক মামা ছাড়া আর কেউ নেই।

এক পিসী ছিল, বছর দেড়েক হল মারা গেছেন। তাঁর কাছেই থাকতাম মুর্শিদাবাদে।

কতদূর পড়াশুনা করেছেন?

আই এ পাশ করে স্টেনো টাইপিং শিখেছি।

এখানে চাকরি নিয়ে আসবার আগে কোথাও চাকরি করেছেন?

ହଁ, ବଚର ଦୁଇ କଲକାତାତେ ଏକଟା ବିଲାତୀ ଫାର୍ମେ ସ୍ଟେନୋ-ଟାଇପିସ୍ଟ ଛିଲାମ । ମେଥାନ ଥେକେଇ ସାହା ସ୍ଟୀଲ୍ ଆଓ କୋମ୍ପାନୀତେ ଢାକରି ପାଇ । ଏକ ବଚର ଅଫିସେ କାଜ କରିବାର ପର ମିଃ ସାହା ଆମାକେ ପାର୍ସୋନ୍ୟାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରେ ଏଥାନେ ନିଯେ ଆସେନ ।

ଆପନାର 'ବସ' କେମନ ଲୋକ ଛିଲେନ ବଲେ ଆପନାର ଧାରଣା ?

ହି ଏହାଙ୍କ ଏ ପାରଫେସ୍ ଜେନ୍ଟଲମ୍ୟାନ ! ଠାଣ୍ଡା ମେଜାଜର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର-ହିଂସା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଛିଲେନ । ନିଜେର ଏମପ୍ଲିଯିଦେର ଉପରେ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରଦ ଛିଲ । ତାଇ ତୋ ଆବାକ ହେୟ ହେବେଇଁ, କେନ ତିନି ଐଭାବେ ଆଘରତ୍ୟା କରିଲେନ !

ରେବେକା ମଣ୍ଡଲେର କଥା ଶୁଣେ ମନେ ହଲ ତାର 'ବସ' ବର୍ଜନ୍‌ଲାଲ ସାହାର ଆକଷିକ ଆଘରତ୍ୟା ମେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟଥିତିଇ ନାହିଁ, ବିଶିଷ୍ଟତା ।

॥ ଆଟ ॥

କିଛୁକ୍ଷଣ ଅତଃପର ସକଳେଇ ଚୁପ କରେ ଥାକେ । ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ସ୍ତରତା ବିରାଜ କରେ ।

ମେଇ ସ୍ତରତା ଆବାର ଡଙ୍ଗ କରିଲ କିରୀଟାଇ । ମେ-ଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ ।

ଆପନାର ଧାରଣା ତାହଲେ ମିସ ମଣ୍ଡଲ, ମିଃ ସାହା ଆଘରତ୍ୟାଇ କରେଛେନ ?

ଆଘରତ୍ୟା ଯେ କରେଛେନ କଥାଟା ବୁଝାତେ କାରୋରଇ କଟ ହବାର ତୋ କଥା ନାହିଁ ମିଃ ରାଯ় ।

କିନ୍ତୁ କଥା ହଚ୍ଛେ ତାଇ ଯଦି ହେୟ ଥାକେ ସତି ତୋ ନିଶ୍ଚଯ ଐଭାବେ ଆଘରତ୍ୟା କରାର କୋନ ତାର କାରଣ ଛିଲ ବା ଘଟେଛିଲ !

ହେୟ ।

ବ୍ୟାପାରଟାଯ କୋନ ରକମ ଆଲୋକସମ୍ପାଦ କରିବେ ପାରେନ ଆପନି ?

ନା । ଆଇ ଅୟାମ ର୍ୟାଦାର ବିଉଇଲଡାର୍ ।

ଆଜ୍ଞା ମିସ ମଣ୍ଡଲ, ଆପନି ସଖନ ତାର ପାର୍ସୋନ୍ୟାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଛିଲେନ ନିଶ୍ଚଯଇ ତାର ଆପନି କନଫିଡେଲ୍-ଏ ଛିଲେନ ? କିରୀଟି ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

ତା ଛିଲାମ ।

ତାର ବ୍ୟବସା-ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ନିଶ୍ଚଯଇ ଆପନି ଅନେକ କିଛୁ ଜାନେନ ଆଶା କରିବେ ପାରି ? ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ ଏବାର ଓ ସି ।

ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁଇ ବଲତେ ପାରିବ ନା, କାରଣ ତିନି ଓ-ବ୍ୟାପାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରିଜାର୍ଡ ଛିଲେନ । ତବେ ତାର ବିଜନେସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାପାରେ ଅନେକ କଥାଇ ଜାଣି ବିଜନେସେର ଅବଶ୍ଯା ତାର କେମନ ଛିଲ ?

ଦେଖୁନ, ଓ ବ୍ୟାପାରେ ଜାନେନ—ଆମାର ଧାରଣା—ମିଃ ମିତ୍ର, ଆମାର ଚାଇତେ ଓ ବେଳି ଇହୁ ମିନ ସାଧନବାବୁ ?

ହଁ । ତବେ ଆମି ଯତଦୂର ଜାନି ତାର ବିଜନେସେର ଅବଶ୍ଯା କ୍ରମଶତ ଡାଲିର ଦିକେଇ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଯାଚିଲ ।

ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସାଧନବାବୁ ଲୋକଟିକେ ଆପନାର କେମନ ମନେ ହୁଏ ମିସ ମଣ୍ଡଲ ?

ଖୁବ ଭଦ୍ର, ଅମାୟିକ ।

ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଆଲାପ କେମନ ?

ଏକ ବାଢ଼ିତେ ଥାକି, ସର୍ବଦା ଦେଖାଶୋନା ହୁଏ, ସେମିକ ଦିଯେ ଆଲାପ ତୋ ଏକଟୁ ବେଶ ହବାରଇ କଥା ।

তা অবিশ্য ঠিক। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম লোকটিকে কেমন মনে হয় আপনার? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

খুব ইন্টেলিজেন্ট আর আ্যামবিশাস।

ইউ লাইক হিউ?

কি বলতে তান আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায মিস রেবেকা মণ্ডল কিরীটীর দিকে।

একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে বলেও সে মনে হয় কারণ ভূ কুণ্ডিত হয়ে ওঠে রেবেকার। না। এই বলছিলাম আর কি, ভদ্রলোকটিকে আপনার ভাল লাগে কিনা?

সত্যিকারের কোন ভদ্রলোককে না ভাল লাগবাব তো কোন কারণ থাকতে পারে না।

তা অবিশ্য ঠিক। আচ্ছা ভাল কথা মিস মণ্ডল, কাল দুপুরে কে একজন সাহেবে আঘায় আপনার শুনলাম দেখা করতে এসেছিলেন? আপনার সেই মামা নাকি?

মামা? কই না!

তবে কে এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে কাল দুপুরে?

কাল দুপুরে?

হ্যাঁ।

ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মিঃ আর্থার মূর, সিংগাপুর থেকে এসেছিলেন মিঃ সাহার সঙ্গে দেখা করতে, এজেন্সীর ব্যাপারে।

কিন্তু তিনি জীবনকে বলেছিলেন তিনি নাকি আপনার আঘায়!

ননসেন্স! একথা বলতেই পারে না। জীবন বলেছে এই কথা?

হ্যাঁ।

ওর কথায় কান দেবেন না আপনারা।

কেন বলুন তো?

লোকটা একের নম্বরের মিথ্যাবাদী। লায়ার!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ডাইনে-বাঁয়ে অকারণ মিথ্যে কথা বলে লোকটা।

তা কি করে জানলেন যে লোকটা মিথ্যাবাদী?

বহুবার বহু প্রমাণ পেয়েছি।

মিঃ সাহা জানতেন কথটা?

জানতেন বৈকি। আর সেই জন্যই পুরনো বিশ্বাসী লোক হলেও ওকে পছন্দ করতেন

না।

লোকটা তাহলে বিশ্বাসী?

অন্ততঃ মিঃ সাহার তাই ধারণা ছিল।

আপনার?

বিশ্বাসী বলেই মনে হয়।

এ সময়কার মত জ্বানবদ্ধি শেষ করে ধানার ও সি সুখময় মালিক উঠে দাঁড়ান।

কিরীটীও বিদায় নেয় অতঃপর।

ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে পাটুল থেকে ফিরে এল সাধন মিত্র। এবং বাড়িতে পৌছে
বজ্জুলালের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তো একেবারে স্তুতি।

কিরীটী সুখময় মন্ত্রককে পূর্বেই বলে রেখেছিল সাধন মিত্র ফিরলেই যেন তাকে
একটা সংবাদ দেওয়া হয়।

যে পুলিশ অফিসারটিকে কিরীটীর নির্দেশেই সুখময় মন্ত্রিক গর্চা লেনের বাড়িতে
প্রহরায় যেখে গিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে ফোনে সাধন মিত্রের পৌছানো সংবাদ পেয়েই
সুখময় কিরীটীকে সংবাদটা দেন। এবং সাধন মিত্র গর্চা লেনের বাড়িতে এসে পৌছবার
স্থানকানেকের মধ্যেই কিরীটী সুখময়কে সঙ্গে নিয়ে গর্চা লেনের বাড়িতে এসে হাজির
হল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতেই ভৃত্য জীবন এগিয়ে এল।

জীবন!

আজেও?

সাধনবাবু আছেন বাড়িতে? সুখময় মন্ত্রিকই প্রশ্ন করেন।

আজেও হ্যাঁ, উপরে আছেন তাঁর ঘরে।

তাঁকে একবার খবর দাও, বল আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

জীবন ওঁদের পারলারে বসিয়ে খবর দিতে গেল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, প্রায় সঙ্গেই সাধন মিত্র এসে পারলারে প্রবেশ
করল।

সাধন মিত্রের চেহারাটা সত্যিই দেখবার মত।

বেশ পরিষ্কার গায়ের রঙ। সুন্দরই বলা চলে। মুখে কয়েকটা বসন্তের ক্ষতচিহ্ন। চক্ষু
দুটি বৃক্ষদীপ্ত। ছুরির ফলার মত যেন ধারাল চোখের দৃষ্টি।

সাধন মিত্রের দিকে তাকিয়ে সুখময় মন্ত্রিকই প্রশ্ন করেন, সাধন মিত্র আপনার নাম?
হ্যাঁ।

বসুন।

কিরীটী একদম্পত্তে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল সাধন মিত্রকে, মুখের মধ্যে কোথাও কোন
সেরকম বেদনা বা দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই।

বেশভূষাও পরিপাটি। এবং পোশাক দেখে মনে হয় বোধ হয় কোথাও বেরকচ্ছিল।
পরিধানে দামী লংস, ডবল কপের শার্ট, গলায় দামী একটি আমেরিকান টাই।

সুখময় মন্ত্রিক বসবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাধন মিত্র কিন্তু বসে না। যেমন
দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই থাকে।

সুখময় মন্ত্রিক আবার বলেন, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আগুন শুনেছেন সাধনবাবু?
হ্যাঁ। মুদু শাস্ত্রকচ্ছে প্রত্যুষের দেয় সাধন মিত্র।

এখানে এসেই খবরটা পেলেন বোধ হয়? সুখময় আবার জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ, terribly shocking! তাছাড়া রেবেকা বলছিল—

কি বলছিলেন মিস মঙ্গল? কিরীটাই এবার প্রশ্নটা করে।

বলছিল, আপনাদের ধারণা নাকি ব্যাপারটা হত্যা, homicide!

হ্যাঁ। জবাব দেন সুখময় মল্লিক।

কিন্তু—

হ্যাঁ, কারণ প্রোস্টমটেম রিপোর্ট যদিও এখনও আমরা পাইনি—সুখময়ই কথা বলেন, তবু ব্যাপারটা যে আঘাতহত্যা নয়—হত্যা, সেটাই আমাদের ধারণা।

সাধন মিত্র চোখ তুলে তাকাল সুখময়ের দিকে, হত্যাই তাহলে আপনাদের হিঁর ধারণা?

হ্যাঁ।

কিন্তু হঠাতে কে তাঁকে হত্যা করতে যাবে আর কেনই বা করবে, এটা তো আমি বুঝতে পারছি না মিঃ মল্লিক! সাধন মিত্র বলে।

Who and why অর্থাৎ কে করতে পারে এবং কেন করল সেটুকু জানতে পারলে তো আমাদের যাবতীয় মুশকিল আসানই হয়ে যেত সাধনবাবু। কিন্তু আপনার কি ধারণা, ব্যাপারটা তা নয়? সুখময় মল্লিক শুধান।

To tell you frankly, আমার অস্ততঃ তা মনে হয় না। কারণ আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি তাঁকে অনেকদিন ধরে জানতাম। তাঁর কোন শক্তি থাকতে পারে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। তাছাড়া—

বলুন, থামলেন কেন?

না। কিছু না। আই সিমপ্লি ডোন্ট বিলিভ ইট, রাদার আই কান্ট বিলিভ ইট, আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

সহস্রা ঐ সময় কিরীটী শাস্ত্রকল্পে সাধন মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে কি আপনার ধারণা মিঃ মিত্র, উনি আঘাতহত্যাই করেছেন?

সত্যি কথা বলতে কি, সেরকম কিছুও আমি ভাবতে পারছি না। কেনই বা আঘাতহত্যা তিনি করতে যাবেন? সাধন মিত্র বলে।

কেন?

মিঃ সাহা সত্যিকারের বুদ্ধিমান, বিবেচক ও স্থিতধী লোক ছিলেন। আঘাতহত্যা করবার মত টেম্পারামেন্ট কোনদিনই তাঁর ছিল না। তাছাড়া—

তাছাড়া?

তাছাড়া মান যশ অর্থ প্রতিপন্থি সবই তো বেশি পেয়েছিলেন এবং যতদূর জানি মাঝেই ছিলেন। সেক্ষেত্রে হঠাতে কেন আঘাতহত্যা করতে যাবেন?

আচ্ছা মিঃ মিত্র—কিরীটাই আবার কথা বলে।

বলুন?

অফিস-সংক্রান্ত কাজেই শুনলাম আপনি মিঃ সাহাকে নাকি মাঝেই থেকে আকস্মিক ভাবে ট্রাক কল করে ডেকে এনেছিলেন?

হ্যাঁ, এনেছিলাম। পাটনার ভাগ্ন অফিস সংক্রান্ত একটা জরুরী ব্যাপারে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়েছিল বলে তাঁকে ডেকে আনতে রাখ্য হয়েছিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো তিনি পাটনা যাননি?

না। আমাকেই পাঠিয়েছিলেন।

আচ্ছা মিঃ মিত্র, আপনি তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন এবং আপনাকে তিনি যেমন মেহ করতেন তেমনি বিশ্বাসও করতেন শুনেছি।

ঠিক শুনেছো

তাঁর জীবনের অনেক কথাই আশা করতে পারি আপনি জানেন?

কি জুতে চান বলুন স্পষ্ট করে, জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

মিঃ মিত্র?

বলুন।

তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন কিন্তু একটা কথা বলেননি।

কি বলিনি?

বলছিলাম তাঁর চরিত্র কেমন ছিল? বহুদিন ধরে তিনি বিপজ্জন ছিলেন শুনেছি—

সেরকম একটু-আধটু দুর্বলতা মাত্রেরই থাকে, বিশেষ করে ঐরকম বয়েসে উইডোয়ার হলে।

তাহলে খুলেই বলি মিঃ মিত্র—কিরীটী বলে, আমি জানতে চাইছিলাম তাঁর সঙ্গে রেবেকা মণ্ডলের সম্পর্কের কথাটা।

মুহূর্তকাল সাধন মিত্র চুপ করে থাকে, তারপর মন্দু একটা হাসি তার ওষ্ঠপ্রাণে দেখা দেয়।

কই জবাব দিলেন না তো আমার প্রশ্নের? কিরীটী আবার বলে।

বোধ হয় একটু দুর্বলতা ছিল ঐ দিকে তাঁর।

শুধু দুর্বলতাই।

হ্যাঁ। আর কি বলব বলুন!

আর কিছু জানেন না আপনি?

দেখুন, তাঁকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। এবং আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না, তাঁর মেহ ও সাহায্য না পেলে আজ আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না। আর বেশি কিছু তাঁর সম্পর্কে আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। আমাকে ক্ষমা করবেন।

॥ দশ ॥

অতঃপর উভয় পক্ষই কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না।

সুখময় মঞ্চিক বোধ হয় ভাবছিলেন, আর কি প্রশ্ন তাঁদের থাকতে পারে সাধন মিত্রকে!

কিরীটীর মুখের দিকে তাকান সুখময় মঞ্চিক।

কিরীটী একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করছিল একটা ঝুলত কম্পন্ত দিয়ে, সিগারটা ধরে উঠলে কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলে দিয়ে তাকাল আবার সুখন গিত্রের মুখের দিকে।

আচ্ছা মিঃ মিত্র, মিঃ সাহার আজ্ঞায়স্বজন কে কোথায় আছে জানেন কিছু?

তাঁর বড় ভাইয়ের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে জানি।

দুই ছেলে, এক মেয়ে?

হ্যাঁ। এবং তাঁদের সম্পর্কে যতটুকু জানি—একজন প্রশান্ত সাহা, বেশীদূর মেখাপড়া

শেখেননি, এই কলকাতা শহরেই অ্যালাম ইলেকট্রিক্যালস কোম্পানীতে চাকরী করেন। বিয়ে-থা শুনেছি করেননি। বিতীয় সুশাস্ত্র সাহা আই. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন; শেয়ার মার্কেটের দালাল ভাই বোধ হয় উপায় করেন। তবে নেশা ও রেসের মাঠে শুনেছি পকেট সর্বদাই থাল থাকে। ভাইবী শ্রীমতী দেবী, হাসপাতালের নার্স। বিয়ে-থা করেননি।

তাঁর এ বাড়িতে যাতায়াত করেন না?

শ্রীমতী দেবী দু-একবার মনে পড়ে এসেছেন। তবে ভাইপোদের কথনও তিনি বাড়িতে চুক্তি দিতেন না। তবু অবিশ্য মধ্যে মধ্যে সুশাস্ত্র বাড়ের মত তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হতেন।

কেন?

টাকার জন্য।

টাকা দিতেন মিঃ সাহা ভাইপোকে?

দিতেন। ভৌষণ চট্টে রাগারাগি করতেন, কিন্তু দিতেন। কারণ আমার মনে হয়েছে বরাবর, ঐ জুয়াড়ি নেশাখোর উচ্ছৃঙ্খল লোকটাকে মুখে রাগারাগি করলেও উনি ভালই বোধ হয় সত্য বাসতেন তাঁকে ভাইপো-ভাইবিদের মধ্যে।

আচ্ছা, প্রশাস্ত্রবাবু আসতেন না কথনও তাঁর কাকার কাছে?

না। আসতে তাঁকে কথনও দেখিনি।

আচ্ছা সাধনবাবু, কোন উইল মিঃ সাহা করে গিয়েছেন বলে জানেন?

করেছেন বলেই জানি।

নিশ্চয় করে জানেন না কিছু।

না। তবে আপনি সাহা কোম্পানীর সলিসিটার রূপচাঁদ চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। তিনি সব জানেন।

সাধন মিত্রের কথাটা শেষ হল না, ঘরের মধ্যে সুট-পরিহিত সাতাশ-আঠাশ বৎসরের একটি সুন্তী যুবক এসে ঢুকল। আগস্টক কারোর দিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজাসুজি সাধনের দিকেই তাকিয়ে বলে, এই যে সাধন মিত্র, হোয়াট অল দিস? কাকা নাকি সুইসাইড করেছে?

সাধন মিত্র কোন জবাব দেয় না। তার আগেই সুখময় মঞ্জিক আগস্টকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, কে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সুখময়ের প্রশ্নে আগস্টক ফিরে তাকাল সুখময়ের দিকে, কে আমি? ইয়েস পুলিস অফিসার, অফ কোর্স ইউ ক্যান আক্ষ দ্যাট। আমার নাম সুশাস্ত্র সাহা।

আপনি কার কাছে শুনলেন সুশাস্ত্রবাবু যে আপনার কাকা সুইসাইড করেছেন? কার কাছে আবার—আজ অফিসে গিয়েই তো শুনলাম।

আজ কথন অফিসে গিয়েছিলেন আপনি? কিরীটী এবারে প্রশ্নটা বলল।
কেন, দুপুরবেলা।

আপনার দাদা কোন সংবাদ পাননি?

গড মোস।

আপনি দেননি?

নো স্যার।

কেন?

কেন আবার কি? ইট হঁজ দেয়ার হেডেক, নট মাইন। কথাটা বলে সুশাস্ত সাহা ঘর
থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিরীটীর ইঙ্গিতে সুখময় তাকে ডাকল, সুশাস্তবাবু, কোথায়
যাচ্ছেন?

উপরে।

কিরীটী বলে, এখন যাবেন না।

মাৰ না? বাট হোয়াই? কেন যাৰ না বলুন তো? তাছাড়া who are you?

আমি থানার ও সি—সুখময় বললেন।

O. C.—I see! তা আমি উপরে যাৰ না কেন—শুনতে পারি কি?

জীবিত থাকতে তিনি আপনার এবাড়িতে আসা যখন পছন্দ করতেন না তখন তাঁর
উইল না জানা পর্যন্ত আপনাকে তো আমরা এ বাড়ির উপরে যেতে দিতে পারি না!

পারেন না! বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল সুশাস্ত সুখময়ের দিকে।

না।

ননসেন্স! আমার নিজের কাকার বাড়ি এটা—আর আমরাই তাঁর সব।

তা আমরাও জানি সুশাস্তবাবু—তবু সেটা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। কিরীটী শাস্তকঠে
বলে।

মানে! কি আবার প্রমাণসাপেক্ষ—আমরা তাঁর ভাইপো কিনা?

না। তাঁর মৃত্যুর পর আপনাদের এ বাড়িতে প্রবেশের কোন সত্ত্বিকারের আইনত
অধিকার আছে কিনা সেইটাই প্রমাণসাপেক্ষ।

প্রমাণসাপেক্ষ! তা আমাদের নেই তো কার আছে শুনি? আইনত তাঁর যাবতীয় স্থাবর
ও অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র উন্নতাধিকারী আমরা ছাড়া আর কারা?

কথাটা আপনার যেমন মিথ্যা নয় সুশাস্তবাবু তেমনি এও মিথ্যা নয় যে জীবিত
থাকাকালীন কোনদিন আপনাদের এখানে তিনি প্রবেশ করতে দেননি।

কে বললে?

যেই বলুক কথাটা যে সত্যি, আপনি কি অঙ্গীকার করতে পারেন?

নিশ্চয়ই করি। নিশ্চয়ই ঐসব আজগুবী কথা সাধন মিত্তির বলেছে আপনাদের! ও
কে! দেখে নেব সাধন মিত্তির, আমিও সুশাস্ত সাহা—

কথাটা বলে সাধনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বোধ হয় ঘর থেকে পুনরায় বেরিয়ে
যাবার জন্য পা বাঢ়ায় দরজার দিকে সুশাস্ত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী আবার বাধা দেয়, যাবেন না সুশাস্তবাবু, আপনার সঙ্গে
আরও কিছু আমাদের কথা আছে।

ঘুরে দাঁড়াল সুশাস্ত সাহা দরজার মাঝবরাবর গিয়ে এবং ভু-দুটো কুঁচকে কিরীটীর
দিকে তাকিয়ে বলে, কথা আছে—আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার আপনার সঙ্গে কোন কথা নেই। বলে আবার পা বাঢ়াবার চেষ্টা করে
সুশাস্ত।

বাধা দিলেন এবারে সুখময় মন্ত্রিক, আপনার না থাকবেও আমাদের আছে। দাঁড়ান।

আমি যদি না শুনি আপনাদের কথা, আমাকে জোৱা করে শোনাবেন নাকি?

শাস্ত কঠে এবার কিরীটীই বলে, প্রয়োজন হলে শোনাতে হবে বৈকি। শুধু আপনি

কেন, তাঁর আঞ্চলিকসম্পত্তির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড তাঁদের প্রত্যেকেই যাঁরা তাঁর সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজন। কারণ—

কারণ?

কারণ—জনসম্মত আঞ্চলিক আঞ্চলিক করেন নি, তিনি নিহত হয়েছেন।

কি—কি বললেন?

বললাগু কেউ তাঁকে হত্যা করেছে এবং তাদেরই কারও পক্ষে সেটা সম্ভব বেশী যারা তাঁর সম্পত্তির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড ছিল।

সুশাস্ত্র অতঃপর কিছুক্ষণ যেন কিরীটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর শাস্ত কঠে বলে, আই সি! তাহলে আপনার ধারণা আমাদের মধ্যেই কেউ-না-কেউ তাঁকে হত্যা করেছি তাঁর সম্পত্তির লোডেই?

আপাততঃ সেটাই কি স্বাভাবিক ভাবে মনে হয় না সুশাস্ত্রবাবু?

চমৎকার! তাহলে এই ধরে নেব যে আপনারা আমাকে কাকার সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসাবে অ্যারেস্ট করবেন?

না, অ্যারেস্ট করছি না।

তবে?

যতক্ষণ না আপনাদের প্রত্যেকের উপর থেকে পুলিসের সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়, আপনারা প্রত্যেকেই সন্দেহের তালিকার মধ্যে থাকবেন। বললে আবার কিরীটি।

হঁ। তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে সেটা জানতে পারি কি?

হ্যাঁ, যতক্ষণ না এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় আপনি এ বাড়িতে যেমন চুক্তে পারবেন না তেমনি আপনার বর্তমান কলকাতার রেসিডেন্স থেকে কোথাও যেতে পারবেন না পুলিসের পারমিশন ব্যতীত।

বেশ তাই হবে।

আপনি এবাবে যেতে পারেন।

সুশাস্ত্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ এগার ॥

পরের দিন ময়না তদন্তের রিপোর্ট ও কাচের গ্লাস ও সঙ্গের বোতলের কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট পাওয়া গেল।

গ্লাসে বা বোতলের মধ্যে কোন রকম বিষ যেমন পাওয়া যায় নি তেমনি মৃতদেহেও কোন রকম বিষের সংক্ষান মেলেনি। ময়না তদন্তকারী ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছেন, হত্যার কারণ হাই ভোল্টের ইলেক্ট্রিক কারেন্ট।

তালুকদারই রিপোর্টটা নিয়ে এসেছিল কিরীটির এখানে।

তিনি বলেন, ব্যাপারটা কেমন হল কিরীটি, এ যে কেমন গোলমাল হয়ে গেল!

রিপোর্টগুলো দেখবার পরই কিরীটি যেন কেমন আঞ্চলিকভাবে সমাহিত হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। হাতের ধরা পাইপটা নিতে গিয়েছিল।

সেটায় পুনরায় অগ্নিসংযোগ করে কিরীটি বলে, যদিও হত্যাকারী নিঃসন্দেহে খুব চতুর এবং অসাধারণ ঝুঁকিমত্তার পরিচয় দিয়েছে হত্যার ব্যাপারে তবু বলব সেদিনকার একটা ব্যাপার তাকে— যাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল।

বিশ্বয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন তালুকদার, সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল একটা ব্যাপার? হ্যাঁ।

কি বল তো?

কারোরই তো ব্যাপারটা অজানা থাকবার কথা নয় তালুকদার, কারণ ঐদিন সকালেই কাগজে ঘোষণা করা হয়েছিল কলকাতা শহরে কোন কোন এলাকায় সেদিন রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

কথটা একটু পরিষ্কার করে বল তো?

এখনও ঠিক বলতে পারছি না তালুকদার, কারণ একটা জায়গায় এসে আমার চিন্তার যোগসূত্রা ছিঁড়ে যাচ্ছে—

আচ্ছা কিরীটী, তালুকদার প্রশ্ন করেন, এখনও কি তোমার ধারণা ব্যাপারটা হত্যাই?

নিঃসন্দেহে। আত্মহত্যা আদৌ নয়। হতভাগ্য ব্রজদুলাল সাহার দেহে তাঁর অঙ্গাতেই হাই ভোল্টেজের ইলেক্ট্রিক কারেন্ট পাস করিয়ে তাঁকে মৃহৃত্বে হত্যা করা হয়েছে।

বল কি!

ঠিক তাই।

কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব হল?

কেমন করে যে সম্ভব হল সেটাই ভাবছি এখনও। তবে সম্ভব হয়েছিল নিশ্চয়ই, নচেৎ ঐভাবে তাঁকে অতর্কিতে মৃত্যুবরণ করতে হত না।

তারপরই একটু থেমে হঠাতে কি একটা কথা মনে পড়্যায় কিরীটী বলে, ভাল কথা তালুকদার, সাহার সেই শয়নকক্ষটা লক-আপ করে রাখা হয়েছে, না?

হ্যাঁ। কেন, তুমিই তো সুখময়বাবুকে ঘরটাতে তালাবন্ধ করে রাখতে বলে দিয়েছিলে!

একটু বস তালুকদার, আমি চট করে একটা টেলিফোন করে আসি।

কাকে ফোন করবে?

সুখময়বাবুকে।

কিরীটী ঘর থেকে উঠে গেল।

তালুকদার অতঃপর সোফাটায় বসে একটা পিকটোরিয়াল সাম্প্রাহিক ইংরাজী ম্যাগাজিনের পাতাগুলো উল্টে উল্টে ছবি দেখতে থাকেন।

পুলিসের বড়কর্তা ঐদিন সকালেই তালুকদারকে ডেকে ব্রজদুলাল সাহার হত্যার রহস্যজনক ব্যাপারটার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। সেই সূত্রেই ঐদিন সন্ধ্যায় কিরীটীর শরণপন্থ হয়েছিলেন তালুকদার।

কারণ থানা অফিসার সুখময় মল্লিকের কাছে গিয়ে শুনেছিলেন কি ভদ্রবৰ ঘটনাচ্ছে কিরীটী ব্রজদুলাসের হত্যার পরের দিন গিয়ে অকৃত্তানে হাজির হয়েছিল।

কিন্তু কিরীটীর ওখানে এসে, তার মতামত শুনে ব্রজদুলাসের হত্যার বহসের মীমাংসার ব্যাপারে যে খুব বেশি আশাস্থিত হয়েছেন তা নয়।

অর্থাৎ এও সে ভাসভাবেই জানে যে, কিরীটী ঐ হত্যাবৃহসোর মীমাংসায় পৌছবার একটা-মা-একটা পথ খুঁজে পেয়েছে যদিও—তথাপি সে নিজে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যতক্ষণ স্থুত না খুলবে ততক্ষণ যতটুকু সে বলেছে তার বেশি জানবার আর কোন উপায়ই নেই।

একটু পরেই কিরীটী ফিরে এল একেবারে বাইরে বেরুবার বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে।
রাত তখন বোধ হয় পোনে আটটা।

গ্রীষ্মের রাত। খোনে আটটা বিশেষ করে কলকাতা শহরে তো এমন কিছুই নয়।
একেবারে সন্ধ্যারাত্রি ঘলনেও বেশি বলা হয় না।

কিরীটীর পরিবর্তিত বেশের দিকে তাকিয়ে তালুকদার প্রশ্ন করেন, কোথাও বেরুচ্ছ
নাকি ওখন?

হ্যাঁ একটু ঘুরে আসা যাক। তোমার হাতে যদি তেমন জরুরী বা প্রয়োজনীয় কোন
কাজ না থাকে তো আমার সঙ্গে যেতে পার।

কিরীটী টোবাকো পাউচ ও লাইটারটা হাতে তুলে নিতে নিতে ওঁর মুখের দিকে
তাকিয়ে বলে কথাগুলো।

তালুকদার ম্যাগাজিনটা টেবিলের উপর রেখে দাঁড়িয়ে বলেন, না, অন্য কোন কাজ
তেমন নেই, তোমার এখানেই তো এসেছিলাম। চল।

রাস্তায় বের হয়ে দুজনে একটা ট্যাক্সি নেয়।

ট্যাক্সিওয়ালা কিরীটীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞসা করে, কোন্ দিকে যাব বাবুজী?

গর্চা লেন চল। কিরীটী বলে।

পার্শ্বে উপবিষ্ট তালুকদার গর্চা লেন কথাটা কানে যেতেই কিরীটীর মুখের দিকে
তাকান।

গাড়ি তখন গর্চা লেনের দিকেই ছুটে চলেছে।

কিন্তু গাড়ি কিছুদূর এগুবার পরই কিরীটী ড্রাইভারকে সোজা এগিয়ে যেতে বলল
একটা রেস্তোরাঁর দিকে চায়ের পিপাসা পেয়েছে বলে।

॥ বারো ॥

‘পাহুঁশালা’।

ঐ পাড়ারই একটা আধুনিক রেস্তোরাঁ।

রেস্তোরাঁটি খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু বেশি দিনের না হলেও মালিক প্রচুর অর্থব্যয়
করে আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও আরামের ব্যবস্থায় রেস্তোরাঁটি সত্যিকারের যাকে বলে
আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

সামান্য কয়েক মাসেই ‘পাহুঁশালা’ রেস্তোরাঁ-প্রিয় লোকদের কাছে ঐ অঞ্চলের
আকর্ষণের অন্যতম বিলাস ও আরামকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রেস্তোরাঁটির মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিশেষ ছিল। তরুণ ও তরুণী খরিদারদের জন্য
ছোট ছোট নির্জন কিউবিক্যালস। কাজেই অল্পবয়সের কলেজের ছাত্রছাত্রী ও তরুণ-তরুণী
খরিদারদের ভিড়ই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি ‘পাহুঁশালা’য়।

কিরীটী ও তালুকদার যখন ‘পাহুঁশালা’য় এসে ঢুকলো রাত তখন সোয়া আটটা।
বিয়াটি হলঘরের এক কোণে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে দু’কাপ কফির অর্ডার দিল
কিরীটী দুজনের জন্য।

কিরীটী সক্ষ্য করেনি।

তার ঠিক হাত দশেক দূরেই দেওয়াল যেঁথে আলো-আধীরির মধ্যে অন্য একটা

টেবিলে মুখোমুখি বসেছিল—কাপ চকোলেট ড্রিংক ও কিছু স্যান্ডউইচ নিয়ে দুটি ঘূরক-যুবতী।

মিস রেবেকা অন্তেজ ও সাধন মিত্র।

তাদের প্রস্তরের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা চলছিল।

বেবেকা বলছিল, কিন্তু ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায়টা কি
বল সাধন?—যার চাকরি করছিলাম, যে দয়া করে তার গৃহে স্থান দিয়েছিল সেই যথন
চলে গেল তখন আর দাবী কোথায় আমার ওখানে থাকবার আর থাকতেই বা দেবে কে
আমাকে?

মৃদুকষ্টে সাধন বলে, নতুন করে দাবীরও তো সৃষ্টি হতে পারে আবার!

নতুন দাবী? মন্দ বলনি কথাটা সাধন। প্রশাস্ত, সুশাস্ত ও শ্রীমতী সাহাও এসে ঐ
বাড়িতে আর যার যে ব্যবহৃত করুক আমার ব্যবহৃটা যে বাড়ির বাইরে হবে, সে কি আর
আমি জানি না!

কিন্তু তারাই যে বাড়ির একমাত্র মালিক হচ্ছে তা তুমি জানলে কি করে? ব্যাপারটা
তো এখনও পর্যন্ত কেউই জানে না।

ওর আবার জানাজানির কি আছে সাধন! মিঃ সাহা নিজে বিপত্তীক ছিলেন, কোন
সন্তানাদিও তাঁর নেই—সেক্ষেত্রে ওরা ছাড়া আর তাঁর টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি পাবে কে!

তুমি তো জান, তাদের প্রতি মিঃ সাহা কোনদিন এতক্ষেত্রে সন্তুষ্টও ছিলেন না।

সে তুমি যাই বল সাধন, হাজার হোক নিজের ভাইপো-ভাইয়ি তো—তাদের বঞ্চিত
করে অপর কাউকে কিছু তিনি দিয়ে যাবেন, এটা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।
তাছাড়া আরও একটা কথা, নতুন ম্যানেজমেন্টে যদি আমার চাকরাই না থাকে তখন তো
আমাকে চলে যেতেই হবে ঐ বাড়ি থেকে। সেক্ষেত্রে মানে মানে সময় থাকতে
আগেভাগেই সরে পড়াই কি ভাল নয়?

তুমি দেখছি বড় অল্পেতেই হতাশ হয়ে পড় রেবেকা—সাধন বলে।

মানে?

তা নয় তো কি। সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও পর্যন্ত অঙ্ককারে রয়েছে।

অঙ্ককারে কেন হবে? আমার মনে হয় সুশাস্তবাবু উইলের সম্পর্কে কিছু কিছু জানেন।

চমকে ওঠে যেন সাধন মিত্র। বলে, কে বললে?

কেন, জান না? আজ দুপুরে যে ঐ বাড়িতে এসে জীবনকে হস্তিত্বি করছিল
সুশাস্তবাবু।

হস্তিত্বি করছিল?

হ্যাঁ। বলছিল পূরনো আগাছা নাকি সব কেটে সাফ করে দেবে বাড়ি থেকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

॥ তের ॥

‘পাহুঁশালা’ থেকে যখন বের হয়ে এল কিরীটী ও তালুকদার রাত তখন পৌনে নটা।

আগের ট্যাঙ্গিটা ছেড়ে দিয়েছিল শুরা।

নতুন একটা ট্যাক্সি নিয়ে শুরু যখন গর্চা লেনে ব্রজদুলাল-ভবনে এসে পৌঁছাল তখন
নটা বেজে মাত্র সাত মিনিট।

ট্যাক্সির ভাড়া রাস্তা থেকেই মিটিয়ে দিয়ে কিরীটী আর তালুকদার গেট দিয়ে ভেতরে
প্রবেশ করে। এবং কয়েক পা এগুতেই ওদের নজরে পড়ল, পারলারের কাটের
জানলাপথে আলো দেখা যাচ্ছে।

পারলারের দরজার দিকে এগুতেই ওদের কানে এল একটা রুক্ষ পুরুষের কঠস্থর:
সেট্টিংতো আমি জানতে চাইছি মিঃ মল্লিক। কেন এখানে এ-সময় আমাকে ডেকে নিয়ে
আসা হল? যে বাড়িতে ঘৃণায় আজ পর্যন্ত কখনও আমি পা ফেলিনি সেখানে কেন
আমাকে ডেকে আনা হল?

সুখময় মল্লিকের কঠস্থর শোনা যায়, কিন্তু আজ যখন আপনাদের কাকা ব্রজবাবুর
মৃত্যুতে আপনারাই এ বাড়ির মালিক হচ্ছেন তখন আজ হোক কাল বা পরশুই হোক
একদিন এখানে আসতেই হবে আপনাকেও।

কে বললে আপনাকে সে কথা? যার খুশি সে আসুক, জানবেন প্রশান্ত সাহা এখানে
জীবনেও পা দেবে না।

কিন্তু কেন বলুন তো প্রশান্তবাবু? এত রাগ কেন আপনার ব্রজবাবুর উপরে?
রাগ? একটা লম্পট, আউট জ্যান্ড আউট স্কাউন্ডেল একটা।

লম্পট!

নয়? কারও জানতে আজও বাকি আছে, এই ঠাঁর সেক্রেটারী না কি সেই ঝীশ্চান
মেয়েটা রেবেকার সঙ্গে ঠাঁর সম্পর্কের কথাটা?

সে কথাটা আপনি বিশ্বাস করেন প্রশান্তবাবু?

পৃথিবীসূন্দর লোক করে, আর আমিই বা করব না কেন?

কিন্তু এও শুনেছি অনেক লোকই নাকি বলে কথাটা মিথ্যে।

মিথ্যে?

হ্যাঁ।

তারা জানে না।

আপনিই বা স্থিরনিশ্চিত হলেন কি করে? এ-বাড়িতে তো কখনও আসেন নি?

না, আসিনি—

তবে?

তবে আবার কি! ঐসব নোংরামি কখনও কেউ চাপা দিয়ে রাখতে পারে, না পেরেছে
বুঝলাম। কিন্তু যা আপনি নিজে চোখে কখনও দেখেন নি, কেবলমাত্র লোকের কথা

শনে—

লোকেরাই বা ঠাঁর সম্পর্কে মিথ্যে রটনা করবে কেন বলতে পারেন মিঃ মল্লিক?

তাদের কি স্বার্থ?

স্বার্থ হচ্ছে দীর্ঘ। শাস্ত কষ্টে সুখময় জবাব দেন, হ্যাঁ, একটা কথা জানবেন, কেউ
কখনও আশাত্তিরিক্ত উন্নতি করলে তার আঙ্গীয়স্বজন বন্ধু ও পরিচিত জনেরাই তার
আড়ালে নিস্তে করে, কলক রটায়, এবং সেটা করে নিষ্ক্রিয় করায়। এবং এ যে কত বড়
গোপন ও কুৎসিত ব্যাধি আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মনে সেটা যেন আমরা জেনেও
জানতে চাই না।

না, না—সে আপনি যাই ক্ষম মিঃ মল্লিক, তার মুখ-চোখই আমাকে বলে দিত, কি টাইপের লোক সে। যাক গে মশায়, ও নিয়ে তর্ক আমি করতে চাই না। আমাকে যেতে দিন।

কিরীটী এতক্ষণ দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছিল, এবারে তালুকদারকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। এবং কতকটা যেন অকস্মাই গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ওয়েব প্রক্ষেপে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সুখময় মল্লিক ও প্রশান্ত সাহা দুজনেই যুগপৎ ওদের দিকে ফিরে তাকায়।

এই যে মিঃ রায় এসে গিয়েছেন, প্রশান্তবাবু আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাইছেন না। সুখময় মল্লিক কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েই কথাটা উচ্চারণ করেন।

ওঁরই নাম প্রশান্ত সাহা? কিরীটী সুখময় মল্লিকের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ, উনিই। আপনার ফোন পেয়ে তখনই ওঁকে আমি ফোন করি এখানে চলে আসবার জন্য। এসে দেখি আমার আগেই উনি এখানে এসে পৌঁছে গিয়েছেন।

কিরীটী প্রশান্ত সাহার দিকে চেয়ে ছিল।

সুশান্ত সাহাকে তার সুপুরুষ মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রশান্ত সাহা ততোধিক সুন্দর।

যেমন লম্বাচওড়া চেহারা তেমনি উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ।

পরিধানে একটা রেয়ন সিক্কের সাদা লংস ও টেরিলিনের ইবং নীলাভ রংয়ের শার্ট এবং চোখে সোনার ফ্রেমের ফ্যাসি চশমা। দাঢ়িগোঁফ নির্খুঁত কামানো।

শুধু সুন্দর চেহারাই নয়, বেশভূষাও যেমন পরিচ্ছম তেমনিই নির্খুঁত রুচির পরিচায়ক।

॥ চোদ ॥

আপনিই প্রশান্ত সাহা? কিরীটী প্রশান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনলাম না?

জবাব দিল এবারে তালুকদার পাশ থেকে, ওঁকে না চিনলেও নাম নিশ্চয়ই ওঁর শুনেছেন, উনি সত্যসন্ধানী শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়।

কিরীটী রায়! কথাটা যেন কিছুটা আত্মগত ভাবেই উচ্চারণ করে প্রশান্ত।

প্রশান্তবাবু, আপনি তো যাজেন ইলেক্ট্রিক্যালস কোম্পানীতে চাকরি করেন, তাই না? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

সেখানে কি কাজ করেন?

সেখানে আমি ওদের ওয়ার্কশপে ইলেক্ট্রিক্যাল মেকানিক।

কিছু মনে করবেন না, কত মাইনে পান?

তিনশো টাকা।

বিয়ে করেননি তো এখনও?

না।

কেন বলুন তো এখনও বিয়ে করেননি?

কেন আবার কি, তিনশো টাকা আবার একটা টাকা নাকি! একজন মানুষেরই ভদ্রভাবে জীবন ওই টাকাতে কাটে না তায় আবার পরিবার। ক্ষমা করবেন মশাই, এতবড় নিরেট গর্দন আমি নই।

তা তো সত্যিই, আজকালকৰ দিনে তিনশো টাকা আবার কি! কিন্তু এবাবে বোধ হয় বিয়ে করবেন—কি বলেন, কাকাৰ সম্পত্তি যখন পাচ্ছেন?

কি বলেন? কাকুৰসম্পত্তি? তাহলৈই হয়েছে! ব্ৰজদুলাল সাহাটি যে কি একখানা চিজ ছিল আপনাৰ তে? আৱ জানতেন না। মশাই, ও আশা আমি কৰি না। যাক গে, লোকটাৰ নামও আমাৰ সহ্য হয় না। জীবনে এ বাড়িতে কখনও এৱে আগে আমি পা দিইনি। মিহামও না, আজ যদি আপনাৰা আমাকে এখানে ঢেকে না আনতেন। কেন ঢেকেছেন এবাবে বলুন?

কেন ঢেকেছি? তাৰ কাৱণ আছে—

কি কাৱণ?

এক্ষুনি জানতে পাৱেন, একটু অপেক্ষা কৰলুন।

না মশাই, ক্ষমা কৰলুন আমাকে। আমাৰ কাজ আছে, এখুনি আমাকে যেতে হবে।

প্ৰশাস্ত সাহাৰ কথাটা শ্ৰেষ্ঠ হল না, দৰজাৰ বাইৱে ভাৰী গলায় শোনা গেল, ভিতৰে আসতে পাৱি মিঃ মল্লিক?

কে? সুখময় মল্লিক শুধান।

আমি রূপচাঁদ চ্যাটার্জী।

আসুন, আসুন—ভেতৰে আসুন।

ব্ৰজদুলাল সাহাৰ সলিসিটাৰ মিঃ রূপচাঁদ চ্যাটার্জী এসে ঘৰে ঢুকলৈন।

ভদ্ৰলোকেৰ বয়েস হয়েছে, অন্ততঃ পঞ্চাশেৰ নীচে নয়। বেশ হস্টপুষ্ট চেহাৰা।

পৰিধানে দার্মা সুট। হাতে একটা চামড়াৰ ফোলিও।

রূপচাঁদ চ্যাটার্জী ঘৰেৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰে পৰগৱ সকলেৰ মুখেৰ দিকে তাকিয়ে শ্ৰেণে তাকালৈন প্ৰশাস্ত সাহাৰ মুখেৰ দিকে, প্ৰশাস্তবাৰু, আপনিও আছেন দেখছি! কিন্তু মিঃ মল্লিক কে?

সুখময় মল্লিক তখন বলেন, আমাৰই নাম সুখময় মল্লিক। উনি ডি.সি. মিঃ তালুকদাৰ আৱ উনি—

ওঁৰ আৱ পৰিচয় দিতে হবে না মিঃ মল্লিক, কিৱাটী রায়কে আমি চিনি। যদিও আমাদেৱ পৰম্পৱেৰ সঙ্গে পৰিচয়েৰ সৌভাগ্য আজও হয়নি।

একটু থেমে রূপচাঁদ চ্যাটার্জী আবার বলেন, আপনি যখন আমাৰ অফিসে ফোন কৰেন তখন আমি অফিসে ছিলাম না। বাইৱে বাৰলো সাহেবেৰ চেম্বারে একটা কনসালটেশনে গিয়েছিলাম। ফিরে আসতেই আমাৰ জুনিয়াৰ বললে, আমাকে না কি আপনি চেম্বারে ফোন কৰে ফেৱাৰ সঙ্গে সঙ্গেই এখানে চলে আসতে বলেছেন। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

॥ পনেৱ ॥

কথা বলে এবাবে কিৱাটী, আমিই সুখময়বাৰুকে বলেছিলাম ফোনে আপনাকে আজ একবাৰ এখানে আসবাৰ জন্য খবৱ দিতে মিঃ চ্যাটার্জী। ব্ৰজদুলাল সাহা, আপনাৰ ক্লায়েন্টেৰ উইল সম্পর্কে কয়েকটা ইনফৱমেশন আমাৰ দ্বাৰা কাৰ।

উইল সম্পর্কে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কিরীটীবাবু, আমাৰ ক্লায়েন্ট তো কোন উইল শেষ পর্যন্ত কৱে যেতে পাৱেন নি? কেন, প্ৰশাস্তবাৰু তো জানেন সেকথা। ওঁকে তো আজই বলেছি।

ৱাপচাঁদ চ্যাটার্জী কুঠাটা বলাৰ সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী প্ৰশাস্ত সাহাৰ দিকে তাকাল। কিন্তু সে মুহূৰ্তেৰ জন্ম।

পৰক্ষণেই তাকাল আবাৰ বাপচাঁদ চ্যাটার্জীৰ দিকে, আপনাৰ ক্লায়েন্টেৰ কোন উইল নেই।

না। মাদ্রাজ যাবাৰ আগে সৰ্বপ্ৰথম তিনি উইলেৰ কথা আমাকে জানান।

তাৰ আগে কখনও উইলেৰ প্ৰশ্ন ওঠেনি?

না। সেই প্ৰথম উইলেৰ কথা আমাকে বলেন এবং কি ভাৱে উইল হবে মুখে সেটা বলে আমাকে একটা ড্রাফট তৈৱী কৱে রাখতে বলেন, মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে সেটা পাকাপাকি কৱবেন বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো সব ভেত্তে গেল। মাদ্রাজ থেকে যেদিন ফিরলেন সেই রাত্ৰেই আভ্যন্তা কৱলেন।

আভ্যন্তা তো তিনি কৱেননি মিঃ চ্যাটার্জী! গন্তীৰ কঠে কিরীটী এবাৰ বলে।

সে কি, আভ্যন্তা কৱেননি?

না। স্থিৱ কঠে কিরীটী পুনৱায় প্ৰতিবাদ জানাল।

কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম—

ভুল শুনেছিলেন। তাঁকে হত্যা কৱা হয়েছে। কিরীটী আবাৰ বলে।

হত্যা কৱা হয়েছে?

হ্যাঁ।

বাট হাউ!

হাই ভোলটেজ ইলেক্ট্ৰিক কাৱেন্ট তাঁৰ দেহে পাস কৱিয়ে তাঁকে সেৱাত্ৰে হত্যা কৱা হয়েছে মিঃ চ্যাটার্জী।

এতক্ষণে প্ৰশাস্ত সাহা কথা বললে, সত্তি বলছেন কিরীটীবাবু, কাকাকে হত্যা কৱা হয়েছে?

হ্যাঁ প্ৰশাস্তবাৰু। তাঁকে সত্তি হত্যা কৱা হয়েছে।

কিন্তু কে—কে তাঁকে হত্যা কৱবে?

যাৱ স্বাৰ্থ ছিল সেই। যাক সেকথা প্ৰশাস্তবাৰু, আপনাকে আমাৰ যেজন্য প্ৰয়োজন এবং যেজন্য ডেকেছিলাম—অনুগ্ৰহ কৱে আমাৰ সঙ্গে একবাৰ ওপৱে যাবেন।

ওপৱে? কেন বলুন তো?

এক্সপাৰ্ট ওপিনিয়ন নেব।

এক্সপাৰ্ট ওপিনিয়ন কি ব্যাপাৱে?

আপনি তো একজন ইলেক্ট্ৰিক্যাল মেকানিক, ইলেক্ট্ৰিকেৰ ব্যাপাৱেই আপনাৰ ওপিনিয়ন আমাৰ চাই। চলুন।

ওৱা ঘৱ থেকে বেৱ হয়ে দোতলাৰ সিডিৰ দিকে আগুছে, এমন সময় সাধন আৱ রেবেকাৰে সেখানে প্ৰবেশ কৱতে দেখা গেল।

রেবেকা আৱ সাধন মিত্ৰ যেন হঠাৎ ওই সময় ওদেৱ ওখানে দেখে থমকে দাঢ়িয়ে যায়।

কিরীটি কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে মন্দু হেসে বলে, যাক, আপনারা দুজনও এসে গিয়েছেন ভালই হল। বাকী রহিলেন শুধু সুশাস্ত্রবাবু।

এরপর কিরীটি সুখময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ মল্লিক!

বলুন?

আপমি সুশাস্ত্রবাবুকে আসবার জন্য খবর পাঠাননি?

হাঁ, কোন্তে পাঠিয়েছি তো। যাকে পাঠিয়েছি তাকে বলেও দিয়েছি সুশাস্ত্রবাবুকে তাঁর ফ্ল্যাটে না পাওয়া গেলে, হংকং হোটেলে পাওয়া যাবে। প্রয়োজন হলে সেখানেও যেতে। তবে তিনিও হয়তো এসে পড়বেন। চলুন ওপরে যাওয়া যাক। চলুন প্রশাস্ত্রবাবু, সাধনবাবু! মিঃ মল্লিক, আপনিও।

সকলে এসে উপরে ব্রজদুলাল সাহার ঘরের তালা খুলে প্রবেশ করল।

ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ব্রজদুলালের হত্যার পরদিন সকালে যেমন ছিল, যেখানে যেটি, সাতদিন পরে ঠিক তেমনিই আজও সব আছে।

কিরীটি একবার চারদিকে চোখ ঝুলিয়ে দেখে নিল।

তারপর সুখময়ের দিকে চেয়ে বললে, মিঃ মল্লিক, ভৃত্য জীবন আর দারোয়ান মিশিরকে একবার এ ঘরে ডেকে আনুন।

সুখময় মল্লিক ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটি ঘরের দক্ষিণ দিককার জানলাটা খুলে দিয়ে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে বাকী সকলে স্তুক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে অঙ্গুত একটা স্তুকতা যেন থমথম করতে থাকে।

মিনিট কয়েক বাদেই সুখময় মল্লিক ভৃত্য জীবন ও দারোয়ান মিশিরকে নিয়ে ফিরে এলেন।

ভৃত্য জীবনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই কিরীটি ঘুরে দাঁড়াল, জীবন!

আজ্ঞে?

প্রশাস্ত্রকে দেখিয়ে বলে, এই বাবুকে চেনো!

কেন চিনব না আজ্ঞে, উনি তো বাবুর বড় ভাইপো?

এ বাড়িতে উনি এর আগে কখনও এসেছেন?

আজ্ঞে না।

এবারে দারোয়ান মিশিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিরীটি, মিশিরজী জী?

ওই বাবুকে তুম পয়সাঙ্গে?

জী নেই।

কভি দেখা নেই?

নেই জী।

বাহিরে ওই সময় জুতোর শব্দ শোনা গেল।

মিঃ মল্লিক, দেখুন তো আপনার সুশাস্ত্রবাবু শোধ হয় এলেন। কিরীটি সুখময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

সুখময় মল্লিককে আবৃ প্রগায়ে দেখতে হল না।

সত্তি সুশাস্ত সাহা ও একজন প্লেন-ড্রেস সি.আই.ডি অফিসার ঘরে এসে ঢোকেন।

সুশাস্তর দাঁড়াবার তঙ্গটা যেন কেমন একটু শিথিল।

কোনমতেই যেন যে সোজা হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না।

আজও তার পরিধানে দামী সুট ছিল।

সুশাস্ত ঘরে চুকতে চুকতেই বলে, কোথায় সুখময় মল্লিক, কেন সে আমাকে এখানে এভাবে ধরে নিয়ে এল আমি জানতে চাই! কোথায় সে?

কঠস্বর জড়িত। বোঝা যায় অতিরিক্ত মদ্যপানে সুশাস্ত সাহা নেশাগত্ত, ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়।

কিরীটীই এগিয়ে এল, সুশাস্তবাবু, বসুন সোফাটায়।

সুশাস্ত বলে ওঠে, ড্যাম ইট, বসতে আমি আসিনি—কথাটা সুশাস্তর শেষ হয় না, ঘরের মধ্যে অন্যান্য দণ্ডায়মান সকলের দিকে একে একে তার নজর পড়ে এবং সর্বশেষে প্রশাস্তর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, এই যে বড় সাহেব, তুমি তাহলে উপস্থিত হয়েছে! ভাল, ভাল!

কিরীটী আবার গভীর এবং গলায় নির্দেশের সূর এনে বলে, বসুন সুশাস্তবাবু!

বসব?

হ্যাঁ, বসুন।

আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে থাকবেন—আর শুধু আমি বসব মিঃ রায়?

হ্যাঁ, আপনি বসুন।

ও-কে বস! তবে বসলাম।

ধপ করে সুশাস্ত সোফার উপরে বসে পড়ল।

কিরীটী এবারে সাধন মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললে, আজ এই সময় এমন যে একটা যোগাযোগ হবে, সত্যিই বলছি, ভাবতেও পারিনি সাধনবাবু। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভগবানের ইচ্ছায় যখন যোগাযোগটা হলই, তখন যে কথাটা আপনাদের প্রত্যেককেই আমার বলবার ছিল সেটা আজই বলব।

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে লাগল, গত ২৩শে জুলাই রাত্রে এই কক্ষের মধ্যে নশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, সেই হত্যাকাণ্ডের কথাই বলব। কেমন করে সে রাত্রে ব্রজদুলালবাবু নিহত হয়েছিলেন আপনারা হয়ত এখনও সকলে তা ঠিকমত জানেন না।

॥ ঘোল ॥

সবাই কুকু নিষ্পাসে যেন কিরীটীর কথা শুনতে থাকে।

কিরীটী বলে, আপনারা হয়ত সবাই জানেন গত ২৩শে জুলাই এই অঞ্চলে রাত দশটা পঁয়তাল্লিপ থেকে সোয়া এগারোটা পর্যন্ত ইলেক্ট্রিক কার্মেট রঞ্জ থাকায় এই অঞ্চলটা ঐ আধ ঘন্টা সময় অক্ষকার হয়ে ছিল। সেই সময়ের মধ্যেই হত্যাকারী এই ঘরের মধ্যে কৌশলে ব্রজদুলালবাবুর মৃত্যু-ফাঁদ পাতে—যে ফাঁদে ব্রজদুলালবাবু অবধারিত ভাবে পা দেন নিজের অজ্ঞাতেই।

মৃত্যুফাঁদ। মৃদুকষ্টে কথাটা উচ্চারণ করে সাধন মিত্র।

হ্যাঁ, মৃত্যুফাঁদ। ডেথ-ট্র্যাপ। এবং মৃত্যুফাঁদটা কি ছিল জানেন—একটা টেবিল ল্যাম্প!

টেবিল-ল্যাম্প ? কথাটা বলে যেন হাঁ করে তাকায় সাধন মিত্র কিরীটির মুখের দিকে।

হাঁ মিঃ মিত্র, একটা টেবিল-ল্যাম্প। যে টেবিল-ল্যাম্পটা ঐ ত্রিপয়ের উপরে বরাবর থাকত এবং যেটা সেই রেজিনাল ল্যাম্পটা হত্যাকারী সেই রাত্রেই সরিয়ে ফেলে ঐ নতুন টেবিল-ল্যাম্প এখানে রেখে দেয়।

ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা—

একটা নতুন ল্যাম্প। এবং অরিজিন্যাল ল্যাম্পটা সরিয়ে ঐ নতুন ল্যাম্পটা রেখেই হত্যাকারী সেই রাত্রের তার হত্যার নির্দর্শন রেখে গিয়েছে তার নিজের অঙ্গাতে। এমনিই হয়ে উঠগবানের বিচারে পাপের ছাপ এমনি করেই হত্যাকারী তার অঙ্গাতে রেখে যায়। আর ঐ ল্যাম্পটাই আমাকে সত্যের সন্ধান দিয়েছে।

সুখময় মল্লিক বলেন, ব্যাপারটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ রায়!

কেন বুঝতে পারছেন না সুখময়বাবু? ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে আমরা জেনেছি সেরাত্রে হাই ভোল্টেজের ইলেক্ট্রিক কারেন্ট পাস করবার জন্যই রেজিনাল ল্যাম্পটা আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছিল, কেমন কিনা?

হাঁ।

সেই কারেন্ট পাস করানো হয়েছিল, যে টেবিল-ল্যাম্পটার কথা বলছি সেটারই ভিত্তির দিয়ে।

কিন্তু সেই অরিজিন্যাল টেবিল-ল্যাম্পটা গেল কোথায়? প্রশ্ন করেন সুখময় মল্লিক।

মিস রেবেকা মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করুন, উনিই হয়ত বলতে পারবেন কোথায় সে ল্যাম্পটা।

কিরীটির মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি যেন একসঙ্গে গিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে দণ্ডয়মান রেবেকার উপরে।

রেবেকা প্রথমটায় বোধ হয় একটু খতমত থেয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তীক্ষ্ণ কঢ়ে বলে ওঠে, হোয়াট ডু ইউ মিন! এ কথার আপনার অর্থ কি মিঃ রায়, আমি জানতে চাই। ইট ইজ নট অনলি ইনসালটিং—ড্যামেজিং টু।

কিরীটি মৃদু হেসে একবার রেবেকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, অবশ্যই ড্যামেজিং মিস মণ্ডল এবং ড্যামেজিং যে হতে পারে সেটা অন্ততঃ আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে পূর্বেই বোৰা উচিত ছিল।

What do you mean ? কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাই ল্যাম্পটা আপনারই ঘরে আলমারির টানার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।

What ? কি বললেন?

যা বললাম তা তো আপনার অজানা নয় মিস মণ্ডল।

সাজানো—মিথ্যা একটা ঘড়িযন্ত্র।

কোর্টে তাই বলবেন—বলেই জীবনের দিকে তাকিয়ে কিরীটি শুধায় ল্যাম্পটা কোথায় তুমি পেয়েছিসে জীবন?

আজ্ঞে সেক্রেটারী মেমসাহেবের ঘরে—

চিক্কার করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ রেবেকা, জীবন, ইউ লায়ার—

লায়ার ও নয় মিস মণ্ডল—ল্যাম্পটা সত্যিই ও আপনার ঘরে পেয়েছিল। ওকে আমি বাড়ির সর্বত্র ল্যাম্পটা থুঁজে দেখতে বলেছিলাম। ও আপনার ঘরে আলমারির ড্রয়ারের

মধ্যেই সেটা খুঁজে পেয়ে আস্তকে পোছে দেয়।

সুশাস্ত্র জড়িত কঠে বলে ওঠে, তাহলে মেমসাহেব, তুমই—

না সুশাস্ত্রবাবু—ঢিকে উনি নন—যদিও উনি সাহায্যকারিগী ছিলেন সে-রাত্রের ব্যাপারে। কিরীটী বলে ওঠে।

সাধন মিত্র একক্ষণে চুপ করে যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়েছিল।

সুশাস্ত্র ব্যবধান তখন তার ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

আর দিকে তাকিয়ে এবার কিরীটী বললে, সাধনবাবু, নারীর মন বড় বিচ্ছিন্ন! তা হলেও এটা আপনার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অস্ততৎ বোঝা উচিত ছিল। যে নারী একজনের সঙ্গে স্বার্থের জন্য প্রেমের খেলা খেলতে পারে, সে আর একজনের সঙ্গেও পারে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, ইউ হ্যাভ বিন ডিসিভ্ড! আপনিও প্রতারিত হয়েছেন!

সাধন মাথা নীচু করে।

কিরীটী বলে, তবে আপনার দৃঃখ্যের কোন কারণ নেই। ঐ রেবেকা মণ্ডল যেমন আপনাকে প্রেমের ব্যাপারে প্রতারণা করেছে—তেমনি নিজেও প্রতারিত হয়েছে। ও জানে না এখনও যে, ও নিজে যেমন আপনার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলেছে, তেমনি প্রশাস্ত সাহাও ওর সঙ্গে নিতান্তই স্বার্থের খাতিরেই প্রেমের খেলা খেলেছে এতদিন।

সহসা যেন রেবেকা পাগলের মতই চিৎকার করে ওঠে, না—না—এ অসম্ভব—

কিরীটী ওই সময় বলে ওঠে, না প্রশাস্তবাবু, এ ঘর থেকে বেঁকুবার চেষ্টা করবেন না—

প্রশাস্ত সবার অজ্ঞাতে দরজার দিকে এগুচ্ছিল পায়ে পায়ে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

কিরীটী সুখময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ মল্লিক, পুট হিম আগুণার অ্যারেস্ট!

সুখময় মল্লিক সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে প্রশাস্তর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন।

॥ সতেরো ॥

সেই রাত্রেই।

কিরীটী বলছিল, ব্রজদুলাল সাহার পৈশাচিক হত্যার পশ্চাতে ছিল বিচ্ছিন্ন একটা নাটক। যার পাত্রপাত্রী ছিল ব্রজদুলাল সাহা স্বয়ং, তাঁর আতুল্পুত্র প্রশাস্ত সাহা, তাঁর পি.এ. সাধন মিত্রির এবং তাঁর স্কেন্টেরী মিস রেবেকা মণ্ডল।

বলাই বাহ্য, বিপন্নীক ব্রজদুলালের দুর্বলতা জম্মেছিল রেবেকার উপরে। শুধু ব্রজদুলালের কেন—সাধন মিত্রেও দুর্বলতা জম্মেছিল রেবেকার উপরে।

কিন্তু ওদের দুজনের কেউ ঘুণাঘূর্ণেও জানতে পারেনি যে রেবেকা ভাঙ্গিবেসেছিল প্রশাস্ত সাহাকে। আবার রেবেকাও তেমনি জানতে পারেনি ঘুণাঘূর্ণেও প্রশাস্ত তার প্রতি সবটাই ছিল নিষ্ক একটা অভিনয়। নারীর চাইতে সে ক্ষণবন্ধেই জীবনে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

এরপর আসা যাক ঘটনায়।

ব্রজদুলাল তাঁর আতুল্পুত্রের আদৌ দেখতে পারতেন না। অবিশ্য দেখতে না পারলেও প্রশাস্ত ও সুশাস্তবাবুদের ধারণা ছিল ব্রজদুলাল তাদের একেবারে বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রশাস্ত সাহা জানতে পারল ব্রজদুলালবাবু রেবেকাকে বিবাহ

করবেন স্থির করেছেন—রেবেকারই মারফৎ সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রজদুলালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য স্থিরপ্রতিষ্ঠ হচ্ছে। কিন্তু একা আত বড় দায়িত্বটা নেওয়া সম্ভব নয় তাই সে রেবেকার সাহায্য চাইলে। রেবেকাও সম্মত হল, যেহেতু প্রশাস্তকে সে মনে মনে ভালবাসত।

মিঃ মল্লিক শুধুলেম, রেবেকাকে ব্রজদুলাল বিবাহ করবেন স্থির করেছিলেন, কথাটা জানলেন কি করে মিঃ রায়?

কথাটাসহে ভৃত্য জীবনই আমাকে কথাটা পরণ রাত্রে বলে ফেলেছিল। এবং কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজদুলালের হত্যারহস্যটা আমার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কেবল একটা কিন্তু থেকে যায়—

কিন্তু!

হ্যাঁ, বুঝতে পারছিলাম না রেবেকা যখন ব্রজদুলালকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিল তখন এত বড় নৃশংস ব্যাপারটা কী করে ঘটতে পারে! কারণ রেবেকার অঙ্গাতে তো এত বড় ব্যাপারটা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে না আদৌ। কিন্তু সে প্রশ্নের মীমাংসাটাও একটু আগে আজ সন্ধ্যায় অকস্মাতই যেন হয়ে গেল পাহুশালায়।

মিঃ মল্লিক সপ্তশ দৃষ্টিতে তাকালেন কিরীটির মুখের দিকে, পাহুশালায়!

হ্যাঁ, পাহুশালায় সাধনবাবু আর রেবেকাকে দেখে ও তাদের কথাবার্তা শুনে। পাহুশালায় বসেই বুঝতে পারলাম, রেবেকা সাধন মিত্রের সঙ্গেও যখন প্রেমের খেলা খেলছে, তখন হতভাগ্য প্রৌঢ় ব্রজদুলালও তার অন্যতম ডিকটিম হয়েছিল স্বার্থজিনিত প্রেমের খেলায় নিঃসন্দেহে!

যাক যা বলছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটু থেমে আবার সুখময় মল্লিকের দিকে তাকিয়ে কিরীটি বলে, আজ যখন সুখময়বাবু আপনাকে ফোনে সকলকে ডেকে এখানে জড়ো করার জন্য বলি তখনও জানতাম না—বুঝতেও পারিনি ঘটনার পরিস্থিতি সহসা এমন হয়ে দাঁড়াবে। আমাকে যেন কোন চেষ্টাই করতে হল না, আপনা হতেই যেন সব জটগুলো খুলে গিয়ে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

সুখময় মল্লিক ওই সময় প্রশ্ন করেন, কিন্তু ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল বলে আপনার ধারণা মিঃ রায়? আর কেনই বা প্রশাস্ত সাহা তার কাকাকে এমনি করে হত্যা করল, এবং প্রশাস্তর ওপরেই বা আপনার সন্দেহ পড়ল কি করে?

কিরীটি বলে, প্রশাস্ত সাহার উপরে সন্দেহ পড়েছিল আমার তিনটি কারণে।
তিনটি কারণে?

হ্যাঁ, প্রথমতঃ ব্রজদুলাল সাহার ইলেক্ট্রিক কারেন্টে মৃত্যু হওয়ায় এবং প্রশাস্তর নিজের স্বীকৃতিতে জানতে পারা যায় যে, সে একজন ইলেক্ট্রিক মেডিনিক, ওর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি, সে এক নম্বরের একজন অর্থলোপু। তৃতীয়তঃ ব্রজদুলালকে ও অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। সব কিছু মিলিয়ে নিতে আর আমার কষ্ট হয়নি।

একটু থেমে কিরীটি আবার বলতে লাগল, প্রশাস্ত সাহা লোকটা অতীব ধূর্ত সন্দেহ নেই। সে জানত, রেবেকার প্রতি সাধনবাবুর দুর্বলতা আছে আর রেবেকা তাকে ভালবাসে। দদিককার এই ভালবাসার ছুরি দিয়েই সে তার পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল।

ঐদিন বিপ্রহরে শাহীবেশে এসে রেবেকার সাহায্যে প্রশান্ত ব্রজদুলালের শয়নকক্ষের ইলেক্ট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা এ বাড়ির ৪৪০ ভোল্পের সঙ্গে ডিরেক্ট কানেকশন করে রেখে গিয়েছিল। সে জানত—ব্রজদুলাল রাত্রে শয়নের পূর্বে সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়েন ড্রিঙ্ক করতে করতে।

সেরাত্রেও শয়নের পূর্বে সোফায় বসে যথারীতি খবরের কাগজ পড়বার জন্য সামনের টেবিল-ল্যাম্পটা জালাতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয় হাই কারেন্টের ইলেক্ট্রিসিটিতে। ইতিমধ্যে নিষ্পন্দীপ হয় ঐ অঞ্চল। এবং ওই নিষ্পন্দীপের মধ্যেই কোন এক সময় অঙ্ককারে ওই ঘরে সবার অলঙ্কৃত পাশের লাইরেরী ঘরের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে প্রশান্ত আসল ল্যাম্পটা সরিয়ে দ্বিতীয় ল্যাম্প যথাস্থানে রেখে যায়। কিন্তু এত করেও সে তিনটি মারাত্মক ভুল করেছিল।

তিনটি মারাত্মক ভুল!

হ্যাঁ, মিঃ মল্লিক! প্রথম ভুল, রেবেকার সাহায্যে সাধনবাবুকে দিয়ে মাদ্রাজ থেকে ব্রজদুলালকে ট্রাফিক কল করে তাড়াহত্তো করে নিয়ে এসে। দ্বিতীয় ভুল করেছিল, আসল ল্যাম্পটা বদলে—দ্বিতীয় একটা নতুন ল্যাম্প সেখানে বদলে রেখে। এবং তৃতীয় মারাত্মক ভুল করেছিল, ঘরের দরজাটা খুলে রেখে দিয়ে।

হত্যা সে করেছিল নিশ্চয়ই ব্রজদুলালের সম্পত্তির লোডে? সুখময় মল্লিক বলেন।

ঠিক তাই। উইলের ড্রাফট হয়ে গিয়েছে শুনে উইল পাকাপোক্ত হবার আগেই সে তাই ট্রাফিক কল করে মাদ্রাজ থেকে এনে ব্রজদুলালকে হত্যা করেছিল। কারণ উইলে কোন রকম কিছু না থাকলে সম্পত্তি পেতে তো কোন অসুবিধাই হত না। কিন্তু আর না মিঃ মল্লিক—রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, এবাবে আমি বিদায় নেব।

কিরীটী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে বাইরে পুলিসের কালো ভ্যানও এসে গিয়েছিল।

হত্যাকারী প্রশান্ত সাহা ও রেবেকা মণ্ডলকে নিয়ে মিঃ মল্লিক হাজতে যাবার জন্য উচ্চে দাঁড়ালেন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত